বারাহীনে আহমদীয়া

মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার স্বপক্ষে
উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি

৫ম খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

বারাহীনে আহমদীয়া

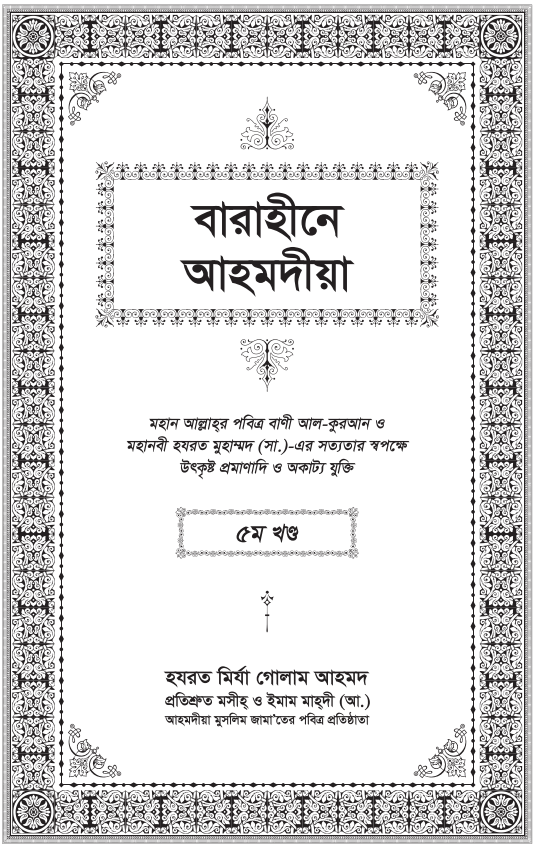
মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার স্বপক্ষে
উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি

৫ম খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

বারাহীনে আহমদীয়া

৫ম খণ্ড



প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

বারাহীনে আহমদীয়া
৫ম খণ্ড

গ্রন্থস্বত্ব | ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.

প্রকাশনায় | আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

মূল | হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

ভাষান্তর | মওলানা ফিরোজ আলম
ইনচার্জ, মরকযী বাংলা ডেস্ক, ইউ. কে.

প্রকাশকাল | জুন ২০২৬

সংখ্যা | ২০০০ কপি

মুদ্রণে | বাড-ঔ-লিভস্
বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন,
৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Barahin-e-Ahmadiyya
Part-5

বারাহীনে আহমদীয়া
৫ম খণ্ড

by **Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian**
The Promised Messiah and Imam Mahdi as

Translated into Bangla by
Maulana Feroz Alam
Incharge, Markazi Bangla Desk, UK

First Published in Bangladesh in June 2026

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

© **Islam International Publications Ltd., UK**

ISBN 978-984-991-069-5

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর দাবির পূর্বে মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সত্যতা আর ইসলাম যে খোদা-মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ ধর্ম তা প্রমাণের উদ্দেশ্যে পঞ্চাশটি খণ্ডের সমন্বয়ে একটি বই লেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। সেই অনুযায়ী, এর প্রথম চারটি খণ্ড ১৮৮০-১৮৮৪ সালের মাঝে প্রকাশিত হয় আর হিন্দুস্থানের সাধারণ ও বিশিষ্ট্য মুসলমানরা ইসলামের সুরক্ষায় এটিকে একটি অনন্য ও অতুলনীয় রচনা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এমনকি মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালবি এ সম্পর্কে লিখেছেন,

"আমার মতে, এই যুগে এবং বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে এটি এমন একটি পুস্তক, যার কোনো দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত ইসলামে প্রকাশিত হয় নি।" (ইশায়াতুস সুন্নাহ, খণ্ড: ৭, পৃ. ১৬৯)

উল্লেখিত চারটি খণ্ড প্রকাশের পর আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ ইচ্ছায় এ পুস্তকের অবশিষ্ট খণ্ডগুলোর প্রকাশ স্থগিত থাকে অথচ ইসলামের সত্যতা এবং মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তের স্বপক্ষে তিনি (আ.) এ সময়ের ভেতর আশির অধিক অনন্য গ্রন্থ রচনা করে প্রকাশ করেন। অবশেষে ১৯০৫ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ার পঞ্চম খণ্ড লেখা আরম্ভ করেন। তিনি 'বারাহীনে আহমদীয়া'র পঞ্চম খণ্ড রচনা করেন দীর্ঘ তেইশ বছর পর। তিনি এটিকে বারাহীনে আহমদীয়ার 'পুনর্জন্ম' বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন,

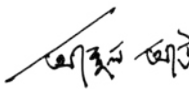
"স্বাভাবিকভাবেই খোদা তা'লার সকল কাজে প্রজ্ঞা ও কল্যাণ নিহিত থাকে, কিন্তু এই মহান ধর্মসেবামূলক গ্রন্থ, যা লেখার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের সকল বিরোধীর আপত্তির অপনোদন– তাই এটি সম্পূর্ণ হবার কাজটি প্রায় ২৩ বছর বিলম্বিত হবার নেপথ্যে কী প্রজ্ঞা থাকতে পারে? এর উত্তর খোদা তা'লাই ভালো জানেন; কোনো মানুষের পক্ষে তাঁর রহস্যাবলী আয়ত্ব ও উন্মোচন করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি যতটা বুঝি তা হলো, এ গ্রন্থের প্রকাশিত চার খণ্ডে এমনসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রথম চার খণ্ডের যুক্তিপ্রমাণাদি পর্দার আড়ালেই থেকে যেত। তাই বারাহীনে আহমদীয়া লেখা ততদিন স্থগিত থাকা আবশ্যক ছিল, যতদিন না কালের প্রবাহে অপ্রকাশিত

বিষয়াদি প্রকাশ পেয়ে যায় আর এসব খণ্ডে লিপিবদ্ধ দলিল-প্রমাণাদি দৃশ্যপটে এসে যায়। কেননা বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ডে এ অধমের প্রতি অবতীর্ণ ঐশীবাণী বা এলহাম– ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী ছিল। অধিকন্তু এতে যে-সব ভবিষ্যদ্‌বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে তা মানুষের সামনে প্রকাশিত হবার দাবি রাখত। তাই প্রজ্ঞাশীল ও সর্বজ্ঞানী খোদা ততদিন বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশ করা বিলম্বিত করেন, যতদিন না সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকাশিত হয়েছে।" (রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২১, পৃ. ৩)

এই পুস্তকটির বিশেষত্ব হলো, হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) এর লেখা একটি মুখবন্ধ এর শোভাবর্ধন করছে। পুস্তকটির অনুবাদ করেছেন মোহতরম মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, ইনচার্জ, মরকযী বাংলা ডেস্ক, লন্ডন। আল্লাহ্ তা'লা তার এই ঐকান্তিক পরিশ্রম গ্রহণ করে তাকে পরজীবনে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরণে ঠাঁই দিন। পুস্তকটির প্রচ্ছদ নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) নির্বাচিত করে সদয় অনুমোদন দান করেছেন।

এ পুস্তকটি বাংলা ভাষায় ছাপার ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য তারা হলেন সর্বজনাব আহমদ তারেক মুবাশ্বের, মামুন-উর-রশীদ, মুহাম্মদ আকরামুল ইসলাম, মোহাম্মদ সোলায়মান, মাহমুদ আহমদ সুমন, সজিব আহমেদ, মোবারিজ আহমদ, শেখ মোস্তাফিজুর রহমান ছাড়াও আরো অনেকেই। যারাই এ কাজের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত খোদা তাদের সকলকে পুরস্কৃত করুন।

আশা করি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এ পুস্তকের মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা পাবে এবং ইসলাম ও আমাদের প্রিয়নবী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বিশ্ববাসীর কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হবে– আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এটিই আমাদের প্রত্যাশা।



আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ঢাকা
জুন ২০২৬



MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
و على عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

অবতরণিকা

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য ১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই খণ্ডগুলোতে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে প্রাপ্ত ওহী ও ঐশীবাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। এর ফলে নানামুখী সমালোচনার ঝড় ওঠে, এবং এই সমালোচনা আরো তীব্র রূপধারণ করে যখন ১৮৯০ সালে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অবহিত করেন যে, হযরত ঈসা (আ.) যাঁকে সাধারণত আকাশে জীবিত বলে মনে করা হয়– সত্যিকার অর্থে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং শেষ যুগের প্রতীক্ষিত মসীহ্ তিনি ছাড়া আর কেউ নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের বাণী প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে গ্রন্থ রচনা অব্যাহত রাখলেও, তিনি 'বারাহীনে আহমদীয়া'র পঞ্চম খণ্ড রচনা করেন দীর্ঘ তেইশ বছর পর। তিনি এটিকে বারাহীনে আহমদীয়ার 'পুনর্জন্ম' বলে অভিহিত করেছেন।

'বারাহীনে আহমদীয়া পঞ্চম খণ্ড' মূলত সেসব চিরন্তন বিষয়ে সমৃদ্ধ যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমগ্র জীবন ও মিশনকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। যেমন- মহান আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও ঐশী তত্ত্বজ্ঞান, পবিত্র কুরআনের ঐশী উৎস ও এর পরমোৎকর্ষতা, মহানবী (সা.)-এর সত্যতা এবং আদর্শ মানব হিসেবে তাঁর অনন্য মর্যাদা, আর আন্তঃধর্মীয় সংলাপে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা। তিনি আরো ঘোষণা করেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমন এবং ইমাম মাহদী সম্পর্কিত শেষ যুগের ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহ তাঁরই সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে। নীচে এই গ্রন্থের কিছু নির্বাচিত অংশ তুলে ধরা হলো যা এই দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করে।

খোদাপ্রেম ও ঐশী তত্ত্বজ্ঞান

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান উদ্দেশ্যই হলো, ঐশী নিদর্শনাবলির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করা যেন মানুষ খোদার পবিত্র চেহারা অবলোকন করতে পারে। তিনি (আ.) লেখেন,

اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا

"খোদার পরিচয় লাভ এবং তাঁকে দর্শন করাই হলো আসল উদ্দেশ্য। সেই পরম বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ করাই হলো প্রকৃত জান্নাত।" (পৃ. ১৭)

اس بے نشان کی چہرہ نمائی نشان سے ہے سچ ہے کہ سب ثبوت خدائی نشان سے ہے

"চিহ্নবিহীন সেই সত্তার মুখচ্ছবি কেবল নিদর্শনের মাধ্যমেই উন্মোচিত হয়, সত্য কথা হলো– খোদার অস্তিত্বের সব প্রমাণ ঐশী নিদর্শনের মাঝে নিহিত।" (পৃ. ২০)

সত্য ধর্ম প্রকৃতপক্ষে সেটিই– যা মানুষের আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব দূর করতে সক্ষম এবং তাকে এমন উচ্চ মাত্রায় ঐশী আশিস ও কল্যাণে ধন্য করে, যার ফলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি তাদের ব্যবহারিক জীবনে সুস্পষ্ট হয়ে পরিলক্ষিত হয়। কেবল সেটিই সত্য ধর্ম এবং কেবল সেটিই তার একনিষ্ঠ অনুসারীকে সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে, যার তৃষ্ণা তার আত্মায় প্রোথিত রয়েছে। (পৃ. ৪৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, কেবল যুক্তিতর্কের মাধ্যমে খোদার অস্তিত্বের একটি অসম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা সত্যের কোনো সন্ধানীর লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, বরং 'আল্লাহ্ তা'লার পূর্ণ মারেফাত' লাভ করা উচিত বা খোদাকে চেনা উচিত। এটি তখনই সম্ভব যদি আল্লাহ্ স্বয়ং চেষ্টাসাধনাকারী ও আত্মশুদ্ধি অর্জনকারীদের কাছে তাঁর রহস্য উন্মোচন করেন।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বা উৎকর্ষ শিক্ষা

কেবল একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মই খোদা সম্পর্কে পূর্ণ মারেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে পারে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলাম (বা যে-কোনো ধর্মের) সম্পূর্ণ ও কামিল ধর্ম গণ্য হতে হলে তাতে দুটি যুক্তি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক বলে উল্লেখ করেন।

প্রথমত, সেই ধর্ম স্বীয় বিশ্বাস, শিক্ষা ও বিধিবিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে এতটাই সম্পূর্ণ, কামেল ও পরিপূর্ণ হওয়া আর অপূর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত, যার চেয়ে উৎকৃষ্টতার কথা কল্পনাই করা যায় না। অধিকন্তু তাতে যেন ত্রুটি ও ঘাটতি চোখে না পড়ে আর সেই শ্রেষ্ঠত্বে যেন সব ধর্মের ওপর বিজয়ী হয়। অর্থাৎ এই গুণাবলিতে কোনো ধর্ম যেন এর সমান না হয়। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআন নিজেই এ দাবি করেছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থাৎ আজ আমি আমার ধর্মকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ করেছি আর ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্ম হিসেবে মনোনীত করেছি।

দ্বিতীয়ত, ইসলামে বিদ্যমান দ্বিতীয় প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব হলো এর জীবন্ত কল্যাণরাজি ও নিদর্শন, যে-ক্ষেত্রে কোনো ধর্ম-ই এর সমকক্ষ নয়, আর যা এর সত্যতায় সুমহান মোহর খচিত করে। অন্যান্য ধর্মাবলি এ হতে সম্পূর্ণরূপে রিক্তহস্ত। এগুলো এমন কামেল নিদর্শন, যার মাধ্যমে ইসলাম কেবল অন্যান্য ধর্মাবলির বিরুদ্ধে জয়যুক্তই হয় না বরং স্বীয় পূর্ণ জ্যোতি প্রদর্শন করে অন্যদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। (পৃ. ৩-৫)

এই নিখুঁত শিক্ষা সত্য-সন্ধানীর জীবনে এক অলৌকিক পরিবর্তন এনে দেয়, যার ফলে সে খোদার অস্তিত্বের জীবন্ত প্রমাণ হয়ে যায়।

একজন পুণ্যবান ব্যক্তির নিদর্শনমূলক জীবন

اسلام چیز کیا ہے خدا کے لئے فنا ترکِ رضائے خویش پئے مرضی خدا

ইসলাম কী? আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিলীন করে দেওয়া, খোদার ইচ্ছার সামনে নিজের সমস্ত চাওয়াপাওয়াকে বিসর্জন দেওয়া। (পৃ. ২৬)

একজন পুণ্যবান মানুষের সমগ্র জীবন জুড়ে যে অলৌকিক নিদর্শনাবলি প্রকাশ পায়, সে সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন,

মনে রাখবেন, একজন পুণ্যবান ব্যক্তির অলৌকিক জীবন মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের পক্ষে স্বর্গ-মর্ত্য তথা সমগ্র সৃষ্টির চেয়েও বড়ো প্রমাণ বহন করে। কারণ কেউ কখনো ঈশ্বরকে নিজের হাতে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করতে দেখে নি। (পৃ. ৫৬)

মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজের জীবনকেই এমন একটি অলৌকিক

জীবনের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যা ঐশী নিদর্শন এবং অদৃশ্য জ্ঞান লাভে ধন্য ছিল।

ভূমিকম্প সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী

অতএব এই গ্রন্থে মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর প্রতি মহান আল্লাহ্‌র অসংখ্য অনুগ্রহ এবং তাঁর জীবনের বহু অলৌকিক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তাঁকে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। এমন একটি নিদর্শন হলো ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণী। মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেছিলেন,

زلزلہ کا دھکا

ভূমিকম্পের তীব্র আঘাত।

এরপর আরেকটি ওহী অবতীর্ণ হয়:

عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمُقَامُهَا

অস্থায়ী বাসস্থান এবং স্থায়ী অট্টালিকা– সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এই ভবিষ্যদ্‌বাণীটি তখন পূর্ণ হয় যখন ১৯০৫ সালের ৪ এপ্রিল ভারতের কাংড়া উপত্যকায় একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে। পরবর্তীকালে তিনি বার বার ওহী লাভ করেন যে, কিয়ামতসদৃশ অপর একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানতে যাচ্ছে। তখন তিনি এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের আগমন বিলম্বিত করার জন্য খোদার কাছে দোয়া করেন। আল্লাহ্ তাঁর এই দোয়া গ্রহণ করেন এবং তদনুযায়ী ভূমিকম্পটি স্থগিত করেন। কালক্রমে, এই মহান ভবিষ্যদ্‌বাণীটি তখন অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয় যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 'ভূমিকম্পে' সমগ্র বিশ্ব কেঁপে ওঠে। এটি এমন এক বিপর্যয় যার নজির ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায় নি। এই বিপর্যয় সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.) যে স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছিলেন, তাতে রাশিয়ার জার-এর শোচনীয় পতনের কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা প্রকাশ্যভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তাঁর একটি উর্দু কবিতায় তিনি লিখেছেন,

مضمحل ہو جائیں گے اس خوف سے سب جنّ و انس　　زار بھی ہو گا تو ہو گا اس گھڑی با حالِ زار

এই ভয়ে মানব ও জিন সবাই যারপর নাই বিচলিত হয়ে পড়বে;
আর রাশিয়ার জার নিজেও সেই মুহূর্তে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার
মুখোমুখি হবে। (পৃ. ২১৮)

আন্তঃধর্মীয় সংলাপে শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা

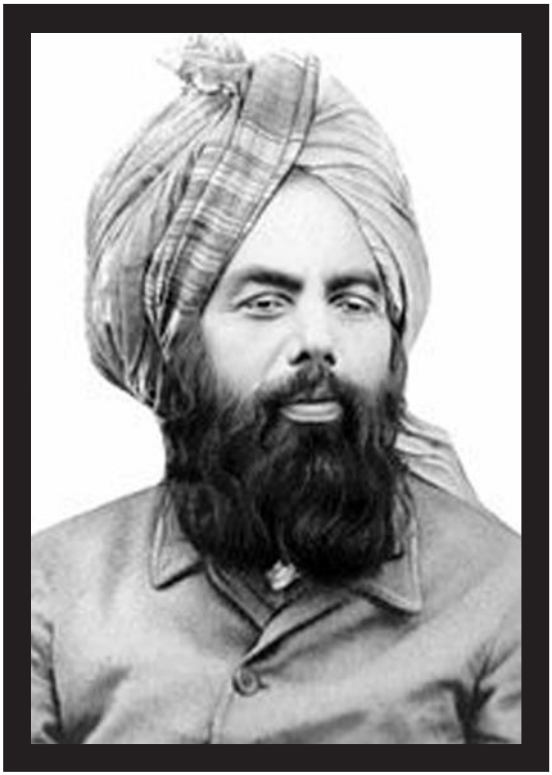
বর্তমান যুগে ধর্মকে প্রায়শই বিভেদ সৃষ্টি এবং অসম্মান প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, অথচ একটি সত্য ধর্ম সর্বদা আচরণের ভদ্রতা এবং মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য গঠনমূলক আলোচনাকে উৎসাহিত করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন,

স্মরণ রাখা উচিত, ধর্মের নামে কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে যে অযথা বিবাদবিসংবাদ, গালমন্দ, কটুক্তি এবং নোংরা ভাষা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, কিন্তু নিজের অভ্যন্তরীণ পাপাচারকে দূরীভূত করা হয় না; অধিকন্তু সেই সত্যিকার প্রেমাস্পদের সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা হয় না আর একদল অন্যদলের ওপর মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে কুকুরের মতো আক্রমণ করে, এছাড়া ধর্মের ছত্রছায়ায় যাবতীয় কামনা-বাসনাজাত হীনতা প্রদর্শন করা হয়; এই নোংরা রীতিনীতি নিছক (অসার) হাড়সদৃশ; এটি এমন নয় যার নাম ধর্ম রাখা যেতে পারে। (পৃ. ২৮)

মসীহ্ মওউদ (আ.) 'বারাহীনে আহমদীয়া পঞ্চম খণ্ড' রচনায় তেইশ বছরের বিলম্বকে আল্লাহ্‌রই এক অমোঘ নিয়তি আখ্যায়িত করেছেন, যাতে তিনি বইয়ের পূর্ববর্তী অংশগুলোতে লিপিবদ্ধ নিদর্শন ও ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোর পূর্ণতা সমগ্র বিশ্বের সামনে প্রকাশ করতে পারেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির সত্যতার বহু নিদর্শন আজও নিরন্তর প্রকাশ পাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৮৮৯ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠা এবং খিলাফত ব্যবস্থা, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে– যেন বিশ্বব্যাপী ইসলামের বাণী প্রচার করা যায় এবং মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পঞ্চম উত্তরসূরি (খলীফা) হিসেবে, আমি সমস্ত ন্যায়পরায়ণ মানুষকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী নিরপেক্ষভাবে যাচাই এবং সকল প্রধান ধর্মে বর্ণিত যুগের লক্ষণাবলির আলোকে এ সম্পর্কে প্রণিধান করার আহ্বান জানাই। এটি এমন একটি বাণী যা বিশ্ব কোনোভাবেই উপেক্ষা করতে পারে না। মহান আল্লাহ্ তাদের অন্তরাত্মাকে আলোকিত করুন যারা এই গ্রন্থের বাণী পাঠ করবেন এবং এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করবেন, আমীন।

মির্যা মসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস
লন্ডন, জুন ২০২৬

লেখক পরিচিতি



হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাসে এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি একদিকে ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান ও ফলপ্রসূ লেখক, গবেষক এবং ধর্মতাত্ত্বিক; অন্যদিকে ছিলেন আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেমানুরাগী ও রসূলপ্রেমে নিবেদিত এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন, সাহিত্যকর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনা এই দুটি ধারাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করেছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ছিলেন এক নজিরবিহীন সৃষ্টিশীল লেখক। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি প্রায় ৮০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখাগুলি কেবল সংখ্যায় বিপুল নয়, বরং বিষয়বস্তুর গভীরতা, যুক্তিতর্কের বলিষ্ঠতা এবং সাহিত্যের দিক থেকেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাঁর লেখার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত আদর্শ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে

আল্লাহর পবিত্র অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া আর ইসলামের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি খ্রিষ্টান মিশনারি ও আর্যসমাজিদের প্রবল আক্রমণের মুখে ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

তিনি পবিত্র কুরআনের এমনসব গভীর ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেন, যা আধুনিক যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম। এছাড়া তিনি নিজের দাবির পক্ষেও অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এই দাবির সমর্থনে ঐশী নিদর্শন ও যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

তাঁকে আরবী, ফার্সী ও উর্দু– এই তিনটি ভাষার একজন দক্ষ লেখক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর আরবী রচনায় অলংকারশাস্ত্রের এমন ব্যবহার দেখা যায়, যা তৎকালীন আরবী পণ্ডিতদেরও বিস্মিত করেছিল। তাঁর লেখা তর্ক, যুক্তি, জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির এক অপূর্ব মিশ্রণ।

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সাহিত্যকর্ম তাঁর হৃদয়ের গভীরতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরই বহিঃপ্রকাশ, যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় নিবেদিত। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এতটাই গভীর প্রেম ও আনুগত্য দেখিয়েছেন যে তাঁর দাবি হলো– এই প্রেমের মাধ্যমেই তিনি আল্লাহর দৃষ্টিতে মসীহ মওউদের মর্যাদা লাভ করেছেন।

তিনি তাঁর ঐশ্বরিক দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করে ১৯০৮ সালের ২৬ মে তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী পুনরায় উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯১৪ সালে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে খিলাফতের আসন অলংকৃত করেন। ১৯৬৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালে তাঁর তিরোধানের পর হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। এরপর তিনি সুদীর্ঘ ২২ বছর খিলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন। ২০০৩ সালে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) পঞ্চম খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত এ ঐশী জামা'ত বর্তমানে বিশ্বের ২২০টি দেশে খাঁটি ইসলাম প্রচার করে চলেছে।

সূচিপত্র

৫ম খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
১) বারাহীনে আহমদীয়ার পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকা	১
২) নুসরাতুল হক	৯
৩) প্রকৃত বিশ্বাসের লক্ষণসমূহ	৩৯
৪) **প্রথম অধ্যায়ঃ** মুজিযা বা অলৌকিক নিদর্শনের প্রকৃত স্বরূপ ও এর প্রয়োজনীয়তা	৭২
৫) **দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ** ভবিষ্যদ্‌বাণীর পরিপূর্ণতা	৭৮
৬) বারাহীনে আহমদীয়া পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্ট	২০২
৭) মৌলবি সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের কতক সন্দেহ-সংশয়ের নিরসন	৪০১
৮) মৌলবি রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের অসংলগ্ন উক্তিসমূহের একটি সংকলন	৪৩৭
৯) উপসংহার	৪৭৮
১০) বিবিধ নোট	৪৮২

(حقوق محفوظ)

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا

آنانکہ بردعاوی ما حملہ کنند | وز راہِ جہل عربدہ ہا بر ملا کنند
گر بایک نظر کنند درین نسخہ کتاب | ہست این یقین کہ ترکِ عناد و دغا کنند
باور نمی کنم کہ نیایند عذر خواہ | ویں امرِ دیگر است کہ ترکِ حیا کنند

براہین احمدیہ

حصہ پنجم

(۵)

ملقب

بالبراہین الاحمدیۃ علی حقیۃ کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیۃ

از تازہ تفضلات حضرت معبود و باقیات الصالحات حضرت میرزا غلام احمد صاحب مسیح موعودؑ

انوار احمدیہ مشین پریس قادیان میں شیخ یعقوب علی تراب پروپرائٹر
کے اہتمام سے چھپکر ۱۵۔ اکتوبر ۱۹۰۸ء کو شایع ہوئی۔

تعداد جلد ۱۶۰۰ | قیمت فی جلد ۱۲ر

(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

যারা আমার দাবিকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করে
তারা বিনা কারণে অজ্ঞতাবশত আমার সাথে প্রকাশ্যে কলহে লিপ্ত হয়।

তারা যদি এই পুস্তকে একটি বার দৃষ্টিপাত করত,
তবে এটি নিশ্চিত যে, তারা শত্রুতা ও অস্বীকার করা থেকে বিরত হতো।

আমি বিশ্বাস করি না যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ফিরে আসবে না,
তবে তারা লজ্জাবোধ বিসর্জন দিলে ভিন্ন কথা।

বারাহীনে আহমদীয়া

পঞ্চম খণ্ড

যেটির নামকরণ করা হয়েছে–

بِالْبَرَاہِیْنِ الْاَحْمَدِیَّةِ عَلٰی حَقِّیَّةِ کِتَابِ اللّٰہِ الْقُرْاٰنِ وَالنُّبُوَّةِ الْمُحَمَّدِیَّةِ

[পবিত্র কুরআনের ঐশী উৎস হতে উৎসারিত হওয়ার স্বপক্ষে এবং
মুহাম্মদী নবুওয়তের সত্যতার অনুকূলে প্রমাণাদি]

মহান আল্লাহপ্রদত্ত অনুগ্রহরাজি এবং
মসীহ মওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর
অক্ষয় কীর্তিসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

মুদ্রণ: আনওয়ার-এ-আহমদীয়া মেশিন প্রেস, কাদিয়ান।
প্রোপ্রাইটর: শেখ ইয়াকূব আলী তুরাব
প্রকাশ: ১৫ অক্টোবর ১৯০৮

মূল্য: ১২ আনা সংখ্যা: ১৬০০

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

বারাহীনে আহমদীয়ার পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকা

بحمد اللہ کہ آخر ایں کتابم مکمل شد بفضلِ آن جنابم

[আল্লাহর প্রশংসাগীত গেয়ে বলছি, অবশেষে আমার এ গ্রন্থ সেই মহাসম্মানিত খোদার কৃপায় সমাপ্ত হচ্ছে। –অনুবাদক]

এরপর স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলছি, এটি বারাহীনে আহমদীয়ার পঞ্চম খণ্ড যা এই ভূমিকার পর লিপিবদ্ধ করা হবে। ঐশী প্রজ্ঞা ও কল্যাণের বিবেচনায় যা ঘটে তা হলো– এ গ্রন্থের চারটি খণ্ড প্রকাশিত হবার পর এর ছাপার কাজ দৈবক্রমে প্রায় ২৩ বছর স্থগিত ছিল। এর চেয়েও বিস্ময়কর বিষয় হলো, এ সময়ের মধ্যে আমি আশিটির মতো পুস্তক রচনা করেছি, যেগুলোর কোনো কোনোটি অনেক বড়ো আকারেরও ছিল, অথচ এ গ্রন্থের কাজ সমাপ্ত করার প্রতি আমার মনোযোগই নিবদ্ধ হয় নি। বেশ কয়েকবার হৃদয়ে এক বেদনা জাগ্রত হয় যে, বারাহীনে আহমদীয়ার কাজ দীর্ঘকাল যাবৎ মুলতুবি রয়েছে! কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও আর ক্রেতাদের পক্ষ থেকেও বইটির জন্য প্রবল দাবি উত্থাপিত হয়, অধিকন্তু এত দীর্ঘকাল কাজের স্থগিতাবস্থার দরুন বিরোধীদের পক্ষ থেকেও আমার সম্পর্কে এমনসব আপত্তি করা হয়, যা ছিল কুধারণা ও নোংরা ভাষার দুর্গন্ধে চরমভাবে কলুষিত; যা দীর্ঘ সময় লাগার কারণে হৃদয়ে দানা বাঁধা ছিল স্বাভাবিক একটি বিষয়– কিন্তু তা সত্ত্বেও নিয়তি আমাকে এই বই লেখার কাজ সম্পন্ন করার সামর্থ্য দেয় নি। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃতপক্ষে নিয়তি বা তকদীর এমন এক বিষয়– যার বেষ্টনি হতে বেরিয়ে আসা মানুষের সাধ্যের বাইরে। এ কারণে আমার আক্ষেপ হয় বরং আমার হৃদয় ব্যথিত হয় এই ভেবে যে, এ পুস্তকের অনেক ক্রেতা, পুস্তক

লেখা বা ছাপার কাজ সমাপ্ত হবার আগেই এই ধরাধাম হতে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু যেমনটি আমি লিখেছি; মানুষ ঐশী নিয়তির অধীন। ঐশী অভিপ্রায় যদি মানুষের অভিপ্রায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে মানুষ শত চেষ্টা করেও নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারে না। পক্ষান্তরে ঐশী অভিপ্রায় যখন মানুষের অভিপ্রায়ের অনুকূলে এসে যায়, তখন যে-সব বিষয় অত্যন্ত কঠিন মনে হতো তা-ও অতি সহজেই সাধিত হয়।

স্বাভাবিকভাবেই খোদা তা'লার সকল কাজে প্রজ্ঞা ও কল্যাণ নিহিত থাকে, কিন্তু এই মহান ধর্মসেবামূলক গ্রন্থ, যা লেখার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের সকল বিরোধীর আপত্তির অপনোদন, তাই এটি সম্পূর্ণ হবার কাজটি প্রায় ২৩ বছর বিলম্বিত হবার নেপথ্যে কী প্রজ্ঞা থাকতে পারে? এর উত্তর খোদা তা'লাই ভালো জানেন; কোনো মানুষের পক্ষে তাঁর সকল রহস্যকে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি যতটা বুঝি তা হলো, এ গ্রন্থের প্রকাশিত চার খণ্ডে এমনসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রথম চার খণ্ডের যুক্তিপ্রমাণাদি পর্দার অন্তরালেই থেকে যেত। তাই বারাহীনে আহমদীয়া লেখা ততদিন স্থগিত থাকা আবশ্যক ছিল, যতদিন না কালের প্রবাহে অপ্রকাশিত বিষয়াদি প্রকাশ পেয়ে যায় আর এসব খণ্ডে লিপিবদ্ধ দলিল-প্রমাণাদি দৃশ্যপটে এসে যায়। কেননা বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ডে এ অধমের প্রতি অবতীর্ণ খোদা তা'লার ঐশীবাণী বা এলহাম– যা বিভিন্ন জায়গায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তা ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী ছিল। অধিকন্তু এতে যে-সব ভবিষ্যদ্‌বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে তা মানুষের সামনে প্রকাশিত হবার দাবি রাখত। তাই সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকাশিত হবার আগ পর্যন্ত প্রজ্ঞাশীল ও সর্বজ্ঞানী খোদা বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশ করতে বিলম্বিত করেন। এছাড়া স্মরণ রাখার মতো বিষয় হলো, কোনো ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য অর্থাৎ এর খোদার পক্ষ থেকে হবার প্রমাণস্বরূপ দুধরনের বিজয় বা সত্য তাতে বিদ্যমান ও বিরাজমান থাকা আবশ্যক।

প্রথমত– সেই ধর্ম, বিশ্বাস, শিক্ষা ও বিধিবিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে এতটাই সম্পূর্ণ, নিখুঁত, পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত হওয়া চাই যার চেয়ে উৎকৃষ্টতা কল্পনাই করা যায় না। অধিকন্তু তাতে যেন ত্রুটি ও ঘাটতি চোখে না পড়ে। সেই শ্রেষ্ঠত্বে যেন সব ধর্মের ওপর বিজয়ী হতে পারে। অর্থাৎ এসব গুণাবলিতে কোনো ধর্ম যেন এর সমান না হয়। উদাহরণস্বরূপ পবিত্র কুরআন নিজেই এ দাবি করেছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

(আল-মায়েদা: ৪)

অর্থাৎ আজ আমি আমার ধর্মকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ করেছি আর ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করেছি। অর্থাৎ সেই প্রকৃত তত্ত্বকথা যা ইসলাম শব্দে বিদ্যমান; যার ব্যাখ্যা স্বয়ং খোদা তা'লা ইসলাম শব্দের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন, সেই সত্যের ওপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত হও। এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, একমাত্র পবিত্র কুরআনই পরিপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছে, অধিকন্তু কুরআন শরীফের যুগই এমন যুগ, যখন উৎকৃষ্টতম শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক ছিল। অতএব পবিত্র কুরআন পরিপূর্ণ শিক্ষা হবার যে দাবি করেছে, সেই অধিকার একমাত্র এরই ছিল। অন্য কোনো ঐশীগ্রন্থ এমন দাবি করে নি; এটি সব চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই অবগত। উদাহরণস্বরূপ তওরাত ও 'ইনজীল' উভয়ই এ দাবি করা থেকে বিরত রয়েছে, কেননা তওরাতে খোদা তা'লার এ উক্তি বিদ্যমান রয়েছে– আমি তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে এক নবী প্রেরণ করব, যার মুখে আমার বাণী সঞ্চার করব আর যে তার কথা মান্য করবে না, তাকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করব।

অতএব এটি স্পষ্ট, ভবিষ্যতের প্রয়োজনে তওরাত মেনে চলাই যদি যথেষ্ট হতো তাহলে অন্য কোনো নবী আগমনের প্রয়োজন ছিল না। অধিকন্তু ঐশী শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করা সেই বাণী অনুসরণের ওপর নির্ভরশীল হতো যা তার প্রতি অবতীর্ণ হতো। অনুরূপভাবে 'ইনজীল' কোথাও নিজ শিক্ষাকে পরিপূর্ণ ও সর্বগুণে গুণান্বিত বলে দাবি করে নি। বরং প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে যে, আরো অনেক কথা বর্ণনা করার আছে কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু যখন ফারকলীত (তথা সত্যের আত্মা) আসবেন, তখন তিনি সেসব কিছু বর্ণনা করবেন। এখন লক্ষণীয় বিষয় হলো, যেভাবে হযরত মূসা (আ.) তাঁর শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ আখ্যা দিয়ে ভবিষ্যতে আগমনকারী নবীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আ.)ও নিজের শিক্ষা অসম্পূর্ণ হবার কথা স্বীকার করে এই অজুহাত উপস্থাপন করেছেন যে, এখনও কামিল বা পরিপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপনের সময় আসে নি; কিন্তু ফারকলীত যখন আসবেন তিনি পরিপূর্ণ শিক্ষা বর্ণনা করবেন। অপরদিকে পবিত্র কুরআন–

তওরাত ও ইনজীলের ন্যায় অন্য কারো বরাত টানে নি বরং নিজের কামিল বা সম্পূর্ণ শিক্ষার কথা সমগ্র বিশ্বের সামনে ঘোষণা করে বলেছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

(আল-মায়েদা: ৪)

এ থেকে স্পষ্ট যে, শিক্ষা পরিপূর্ণ হবার দাবি একমাত্র পবিত্র কুরআন শরীফই করেছে। আমরা যথাস্থানে বর্ণনা করব, পবিত্র কুরআন কেবল দাবিই করে নি বরং যা দাবি করেছে তা সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে। এটি এমন একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা উপস্থাপন করেছে, যা তওরাতও উপস্থাপন করতে পারে নি আর 'ইনজীল'ও বর্ণনা করতে সক্ষম হয় নি। শিক্ষার মানদণ্ডে ইসলাম অন্য সকল ধর্মের ওপর বিজয় লাভ করেছে এবং পরিপূর্ণ শিক্ষা হবার দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য কোনো ধর্ম এর সামনে দাঁড়াতে পারে না; এটি ইসলামের সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে এক বিরাট দলিল।

দ্বিতীয়ত- ইসলামে বিদ্যমান দ্বিতীয় প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব হলো, এর জীবন্ত কল্যাণরাজি ও নিদর্শন, যে-ক্ষেত্রে কোনো ধর্মই এর সমকক্ষ নয়, আর যা এর সত্যতায় সুমহান মোহর খচিত করে। অন্যান্য ধর্ম এ হতে সম্পূর্ণরূপে রিক্তহস্ত। এগুলো এমন কামিল নিদর্শন, যার মাধ্যমে ইসলাম কেবল অন্যান্য ধর্মাবলির বিরুদ্ধে জয়যুক্তই হয় না বরং স্বীয় পূর্ণ জ্যোতি প্রদর্শন করে অন্যদের নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। স্মরণ রাখা আবশ্যক, ইসলামের সত্যতার প্রথম প্রমাণ হিসেবে এখন আমরা লিপিবদ্ধ করেছি যে, এর শিক্ষা হলো কামিল বা সম্পূর্ণ। আমরা মূলত একথা বোঝানোর জন্য এটি লিখেছি যে, ইসলাম একটি ঐশী ধর্ম কিন্তু এটি কোনো পরিষ্কার প্রমাণ নয় কেননা একজন বিদ্বেষী, অস্বীকারকারী যে সূক্ষ্মদর্শী নয়, সে হয়ত বলতে পারে– কোনো শিক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে না হয়েও সম্পূর্ণ হতে পারে, আর এটি অসম্ভব কিছু নয়। যদিও এ যুক্তি একজন বুদ্ধিমান সত্যানুসন্ধানীকে অনেক সন্দেহ থেকে মুক্ত করে বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে দেয় কিন্তু তা সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লিখিত দাবির সাথে অন্যান্য যুক্তি সংযুক্ত না হবে ততক্ষণ তা বিশ্বাসের পরম মার্গে উপনীত হতে পারে না। এ উভয় প্রমাণ সম্মিলিত হলে সত্যধর্মের জ্যোতি পূর্ণতা লাভ করে। যদিও সত্য ধর্ম হাজারো নিদর্শন ও জ্যোতি নিজের মাঝে রাখে, কিন্তু (কেবল) এ দুটি প্রমাণ অন্য কোনো প্রমাণের মুখাপেক্ষিতা ছাড়াই

সত্যানুসন্ধানীর হৃদয়কে বিশ্বাসের অমিয় সুধায় পরিতৃপ্ত করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের ওপর সত্যের সত্যতা শতভাগ স্পষ্ট করে। সুতরাং এই দুই প্রকার প্রমাণের উপস্থিতিতে অন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। আমি প্রথমে ইসলামের সত্যতা প্রমাণের লক্ষ্যে বারাহীনে আহমদীয়ায় তিনশ (৩০০) প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করব বলে মনস্থ করেছিলাম, কিন্তু আমি যখন গভীরভাবে প্রণিধান করি তখন বুঝতে পারি যে, এই দুই প্রকার প্রমাণ হাজারো প্রমাণের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণে খোদা তা'লা এ সিদ্ধান্ত হতে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন এবং উল্লিখিত প্রমাণ লিপিবদ্ধ করার জন্য আমার হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা সঞ্চার করেন। আমি যদি বারাহীনে আহমদীয়া সম্পূর্ণ করতে তড়িঘড়ি করতাম তাহলে এভাবে মানুষের সামনে ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করতে পারতাম না। কেননা বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম অংশগুলোতে অনেক ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে যা ইসলামের সত্যতার জোরালো প্রমাণ; কিন্তু তখনো খোদা তা'লার সেসব প্রতিশ্রুত নিদর্শন স্পষ্টভাবে পূর্ণ হবার সময় আসে নি। প্রত্যেক বুদ্ধিমান বুঝবে যে, মুজিযা ও নিদর্শনাবলি প্রকাশিত হবার কথা লিপিবদ্ধ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে, আর সত্য ধর্মের বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো কল্যাণরাজি ও নিদর্শনের বিদ্যমানতা। এর কারণ আমি এখনই বর্ণনা করে এসেছি যে, নিছক শিক্ষা কামিল হওয়া সত্য ধর্মের (সত্যতার) সাকুল্য ও স্পষ্ট প্রমাণ নয় যা পুরোপুরি স্বস্তিদায়ক হতে পারে। সুতরাং এ উভয় শ্রেণির প্রমাণ এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে ইনশাআল্লাহ এটি সমাপ্ত করব। যদিও বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে নিদর্শনাবলি প্রকাশিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নিজ ক্ষমতাবলে কোনো নিদর্শন প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনেক এমন কথা প্রথম খণ্ডগুলোতে বিদ্যমান ছিল, যেগুলোর ব্যাখ্যা করা আমার সাধ্যের বাইরে ছিল। কিন্তু ২৩ বছর পর সেই সময় এসে গেলে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সকল উপকরণ সহজলভ্য হলো। বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম অংশগুলোতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি অনুসারে পবিত্র কুরআনের তত্ত্ব ও গূঢ় বিষয়াদি আমার কাছে প্রকাশ করা হলো। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

(আর-রহমান: ২-৩)

এমন আরো অনেক বড়ো বড়ো নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছে।

নিষ্ঠাবান খোদাসন্ধানী মানুষমাত্রই খুব ভালোভাবে জানে, খোদা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান কেবল খোদার সাহায্যেই লাভ হতে পারে এবং খোদাকে কেবল খোদার সাহায্যেই চেনা যায়। খোদা নিজেকে চেনানোর সাকুল্য প্রমাণ কেবল নিজেই উপস্থাপন করতে পারেন; এটি মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে পুরোপুরি না চিনবে, মানুষ ব্যক্তিগত কোনো চেষ্টা ও কৌশলে পাপের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। এক্ষেত্রে কোনো প্রায়শ্চিত্তও বিন্দুমাত্র কাজের নয়। সেই কামিল তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত পাপ থেকে পবিত্র করার অন্য কোনো উপায় নেই, যা গভীর প্রেম ও পূর্ণ খোদাভীতির জন্ম দিতে পারে। এ দুটি জিনিস অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভয় ও ভালোবাসাই (মানুষকে) পাপ থেকে বিরত রাখে। কেননা ভালোবাসার অগ্নি যখন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে তখন তা পাপের খড়কুটো বা আবর্জনাকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। এই পবিত্র আগুন ও পাপের নোংরা আগুন একস্থানে একত্রিত হতে পারে না। বস্তুত পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত অর্জিত না হয়, ততক্ষণ মানুষ পাপ থেকেও বিরত থাকতে পারে না আর খোদাপ্রেমের ক্ষেত্রেও উন্নতি করতে পারে না। যতক্ষণ খোদার পক্ষ থেকে জীবন্ত কল্যাণরাজি ও নিদর্শন দেওয়া না হয় ততক্ষণ পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান অর্জন হয় না। সত্য ধর্মকে চেনার এটিই এমন এক মাধ্যম যা সকল শত্রুর মুখ বন্ধ করে দেয়। সেই ধর্ম যা উল্লিখিত উভয় প্রকার প্রমাণ নিজের মাঝে অন্তর্নিহিত রাখে অর্থাৎ এমন ধর্ম– যার শিক্ষা সকল অর্থে পরিপূর্ণ, যাতে কোনো ঘাটতি নেই অধিকন্তু নিদর্শনাবলি ও মুজিযার মাধ্যমে খোদা নিজেই এর সত্যতার সাক্ষ্য দেন; সেই ধর্মকে কেবল সেই ব্যক্তিই পরিত্যাগ করতে পারে যে খোদা তা'লাকে প্রাধান্য না দিয়ে পরকালের ওপর ক্ষণস্থায়ী জীবনকে এবং স্বজাতির সাথে নিজের অলীক সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়। সেই খোদা– যিনি আজও সেভাবেই সর্বশক্তিমান যেভাবে আজ থেকে দশ হাজার বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান ছিলেন; তাঁর নিত্যনূতন আশিসরাজি, নিদর্শনাবলি এবং শক্তিমত্তাপ্রকাশক নিত্যনূতন কর্মের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন হলেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস অর্জন হতে পারে। নতুবা বলতে হবে, এই খোদা সেই খোদা নন যিনি পূর্বে ছিলেন বা তাঁর ভেতর সেসব শক্তিমত্তা নেই যা পূর্বে ছিল। এ কারণে তাদের ঈমান অর্থহীন যারা খোদার নিত্যনূতন কল্যাণরাজি ও নিদর্শনাবলি দেখা হতে রিক্তহস্ত এবং যারা

মনে করে যে, তাঁর ক্ষমতাগুলো এখন অতীতের বিষয়, ভবিষ্যতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই!

পরিশেষে এটিও স্মরণ থাকা উচিত, বারাহীনে আহমদীয়ার বাকি অংশ ছাপার কাজ ২৩ বছর স্থগিত রাখা অনর্থক ও অকারণে ছিল না। বরং এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেসব বিষয় প্রকাশ পেয়ে যায় যা বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্বের খণ্ডগুলোতে ভবিষ্যদ্‌বাণীরূপে বিধৃত রয়েছে; ততক্ষণ পর্যন্ত যেন পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত না হয়। কেননা বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলো সুমহান ভবিষ্যদ্‌বাণীতে পরিপূর্ণ আর পঞ্চম খণ্ডের মহান উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিশ্রুত সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতার প্রকাশ (দেখিয়ে দেওয়া)। আল্লাহ নিতান্ত আপন কৃপায় আমাকে সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত জীবিত রেখেছেন আর তখন পঞ্চম খণ্ড লেখার মাহেন্দ্রক্ষণ এবং খোদার যে সাহায্য লাভ হয়েছে, কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তা উল্লেখের সময় উপস্থিত হলো। সুতরাং এটি প্রকাশ করার জন্য বারাহীনে আহমদীয়ার পঞ্চম খণ্ড লেখার সময় আমি এ অংশের নাম 'নুসরতুল হক' রেখেছি যাকে মূলত এ গ্রন্থের নবজন্ম বলা উচিত। যাতে সেই নাম চিরকালের জন্য একথার নিদর্শন হয়ে থাকে। কেননা শত-শত বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও নিছক খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থনে এ খণ্ডটি লেখার কাজ সুসম্পন্ন হয়। এ কারণে এ খণ্ডের প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠার প্রত্যেকটির প্রারম্ভে 'নুসরতুল হক' লেখা হয়েছে। কিন্তু এটি যে সেই 'বারাহীনে আহমদীয়া' যার প্রথম চার খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, তা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে পরবর্তী প্রত্যেক পৃষ্ঠার সূচনাতে বারাহীনে আহমদীয়া পঞ্চম খণ্ড লেখা হয়েছে। প্রথমে পঞ্চাশ খণ্ড লেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পাঁচ খণ্ডকেই এখন যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। পঞ্চাশ ও পাঁচে যেহেতু কেবল একটি শূন্যের পার্থক্য তাই পাঁচ খণ্ডের মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হলো।

তেইশ বছর পর্যন্ত পঞ্চম খণ্ড লেখার কাজ স্থগিত থাকার দ্বিতীয় কারণ হলো, যাদের হৃদয় কুধারণার ব্যাধিতে আক্রান্ত, খোদা তা'লা তাদের ধ্যানধারণা প্রকাশ করে দিতে চেয়েছেন, আর বাস্তবে তা-ই ঘটেছে। কেননা এত দীর্ঘ সময় বিলম্বের কারণে কাঁচা প্রকৃতির লোকেরা কুধারণার ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করেছে; এমনকি কিছু নোংরা স্বভাবের লোক গালমন্দ আরম্ভ করে দিয়েছে। এ পুস্তকের যে চার খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এর কিছু বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে আর কিছু (বিভিন্ন মানুষের কাছে) বিভিন্ন মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে।

যারা মূল্য দিয়েছে তাদের বেশিরভাগ গালিও দিয়েছে আবার অর্থও ফেরত নিয়েছে। তারা যদি তাড়াহুড়ো করে এমনটি না করত তাহলে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হতো; কিন্তু এতটুকু বিলম্বের মাধ্যমে তাদের প্রকৃতিগত অবস্থা কেমন– তা পরীক্ষা করা হয়ে গেছে।

এ বিলম্বের একটি কারণ হলো, খোদা তা'লা মানুষের কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, এ কাজ তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে হচ্ছে। বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্বের খণ্ডগুলোতে যে-সব এলহাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো তাঁরই পক্ষ থেকে, মানুষের বানানো নয়। এ গ্রন্থ লেখার কাজ যদি খোদার ইচ্ছার অধীনে না হতো এবং এসব এলহাম যদি খোদার পক্ষ থেকে না হতো তাহলে যে ব্যক্তি তাঁর দৃষ্টিতে প্রতারক আর যে নিজেই বানিয়ে বানিয়ে সেগুলোর নাম খোদার ওহী ও এলহাম রাখার মতো পাপ করে, তিনি তাকে ২৩ বছর অবকাশ দেবেন, যেন সে ঐশী ইচ্ছায় বারাহীনে আহমদীয়ার বাকি অংশ লেখার কাজ সমাপ্ত করতে পারে! আর কেবল এতটুকুই নয় বরং যে-সব বিষয় এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য মানবীয় শক্তিসামর্থ্যের বাইরে ছিল তা স্বীয় অনুগ্রহে নিজেই সম্পাদন করবেন। এটি জানা কথা, খোদা তা'লা যাকে মিথ্যা রচনাকারী হিসেবে জানেন, এরূপ ব্যক্তির সাথে স্নেহ ও অনুগ্রহের এই ব্যবহার করেন না। অতএব এ বিলম্বের মাধ্যমে আমার অনুকূলে ঐশী সাহায্য সমর্থন থাকার নিদর্শনও প্রকাশিত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে অনেক কাফির, দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদী আখ্যাদাতা, যারা আমাকে ইসলামের গণ্ডি-বহির্ভূত আখ্যা দিত আর মুবাহেলার আদলে মিথ্যাবাদীকে অভিশাপ দিত, তারা ধরাধাম হতে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু খোদা আমাকে জীবিত রেখেছেন আর আমাকে এমনসব সাহায্য-সমর্থন প্রদান করেছেন, মিথ্যাবাদী তো দূরের কথা বরং পৃথিবীতে খুব স্বল্পসংখ্যক সত্যবাদীই এমন অতীত হয়ে থাকবেন যাদের এভাবে সাহায্য-সমর্থন দেওয়া হয়েছে। অতএব যারা চোখ বন্ধ রাখে না এবং খোদার নিদর্শন গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত, তাদের জন্য এটি খোদা তা'লার প্রকাশ্য নিদর্শন।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
মসীহ্ মওউদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ہے شکر ربِّ عزّوجل خارج از بیاں جس کی کلام سے ہمیں اُس کا ملا نشاں

মহাসম্মানিত ও মহাপ্রতাপান্বিত খোদার প্রশংসা বর্ণনাতীত;
যাঁর বাণীর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি তাঁর দিশা।

وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں

যে জ্যোতি আমরা এই গ্রন্থে দেখতে পাই;
হাজার সূর্যেও সেই আলোর দেখা নাই।

اُس سے ہمارا پاک دل و سینہ ہوگیا وہ اپنے منہ کا آپ ہی آئینہ ہوگیا

এর দ্বারা পবিত্র হয়েছে মোদের বক্ষ ও হৃদয়,
নিজের চেহারার জন্য তা স্বয়ং দর্পণ হয়ে গেছে।

اُس نے درختِ دل کو معارف کا پھل دیا ہر سینہ شک سے دھو دیا ہر دل بدل دیا

তা হৃদয়বৃক্ষকে তত্ত্বজ্ঞানের ফলে ভরে দিয়েছে,
সকল বক্ষকে সন্দেহমুক্ত করেছে আর সকল হৃদয় পরিবর্তন করে দিয়েছে।

اُس سے خدا کا چہرہ نمودار ہوگیا شیطاں کا مکر و وسوسہ بیکار ہوگیا

এর মাধ্যমে খোদার চেহারা প্রকাশিত হয়েছে,
শয়তানের ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণা ব্যর্থ হয়েছে।

وہ رَہ جو ذاتِ عزّوجل کو دکھاتی ہے وہ رہ جو دل کو پاک و مطہر بناتی ہے

যে পথ মহাসম্মানিত ও মহাপ্রতাপান্বিত খোদার দিশারি,
যে পথ হৃদয়কে পাক ও পবিত্র করে,

وہ رہ جو یارگم شدہ کو کھینچ لاتی ہے وہ رہ جو جامِ پاک یقیں کا پلاتی ہے

যে পথ হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে কাছে টেনে আনে,
যে পথ বিশ্বাসের অমিয় সুধা পান করায়,

وہ رہ جو اُس کے ہونے پہ محکم دلیل ہے وہ رَہ جو اُس کے پانے کی کامل سبیل ہے

যে পথ তাঁর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ
যে পথ তাঁকে পাবার সর্বোত্তম উপায়,

اُس نے ہر ایک کو وہی رستہ دکھا دیا جتنے شکوک و شبہ تھے سب کو مٹا دیا

এটি সবাইকে সে পথ প্রদর্শন করেছে।
যত সন্দেহ-সংশয় ছিল সব দূরীভূত করেছে,

افسردگی جو سینوں میں تھی دور ہوگئی ظلمت جو تھی دلوں میں وہ سب نور ہوگئی

বক্ষে থাকা বিষণ্নতা কেটে গেছে,
হৃদয়ে যে অমানিশা ছিল তা আলোতে বদলে গেছে,

جو دَور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے چلنے لگی نسیم عنایاتِ یار سے

শরৎকাল বসন্তে রূপ নিয়েছে,
বন্ধুর অনুগ্রহে প্রভাতের মৃদুমন্দ সমীরণ বইতে শুরু করেছে।

جاڑے کی رُت ظہور سے اُسکے پلٹ گئی عشقِ خدا کی آگ ہر اک دل میں اٹ گئی

শীতের ঋতু এর আবির্ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে
খোদাপ্রেমের আগুন সকল হৃদয়ে পুরো মাত্রায় জ্বলে উঠেছে,

جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے پھل اس قدر پڑا کہ وہ میووں سے لد گئے

যে-সকল বৃক্ষে প্রাণ ছিল, সেগুলো সতেজতা ফিরে পেয়েছে।
এত ফল ধরেছে যে, তা ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে,

موجوں سے اُس کی پردے وساوس کے پھٹ گئے جو کُفر اور فسق کے ٹیلے تھے کٹ گئے

এর তরঙ্গে সন্দেহ-কুমন্ত্রণার পর্দা বিদীর্ণ হয়ে গেছে,
অবিশ্বাস ও পাপাচারের পাহাড় ধসে পড়েছে।

قرآں خدا نما ہے خدا کا کلام ہے بے اُس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے

কুরআন খোদা দর্শনের দর্পণ আর মহান খোদার বাণী,
এটিকে বাদ দিলে তত্ত্বজ্ঞানের বাগান অসম্পূর্ণ।

جو لوگ شک کی سردیوں سے تھرتھراتے ہیں اس آفتاب سے وہ عجب دھوپ پاتے ہیں

যারা সন্দেহের শীতে থরথর করে কাঁপে,
এই সূর্য হতে তারা পরম স্নিগ্ধ রোদ লাভ করে।

دنیا میں جس قدر ہے مذاہب کا شور و شر سب قصہ گو ہیں نور نہیں ایک ذرّہ بھر

পৃথিবীতে যত ধর্ম ও ধর্মের হইচইকারী রয়েছে,
তাদের সবাই গপ্পবাজ, বিন্দুমাত্র জ্যোতিও নেই;

پر یہ کلام نورِ خدا کو دکھاتا ہے اسکی طرف نشانوں کے جلوہ سے لاتا ہے

কিন্তু এ গ্রন্থ খোদার জ্যোতি প্রকাশ করে,
নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে এর প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে।

جس دیں کا صرف قصوں پہ سارا مدار ہے وہ دیں نہیں ہے ایک فسانہ گذار ہے

যে ধর্মের পুরো ভিত্তি শুধু কাহিনির ওপর,
তা ধর্ম নয় বরং কাহিনিবেত্তা!

سچ پوچھئے تو قصوں کا کیا اعتبار ہے قصوں میں جھوٹ اور خطا بے شمار ہے

সত্য কথা হলো, কল্পকাহিনির ভরসা কী?
কাহিনিতে অগণিত মিথ্যা ও ভ্রান্তি থাকে।

ہے دیں وہی کہ صرف وہ اک قصہ گو نہیں زندہ نشانوں سے ہے دکھاتا رہِ یقیں

ধর্ম সেটি– যা কেবল কাহিনিই শোনায় না
বরং জীবন্ত নিদর্শনাবলির মাধ্যমে বিশ্বাসের পথ প্রদর্শন করে।

ہے دیں وہی کہ جس کا خدا آپ ہو عیاں خود اپنی قدرتوں سے دکھاوے کہ ہے کہاں

ধর্ম সেটিই– যার খোদা স্বমহিমায় প্রকাশিত;
যিনি স্বীয় শক্তিগুণে নিজ অস্তিত্বের জানান দেন।

جو معجزات سنتے ہو قصوں کے رنگ میں اُنکو تو پیش کرتے ہیں سب بحث و جنگ میں

কাহিনির আদলে তোমরা যে-সব নিদর্শনের কথা শোনো,
সবাই তা ঝগড়াবিবাদের সময় উপস্থাপন করে থাকে।

جتنے ہیں فرقے سب کا یہی کاروبار ہے قصوں میں معجزوں کا بیاں بار بار ہے

যত ফিরকা রয়েছে সবার রীতি এটিই।
কাহিনিগুলোতে বার বার নিদর্শনের বর্ণনা দেখা যায়;

پر اپنے دیں کا کچھ بھی دکھاتے نہیں نشاں گویا وہ ربِّ ارض و سما اب ہے ناتواں

কিন্তু নিজের ধর্মের কোনো নিদর্শন দেখায় না।
যেন ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের প্রতিপালক এখন শক্তি হারিয়ে বসেছেন।

گویا اب اُس میں طاقت و قدرت نہیں رہی وہ سلطنت وہ زور وہ شوکت نہیں رہی

তাঁর মাঝে যেন এখন আর শক্তি ও ক্ষমতা অবশিষ্ট নেই,
যেন সেই আধিপত্য, সেই শক্তি ও মহিমা হারিয়ে গেছে,

یا یہ کہ اب خدا میں وہ رحمت نہیں رہی نیت بدل گئی ہے وہ شفقت نہیں رہی

বা খোদার মাঝে এখন আর সেই দয়া-কৃপা নেই,
নিয়ত বদলে গেছে, সেই স্নেহ আর নেই।

ایسا گماں خطا ہے کہ وہ ذات پاک ہے ایسے گماں کی نوبت آخر ہلاک ہے

এমন ধারণা করা ভ্রান্তি, কেননা সেই সত্তা পবিত্র।
পরিশেষে ধ্বংসই হলো এমন ধারণার পরিণতি,

سچ ہے یہی کہ ایسے مذاہب ہی مر گئے اَب اُن میں کچھ نہیں ہے کہ جاں سے گذر گئے

সত্য এটিই যে, এমনসব ধর্ম মৃত।
সেগুলোতে এখন কিছু নেই, সেগুলো এখন মৃত;

پابند ایسے دینوں کے دنیا پرست ہیں غافل ہیں ذوقِ یار سے دنیا میں مست ہیں

এমন ধর্মের অনুসারীরা জগৎপূজারি,
বন্ধুকে পাবার আনন্দ সম্পর্কে তারা উদাসীন আর জগতের মোহে আচ্ছন্ন

مقصود اُن کا جینے سے دنیا کمانا ہے مومن نہیں ہیں وہ کہ قدم فاسقانہ ہے

তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো জাগতিক আয়-উপার্জন।
তারা মুমিন নয়, তাদের পদচারণা হলো অবাধ্যদের ন্যায়–

تم دیکھتے ہو کیسے دلوں پر ہیں اُن کے زنگ دنیا ہی ہوگئی ہے غرض۔ دین سے آئے ننگ

তাদের হৃদয়ে কীভাবে মরিচা পড়ে আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ!
তাদের উদ্দেশ্য কেবল দুনিয়া– ধর্মের কথা বলতে তাদের লজ্জা হয়।

وہ دیں ہی چیز کیا ہے کہ جو رہنما نہیں ایسا خدا ہے اُس کا کہ گویا خدا نہیں

সে ধর্ম ধর্ম নয়, যেটি পথের দিশা দেয় না;
এ ধর্মের খোদা এমন যেন তিনি খোদা নন।

پھر اُس سے سچی راہ کی عظمت ہی کیا رہی اور خاص وجہ صفوتِ ملّت ہی کیا رہی

এর অনুসরণে সত্য পথের কোনো মাহাত্ম্য বোঝা যায় না,
সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

نُور خدا کی اُس میں علامت ہی کیا رہی توحید خشک رہ گئی نعمت ہی کیا رہی

তাতে খোদার জ্যোতির কিবা লক্ষণ বাকি থাকল
অন্তঃসারশূন্য তওহীদ ছাড়া তাতে আর কোনো নিয়ামত বাকি থাকল না।

لوگو! سنو! کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ عادتِ قدرت نما نہیں

হে লোকসকল শোনো! সে খোদা জীবিত খোদা নয়,
যার মাঝে সর্বদা ক্ষমতা প্রদর্শনের অভ্যাস নেই।

مُردہ پرست ہیں وہ جو قصہ پرست ہیں پس اس لئے وہ موردِ ذِل و شکست ہیں

যারা কাহিনির পূজা করে তারা লাশের পূজারি,
এ কারণেই লাঞ্ছনা ও পরাজয় তাদের অদৃষ্ট।

بن دیکھے دل کو دوستو پڑتی نہیں ہے کل قصوں سے کیسے پاک ہو یہ نفس پُر خلل

দর্শন ছাড়া হে বন্ধু! হৃদয় প্রশান্ত হয় না,
এ শূন্য হৃদয় কাহিনি শুনে কীভাবে পবিত্র হতে পারে?

کچھ کم نہیں یہودیوں میں یہ کہانیاں پر دیکھو کیسے ہوگئے شیطاں سے ہم عناں

ইহুদীদের মাঝে এমন কাহিনির নেই কোনো অভাব,
কিন্তু দেখো! কীভাবে তারা শয়তানের সাথি হয়ে গেল।

ہر دم نشانِ تازہ کا محتاج ہے بشر قصوں کے معجزات کا ہوتا ہے کب اثر

মানুষ সদা তাজা নিদর্শনের মুখাপেক্ষী,
গল্পসর্বস্ব নিদর্শন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

کیونکر ملے فسانوں سے وہ دلبرِ ازل گر اِک نشاں ہو ملتا ہے سب زندگی کا پھل

গল্পের মাধ্যমে সেই চিরন্তন বন্ধুকে লাভ করা সম্ভব নয়,
একটি নিদর্শন পেলেও জীবনের সব ফল লাভ হয়ে যায়।

قصوں کا یہ اثر ہے کہ دل پُر فساد ہے ایماں زباں پہ۔ سینہ میں حق سے عناد ہے

হৃদয় যে পাপাচারী হয়ে উঠেছে, এটি কেবল গল্প কাহিনির প্রভাবেই হয়েছে,
মুখে ঈমান থাকলেও হৃদয়ে রয়েছে সত্যের প্রতি বৈরিতা।

دُنیا کی حرص و آز میں یہ دل ہیں مرگئے غفلت میں ساری عمر بسر اپنی کر گئے

জাগতিকতার লোভ ও মোহে এসব হৃদয় মরে গেছে,
গোটা জীবন উদাসীনতার মাঝে কাটিয়ে দিয়েছে।

اے سونے والو جاگو کہ وقتِ بہار ہے اب دیکھو آکے درپہ ہمارے وہ یار ہے

হে ঘুমন্তরা! জাগ্রত হও কেননা বসন্ত এসে গেছে;
এই যে দেখো! দ্বারে আমাদের সেই বন্ধু দাঁড়িয়ে আছেন।

کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اُس سے ہیں جُدا

তাঁর সাথে যদি সম্পর্ক না থাকে তাহলে জীবন নিরানন্দ;
প্রকৃতপক্ষে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনকে আমি অভিশপ্ত মনে করি।

اُس رُخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدّعا جنت بھی ہے یہی کہ ملے یارِ آشنا

সেই মহান সত্তার চেহারা দেখাই হলো আসল উদ্দেশ্য,
সেই পরম বন্ধুকে পাওয়াই হলো প্রকৃত জান্নাত লাভ করা।

اَے حُبِّ جاہ والو یہ رہنے کی جا نہیں اِس میں تو پہلے لوگوں سے کوئی رہا نہیں

হে যশ ও ক্ষমতার ভিখারীরা! এটি (স্থায়ী) নিবাস নয়,
পূর্ববর্তীদের কেউ তো এখানে বেঁচে নেই।

دیکھو تو جاکے اُن کے مقابر کو اِک نظر سوچو کہ اب سلف ہیں تمہارے گئے کدھر

একবার গিয়ে তাদের কবরগুলো দেখে আসো,
এখন চিন্তা করো তোমাদের পূর্বসূরিরা কোথায় গেল?

اِک دن وہی مقام تمہارا مقام ہے اِک دن یہ صبح زندگی کی تم پہ شام ہے

সেই স্থানটিই একদিন তোমাদের ঠিকানা হবে,
তোমার এই জীবনপ্রভাত একদিন সায়াহ্নে পর্যবসিত হবে।

اِک دن تمہارا لوگ جنازہ اُٹھائیں گے پھر دفن کرکے گھر میں تاسّف سے آئیں گے

একদিন মানুষ তোমার শবদেহ বহন করবে,
সমাহিত করে আক্ষেপের সাথে ঘরে ফিরে আসবে।

اے لوگو! عیشِ دنیا کو ہرگز وفا نہیں کیا تم کو خوفِ مرگ و خیالِ فنا نہیں

হে মানুষ! পার্থিব জীবনের কোনো বিশ্বাস নেই,
তোমাদের কি মৃত্যুভয় ও বিলুপ্তির কথা মাথায় আসে না?

سوچو کہ باپ دادے تمہارے کدھر گئے کس نے بلا لیا وہ سبھی کیوں گذر گئے

চিন্তা করো, তোমাদের পিতা-পিতামহ কোথায় গিয়েছেন?
কে তাদের ডেকে পাঠিয়েছে, তারা সবাই কেন অতীত হয়ে গেলেন?

وہ دن بھی ایک دن تمہیں یارو نصیب ہے خوش مت رہو کہ کوچ کی نوبت قریب ہے

বন্ধুগণ! একদিন তোমরা সেদিনের সম্মুখীন হবেই;
বেশি আনন্দিত হয়ো না, বিদায়ক্ষণ খুবই সন্নিকটে।

ڈھونڈو وہ راہ جس سے دل و سینہ پاک ہو نفس دنی خدا کی اطاعت میں خاک ہو

সেপথ অনুসন্ধান করো, যার মাধ্যমে হৃদয় ও বক্ষ পবিত্র হবে,
হীন প্রবৃত্তি খোদার আনুগত্যে বিলীন হোক।

ملتی نہیں عزیزو فقط قصوں سے یہ راہ وہ روشنی نشانوں سے آتی ہے گاہ گاہ

হে প্রিয়গণ! সে পথ শুধু কাহিনির মাধ্যমে লাভ হয় না,
সে আলো কখনো কখনো নিদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

وہ لغو دیں ہے جس میں فقط قصہ جات ہیں اُن سے رہیں الگ جو سعید الصفات ہیں

সেই ধর্ম অর্থহীন যাতে কল্পকাহিনি ছাড়া আর কিছু নেই,
পুণ্য-প্রকৃতির মানুষ এমন ধর্ম এড়িয়ে চলে।

صد حیف اِس زمانہ میں قصوں پہ ہے مدار قصوں پہ سارا دیں کی سچائی کا اِنحصار

শত ধিক! এ যুগে কাহিনির ওপরই হলো সবকিছুর ভিত্তি,
সকল ধর্মের সত্যতা গল্পকাহিনি নির্ভর।

پر نقد معجزات کا کچھ بھی نشاں نہیں پس یہ خدائے قصّہ خدائے جہاں نہیں

নিত্যনূতন নিদর্শনের তাতে কোনো চিহ্ন নেই,
অতএব উপাখ্যানের এ খোদা মহাবিশ্বের খোদা নন।

دنیا کو ایسے قصّوں نے یکسر تبہ کیا مُشرک بنا کے کُفر دیا روسیہ کیا

এমন কাহিনিই পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে,
মুশরিক বানিয়ে অবিশ্বাস দিয়েছে আর চেহারা কালিমালিপ্ত করেছে।

جس کو تلاش ہے کہ ملے اُس کو کردگار اُس کے لئے حرام جو قصّوں پہ ہو نثار

যে কার্যনির্বাহক খোদাকে সন্ধান করে,
কাহিনির পেছনে ছোটা তার জন্য হারাম।

اُس کا تو فرض ہے کہ وہ ڈھونڈے خدا کا نور تاہووے شک وشبہ سبھی اُس کے دِل سے دُور

তার জন্য খোদার জ্যোতি সন্ধান করা আবশ্যক,
যেন তার হৃদয় হতে সকল সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত হয়;

تا اُس کے دل پہ نُورِ یقیں کانزول ہو تا وہ جنابِ عزّوجل میں قبول ہو

যেন তার হৃদয়ে বিশ্বাসের জ্যোতি অবতীর্ণ হয়;
যেন মহাসম্মানিত, প্রতাপান্বিত প্রভুর সন্নিধানে সে গৃহীত হয়।

قصّوں سے پاک ہونا کبھی کیا مجال ہے سچ جانو یہ طریق سراسر محال ہے

অলিক গল্পকাহিনি দ্বারা পবিত্র হওয়া কীভাবে সম্ভব?
সত্য কথা হলো, এভাবে কখনো পবিত্র হওয়া সম্ভব নয়।

قصّوں سے کب نجات ملے ہے گناہ سے ممکن نہیں وصالِ خدا ایسی راہ سے

গল্পকাহিনির মাধ্যমে কে কবে পাপ হতে মুক্তি লাভ করেছে?
এমন পথে চলে খোদালাভ কখনো সম্ভব নয়।

مُردہ سے کب اُمید کہ وہ زندہ کرسکے اُس سے تو خود محال کہ رہ بھی گذرسکے

মৃতের কাছে কি কখনো আশা করা যায় যে, সে জীবিত করবে?
সে নিজেই তো পথ অতিক্রম করতে অক্ষম।

وہ رہ جو ذاتِ عزّوجل کو دکھاتی ہے وہ رہ جو دل کو پاک و مطہر بناتی ہے

সে পথ– যা মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত সত্তা (খোদাকে) প্রকাশ করে,
সে পথ যা হৃদয়কে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে;

وہ رہ جو یارِ گم شدہ کو ڈھونڈ لاتی ہے وہ رہ جو جامِ پاک یقین کا پلاتی ہے

সে পথ যা হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে খুঁজে আনে,
সে পথ যা বিশ্বাসের অমিয় সুধা পান করায়,

وہ تازہ قدرتیں جو خدا پر دلیل ہیں وہ زندہ طاقتیں جو یقیں کی سبیل ہیں

সেসব নিত্যনূতন কুদরত যা খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে;
(খোদাতে) বিদ্যমান ও বর্তমান সেসব শক্তি, যা বিশ্বাসে উপনীত হবার উপায়।

ظاہر ہے یہ کہ قصوں میں اُن کا اثر نہیں افسانہ گو کو راہِ خدا کی خبر نہیں

বিদিত যে, গল্পকাহিনিতে প্রভাব বিস্তারের সেই শক্তি নেই,
গল্পকাহিনির লেখক খোদার পথসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ।

اُس بے نشاں کی چہرہ نمائی نشاں سے ہے سچ ہے کہ سب ثبوت خدائی نشاں سے ہے

সেই নিরাকার সত্তার চেহারা নিদর্শনাবলির মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়,
সত্য কথা হলো, খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ নিদর্শনাবলিতেই নিহিত।

کوئی بتائے ہم کو کہ غیروں میں یہ کہاں قصوں کی چاشنی میں حلاوت کا کیا نشاں

অন্যদের মাঝে কেউ এটি আমাদের দেখাতে পারবে কি?
কল্পকাহিনির মাঝে সেই স্বাদ নেই।

یہ ایسے مذہبوں میں کہاں ہے دکھایئے ورنہ گزاف قصوں پہ ہرگز نہ جایئے

এমন ধর্মে এটি কোথায় (আমাকে) একটু দেখাও তো!
দেখাতে যদি না পারো তাহলে গল্পকাহিনির মিথ্যা পরিহার করো।

جب سے کہ قصے ہوگئے مقصود راہ میں آگے قدم ہے قوم کا ہردم گناہ میں

যেদিন হতে কাহিনি উদ্দেশ্য হয়ে গেছে,
(সেদিন থেকে) জাতি প্রতিটি মুহূর্তে পাপে নিমজ্জিত হচ্ছে।

تم دیکھتے ہو قوم میں عِفّت نہیں رہی وہ صدق وہ صفا وہ طہارت نہیں رہی

তোমরা দেখছ! জাতির মাঝে পবিত্রতার লেশমাত্র নেই,
সেই নিষ্ঠা, সেই স্বচ্ছতা এবং সেই পবিত্রতা নেই।

مومن کے جو نشاں ہیں وہ حالت نہیں رہی اُس یار بے نشاں کی محبت نہیں رہی

মু'মিনের পরিচিতি বলতে যা বুঝায় তা হারিয়ে গেছে,
সেই নিরাকার বন্ধুর ভালোবাসা হারিয়ে গেছে।

اِک سیل چل رہا ہے گناہوں کا زور سے سنتے نہیں ہیں کچھ بھی معاصی کے شور سے

পাপের প্রবল বন্যা বয়ে যাচ্ছে,
পাপাধিক্যের কারণে কিছুই শোনে না।

کیوں بڑھ گئے زمیں پہ بُرے کام اس قدر کیوں ہوگئے عزیزو! یہ سب لوگ کور و کر

ভূপৃষ্ঠে পাপ কেন এতটা বৃদ্ধি পেল?
বন্ধুগণ! এরা সবাই কেন অন্ধ ও বধির হয়ে গেল?

کیوں اب تمہارے دل میں وہ صدق و صفا نہیں کیوں اس قدر ہے فسق کہ خوف و حیا نہیں

তোমাদের হৃদয়ে এখন কেন সেই নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতা নেই?
কেন এত পাপ, যার কারণে ভয় ও লজ্জা লোপ পেয়েছে?

کیوں زندگی کی چال سبھی فاسقانہ ہے کچھ اِک نظر کرو کہ یہ کیسا زمانہ ہے

জীবনের সব রীতিনীতি কেন পাপাচারে কলুষিত?
একটিবার চিন্তা করে দেখো! এটি কেমন (ভয়াবহ) যুগ।

اِس کا سبب یہی ہے کہ غفلت ہی چھاگئی دُنیائے دُوں کی دل میں محبت سما گئی

এর কারণ হলো ঔদাসীন্য ছেয়ে গেছে,
হীন জগতের ভালোবাসা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

تقویٰ کے جامے جتنے تھے سب چاک ہوگئے جتنے خیال دل میں تھے ناپاک ہوگئے

তাকওয়ার সব পোশাক ছিন্ন হয়ে গেছে,
হৃদয়ের সব চিন্তাধারা অপবিত্র হয়ে গেছে।

ہر دم کے خبث و فسق سے دل پر پڑے حجاب آنکھوں سے اُن کی چھپ گیا ایماں کا آفتاب

নিত্যদিনের নোংরামি ও অবাধ্যতার ফলে হৃদয়ে পর্দা পড়ে গেছে,
তাদের চোখ থেকে ঈমানের সূর্য হারিয়ে গেছে।

جس کو خدائے عزوجل پر یقیں نہیں اُس بدنصیب شخص کا کوئی بھی دیں نہیں

মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদায় যার বিশ্বাস নেই,
সেই দুর্ভাগার কোনো ধর্মই নেই।

پر وہ سعید جو کہ نشانوں کو پاتے ہیں وہ اُس سے مل کے دل کو اُسی سے ملاتے ہیں

কিন্তু সেসব লোক সৌভাগ্যবান– যারা নিদর্শন লাভ করে,
তারা তাঁর সাথে মিলিত হয়ে কেবল খোদাতেই মনোযোগ নিবদ্ধ করে।

وہ اُس کے ہوگئے ہیں اُسی سے وہ جیتے ہیں ہر دم اُسی کے ہاتھ سے اِک جام پیتے ہیں

তারা তাঁর হয়ে গেছে আর সেই মহান সত্তাই তাদের জীবনের উৎস,
সদা তাঁর হাতে এক জীবন সুধা পান করে।

جس مے کو پی لیا ہے وہ اُس مے سے مَست ہیں سب دشمن اُن کے اُن کے مقابل میں پَست ہیں

যে জীবন সুধা তারা পান করেছে তার নেশায় তারা বিভোর;
তাদের সব শত্রু তাদের বিরোধিতায় পরাজিত।

کچھ ایسے مست ہیں وہ رُخ خوب یار سے ڈرتے کبھی نہیں ہیں وہ دشمن کے وار سے

সেই বন্ধুর সুন্দর চেহারার সৌন্দর্যে তারা এমন বিভোর যে,
তারা শত্রুর আক্রমণকে কখনো ভয় করে না।

اُن سے خدا کے کام سبھی معجزانہ ہیں یہ اس لئے کہ عاشقِ یارِ یگانہ ہیں

তাদের সাথে খোদার সব ব্যবহার নিদর্শনমূলক,
এক কারণ হলো, তারা এক অনন্য খোদার বন্ধু।

اُن کو خدانے غیروں سے بخشی ہے امتیاز اُن کے لئے نشاں کو دکھاتا ہے کارساز

খোদা তাদেরকে অন্যদের চেয়ে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন,
কার্যনির্বাহক খোদা তাদের জন্য নিদর্শন প্রদর্শন করেন।

جب دشمنوں کے ہاتھ سے وہ تنگ آتے ہیں جب بدشعار لوگ اُنہیں کچھ ستاتے ہیں

শত্রুর হাতে যখন তারা কষ্ট পায়,
যখন পাপাচারীরাও তাদের কষ্ট দেয়।

جب اُن کے مارنے کیلئے چال چلتے ہیں جب اُن سے جنگ کرنے کو باہر نکلتے ہیں

যখন তাদেরকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করে,
যখন তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়।

تب وہ خدائے پاک نشاں کو دکھاتا ہے غیروں پہ اپنا رُعب نشاں سے جماتا ہے

তখন সেই পবিত্র খোদা নিদর্শন দেখান,
নিদর্শনের মাধ্যমে অন্যদের ত্রস্ত করেন।

کہتا ہے یہ تو بندۂ عالی جناب ہے مجھ سے لڑو اگر تمہیں لڑنے کی تاب ہے

খোদা বলেন, এ-তো আমার (মহান আল্লাহর) বান্দা;
তোমার সাধ্য থাকলে আমার সাথে লড়াই করে দেখাও।

اُس ذاتِ پاک سے جو کوئی دل لگاتا ہے آخر وہ اُس کے رحم کو ایسا ہی پاتا ہے

সেই মহান সত্তাকে যে ভালোবাসে,
পরিশেষে সে তাঁর অনুগ্রহ এভাবেই লাভ করে।

جن کو نشانِ حضرت باری ہوا نصیب وہ اُس جنابِ پاک سے ہردم ہوئے قریب

যাদের মহান সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়েছে,
সকল যুগে তারা সেই মহান পবিত্র সত্তার নৈকট্য লাভ করেছে।

کھینچے گئے کچھ ایسے کہ دنیا سے سو گئے کچھ ایسا نور دیکھا کہ اُس کے ہی ہوگئے

তারা তাঁর প্রতি আকর্ষণের কারণে জগদ্‌বিমুখ হয়ে গেছে,
তারা এমন এক জ্যোতি দেখেছে যার ফলে আপাদমস্তক তাঁরই হয়ে গেছে।

بِن دیکھے کیسے پاک ہو انساں گناہ سے اِس چاہ سے نکلتے ہیں لوگ اُس کی چاہ سے

তাঁর দর্শন লাভ করা ছাড়া মানুষ কীভাবে পাপমুক্ত হতে পারে?
এ কূপ থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে, যদি তাঁকে সন্ধান করে।

تصویر شیر سے نہ ڈرے کوئی گوسپند نَے مار مُردہ سے ہے کچھ اندیشۂ گزند

সিংহের ছবি দেখে কোনো ভেড়া ভয় পায় না,
আর মৃত সাপের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।

پھر وہ خدا جو مُردہ کی مانند ہے پڑا پس کیا امید ایسے سے اور خوف اُس سے کیا

সুতরাং সেই খোদা! যে শবদেহের ন্যায় পড়ে আছে,
এমন খোদার কাছে আশা বা ভয়ের কী আছে?

ایسے خدا کے خوف سے دل کیسے پاک ہو سینہ میں اُسکے عشق سے کیونکر تپاک ہو

এমন খোদার ভয়ে হৃদয় কীভাবে পবিত্র হতে পারে?
তার ভালোবাসায় হৃদয়ে কীভাবে উষ্ণতা সৃষ্টি হতে পারে?

بِن دیکھے کس طرح کسی مَہ رُخ پہ آئے دل کیونکر کوئی خیالی صنم سے لگائے دل

না দেখে কোনো চন্দ্রমুখীকে কীভাবে ভালোবাসা যেতে পারে?
কাল্পনিক প্রেমাস্পদকে কেউ কীভাবে ভালোবাসতে পারে?

دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی سہی حُسن و جمالِ یار کے آثار ہی سہی

দর্শন না মিললেও নিদেনপক্ষে বাক্যালাপ তো হওয়া উচিত,
বন্ধুর সৌন্দর্য ও সুষমার কমপক্ষে ছাপ হলেও থাকা উচিত।

جب تک خدائے زندہ کی تم کو خبر نہیں بے قید اور دلیر ہو کچھ دل میں ڈر نہیں

জীবন্ত খোদাকে যতদিন তোমরা না চিনবে,
ততদিন তোমরা বল্গাহীন দুঃসাহসী আর তোমাদের হৃদয় খোদাভীতিশূন্য।

سَو روگ کی دوا یہی وصلِ الٰہی ہے اِس قید میں ہر ایک گنہ سے رہائی ہے

সব ব্যাধির চিকিৎসা হলো এই খোদার সাক্ষাৎ
এ কারাগারেই সকল পাপের মুক্তি নিহিত।

پر جس خدا کے ہونے کا کچھ بھی نہیں نشاں کیونکر نثار ایسے پہ ہو جائے کوئی جاں

কিন্তু যে খোদার অস্তিত্বের কোনো চিহ্নই নেই,
এমন সত্তার জন্য প্রাণ কীভাবে নিবেদিত হতে পারে?

ہر چیز میں خدا کی ضیا کا ظہور ہے پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے

সকল বস্তুতে খোদার জ্যোতির বিকাশ ঘটছে,
কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই বন্ধু উদাসীনদের কাছ থেকে দূরে।

جو خاک میں ملے اُسے ملتا ہے آشنا اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما

যে মাটিতে মিশে যায় সে-ই পরম বন্ধুকে লাভ করে,
হে পরীক্ষাকারী! এ ব্যবস্থাপত্রটিও একবার পরীক্ষা করে দেখো।

عاشق جو ہیں وہ یار کو مَر مَر کے پاتے ہیں جب مر گئے تو اُسکی طرف کھینچے جاتے ہیں

মৃত্যুকে বরণ করলেই প্রেমিক বন্ধুকে লাভ করতে পারে,
মৃত্যুবরণের পরেই কেবল তার কাছে পৌঁছাতে পারে।

یہ راہ تنگ ہے پہ یہی ایک راہ ہے دلبر کی مرنے والوں پہ ہردم نگاہ ہے

এ পথ সংকীর্ণ কিন্তু এটিই একমাত্র পথ,
যারা মৃত্যুকে বরণ করে, তাদের প্রতি বন্ধুর সদা দৃষ্টি রয়েছে।

ناپاک زندگی ہے جو دوری میں کٹ گئی دیوار زُہد خشک کی آخر کو پھٹ گئی

সেই জীবন অপবিত্র যা বন্ধুর থেকে বিচ্ছিন্নতার মাঝে কেটে যায়,
প্রাণহীন বৈরাগ্যের দেয়াল অবশেষে ফেটে গেছে।

زندہ وہی ہیں جو کہ خدا کے قریب ہیں مقبول بن کے اُس کے عزیزو حبیب ہیں

জীবিত তারা– যারা খোদার নৈকট্য লাভ করেছে,
তাঁর দৃষ্টিতে গৃহীত হয়ে যারা তাঁর প্রিয় ও স্নেহভাজন হয়েছে।

وہ دُور ہیں خدا سے جو تقویٰ سے دُور ہیں ہر دم اسیرِ نخوت و کبر و غرور ہیں

যে তাকওয়া হতে দূরে সে খোদা হতে দূরে,
প্রতিটি মুহূর্ত সে অহমিকা, গর্ব ও দাম্ভিকতার বেড়াজালে বন্দি।

تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو

বন্ধুগণ! গর্ব পরিহার করো, কেননা এটিই তাকওয়া;
অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও কার্পণ্য ছেড়ে দাও।

اِس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو اُس یار کے لئے رہِ عشرت کو چھوڑ دو

এই ক্ষণভঙ্গুর জগতের মোহ পরিত্যাগ করো,
সেই বন্ধুর খাতিরে বিলাসিতা পরিত্যাগ করো।

لعنت کی ہے یہ راہ سو لعنت کو چھوڑ دو ورنہ خیالِ حضرتِ عزّت کو چھوڑ دو

এটি অভিশপ্ত পথ, কাজেই এই অভিশাপকে পরিত্যাগ করো;
নতুবা মহাসম্মানিত খোদাকে পাবার অলীক ধারণা পরিত্যাগ করো।

تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول

নিষ্ঠার সাথে তিক্ত জীবনকে বরণ করো,
যেন তোমার নিকট ঊর্ধ্বলোক হতে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়।

اسلام چیز کیا ہے خدا کیلئے فنا ترکِ رضائے خویش پئے مرضی خدا

ইসলাম কী জিনিস? (তা হলো) খোদার সত্তায় বিলীন হওয়া,
খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের পছন্দকে পরিহার করা।

جو مرگئے انہی کے نصیبوں میں ہے حیات اِس راہ میں زندگی نہیں ملتی بجز ممات

যারা মৃত্যুকে বরণ করে নেয় তারাই প্রকৃত জীবন লাভ করে,
এ পথে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া নবজীবন লাভ হয় না।

شوخی و کبر دیو لعیں کا شعار ہے آدم کی نسل وہ ہے جو وہ خاکسار ہے

আত্মগরিমা ও অহংকার করা অভিশপ্ত শয়তানদের রীতি,
আদমের বংশ সে– যে বিনয়ী হয়ে থাকে।

اے کرمِ خاک چھوڑ دے کبروغرور کو زیبا ہے کبر حضرتِ ربِّ غیور کو

হে মাটির কীট! অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহার করো,
অহংকার করা কেবল আত্মাভিমানী খোদাকেই শোভা পায়।

بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں

নিজেকে সবার চেয়ে তুচ্ছ জ্ঞান করো,
হয়ত এর মাধ্যমে (খোদার) সাক্ষাৎ লাভ করবে।

چھوڑو غرور و کبر کہ تقویٰ اسی میں ہے ہو جاؤ خاک مرضیٔ مولیٰ اِسی میں ہے

দম্ভ ও অহংকার পরিত্যাগ করো, কেননা এতেই তাকওয়া নিহিত;
মাটির মানুষ হয়ে যাও, প্রভুর সন্তুষ্টি এতেই নিহিত।

تقویٰ کی جڑ خدا کے لئے خاکساری ہے عفّت جو شرط دیں ہے وہ تقویٰ میں ساری ہے

খোদার জন্য বিনয় অবলম্বন করা হলো তাকওয়ার মূল,
পবিত্রতা– যা ধর্মের শর্ত, তা পুরোটাই তাকওয়ায় নিহিত।

جو لوگ بدگمانی کو شیوہ بناتے ہیں تقویٰ کی راہ سے وہ بہت دُور جاتے ہیں

যারা কুধারণায় অভ্যস্ত হয়ে যায়,
তারা তাকওয়ার পথ থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

بے احتیاط اُن کی زباں وار کرتی ہے اِک دم میں اُس علیم کو بیزار کرتی ہے

তাদের জিহ্বা নির্বিচারে হামলা করে,
নিমিষেই সেই সর্বশক্তিমানকে অসন্তুষ্ট করে।

اِک بات کہہ کے اپنے عمل سارے کھوتے ہیں پھر شوخیوں کا بیج ہر اک وقت بوتے ہیں

এক কথা বলেই নিজেদের সকল কর্মকে বিনষ্ট করে,
এরপর তাদের একমাত্র কাজ হয়ে থাকে অহংকারের বীজ বপন করা।

کچھ ایسے سوگئے ہیں ہمارے یہ ہم وطن اُٹھتے نہیں ہیں ہم نے تو سوسوکئے جتن

আমাদের স্বদেশবাসী এমন গভীর ঘুমে অচেতন যে,
তারা জাগে না, যদিও আমরা তাদের জাগানোর জন্য বহুবার চেষ্টা করেছি।

سب عضو سست ہوگئے غفلت ہی چھاگئی قوت تمام نوکِ زباں میں ہی آگئی

সকল অঙ্গ অলস হয়ে গেছে, আলস্য ছেয়ে গেছে;
পুরো শক্তি শুধু জিহ্বার ডগায় অর্থাৎ তারা শুধু কথার খৈ ফুটায়।

یا بدزباں دکھاتے ہیں یا ہیں وہ بدگماں باقی خبر نہیں ہے کہ اسلام ہے کہاں

হয়ত তারা নোংরা ভাষা ব্যবহার করে বা নোংরা ধারণা পোষণ করাই তাদের রীতি;
ইসলামের এই দুরবস্থা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যাথা নেই।

تم دیکھ کر بھی بدکو بچو بدگمان سے ڈرتے رہو عقابِ خدائے جہان سے

তোমরা মন্দকাজ দেখেও মন্দধারণা করা থেকে বিরত থাকো,
বিশ্বের অধিপতি খোদার শাস্তিকে ভয় করো।

شاید تمہاری آنکھ ہی کر جائے کچھ خطا شاید وہ بد نہ ہو جو تمہیں ہے وہ بدنما

হয়ত তোমাদের চোখ কোনো ভুল করতে পারে,
হয়ত যাকে তোমরা কুৎসিত জ্ঞান করছ, সে কুৎসিত নয়।

شاید تمہاری فہم کا ہی کچھ قصور ہو شاید وہ آزمائشِ ربِّ غفور ہو

হয়ত তোমাদেরই বোঝার ভুল,
হয়ত এটি ক্ষমাশীল প্রভুর পক্ষ হতে পরীক্ষা।

پھر تم تو بدگمانی سے اپنی ہوئے ہلاک خود سرپہ اپنے لے لیا خشمِ خدائے پاک

এরপর তোমরা নিজেদের কুধারণার কারণে ধ্বংস হয়েছ।
স্বয়ং খোদার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানিয়েছ,

گر ایسے تم دلیریوں میں بے حیا ہوئے پھر اِتّقا کے سوچو کہ معنے ہی کیا ہوئے

তোমরা যদি ধৃষ্টতা প্রদর্শনে এতটা নির্লজ্জ হয়ে যাও।
তাহলে চিন্তা করো তাকওয়ার যে দাবি করো, এর অর্থ কী?

موسیٰ بھی بدگمانی سے شرمندہ ہوگیا قرآں میں خضر نے جو کیا تھا پڑھو ذرا

নিজের ধারণার জন্য মূসাও লজ্জিত হয়েছিল।
খিযির যা করেছে তা কুরআনে একটু পড়ে দেখো;

بندوں میں اپنے بھید خدا کے ہیں صد ہزار تم کو نہ علم ہے نہ حقیقت ہے آشکار

বান্দাদের সম্পর্কে খোদার শত-সহস্র রহস্য রয়েছে।
তোমরা জানোও না আর সত্যও তোমাদের কাছে স্পষ্ট নয়,

پس تم تو ایک بات کے کہنے سے مرگئے یہ کیسی عقل تھی کہ براہِ خطر گئے

সুতরাং তোমরা শুধু একটি অন্যায় কথা বলে ধ্বংস হয়ে গেলে।
এটি কেমন বুদ্ধিমানের কাজ করলে যে, বিপজ্জনক পথে এগিয়ে গেলে!

بدبخت تر تمام جہاں سے وہی ہوا جو ایک بات کہہ کے ہی دوزخ میں جاگرا

সুতরাং সমগ্র বিশ্বে সবার চেয়ে হতভাগা সে–
যে একটি কথা বলার কারণেই দোযখে গিয়ে পড়ল।

پس تم بچاؤ اپنی زباں کو فساد سے ڈرتے رہو عقوبت ربّ العباد سے

সুতরাং নৈরাজ্য হতে নিজের জিহ্বাকে বিরত রাখো,
মানুষের প্রতিপালকের শাস্তিকে ভয় করো।

دو عضو اپنے جو کوئی ڈر کر بچائے گا سیدھا خدا کے فضل سے جنت میں جائے گا

নিজের দুটি অঙ্গকে যে খোদার ভয়ে সুরক্ষিত রাখবে,
সে খোদার কৃপায় সোজা জান্নাতে যাবে।

وہ اِک زباں ہے عضو نہانی ہے دوسرا یہ ہے حدیث سیّدنا سیّد الورٰی

সেগুলোর একটি হলো জিহ্বা আর অন্যটি হলো গোপনাঙ্গ;
এটি আমাদের নেতা সৃষ্টির সেরা (সা.)-এর হাদীস।

پر وہ جو مجھ کو کاذب و مکّار کہتے ہیں اور مفتری و کافر و بدکار کہتے ہیں

কিন্তু যারা আমাকে মিথ্যাবাদী ও ষড়যন্ত্রকারী আখ্যা দেয়,
প্রতারক ও কাফির এবং অপকর্মশীল বলে;

اُن کیلئے تو بس ہے خدا کا یہی نشاں یعنی وہ فضل اُس کے جو مجھ پر ہیں ہرزماں

তাদের জন্য খোদার এ নিদর্শনই যথেষ্ট,
অর্থাৎ সেই কৃপা যা প্রতিনিয়ত আমার প্রতি বর্ষিত হচ্ছে।

دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا گمنام پاکے شہرۂ عالم بنا دیا

লক্ষ করো! খোদা এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করেছেন,
আমাকে অখ্যাত, অপরিচিত পেয়েছেন আর পুরো বিশ্বে খ্যাতি দান করেছেন।

جو کچھ مری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا میں اِک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا

যা কিছু আমার উদ্দেশ্য ছিল সবকিছু তিনি সাধন করেছেন;
আমি নিঃস্ব ছিলাম, তিনি আমাকে অঢেল দিয়েছেন।

دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی جو اُس نے مجھ کو اپنی عنایات سے نہ دی

পৃথিবীতে এমন কোনো নিয়ামত বাকি নেই,
যা তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাকে দান করেন নি।

ایسے بدوں سے اُس کے ہوں ایسے معاملات کیا یہ نہیں کرامت وعادت سے بڑھ کے بات

এমন পাপিষ্ঠদের সাথে তিনি এমন ব্যবহার করবেন!
এটি কি মহান খোদার সম্মান ও রীতিবিরুদ্ধ বিষয় নয়?

جو مفتری ہے اُس سے یہ کیوں اتحاد ہے کس کو نظیر ایسی عنایت کی یاد ہے

(আল্লাহর নামে) যে প্রতারণা করে তার সাথে কেন এত দহরম-মহরম?
এমন পুরস্কারের দৃষ্টান্ত কেউ কি দিতে পারে?

مجھ پر ہر اک نے وار کیا اپنے رنگ میں آخر ذلیل ہوگئے انجام جنگ میں

সবাই নিজ নিজ রীতিতে আমার ওপর হামলা করেছে,
কিন্তু যুদ্ধের ফলাফলস্বরূপ তারা লাঞ্ছিত হয়েছে।

اِن کینوں میں کسی کو بھی ارماں نہیں رہا سب کی مراد تھی کہ میں دیکھوں رہِ فنا

এই বিদ্বেষপরায়ণরা কেউ আশা করে নি যে, আমি টিকে থাকব;
সবাই চাইত, আমি যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই।

تھے چاہتے کہ مجھ کو دکھائیں عدم کی راہ یا حاکموں سے پھانسی دلا کر کریں تباہ

তারা আমাকে বিলুপ্তির পথ দেখাতে চাইত,
বা শাসকদের হাতে আমার ধ্বংস চাইত।

یا کم سے کم یہ ہو کہ میں زنداں میں جا پڑوں یا یہ کہ ذلتوں سے میں ہو جاؤں سرنگوں

অন্ততপক্ষে, আমি যেন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই;
বা চাইত, লাঞ্ছিত হয়ে যেন মস্তক অবনত করি,

یا مخبری سے ان کی کوئی اَور ہی بلا آجائے مجھ پہ یا کوئی مقبول ہو دُعا

বা তাদের গোয়েন্দাগিরির ফলাফলস্বরূপ
আমার ওপর যেন অন্যকোনো বিপদ নেমে আসে বা আমার বিরুদ্ধে তাদের কোনো দোয়া যেন গৃহীত হয়।

پس ایسے ہی ارادوں سے کرکے مقدمات چاہا گیا کہ دن مرا ہوجائے مجھ پہ رات

অতএব এমন অভিসন্ধি নিয়ে মামলা করে,
তারা চেয়েছে আমার দিন যেন আমার জন্য অমানিশায় বদলে যায়।

کوشش بھی وہ ہوئی کہ جہاں میں نہ ہو کبھی پھر اتفاق وہ کہ زماں میں نہ ہو کبھی

এমন ষড়যন্ত্র করেছে দোয়া করি তা যেন পৃথিবীতে কারো বিরুদ্ধে না হয়,
তাদের মাঝে (এ বিষয়ে) এমন ঐক্য গড়ে উঠেছে
যা (আগে) কখনো হয় নি।

مجھ کو ہلاک کرنے کو سب ایک ہوگئے سمجھا گیا میں بد پہ وہ سب نیک ہوگئے

আমাকে ধ্বংস করার মানসে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে,
ভাবটা এমন যেন, আমি পাপাচারী আর তারা সবাই পুণ্যবান।

آخر کو وہ خدا جو کریم و قدیر ہے جو عالم القلوب و علیم و خبیر ہے

অবশেষে সেই খোদা– যিনি মহাসম্মানিত ও সর্বশক্তিমান,
যিনি হৃদয়ের জ্ঞাতা ও সর্বজ্ঞানী এবং মহাপরিজ্ঞাতা।

اُترا مری مدد کیلئے کرکے عہد یاد پس رہ گئے وہ سارے سیہ رُوئے و نامراد

তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে আমার সাহায্যে নেমে এসেছেন,
সুতরাং তাদের সবার চেহারা মলিন হয়ে গেল ও সবাই ব্যর্থ হলো।

کچھ ایسا فضل حضرتِ ربّ الوریٰ ہوا سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا

সৃষ্টির প্রতিপালক-প্রভুর এমন কৃপা হয়েছে যে,
সকল শত্রু এটি দেখে হতবাক হয়ে গেল।

اِک قطرہ اُس کے فضل نے دریا بنا دیا میں خاک تھا اُسی نے ثریا بنا دیا

তার অনুগ্রহ– বিন্দুকে সিন্ধুতে পরিণত করেছে,
আমি ধূলিকণা ছিলাম, তিনিই আমাকে নক্ষত্র বানিয়েছেন।

میں تھا غریب و بیکس و گمنام و بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر

আমি দরিদ্র, অসহায়, অজানা ও অকুশলী ছিলাম,
কারো জানা ছিল না যে, কাদিয়ান কোথায় অবস্থিত!

لوگوں کی اِس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی

মানুষের এদিকে কোনো দৃষ্টিই ছিল না,
আমার সত্তা সম্পর্কে কেউ জানতও না।

اب دیکھتے ہو کیسا رجوعِ جہاں ہوا اِک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا

এখন দেখো! জগৎ কীভাবে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে,
এই কাদিয়ান– বিশেষ লোকদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

پر پھر بھی جن کی آنکھ تعصب سے بند ہے اُن کی نظر میں حال مرا ناپسند ہے

তা সত্ত্বেও যাদের চোখ বিদ্বেষে অন্ধ,
তাদের কাছে আমার অবস্থান পছন্দনীয় নয়।

میں مفتری ہوں اُن کی نگاہ و خیال میں دنیا کی خیر ہے مری موت و زوال میں

তাদের দৃষ্টি ও ধারণা অনুসারে আমি মিথ্যা রচনাকারী,
আমার মৃত্যু ও অধঃপতনে (যেন) জগতের কল্যাণ নিহিত!

لعنت ہے مفتری پہ خدا کی کتاب میں عزّت نہیں ہے ذرّہ بھی اُس کی جناب میں

ঐশী গ্রন্থে মিথ্যা রচনাকারীকে অভিসম্পাত করা হয়েছে,
তাঁর সন্নিধানে (তার) আদৌ কোনো সম্মান নেই।

توریت میں بھی نیز کلام مجید میں لکھا گیا ہے رنگِ وعیدِ شدید میں

তওরাতেও আর পবিত্র কুরআনেও–
কঠিন সতর্কীকরণমূলক ভাষায় তা লেখা হয়েছে।

کوئی اگر خدا پہ کرے کچھ بھی افترا ہوگا وہ قتل ہے یہی اِس جرم کی سزا

কেউ খোদার নাম নিয়ে যদি সামান্য মিথ্যাও বলে,
সে নিহত হবে– এটিই এ অপরাধের শাস্তি।

پھر یہ عجیب غفلت ربِّ قدیر ہے دیکھے ہے ایک کو کہ وہ ایسا شریر ہے

তাই (আমার ক্ষেত্রে) এটি সর্বশক্তিমান খোদার আশ্চর্যজনক ঔদাসীন্য!
এক ব্যক্তিকে তিনি দেখলেন, যে এমন বিদ্রোহপরায়ণ।

پچیس سال سے ہے وہ مشغولِ افترا ہر دن ہر ایک رات یہی کام ہے رہا

পঁচিশ বছর ধরে সে অনবরত মিথ্যা রচনা করে যাচ্ছে,
প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত এ কাজই সে করছে।

ہر روز اپنے دل سے بناتا ہے ایک بات کہتا ہے یہ خدا نے کہا مجھ کو آج رات

প্রত্যেক দিন মনগড়া একটি কথা রচনা করে,
আবার বলে একথা খোদা আমাকে আজ রাতে অবহিত করেছেন।

پھر بھی وہ ایسے شوخ کو دیتا نہیں سزا گویا نہیں ہے یاد جو پہلے سے کہہ چکا

তা সত্ত্বেও তিনি এমন অহংকারীকে শাস্তি দেন না,
যেন পূর্বে তিনি যা বলে রেখেছেন তা তাঁর স্মরণই নেই।

پھر یہ عجیب تر ہے کہ جب حامیانِ دیں ایسے کے قتل کرنے کو فاعل ہوں یا معیں

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, ধর্মের (তথাকথিত) রক্ষণাবেক্ষণকারীরা যখন
এমন লোককে হত্যা করার জন্য সক্রিয় হয় বা এ কাজে
সাহায্যকারী হিসেবে দাঁড়ায়;

کرتا نہیں ہے اُن کی مدد وقتِ انتظام تا مفتری کے قتل سے قصہ ہی ہو تمام

তিনি সে সময় তাদের সাহায্য করেন না,
যেন মিথ্যা রটনাকারীর হত্যার মাধ্যমে বিষয়ের অবসান ঘটতে পারে।

اپنا تو اُس کا وعدہ رہا سارا طاق پر اوروں کی سعی و جہد پہ بھی کچھ نہیں نظر

তাঁর সব প্রতিশ্রুতি তাকের ওপরই রয়ে গেল,
অন্যদের চেষ্টাপ্রচেষ্টার প্রতিও কোনো দৃষ্টি নেই।

کیاوہ خدا نہیں ہے جو فرقاں کا ہے خدا پھر کیوں وہ مفتری سے کرے اسقدر وفا

তিনি কি সেই খোদা নন যাকে কুরআন উপস্থাপন করে?
প্রশ্ন হলো, তিনি কেন প্রতারকের প্রতি এত বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করছেন?

آخر یہ بات کیا ہے کہ ہے ایک مفتری کرتا ہے ہر مقام میں اُس کو خدا بَری

ব্যাপার কী! (এক ব্যক্তি) যে একজন মিথ্যা রচনাকারী,
খোদা সর্বত্র তাকে নির্দোষ প্রমাণ করছেন!

جب دشمن اُسکو پیچ میں کوشش سے لاتے ہیں کوشش بھی اسقدر کہ وہ بس مر ہی جاتے ہیں

শত্রু যখন তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে,
আর চেষ্টাও এমন যে, তারা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়;

اِک اتفاق کرکے وہ باتیں بناتے ہیں سو جھوٹ اور فریب کی تہمت لگاتے ہیں

তারা সর্বসম্মতভাবে কথা বানায়,
মিথ্যা ও প্রতারণার শত অপবাদ আরোপ করে।

پھر بھی وہ نامراد مقاصد میں رہتے ہیں جاتا ہے بے اثر وہ جو سو بار کہتے ہیں

তা সত্ত্বেও তারা তাদের পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়,
আর যা তারা শতবার বলে তা বিফল হয়।

ذلّت ہیں چاہتے۔ یہاں اِکرام ہوتا ہے کیا مفتری کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے

তারা আমার লাঞ্ছনা কামনা করে, কিন্তু এখানে আমাকে সম্মানিত করা হচ্ছে,
মিথ্যা উদ্ভাবনকারীর পরিণতি কি এমনই হয়ে থাকে?

اے قوم کے سرآمدہ اے حامیانِ دیں سوچو کہ کیوں خدا تمہیں دیتا مدد نہیں

হে জাতির নেতাগণ! হে ধর্মের ধ্বজাধারীরা!
একটু চিন্তা করো, খোদা কেন তোমাদের সাহায্য করেন না?

تم میں نہ رحم ہے نہ عدالت نہ اتّقا پس اس سبب سے ساتھ تمہارے نہیں خدا

তোমাদের মাঝে দয়ামায়া, ন্যায়বিচার কিংবা তাকওয়ার কিছুই নেই,
এ কারণে তোমাদের সাথে খোদা-ও নেই।

ہو گا تمہیں کلارک کا بھی وقت خوب یاد جب مجھ پہ کی تھی تہمت خوں ازرہِ فساد

তোমাদের মার্টিন ক্লার্কের (কেইসের কথাও) খুব ভালোভাবে স্মরণ থাকবে,
যখন নৈরাজ্য সৃষ্টির মানসে আমার প্রতি হত্যার অপবাদ আরোপ করেছে।

جب آپ لوگ اُس سے ملے تھے بدیں خیال تا آپ کی مدد سے اُسے سہل ہو جدال

তোমরা যখন এ ধারণায় তার সাথে যোগসাজশ করেছ,
যেন তোমাদের সাহায্য-সমর্থন নিয়ে তার জন্য মামলা জয় করা সহজ হয়।

پر وہ خدا جو عاجز و مسکیں کا ہے خدا حاکم کے دل کو میری طرف اُس نے کر دیا

কিন্তু সেই খোদা! যিনি বিনয়ী ও দুর্বলদের খোদা,
তিনি বিচারকের হৃদয় আমার প্রতি আকৃষ্ট করেন।

تم نے تو مجھ کو قتل کرانے کی ٹھانی تھی یہ بات اپنے دل میں بہت سہل جانی تھی

তোমরা ষড়যন্ত্র করেছিলে যেন আমাকে ফাঁসি দেওয়া হয়,
আর ধরে নিয়েছিলে যে, এটি অত্যন্ত সহজ।

تھے چاہتے صلیب پہ یہ شخص کھینچا جائے تاتم کو ایک فخر سے یہ بات ہاتھ آئے

তোমরা চাইতে, এ ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হোক,
যেন তোমরা দম্ভভরে একথা বলতে পারো–

جھوٹا تھا مفتری تھا تبھی یہ ملی سزا آخر مری مدد کیلئے خود اُٹھا خدا

মিথ্যাবাদী ছিল, মিথ্যা রচনাকারী ছিল, সে কারণে এই শাস্তি পেল;
অবশেষে আমার সাহায্যের জন্য খোদা দণ্ডায়মান হন।

ڈگلس پہ سارا حال بریّت کا کھل گیا عزت کے ساتھ تب میں وہاں سے بَری ہوا

ক্যাপ্টেন ডগলাসের কাছে আমি নির্দোষ ছিলাম মর্মে পুরো বিষয় প্রকাশিত হয়ে যায়,
আমি সেখান থেকে সসম্মানে মুক্তি পেলাম।

الزام مجھ پہ قتل کا تھا سخت تھا یہ کام تھا ایک پادری کی طرف سے یہ اتّہام

আমার বিরুদ্ধে হত্যার অপবাদ ছিল, এটি ছিল ভয়ানক এক অপবাদ,
এ অপবাদ এক পাদরির পক্ষ থেকে আরোপ করা হয়েছিল।

جتنے گواہ تھے وہ تھے سب میرے برخلاف اِک مولوی بھی تھا جو یہی مارتا تھا لاف

যত সাক্ষী ছিল, সবাই ছিল আমার বিরোধী,
এক মৌলবিও ছিল, যে কিনা এই বুলি আওড়াতো–

دیکھو یہ شخص اب تو سزا اپنی پائے گا اب بن سزائے سخت یہ بچ کر نہ جائے گا

দেখো! এ ব্যক্তি এখন নিজের (কর্মের) শাস্তি তো পাবেই,
এখন সে কোনোভাবে কঠিন শাস্তিকে এড়াতে পারবে না।

اتنی شہادتیں ہیں کہ اب کھل گیا قصور اب قیدیا صلیب ہے اک بات ہے ضرور

এত সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে যে, তার অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গেল বলে
এখন হয় যাবজ্জীবন নয় ফাঁসি, দুটির একটি তো অবশ্যই ঘটবে।

بعضوں کو بددُعا میں بھی تھا ایک انہماک اِتنی دُعا کہ گھس گئی سجدے میں اُن کی ناک

কতক আমাকে অভিশাপ দেওয়ায় নিমগ্ন ছিল,
দোয়া করতে করতে সিজদায় তাদের নাক ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল।

القصّہ جہد کی نہ رہی کچھ بھی انتہا اِک سُو تھا مکر ایک طرف سجدہ و دُعا

বস্তুত তারা অপচেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে,
একদিকে ছিল ষড়যন্ত্র আর অন্যদিকে কেবল সিজদা ও দোয়া।

آخر خدا نے دی مجھے اُس آگ سے نجات دُشمن تھے جتنے اُن کی طرف کی نہ التفات

পরিশেষে খোদা আমাকে এই অনল থেকে মুক্তি দিলেন,
শত্রু যতই হোক না কেন– তিনি করেন নি কারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ।

کیسا یہ فضل اُس سے نمودار ہوگیا اِک مفتری کا وہ بھی مددگار ہوگیا

এ কেমন বিস্ময়কর কৃপা– তিনি করেছেন আমার ওপর!
তিনি একজন প্রতারকের সাহায্যকারী হয়ে গেলেন!

اُس کا تو فرض تھا کہ وہ وعدہ کو کرکے یاد خود مارتا وہ گردنِ کذّاب بدنہاد

তাঁর জন্য আবশ্যক ছিল, স্বীয় প্রতিশ্রুতি স্মরণ করা–
তাঁর নিজের জন্যই আবশ্যক ছিল, মিথ্যাবাদীকে হত্যা করা।

گر اُس سے رہ گیا تھا کہ وہ خود دکھائے ہاتھ اتنا تو سہل تھا کہ تمہارا بٹائے ہاتھ

তিনি যদি শক্তি প্রদর্শন করা ভুলেও গিয়ে থাকেন,
অন্ততপক্ষে তোমায় সাহায্য করা কঠিন কিছু ছিল না।

یہ بات کیا ہوئی کہ وہ تم سے الگ رہا کچھ بھی مدد نہ کی نہ سنی کوئی بھی دُعا

এটা কেমন কথা যে, তিনি তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে গেলেন!
তোমাদের মোটেও সাহায্য করলেন না আর কোনো দোয়াও শুনলেন না।

جو مفتری تھا اُس کو تو آزاد کردیا سب کام اپنی قوم کا برباد کردیا

(অথচ) যে মিথ্যা রচনাকারী ছিল তাকে মুক্তি দিলেন,
নিজ জাতির সবকিছু ধ্বংস করে দিলেন!

سب جدوجہد وسعی اکارت چلی گئی کوشش تھی جس قدر وہ بغارت چلی گئی

সকল সংগ্রাম চেষ্টাপ্রচেষ্টাও বৃথা গেল,
যত চেষ্টা ছিল সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

کیا "راستی کی فتح" نہیں وعدۂ خدا دیکھو تو کھول کر سخنِ پاک کبریا

সততার বিজয় হবে, এটি কি খোদার প্রতিশ্রুতি নয়?
মহাসম্মানিত খোদার কিতাব খুলে দেখো!

پھر کیوں یہ بات میری ہی نسبت پلٹ گئی یا خود تمہاری چادرِ تقویٰ ہی پھٹ گئی

আমার বেলায় একথাটি কেন বদলে গেল?
নাকি তোমাদের তাকওয়ার চাদরই ছিন্ন হয়ে গেল?

کیا یہ عجب نہیں ہے کہ جب تم ہی یار ہو پھر میرے فائدہ کا ہی سب کاروبار ہو

আশ্চর্যের বিষয় হলো তোমরাই তাঁর বন্ধু!
কিন্তু কল্যাণকর সবকিছু ঘটছে আমার অনুকূলে।

پھر یہ نہیں کہ ہوگئی ہے صرف ایک بات پاتا ہوں ہر قدم میں خدا کے تفضلات

শুধু একটি ক্ষেত্রেই তিনি আমাকে সাহায্য করেন নি,
প্রতিটি পদক্ষেপেই খোদার কৃপারাজি প্রত্যক্ষ করি।

دیکھو وہ بھیں کا شخص کرم دیں ہے جس کا نام لڑنے میں جس نے نیند بھی اپنے پہ کی حرام

ভী নিবাসী সেই ব্যক্তিকে দেখো! যার নাম করম দীন,
আমার সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হতে গিয়ে সে নিজের ঘুম হারাম করেছে।

جس کی مدد کے واسطے لوگوں میں جوش تھا جس کا ہر ایک دشمنِ حق عیب پوش تھا

যাকে সাহায্য করার জন্য মানুষের মাঝে এক উচ্ছ্বাস ছিল,
সত্যের সকল শত্রু যার দোষত্রুটি ঢেকে রাখত।

جس کا رفیق ہوگیا ہر ظالم و غوی جس کی مدد کے واسطے آئے تھے مولوی

সকল অত্যাচারী ও ভ্রষ্ট যার সঙ্গ দিয়েছে,
যার সাহায্যের জন্য মৌলবিরা এসেছে।

اُن میں سے ایسے تھے کہ جو بڑھ بڑھ کے آتے تھے اپنا بیاں لکھانے میں کرتب دکھاتے تھے

তাদের মাঝে এমনও ছিল, যারা বড়ো উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আসত,
নিজেদের বিবৃতি লেখানোর ক্ষেত্রে দক্ষতা ও কৌশল প্রদর্শন করত।

ہشیاری مستغیث بھی اپنی دکھاتا تھا سو سو خلاف واقعہ باتیں بناتا تھا

বাদীও নিজের চালাকি দেখাতো,
শত শত মিথ্যা কথা বানাতো।

پر اپنے بدعمل کی سزا کو وہ پاگیا ساتھ اُس کے یہ کہ نام بھی کاذب رکھا گیا

কিন্তু সে নিজের অপকর্মের শাস্তি পেয়ে গেছে,
একই সাথে তার নামও মিথ্যাবাদী রাখা হয়েছিল।

کذّاب نام اس کا دفاتر میں رہ گیا چالاکیوں کا فخر جو رکھتا تھا بہ گیا

তার রাখা মিথ্যাবাদী নামটি কাগজেই রয়ে গেছে,
যে চালাক হওয়া নিয়ে গর্ব করত, সে (স্রোতের) সাথে ভেসে গেছে।

اے ہوش و عقل والو یہ عبرت کا ہے مقام چالاکیاں تو ہیچ ہیں تقویٰ سے ہوویں کام

হে বিবেকবান ও বুদ্ধিমানগণ! এটি শিক্ষণীয় বিষয়,
চালাকি কোনো কাজের নয়, সব কাজ হয়েছে তাকওয়ার কল্যাণে।

جو متقی ہے اُس کا خدا خود نصیر ہے انجام فاسقوں کا عذاب سعیر ہے

যে তাকওয়া অবলম্বন করে, খোদা স্বয়ং তার সাহায্যকারী,
অবাধ্যদের পরিণাম প্রজ্বলিত অগ্নি।

جڑ ہے ہر ایک خیروسعادت کی اتّقا جس کی یہ جڑ رہی ہے عمل اُس کا سب رہا

সকল কল্যাণ ও সৌভাগ্যের মূল হলো তাকওয়া,
যার এই মূল অটুট থাকে তার সব কর্মই সুরক্ষিত থাকবে।

مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں ایسا ہی پاؤگے سخنِ کردگار میں

অবশেষে মুমিনই বিজয় লাভ করে,
খোদার বাণীতে এমন কথাই দেখতে পাবে।

کوئی بھی مفتری ہمیں دنیا میں اب دکھا جس پر یہ فضل ہو یہ عنایات یہ عطا

পৃথিবীতে আমাদেরকে এমন কোনো মিথ্যা রচনাকারী দেখাও,
যার প্রতি এমন কৃপা ও অনুগ্রহ হয়েছে।

اِس بدعمل کی قتل سزا ہے نہ یہ کہ پیت پس کس طرح خدا کو پسند آگئی یہ ریت

এই অপকর্মের শাস্তি কেবলই হত্যা, কোনোভাবেই প্রীতি নয়;
সুতরাং খোদা কীভাবে এ রীতি পছন্দ করলেন?

کیا تھا یہی معاملہ پاداشِ اِفترا کیا مفتری کے بارے میں وعدہ یہی ہوا

এটি কি প্রতারণার ফলাফল ও প্রতিদান ছিল?
প্রতারক সম্পর্কে কি এই প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়েছে?

کیوں ایک مفتری کا وہ ایسا ہے آشنا یا بے خبر ہے عیب سے دھوکے میں آگیا

তিনি কেন একজন প্রতারককে এত পছন্দ করেন?
নাকি তিনি অন্যায় সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে প্রতারিত হয়েছেন?

آخر کوئی تو بات ہے جس سے ہوا وہ یار بدکار سے تو کوئی بھی کرتا نہیں ہے پیار

কোনো ব্যাপার আছে, যে কারণে তিনি বন্ধু হয়ে গেলেন,
পাপাচারীকে তো কেউই ভালোবাসে না।

تم بد بنا کے پھر بھی گرفتار ہوگئے یہ بھی تو ہیں نشاں جو نمودار ہوگئے

তোমরা আমাকে পাপাচারী আখ্যা দিয়ে নিজেরাই ধরা পড়েছ,
এগুলো হলো নিদর্শন যা প্রকাশ পেয়ে গেছে।

تاہم وہ دوسرے بھی نشاں ہیں ہمارے پاس لکھتے ہیں اب خدا کی عنایت سے بے ہراس

কিন্তু আমাদের কাছে অন্যান্য নিদর্শনও রয়েছে,
এখন খোদার অনুগ্রহস্বরূপ ভয়ভীতিমুক্ত হয়ে লিখছি–

جس دل میں رچ گیا ہے محبت سے اُس کا نام وہ خود نشاں ہے نیز نشاں سارے اس کے کام

যে হৃদয়ে ভালোবাসার কারণে তাঁর নাম স্থান করে নেয়,
সে নিজেই একটি নিদর্শন আর তার সব কাজ নিদর্শন।

کیا کیا نہ ہم نے نام رکھائے زمانہ سے مردوں سے نیز فرقہ ناداں زنانہ سے

মানুষের হাতে আমি নিজের কত-না নাম রাখিয়েছি,
পুরুষদের মাধ্যমে এবং অজ্ঞ মহিলাদের মাধ্যমেও।

اُس کے گمان میں ہم بدوبدحال ہوگئے اُن کی نظر میں کافر و دجّال ہوگئے

তার দৃষ্টিতে আমি পাপাচারী এবং শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হয়েছি,
তাদের দৃষ্টিতে আমি কাফির ও দাজ্জাল হয়ে গেছি।

ہم مفتری بھی بن گئے اُن کی نگاہ میں بے دیں ہوئے فساد کیا حق کی راہ میں

আমি তাদের দৃষ্টিতে মিথ্যা রচনাকারী হয়ে গেলাম!
আমি বিধর্মী হয়ে গেলাম আর ধর্মের বিষয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করলাম!

پر ایسے کفر پر تو فدا ہے ہماری جاں جس سے ملے خدائے جہان وجہانیاں

সত্য কথা হলো, এমন কুফরীর জন্য আমাদের প্রাণ নিবেদিত,
যার কল্যাণে আমরা বিশ্ব ও বিশ্বজগৎসমূহের প্রভুকে লাভ করলাম,

لعنت ہے ایسے دیں پہ کہ اس کفر سے ہے کم سَو شکر ہے کہ ہوگئے غالب کے یار ہم

এমন ধর্মের প্রতি অভিশাপ– যা এ কুফরীর পর্যায়ে উপনীত নয়,
আমি (খোদার প্রতি) যারপরনাই কৃতজ্ঞ যে, আমরা প্রতাপশালী খোদার বন্ধু হয়ে গেছি।

ہوتا ہے کردگار اسی رہ سے دستگیر کیاجانے قدر اس کا جو قصوں میں ہے اسیر

এ পথেই কর্মনির্বাহক খোদা বন্ধু হয়ে যান,
যে কাহিনির দাসত্ব করে, সে এর মূল্য কী বুঝবে?

وحی خدا اِسی رہِ فرخ سے پاتے ہیں دلبر کا بانکپن بھی اسی سے دکھاتے ہیں

এই আলোকিত পথেই খোদার ওহী লাভ করা সম্ভব,
এ পথেই প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়।

اے مدعی نہیں ہے تیرے ساتھ کردگار
یہ کفر تیرے دیں سے ہے بہتر ہزار بار

হে বাদী! তোর সাথে কার্যনির্বাহক খোদা নেই,
তোর ধর্ম থেকে এই কুফর সহস্রগুণ শ্রেয়।



সহস্র সহস্র কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য সেই মহাসম্মানিত খোদার প্রাপ্য– যিনি আমাদেরকে এমন ধর্ম দিয়েছেন যা খোদাকে চেনা আর খোদাভীতির এমন এক মাধ্যম যার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো যুগে কখনো পাওয়া যেত না। সহস্র সহস্র দরূদ সেই নিষ্পাপ নবীর প্রতি, যাঁর কল্যাণে আমরা এই পবিত্র ধর্মে প্রবেশ করেছি। মহানবী (সা.)-এর সেসব সাহাবীদের প্রতি হাজারো রহমত বর্ষিত হোক যারা স্বীয় রক্ত দিয়ে (ইসলামরূপী) এ বাগানে সিঞ্চন করেছেন।

ইসলাম এমন এক আশিসময় ধর্ম এবং খোদা দর্শনের এমন এক দর্পণ, কোনো ব্যক্তি যদি সত্যিকার অর্থে এটিকে শিরোধার্য করে আর খোদার পবিত্র বাণী কুরআন শরীফে বর্ণিত শিক্ষামালা, পথনির্দেশ এবং তাকিদপূর্ণ উপদেশসমূহ হৃদয়ঙ্গম করে, সে এ পৃথিবীতেই খোদার দর্শন লাভ করবে। সেই খোদা যিনি পৃথিবীর দৃষ্টি হতে হাজার পর্দার অন্তরালে লুক্কায়িত, তাঁকে চেনার জন্য কুরআনের শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম নেই। পবিত্র কুরআন যৌক্তিক ও ঐশী নিদর্শনাবলির মাধ্যমে অনায়াসে এবং অতি সহজেই আল্লাহ তা'লার প্রতি পথপ্রদর্শন করে। এর মাঝে এক কল্যাণ ও আকর্ষণ-শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে যা খোদাসন্ধানীকে প্রতিক্ষণে খোদার প্রতি আকর্ষণ করে আর আলো, সুখ এবং স্বস্তি দান করে। পবিত্র কুরআনের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপনকারী কেবল দার্শনিকদের ন্যায় এই ধারণাই পোষণ করে না যে, রহস্যময় এ বিশ্বের কোনো স্রষ্টা থাকা উচিত বরং সে এক ব্যক্তিগত অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে এবং একটি পবিত্র দর্শনে সম্মানিত হয়ে এই নিশ্চিত বিশ্বাসভিত্তিক দৃঢ় জ্ঞান লাভ করে যে, সত্যিই সেই স্রষ্টা বিদ্যমান। আর সেই পবিত্র বাণীর জ্যোতি অর্জনকারী কেবল নিষ্প্রাণ যুক্তিবাদীদের ন্যায় এ ধারণা রাখে না যে, খোদা এক-অদ্বিতীয় বরং শত শত উজ্জ্বল নিদর্শনাবলি তার হাত ধরে তাকে অমানিশা থেকে বের করে আনে। এর কল্যাণে কার্যত সে প্রত্যক্ষ করে যে,

অস্তিত্ব ও গুণাবলির ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে খোদার কোনো শরীক বা অংশীদার নেই। কেবল এতটুকুই নয় বরং কার্যত সে জগদ্‌বাসীকে দেখিয়ে দেয় যে, খোদাকে সে এমনই মনে করে। খোদার একত্ববাদের মাহাত্ম্য তার হৃদয়ে এমনভাবে বাসা বাঁধে যে, সে ঐশী ইচ্ছার বিপরীতে সমগ্র বিশ্বকে এক মৃত কীট-তুল্য বরং সম্পূর্ণভাবে অস্তিত্বহীন ও বিলুপ্ত জ্ঞান করে।

মানবপ্রকৃতি এমন এক বৃক্ষতুল্য যার এক অংশের শাখাগুলো আবর্জনা ও প্রস্রাবের গর্তে নিমজ্জিত থাকে এবং দ্বিতীয় অংশের শাখাগুলো এমন এক চৌবাচ্চায় গিয়ে পড়ে যা কেওড়া*, গোলাপ ও অন্যান্য উন্নতমানের সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ। একদিক থেকে যখন বাতাস প্রবাহিত হয়, তখন বাতাসের গতিপথ অনুসারে দুর্গন্ধ বা সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয়। একইভাবে অবাধ্য প্রবৃত্তির বাতাস দুর্গন্ধ প্রকাশ করে আর রহমানের সৌরভে সুরভিত বাতাস গুপ্ত-সুপ্ত সুগন্ধিকে প্রকাশিত ও দৃশ্যমান করে। অতএব ঊর্ধ্বলোক থেকে আগত রহমানী বায়ুপ্রবাহের পথে যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তাহলে তখন মানুষ অবাধ্য প্রবৃত্তির কামনা-বাসনারূপী উত্তাল ঝঞ্ঝাবায়ুর সর্বমুখী চপেটাঘাতে ও সেগুলোর তীব্র দুর্গন্ধের নীচে চাপা পড়ে এমনভাবে খোদাবিমুখ হয়ে পড়ে যে, মূর্তিমান শয়তান হয়ে যায় এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়ে নিক্ষিপ্ত হয়, ফলে তার মাঝে আর কোনো পুণ্য অবশিষ্ট থাকে না। অবিশ্বাস, পাপ, অবাধ্যতা, কদাচার ও হীন কর্মকাণ্ডের বিষক্রিয়ায় অবশেষে ধ্বংস হয়ে যায়। তার জীবন নারকীয় হয়ে থাকে আর মৃত্যুর পর অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। পক্ষান্তরে খোদা তা'লার কৃপা যদি সহায়ক হয় আর ঐশী সুগন্ধি ও সৌরভ তাকে পরিষ্কার ও সুরভিত করার জন্য ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রবাহিত হয়, তার আত্মাকে স্বীয় বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিটি মুহূর্তে জ্যোতি, সতেজতা ও পবিত্র শক্তিতে বলীয়ান করে, তাহলে সে ঊর্ধ্বলোকের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এতটা ওপরে উত্থিত হয় যে, ফেরেশতাদের চেয়েও ওপরে চলে যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মাঝে অধঃপতিত হবার বৈশিষ্ট্যও রয়েছে আর ওপরে উত্থিত হবারও। জনৈক ব্যক্তি এ সম্পর্কে একান্ত সত্য কথা বলেছেন যে,

---

* **টীকা:** এটি একটি গাছের নাম যার বৈজ্ঞানিক নাম পান্দানাস ওডোরাটিসিমাস (Pandanus odoratissimus) যাকে বাংলায় বলে কেয়া বা কেতকী গাছ।

حضرتِ انساں کہ حدِّ مشترک را جامع است می تواند شد مسیحا مے تواند خرشدن

[মানুষ নিজের মাঝে দুটো চরম অবস্থার প্রকাশ ঘটাতে পারে,
চাইলে সে মানুষের পরিত্রাতাও হতে পারে, আবার সে গাধাও হতে পারে।
–অনুবাদক]

এখানে সমস্যা হলো মানুষের জন্য অধঃপতিত হওয়া সহজ বিষয় বরং বলতে গেলে, যেন একটি স্বাভাবিক বিষয়। যেমন- তোমরা দেখে থাকো যে, একটি পাথর অনেক কষ্টে ওপরে যায়; আর সেটি অন্য কারো শক্তির মুখাপেক্ষী। কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে নীচে পড়ে যায়, কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নয়। অতএব মানুষ ওপরে যাবার জন্য একটি শক্তিশালী হাতের মুখাপেক্ষী। এই মুখাপেক্ষিতাই নবীদের ও ঐশীবাণীর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছে। পৃথিবীর মানুষ সত্য ধর্ম যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সহস্র সহস্র জটিল বিতর্কে লিপ্ত হয়েও কোনো গন্তব্যে পৌঁছে নি। কিন্তু সত্য কথা হলো, যে ধর্ম মানুষের অন্ধত্ব দূরীভূত করা ও তাকে স্বর্গীয় কল্যাণরাজিতে ধন্য করার ক্ষেত্রে এতটা সাফল্য লাভ করতে পারে যে, এর অনুসারীদের ব্যাবহারিক জীবনে খোদার অস্তিত্বের স্বীকৃতি ও মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, সে ধর্মই সত্য আর সে ধর্মই মানুষকে অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে, যার পিপাসা তার আত্মায় স্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। অধিকাংশ মানুষ এমন কল্পিত খোদায় ঈমান আনে, যার শক্তিমত্তা ভবিষ্যতের নয় বরং নিছক অতীতের কাহিনির মাঝে সীমাবদ্ধ। যার শক্তি ও সামর্থ্যের কথা কেবল কল্প-কাহিনি হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এ কারণেই এমন কল্পিত খোদা সেসব পাপ হতে রক্ষা করতে পারে না। এমন ধর্মের অনুসরণে তাদের গোঁড়ামি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাবার পাশাপাশি পাপাচার, অহংবোধ এবং ধৃষ্টতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে আর অবাধ্য প্রবৃত্তির আকর্ষণ এতটা প্রবল রূপধারণ করে, যেমনটি কোনো নদীর বাঁধ ভেঙে জলরাশি আশপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে আর বহু ঘরবাড়ি ও খেতখামার ধ্বংস করে দেয়। সেই জীবন্ত খোদা যিনি শক্তিশালী নিদর্শনের কিরণ নিজের মাঝে রাখেন আর নিত্যনূতন নিদর্শন ও ক্ষমতার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকেন, তিনি সেই সত্তা, যাকে পাওয়া ও আবিষ্কার করা পাপ থেকে বিরত রাখে এবং প্রকৃত প্রশান্তি এবং স্বস্তি দিয়ে থাকে আর অবিচলতা ও সত্যিকার বীরত্ব দান করে। তা আগুন হয়ে পাপকে ভস্মীভূত করে আর পানি হয়ে জগৎপূজার বাসনাকে

ধুয়েমুছে ফেলে। তাঁকে সন্ধান করা আর তাঁর সন্ধানে পাগলপারা হওয়াকেই ধর্ম বলা হয়।

স্মরণ রাখা উচিত, কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে ধর্মের নামে যে-সব অর্থহীন বিবাদবিসংবাদ, গালমন্দ, কটূক্তি, অপলাপ করা হয়ে থাকে আর নিজের ভেতরকার পাপাচারকে দূরীভূত করা হয় না এবং সেই সত্যিকার প্রেমাস্পদের সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্কও স্থাপন করা হয় না এছাড়া একদল অন্যদলের ওপর মানুষ নয় বরং কুকুরের মতো আক্রমণ করে, অধিকন্তু ধর্মের ছত্রছায়ায় যাবতীয় কামনা-বাসনাজাত বজ্জাতি প্রদর্শন করা হয়- এই নোংরা রীতিনীতি নিছক (অসার) হাড়সদৃশ; এটি এমন নয় যার নাম ধর্ম রাখা যেতে পারে। পরিতাপ! এমন মানুষ জানে না যে, তারা পৃথিবীতে কেন এসেছে এবং আমাদের এই সংক্ষিপ্ত জীবনের মূল ও মহান উদ্দেশ্য কী? বরং তারা সর্বদা অন্ধ ও অপবিত্র প্রকৃতির বশবর্তী হয়ে নিছক বিদ্বেষপূর্ণ প্রবণতার নাম রাখে ধর্ম এবং এমন কাল্পনিক খোদার সমর্থনে পৃথিবীতে অসদাচরণ করে ও বাজে কথাবার্তা বলে বেড়ায়; যার অস্তিত্বের পক্ষে তাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। যে ধর্ম জীবন্ত খোদার পূজারি নয়, সেটি কোন কাজের? বরং এমন খোদা এক মৃত মানুষের লাশ ছাড়া আর কিছু নয়, যে অন্যের ওপর ভর করে টিকে আছে। সেই ভর যখনই অপসারিত হয় তখনই সে ভূপাতিত হয়। এমন ধর্মের মাধ্যমে যদি কিছু অর্জন হয় তাহলে তা কেবল ধর্মীয় বিদ্বেষ। প্রকৃত খোদাভীতি ও মানবজাতির প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি যা শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, তা তাদের প্রকৃতি থেকে লোপ পায়। এমন ব্যক্তিকে যদি তাদের মুখোমুখি হতে হয়, যারা তাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের বিরোধী; তাহলে কেবল এতটুকু বিরোধিতা হৃদয়ে লালন করতে থাকে আর তার প্রাণ সম্পদ ও সম্মানের শত্রু হয়ে যায়। কোনো ভিন্ন ধর্মের মানুষের যদি তাদের সাথে কোনো কাজ থাকে তাহলে ন্যায়বিচার ও খোদাভীতি বিসর্জন দিয়ে তাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যত হয় আর সেই দয়া ও সহানুভূতি, যা মানবপ্রকৃতির মহান শ্রেষ্ঠত্ব, তা তাদের প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে উধাও হয়ে যায় আর ধর্মান্ধতার আতিশয্যে এক হিংস্র পাশবিকতা তাদের ভেতর স্থান করে নেয়; কিন্তু জানে না 'ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী'?

ধর্ম ও জাতির সত্যিকার অমঙ্গলকামী সেসব দুরাচারী ও দুশ্চরিত্র লোক হয়ে থাকে, যারা সত্য, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যিকার পবিত্রতাকে কোনো গুরুত্বই দেয় না বরং কেবল কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনাকেই ধর্ম আখ্যায়িত করে থাকে। পুরোটা সময় বৃথা ঝগড়া-বিবাদ ও নোংরা কথাবার্তার মাঝে নষ্ট করে।

নিরলে-নির্জনে খোদার সাথে যে সময় অতিবাহিত করা উচিত, তা স্বপ্নেও তাদের ভাগ্যে জোটে না। তাদের কাজ হলো পুণ্যবানদের নিন্দা ও অসম্মান করা, কিন্তু তাদের হৃদয় প্রবৃত্তির নোংরামিতে ততটা কলুষিত থাকে যতটা পয়ঃপ্রণালি মলমূত্রে পরিপূর্ণ থাকে। মুখে কথার খই ফোঁটায় কিন্তু তাদের হৃদয় খোদা থেকে অনেক দূরে। জগতের নোংরামিতে নিমজ্জিত অথচ জাতির সংস্কারক হবারও দাবি করে।

خفتہ را خفتہ کے کند بیدار

(ঘুমন্তকে একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি কীভাবে জাগাতে পারে? –অনুবাদক)

এমন মানুষ খোদাভীতি নিয়ে কারো কথা শুনতেও সক্ষম নয় আর ধৈর্যের সাথে উত্তরও দিতে পারে না। তাদের দৃষ্টিতে ইসলামের সবকিছুই আপত্তিকর, ভালো বলতে কিছুই নেই। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, তারা এ অবস্থা নিয়েই উল্লসিত। ভিন জাতির কোনো মানুষকে কষ্ট দিয়ে মনে করে যে, আমরা মহাপুণ্যের কাজ করেছি বা অনেক বড়ো সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এ যুগে অধিকাংশ জাতি এ বিদ্বেষভাবাপন্ন আচরণকে ধর্ম মনে করে থাকে আর আমরা সাধারণ মুসলমানদেরকেও এই নোংরা অভ্যাসের বাইরে রাখি না। এরা খোদার দৃষ্টিতে বেশি ধরা পড়ার যোগ্য, কেননা তাদেরকে যে ধর্ম দেওয়া হয়েছে তার নাম ইসলাম। যার অর্থ পবিত্র কুরআনে স্বয়ং খোদা তা'লা প্রকাশ করেছেন। যেমন- তিনি বলেন,

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

(আল-বাকারা: ১১৩)

অর্থাৎ ইসলামের দুটো অংশ আছে। একটি হলো, খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে পুরোপুরি বিলীন হওয়া অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানে, তাঁর আস্তানায় লুটিয়ে পড়া আর দ্বিতীয়টি মোটের ওপর পুরো মানবজাতির প্রতি পুণ্য করা। দেখুন! এ ধর্ম কত আকর্ষণীয় ও পুণ্যময় এবং পূতপবিত্র নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত– যার শিক্ষা থেকে তারা যোজন যোজন দূরে চলে গেছে। এই ধ্বংস তখন নেমে এসেছে যখন জেনেশুনে বা ভ্রমে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা হয়েছে। কেননা উপেক্ষা বাহ্যিকভাবে করা হোক বা অর্থগতভাবে, তা ঐশী কল্যাণরাজি থেকে বঞ্চিত

করে দেয়। এখানে বাহ্যিক উপেক্ষা বলতে আমরা কোনো ব্যক্তির খোদার বাণী বা কথাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা বুঝাচ্ছি। অর্থগতভাবে অস্বীকার করার অর্থ হলো, বাহ্যত কেউ অস্বীকার না করলেও সামাজিক কুপ্রথা, বদভ্যাস, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও বিভিন্ন কথাবার্তার চাপে পড়ে খোদার কথা বা বাণীকে আদৌ গুরুত্ব না দেওয়া।

এককথায় এ দুটো নোংরা ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য সত্য ধর্ম অনুসরণ করা আবশ্যক। অর্থাৎ প্রধানত, খোদাকে এক অদ্বিতীয় এবং সকল কামিল গুণাবলিতে গুণান্বিত ও পূর্ণ শক্তিতে বলীয়ান মেনেও তাঁর প্রাপ্য অধিকার প্রদানে বিমুখ হওয়া এবং একজন অকৃতজ্ঞ মানুষের ন্যায় তাঁর সেসব কল্যাণ অস্বীকার করা– যা দেহপ্রাণের প্রতিটি বিন্দুর অবিচ্ছেদ্য অংশ। দ্বিতীয়টি হলো, মানবজাতির প্রাপ্য প্রদানে দুর্বলতা প্রদর্শন। প্রত্যেক ব্যক্তি, যে তার নিজের ধর্ম ও স্বজাতিকে ছেড়ে দেয় বা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে– তাকে কষ্ট দেবার জন্য এক বিষাক্ত সাপের মতো হয়ে যাওয়া আর মানুষ হিসেবে তার সকল অধিকার সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করা। এমন মানুষ সত্যিকার অর্থে মৃত, জীবিত খোদা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ। মানুষ জীবন্ত খোদার বিকাশ ও মহান নিদর্শনাবলি হতে যতক্ষণ কল্যাণমণ্ডিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আদৌ জীবন্ত ঈমান আনা সম্ভব নয়। সাধারণত নাস্তিক ছাড়া সবমানুষই কোনো না কোনোভাবে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী কিন্তু এই বিশ্বাস যেহেতু নিছক নিজেরই মনগড়া, জীবন্ত খোদার আপন বিকাশের মাধ্যমে নয়; তাই এমন ধারণা রেখে জীবন্ত ঈমান লাভ হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার পক্ষ থেকে اَنَا الْمَوْجُوْد অর্থাৎ 'আমি বিদ্যমান' শব্দ পূর্ণ মহিমায় ও নিদর্শনমূলকভাবে এবং অলৌকিকরূপে কানে না বাজবে আর কার্যত এর পাশাপাশি অন্যান্য শক্তিশালী নিদর্শন না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই জীবন্ত খোদায় ঈমান লাভ হতে পারে না। এমন লোকেরা শুধুমাত্র শোনা কথার নামই খোদা কিংবা পরমেশ্বর রাখে। শুধু গলায় ঝোলানো ঢোল বাজাচ্ছে আর (খোদাকে) যতটা চেনে তার চেয়ে বেশি জানার ভান করছে।

প্রকৃতপক্ষে খোদাকে চেনার পুরোটাই সেই জীবন্ত খোদাকে পাবার ওপর নির্ভর করে যিনি তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের সাথে বাক্যালাপ করেন আর নিজের মহিমান্বিত ও সুমিষ্ট বাণীর মাধ্যমে তাদেরকে আশ্বস্ত করেন ও প্রবোধ দেন। যেভাবে মানুষ পরস্পরের সাথে কথা বলে ঠিক সেভাবে তাদের সাথে

সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত ও সুনিশ্চিত বাক্যালাপ করেন। তাদের কথা শোনেন এবং কথার উত্তর দেন। তাদের দোয়া শুনে দোয়া গ্রহণ করা সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। একদিকে সুমিষ্ট ও গৌরবময় কথার মাধ্যমে আর অপরদিকে অলৌকিক ব্যবহার ও শক্তিশালী এবং পরাক্রমশালী নিদর্শনাবলির মাধ্যমে তাদের সামনে প্রমাণ করেন যে, তিনিই খোদা। প্রধানত তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণীস্বরূপ তাদেরকে সাহায্য এবং বিশেষ ধরনের সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। অপরদিকে নিজের প্রতিশ্রুতির মাহাত্ম্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে জগতের বিশাল জনগোষ্ঠীকে তাদের বিরোধী বানিয়ে দেন। তারা নিজেদের সর্বশক্তি, সকল ষড়যন্ত্র, প্রতারণা এবং সকল ছলচাতুরীকে কাজে লাগিয়ে খোদার সেসব প্রতিশ্রুতিকে ব্যর্থ প্রমাণ করার চেষ্টা করে যা তাঁর সেসব নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দার বিজয় ও সাহায্যসংক্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু খোদা সেসব অপচেষ্টাকে ধ্বংস করে দেন। তারা দুষ্কৃতির বীজ বপন করে আর খোদা তা'লা এর মূলোৎপাটন করেন। তারা অগ্নিসংযোগ করে আর খোদা তা নির্বাপিত করেন। তারা চূড়ান্ত চেষ্টা করে কিন্তু অবশেষে খোদা তাদের ষড়যন্ত্র তাদের মুখে ছুড়ে মারেন। খোদা তা'লার প্রিয় ও মুত্তাকী বান্দারা সাদাসিধে ও সরল প্রকৃতিসম্পন্ন আর খোদার সামনে মায়ের কোলের শিশুর ন্যায় হয়ে থাকে। জগৎ তাদের প্রতি শত্রুতা রাখে, কেননা তারা এ জগতের সাথে সম্পর্ক রাখেন না। তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য হরেক রকম ষড়যন্ত্র করা হয়। বিভিন্ন জাতি তাদের কষ্ট দেবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। সব অথর্ব-অযোগ্য একই ধনুক থেকে তাদের প্রতি তির নিক্ষেপ করে এবং বিভিন্ন প্রকার অপবাদ ও মিথ্যা তাদের প্রতি আরোপ করা হয় যেন তারা কোনোভাবে ধ্বংস হয়ে যায় আর যেন তাদের চিহ্ন মুছে যায়। কিন্তু খোদা তা'লা অবশেষে নিজের কথা সত্য প্রমাণ করে দেখান। একইভাবে তাদের জীবদ্দশায় তাদের সাথে এমন ব্যবহার অব্যাহত থাকে অর্থাৎ একদিকে তারা সত্য, স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত বাক্যালাপে সম্মানিত হন আর অদৃশ্য বিষয়াদি– যার জ্ঞান মানবীয় ক্ষমতার বাইরের– দয়ালু সর্বশক্তিমান খোদা স্বীয় প্রাঞ্জল বাণীর মাধ্যমে তাদের সামনে প্রকাশ করা অব্যাহত রাখেন। অপর দিকে নিদর্শনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে আলোর ওপর আলোতে রূপান্তরিত করা হয় যা সেসব বাণীকে সত্য প্রমাণ করে। মানবপ্রকৃতির, খোদাকে সুনিশ্চিতভাবে চেনার জন্য যতটা তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন, সেই তত্ত্বজ্ঞান বাচনিক ও কর্ম সংক্রান্ত জ্যোতির্বিকাশের

মাধ্যমে পূর্ণ করা হয়; এমনকি বিন্দু পরিমাণ অমানিশাও অবশিষ্ট থাকে না। ইনি হলেন খোদা– বাচনিক ও কার্যসংক্রান্ত– যাঁর এসব বিকাশের পর যা নিজের ভেতর সহস্র সহস্র পুরস্কার রাখে এবং হৃদয়ে খুবই শক্তিশালী প্রভাব ফেলে, মানুষ সত্য ও জীবন্ত ঈমান লাভ করে আর খোদার সাথে একটি নিষ্ঠাপূর্ণ ও পবিত্র সম্পর্ক রচিত হয়ে অবাধ্য প্রবৃত্তির সব নোংরামি দূর হয়ে যায়। সকল দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে স্বর্গীয় জ্যোতির প্রখর কিরণে অভ্যন্তরীণ অমানিশা বিদূরীভূত হয় এবং এক বিস্ময়কর পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়।

অতএব সে ধর্ম সত্য নয় যা সেই খোদাকে উপস্থাপন করে না, যাঁর এসব গুণাবলিতে গুণান্বিত হওয়া প্রমাণিত এবং ঈমানকে শুধু অতীতের গল্পকাহিনি এবং এমনসব বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখে– যা চোখেও পড়ে নি এবং যা সম্পর্কে কেউ কথাও বলে নি। এমন কাল্পনিক খোদার অনুসরণ এক লাশের কাছে জীবন্ত মানুষের ন্যায় আচরণের প্রত্যাশা রাখার মতো বিষয়। যে খোদা সবসময় নতুনভাবে নিজের অস্তিত্বকে নিজে প্রমাণ করে না এমন খোদার থাকা না থাকা সমান। যেন সে এক প্রতিমা, যে না কথা বলে না শোনে আর না প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং ক্ষমতাশীল মানুষের ন্যায় নিজের শক্তি সেভাবে প্রদর্শনও করতে অক্ষম যা দেখে এক কট্টর নাস্তিকও তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।

স্মরণ রাখা উচিত, আমাদের আলো দেবার জন্য প্রতিদিন নতুনভাবে সূর্য উদিত হয়ে থাকে। আমরা শুধু এ কাহিনি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না বা আশ্বস্ত হতে পারি না যে, আমরা অন্ধকারে থাকব এবং আলোর নাম চিহ্নও থাকবে না; আর বলা হবে যে, সূর্য আছে, তবে তা অতীতে কোনো যুগে উদিত হতো, আর এখন তা চিরপ্রচ্ছন্ন! একইভাবে সেই প্রকৃত সূর্য যা হৃদয়কে আলোকিত করে আর প্রতিদিন নিত্যনূতনভাবে উদিত হয় আর নিজের বাচন ও কর্মগত বিকাশের মাধ্যমে মানুষকে তা থেকে অংশ দিয়ে থাকে, তিনিই সত্য খোদা। সে ধর্মই সত্য যে ধর্ম এমন খোদার অস্তিত্বের সুসংবাদ দিয়ে থাকে এবং এমন খোদাকে প্রদর্শন করে আর সেই জীবন্ত খোদার মাধ্যমেই জীবন পবিত্র হয়।

এ আশা রেখো না যে, অন্য কোনো পরিকল্পনা বা কৌশল মানবজীবনকে পবিত্র করতে সক্ষম হবে। যেভাবে কেবল আলোই অন্ধকার দূরীভূত করতে

পারে ঠিক সেভাবে পাপের অমানিশার চিকিৎসা কেবল কথা ও কর্মে খোদা তা'লার আত্মপ্রকাশ, যা নিদর্শনমূলকভাবে শক্তিশালী কিরণ নিয়ে খোদার পক্ষ থেকে কোনো পুণ্যবান হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। সেই কিরণ তাকে দেখায় যে, খোদা আছেন আর তা সকল সন্দেহ দূরীভূত করে আর স্বস্তি ও প্রশান্তি দিয়ে থাকে। কাজেই সেই সবচেয়ে মহান শক্তির দুর্বার আকর্ষণে সেই সৌভাগ্যবান মানুষ (আধ্যাত্মিক) আকাশের দিকে উত্তোলিত হয়। এ ছাড়া অন্য যত চিকিৎসা রয়েছে সব অর্থহীন ও কৃত্রিম। অবশ্য পুরোপুরি পবিত্র হবার জন্য কেবল তত্ত্বজ্ঞানই যথেষ্ট নয় বরং এর সাথে ক্রমাগত বেদনাবিধূর দোয়া অব্যাহত থাকাও আবশ্যক। যেহেতু খোদা তা'লা অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তাই তাঁর কল্যাণরাজি নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এমন দোয়ার অনেক প্রয়োজন রয়েছে যা ক্রন্দন, আহাজারি নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা এবং হৃদয়ের বেদনায় পরিপূর্ণ থাকবে। তুমি জানো, দুধের শিশু যদিও নিজের মাকে ভালোভাবে চেনে এবং তাকে ভালোবাসে আর মা-ও তাকে ভালোবাসেন কিন্তু তা সত্ত্বেও মাতৃদুগ্ধ বক্ষে নেমে আসার ক্ষেত্রে দুধের শিশুদের ক্রন্দনের অনেক বড়ো একটা ভূমিকা রয়েছে। একদিকে শিশু ক্ষুধার তাড়নায় করুণভাবে কাঁদে অপরদিকে মাতৃহৃদয়ে তার ক্রন্দনের প্রভাব পড়ে এবং (মাতৃস্তনে) দুধ নেমে আসে। একইভাবে প্রত্যেক সন্ধানীকে খোদা তা'লার সামনে ক্রন্দন-আহাজারির মাধ্যমে নিজের আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসার প্রমাণ দেওয়া উচিত, যেন সেই আধ্যাত্মিক দুধ নেমে আসে এবং তাকে পরিতৃপ্ত করে। এককথায় পবিত্র পরিচ্ছন্ন হবার জন্য কেবল তত্ত্বজ্ঞানই যথেষ্ট নয় বরং শিশুদের ন্যায় বেদনাঘন ক্রন্দন ও আহাজারিরও প্রয়োজন রয়েছে। নিরাশ হয়ো না, একথা মনে কোরো না যে, আমাদের জীবন অনেক বেশি পাপে কলুষিত, তাই আমাদের দোয়া কিবা গুরুত্ব রাখে আর কিবা এর কার্যকারিতা! বাস্তব কথা হলো, মানব জীবন যা সত্যিকার অর্থে খোদা তা'লাকে ভালোবাসার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা পাপানলে দাউদাউ করে জ্বললেও তাতে তওবার এমন শক্তি অন্তর্নিহিত আছে যা সেই আগুনকে নিভিয়ে দেবার শক্তি রাখে। যেমন-তোমরা জানো ও দেখে থাকো যে, পানিকে আগুনে যত উত্তপ্তই করা হোক না কেন, তা আগুনে ঢালা মাত্রই তা আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

এটিই একমাত্র রীতি, খোদা তা'লা যখন মানব সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে এভাবেই তাদের হৃদয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আসছে। অর্থাৎ জীবন্ত খোদা

যদি স্বয়ং নিজের কথা ও কর্মে নিজেকে বিকশিত করে নিজের অস্তিত্ব, শক্তি ও ঈশ্বরত্বের জানান না দেন এবং নিজের জ্যোতির্ময় প্রতাপ প্রদর্শন না করেন তাহলে অন্য কোনোভাবে মানুষ পবিত্র হতে পারে না।

যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকেও এটিই দেখা যায় এবং একথাই প্রমাণিত। অর্থাৎ মানুষ কেবল সেই বস্তুকে গুরুত্ব দেয় আর সেই বস্তুর প্রতাপ ও মাহাত্ম্যকে হৃদয়ে স্থান দেয় যার মাহাত্ম্য ও ক্ষমতা পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে সে উদ্‌ঘাটন করে। উদাহরণস্বরূপ এটি জানা কথা যে, মানুষ সেই গর্তে হাত দেবে না যার সম্পর্কে তার বিশ্বাস রয়েছে যে, এতে সাপ আছে। এমন জিনিস কখনো খায় না যেটিকে সে বিষ বলে জানে। তাহলে কারণ কী যে, সে সেভাবে খোদা তা'লাকে ভয় করে না বরং সহস্র সহস্র পাপাচার ও কদাচারে ধৃষ্টতার সাথে লিপ্ত হয়, এমনকি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলেও (পাপে লিপ্ত হতে) ভয় পায় না। এর কারণ হলো, সে সেই সত্যিকার শাস্তিদাতার অস্তিত্ব ও সত্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ, যিনি পাপের শাস্তি দিতে সক্ষম।

পরিতাপ! বেশিরভাগ মানুষ দুর্ভাগ্যবশত এ নীতির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে নি আর পাপমুক্ত হবার জন্য এমন মনগড়া রীতি সে নিজেই উদ্ভাবন করেছে যা তাকে পাপে আরো অধিক ধৃষ্ট করে তোলে। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-কে ক্রুশে দেবার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁকে ঈশ্বর মনে করা মানুষের সকল পাপ মোচনের কারণ বলে ধারণা করা। এমন বিশ্বাস রেখে এটি কি আশা করা যায় যে, তা মানুষের হৃদয়ে পাপের বিরুদ্ধে সত্যিকার ঘৃণা সৃষ্টি করবে? এটি জানা কথা, বিপরীত জিনিসই কোনো জিনিসের প্রভাব দূরীভূত করতে পারে। যেমন- শীতকে গরম দূর করে আর অমানিশা দূর করার চিকিৎসা হলো আলো। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, এটি কেমন চিকিৎসা যে যায়েদ ক্রুশবিদ্ধ হলে বকর পাপমুক্ত হয়ে যাবে? সত্যিকার অর্থে এগুলো মানবীয় ভ্রান্তি যা ঔদাসীন্য ও জগৎপূজার যুগে হৃদয়ে বাসা বাঁধে। যে-সব হীন চিন্তাধারার কারণে পৃথিবীতে প্রতিমাপূজা প্রচলন লাভ করেছে, সত্যিকার অর্থে তেমনই স্বার্থান্ধতার কারণে (ঈসার) ক্রুশীয় মৃত্যু ও প্রায়শ্চিত্তবাদের ধারণা খ্রিষ্টানদের মাঝে প্রচলিত হয়েছে।

আসল বিষয় হলো, মানবপ্রকৃতির স্বরূপ হলো, এমন রীতিনীতিকে বেশি পছন্দ করে যাতে কোনো কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয় না। কিন্তু সত্যিকার

পবিত্রতা অনেক কষ্ট ও সংগ্রাম চায়। সেই পবিত্র জীবন লাভ হতে পারে না যতক্ষণ মানুষ মৃত্যুর পেয়ালা পান না করবে। যেমন- আমরা জানি মানুষের অভ্যাস হলো, সে সংকীর্ণ ও কঠিন পথ এড়িয়ে চলে আর সহজ পথ সন্ধান করে। এ কারণেই ক্রুশীয় মৃত্যুতে বিশ্বাস, যা কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তি আর যার আত্মার ওপর কোনো পবিত্র প্রভাব নেই– তাদের অনেক পছন্দ হয়েছে আর এ কারণেই খোদার ভালোবাসা হারিয়ে গেছে। তারা পাপকে ঘৃণা করে নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করতে চায় না। সত্যিকার অর্থে ক্রুশীয় মৃত্যুর বিশ্বাসটি এমন এক বিশ্বাস, যা তাদের আনন্দিত করে যারা প্রকৃত পবিত্রতা অর্জন করতে চায় না এবং এমন কোনো ব্যবস্থাপত্রের সন্ধানে থাকে যার ফলে নোংরা জীবনও নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলমান থাকবে আবার পাপও মুছে যাবে। সে কারণে তারা বহু পাপে কলুষিত হওয়া সত্ত্বেও মনে করে, নিছক ঈসার রক্ত দেওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই পাপমুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এ পবিত্রতা এমন এক ফোঁড়াসদৃশ যা বাহিরে উজ্জ্বল কিন্তু ভেতরে পুঁজে ভরা। কেউ যদি চিন্তাশীল হয়ে থাকে তাহলে সে বুঝবে, ক্রুশীয় ব্যবস্থাপত্র ভ্রান্ত হবার বিষয়টি স্বয়ং ক্রুশপূজারিদের বাস্তব অবস্থাদৃষ্টেই স্পষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ (বুঝা যাবে) যে, তারা কতটা জগৎপূজা ও কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে খোদাপ্রেমে বিভোর হয়ে গেছে! ইউরোপের দেশসমূহে যারা যায় তারা দেখতে পাবে যে, যারা ধর্মের সত্যিকার রক্ষক আখ্যায়িত হয় আর যারা এদেশের অজ্ঞদের মতো নয় বরং সুশিক্ষিত ও সভ্য; তাদের মাঝেও কী পরিমাণ জাগতিক বিলাসিতা, লাগামহীনতা, মদ্যপান ও রিপুর দাসত্ব বিদ্যমান! ঈসা (আ.)-এর রক্ত দেবার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে থাকে পাদরি সাহেবান। অথচ, তাদের বেশিরভাগই সকল নোংরামির মূল তথা মদ্যপানে আসক্ত। সত্যিকার অর্থে কতকের অবস্থা এমন লজ্জাকর যা বলার মতো না আর যা বেশিরভাগ সময় পত্রিকায় ছাপাও হয়ে থাকে। যেমন- আজই আমরা একটি পত্রিকায় পড়েছি যে, বিলাতে ডা. সানদি লীন্ডজ নামের এক পাদরি ধরা পড়েছে, যে মেয়েদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। উল্লিখিত পাদরি সাহেব নাগপুরের বঠান্ডারায় এতিমখানার অধ্যক্ষ ছিল। এটি আগস্টের রিপোর্ট, অর্থাৎ ২৪ আগস্ট রাতে তার কক্ষে একটি মেয়েকে পাওয়া গেছে, সে এর কোনো সদুত্তর দিতে পারে নি। পদত্যাগ করে চলে যাবার পর জানা গেছে, সে ১৭জন মেয়ের সাথে অপকর্ম করেছে। পুলিশের এজাহারে আরো কিছু তথ্য সামনে এসেছে আর তা

হলো, সে অবৈধভাবে গর্ভপাতও করিয়েছে। ওয়ারেন্ট জারি হবার পর সে বিলেতে গ্রেফতার হয়েছে। ভারতে আসার পর বোম্বের হাইকোর্টে সেশন জজের আদালতে মামলা চলবে। 'পাইওনিয়ার' ও 'আখবারে আম' ১৯০৫ সনের ৮ ফেব্রুয়ারি, সংখ্যার প্রথম কলাম এবং ১৯০৫ সনের ৯ ফেব্রুয়ারি, সংখ্যার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলাম দ্রষ্টব্য। এখন স্পষ্ট কথা হলো, এসব মানুষ যারা অত্যন্ত পবিত্র পাদরি আখ্যায়িত হয় আর প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাসকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে, এই যদি তাদের অবস্থা হয় তাহলে অন্য হতভাগারা এ ব্যবস্থাপত্র হতে কতাটা লাভবান হবে? অতএব স্মরণ রাখা উচিত, এটি সত্যিকার পবিত্রতা অর্জনের কোনো রীতি নয়। সময় আসছে বরং সন্নিকটে যখন মানুষ স্বয়ং এই ভ্রান্ত রীতির বিষয়ে নিজেরাই সচেতন হয়ে যাবে। সঠিক পন্থা সেটিই যা আমি বর্ণনা করেছি। প্রত্যেক ব্যক্তি যে খোদার পানে এসেছে– সে সেই পথেই প্রবেশ করেছে।

অবশ্য এ পথ খুবই সংকীর্ণ আর এতে প্রবেশ করার মানুষ খুব কমই হয়ে থাকে, কেননা এ দরজার দহলিজ বা প্রবেশপথ হলো মৃত্যু। খোদার দর্শন লাভ করে তাঁর পথে নিজের সকল শক্তি ও পুরো সত্তাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া হলো তাঁর চৌকাঠ। খুব কম লোকই এ দ্বারপথে প্রবেশ করতে চায়। পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের দেশের বেশিরভাগ খ্রিষ্টানকে হযরত ঈসার প্রায়শ্চিত্তের ধারণা সে দরজা হতে দূরে ঠেলে দিয়েছে। আর্যদেরকে জন্মান্তরবাদের ধারণা আর তওবা গৃহীত না হবার বিশ্বাস– সেই দ্বার থেকে বঞ্চিত করেছে কেননা তাদের মতে পাপ করার পর বিভিন্ন রূপে পুনর্জন্ম লাভ করা ছাড়া পবিত্র হবার অন্য কোনো উপায় নেই। তওবা অর্থাৎ নিজের মাঝে এক মৃত্যুতুল্য পরিবর্তন এনে খোদার দিকে নিষ্ঠা ও সততা-সুরভিত হৃদয় নিয়ে প্রত্যাবর্তন আর লাশতুল্য হয়ে নিজেকে নিজেই জবাই করা তাদের মতে এক বৃথা ধারণা। অতএব এ উভয় দল সেই প্রকৃত পথ হারিয়ে বসেছে। আর্যদের সমস্যা আরো গুরুতর, কেননা তাদের জন্য খোদার সত্তায় বিশ্বাসের কোনো পথ খোলা নেই– যৌক্তিকভাবেও নয় আর ঊর্ধ্বলোক থেকেও নয়। যৌক্তিকভাবে না হবার কারণ হলো, তাদের মতে সব আত্মা নিজগুণে আপনা-আপনিই বিদ্যমান আর প্রকৃতি অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি অণুপরমাণু নিজ বৈশিষ্ট্যগুণে নিজেরাই বিদ্যমান; তাই পরমেশ্বরের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিক আর কোন প্রমাণ অবশিষ্ট রইল? সবকিছু যদি নিজগুণেই বিদ্যমান

থাকে তাহলে সেগুলোর নিজগুণে যুক্ত হওয়া অসম্ভব হবে কেন? অতএব এ ধর্ম নাস্তিক্যবাদের খুব কাছে অবস্থান করছে। খোদা তা'লা যদি তাদের এ ভ্রান্ত পথ হতে তওবা করার সামর্থ্য না দেন তাহলে একদিন তারা সবাই নাস্তিক হয়ে যাবে। একইভাবে ঊর্ধ্বলোক হতে সৃষ্ট ব্যবস্থার মাধ্যমেও খোদা তা'লাকে শনাক্ত করতে তারা ব্যর্থ। ঊর্ধ্বলোকের ব্যবস্থা বলতে স্বর্গীয় নিদর্শন বোঝায়, যা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে নিত্যনূতন মহিমায় প্রকাশ পায়। জীবন্ত খোদায় ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি সে-সবের অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে আর নিশ্চিতভাবে সবকিছুর ক্ষেত্রে তাঁর হাত দেখতে পায়। এরা এসব নিদর্শন পুরোটাই অস্বীকার করে, তাই খোদাকে চেনার উভয় পথ তাদের জন্য রুদ্ধ। অবশ্য কেবল পক্ষপাতমূলকভাবে ধর্মীয় বিতর্কে তারা অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিয়ে থাকে। আর কটূক্তি, অপলাপ ও কথার ছুরি চালানোর ক্ষেত্রে এক অর্থে পাদরিদের চেয়েও তারা এগিয়ে রয়েছে কিন্তু খোদাকে তারা আদৌ চেনে না, কেননা খোদা তা'লাকে প্রধানত যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সৃষ্টিগুণের মাধ্যমে চেনা যায়; কিন্তু তাদের মতে খোদা স্রষ্টা নন। সুতরাং সৃষ্টি বা সৃষ্টবস্তু হবার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কাছে তাঁর অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই। খোদা তা'লাকে চেনার দ্বিতীয় উপায় হলো, স্বর্গীয় নিদর্শন কিন্তু তারা সেগুলোর অস্বীকারকারী এবং সেক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণভাবে রিক্তহস্ত। কেবল পরমেশ্বর শব্দটি হাতে রয়ে গেছে কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। পরিতাপ! এরা জানে না যে, মানুষ যতই বকবক করুক না কেন, যতক্ষণ সে নিজের খোদার সাথে এমনভাবে পরিচিত না হবে যার ফলে তার ইতর জীবনের অবসান ঘটে, তার হৃদয় খোদা তা'লার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয় এবং পাপের প্রতি তার হৃদয়ে ঘৃণা জন্মে ততক্ষণ কোনো লাভ নেই।

এমনিতে সবাই দাবি করতে পারে, আমি এমনই; কিন্তু সত্যিকার খোদাপূজারিদের লক্ষণ হলো, প্রকৃত খোদাপ্রেমের কারণে তাদের মাঝে এক কল্যাণ সৃষ্টি হয় আর খোদা তা'লার বাক্যালাপমূলক ও ব্যাবহারিক বিকাশ তাদের জীবনযাত্রার অংশ হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা খোদার সাথে কথা বলেন আর খোদা তা'লার নিদর্শনমূলক ব্যবহার তাদের মাঝে প্রকাশ পায়। খোদা তা'লা তাদের প্রতি এমন অনেক এলহাম করেন, যাতে ভবিষ্যতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি থাকে আর পরবর্তীতে সেই সাহায্য প্রকাশ পায়। এভাবে তারা তাদের খোদাকে শনাক্ত করে আর বিশেষ নিদর্শনাবলির সুবাদে অন্যদের চেয়ে

স্বতন্ত্রভাবে সামনে আসেন। তাদেরকে এক চৌম্বকশক্তি দেওয়া হয়, যার ফলে মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। খোদাপ্রেম তাদের মুখ বা চেহারায় বর্ষিত হয়। দুয়ের মাঝে যদি এ পার্থক্য না থাকে তাহলে প্রত্যেক দুশ্চরিত্র লোক গোপনে, ব্যভিচারী, পাপাচারী, দুষ্কর্মশীল, মদ্যপ এবং নোংরা প্রকৃতির অধিকারী হয়েও পুণ্যবান আখ্যায়িত হতে পারে। তাহলে প্রকৃত পুণ্যবান এবং সেই কৃত্রিম পুণ্যবানের মাঝে পার্থক্য কী হবে? অতএব পার্থক্য করার জন্য আবহমানকাল থেকে ঐশী রীতি হলো তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জীবন নিদর্শনমূলক হয়ে থাকে। খোদার সাহায্য তাদের সাথে থাকে আর এমনভাবে থাকে যে, তা (নিজেই) একটি স্পষ্ট নিদর্শন।

স্মরণ রাখা উচিত, একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তির নিদর্শনমূলক জীবন ভূলোক ও দ্যুলোক থেকে অধিকতর খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। খোদা তা'লা যে নিজের হাতে আকাশ ও পৃথিবী বানিয়েছেন তা কেউ দেখে নি। শুধু এ বিশ্বের প্রজ্ঞাপূর্ণ সৃষ্টি নিচয়কে দেখে আর এর গঠন ও বিন্যাস নিখুঁত ও সুদৃঢ় পেয়ে সুস্থ বিবেক একথা মানতে বাধ্য হয় যে, এসব অনন্য সৃষ্টির অবশ্যই কোনো স্রষ্টা থাকা উচিত। কিন্তু নিছক যুক্তি বা বুদ্ধি সত্যিই স্রষ্টা রয়েছেন মর্মে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে অক্ষম, কেননা সেই স্রষ্টাকে সে বানাতে দেখে নি। যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির নিরিখে খোদাকে চেনার বিষয়টির সমূহ ভিত্তি 'খোদা হওয়া উচিত বা খোদা থাকতে পারে' -এর ওপর রাখা হয়েছে, পরীক্ষিতভাবে তাঁর বিদ্যমানতার ওপর নয়। কিন্তু খোদাভীরু মানুষের নিদর্শনমূলক জীবন বাস্তব অবস্থার নিরিখে ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে খোদার সত্তাকে তুলে ধরে, কেননা মুত্তাকী প্রারম্ভিকভাবে এক অর্থহীন কণাতুল্য হয়ে থাকে বা এক সরিষার বীজসদৃশ। একজন কৃষক এটি বপন করে আর অত্যন্ত হীন অবস্থায় পড়ে থাকে। তখন ওহীর মাধ্যমে খোদা তা'লা জগৎকে সংবাদ দেন যে, দেখো! আমি তাকে গঠন করব। আমি তার মাঝে নক্ষত্রতুল্য ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করব এবং আকাশের ন্যায় তাকে সুউচ্চ করব। একটি অণুকে পর্বততুল্য করে দেখাবো। এরপর পৃথিবীর সকল দুষ্কৃতিকারীও যদি চায় যে, সেই ঐশী ইচ্ছা ব্যর্থ হোক আর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যেন সে বিষয় প্রকাশ না পায়, কিন্তু তা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত থামতে পারে না। আর খোদার হাত সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে তাকে পূর্ণতা দেয়। তিনি এক অজানা-অচেনা ব্যক্তিকে স্বীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারে এক মহান জামা'ত

বানিয়ে দেন। তিনি সকল সোচ্চার লোককে তাঁর দিকে টেনে আনেন। তিনি সেই অজানা-অচেনা ব্যক্তিকে এমন খ্যাতি দান করেন যা তার পিতা পিতামহের ভাগ্যে তা কখনো জোটে নি। তিনি সকল ক্ষেত্রে তার সহায় হন এবং সকল যুদ্ধে তাকে বিজয় দান করেন। এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে তার দাসত্ববরণে বাধ্য করেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে তার দিকে টেনে আনেন আর তাঁর শিক্ষা তাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ফেরেশতার মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেন। তিনি তার শত্রুদের শত্রু এবং বন্ধুদের বন্ধু হয়ে যান এবং তার শত্রুদের সাথে তিনি নিজেই যুদ্ধ করেন। এ কারণেই আমি বলেছিলাম, পুণ্যবানদের নিদর্শনমূলক জীবন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল থেকে খোদার অস্তিত্বের বড়ো প্রমাণ হয়ে থাকে। কেননা মানুষ স্বচক্ষে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে খোদার হাতে গঠিত হতে দেখে নি কিন্তু তারা স্বচক্ষে এটি দেখে যে, খোদা স্বহস্তে পুণ্যবানদের ভাগ্য ও সাফল্যের অট্টালিকা নির্মাণ করে থাকেন। তিনি দীর্ঘকাল পূর্বে সংবাদ প্রদান করেন যে, এমনটি করব আর তাকে এ পর্যায়ে পৌঁছাবো। এরপর কঠিন প্রতিরোধ এবং দুষ্কৃতিকারীদের পক্ষ থেকে ভয়াবহ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তেমনই করে দেখান।

অতএব এই নিদর্শন সত্যসন্ধানীকে অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য পর্যন্ত পৌঁছায় আর তা খোদার অস্তিত্বের এক সুনিশ্চিত প্রমাণ হয়ে থাকে কিন্তু কেবল তাদের জন্য যারা খোদার সন্ধানী, নিরহংকারী এবং সত্যকে পেয়ে বিনয়ের সাথে তা গ্রহণ করে। এ যুগেও খোদা তা'লা অনেক এমন নিদর্শন (একের পর এক) দেখিয়েছেন। কত ভালো হতো! মানুষ যদি এগুলো সম্পর্কে ভাবত এবং নিজেদেরকে বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রদীপে আলোকিত করে পরিত্রাণের যোগ্য করে তুলত! কিন্তু খোদার নিদর্শনাবলির মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা লাভকরা দুষ্কৃতিকারী মানুষের ভাগ্যে জোটে না। সে আলো দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলে, পাছে আলো তার চোখকে জ্যোতির্মণ্ডিত করে আর পথ স্পষ্ট হয়ে যায়। দুষ্কৃতিকারী সহস্র নিদর্শন দেখেও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে কথা না বুঝে একই কথা বার বার উত্থাপন করে। যে ব্যক্তি খোদার পক্ষ থেকে আসেন তার জন্য আবশ্যক নয় যে, তিনি এমন নিদর্শন প্রদর্শন করবেন যার ফলে নক্ষত্র ভূপাতিত হবে অথবা সূর্য পশ্চিম থেকে উদিত হবে বা ছাগলকে মানুষ বানিয়ে দেখাবে অথবা মানুষের সামনে আকাশে আরোহণ করবে এবং তাদের সামনে আকাশ থেকে অবতরণ করবে। তাদের জন্য

আকাশ থেকে লিখিত পুস্তক নিয়ে আসবে যা মানুষ হাতে নিয়ে পড়বে বা তার সব ঘর স্বর্ণনির্মিত হবে অথবা তার হাতে মানুষের প্রয়াত পিতাপিতামহ জীবিত হয়ে কথা বলতে আরম্ভ করবে আর চিৎকার করতে করতে কবর থেকে বের হয়ে আসবে। নিজেদের পুত্রদের অভিশাপ দেবে আর ভর্ৎসনা করে বলবে, এ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সত্য খোদার রসূল ছিল; তোমরা এ-কী কাণ্ড করলে যে, তাকে অস্বীকার করে বসলে? আমরা স্বচক্ষে দেখে এসেছি, তাঁর প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীরা সোজা বেহেশতের দিকে যাচ্ছে এবং তাঁকে অস্বীকারকারীরা চরম ঘৃণ্য অবস্থায় দোযখে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে! এছাড়া (তারা) শহরে জলসা করবে আর সকল অস্বীকারকারীকে সেসব জলসায় ডাকবে এবং নিজেদের সন্তানসন্ততিকে বলবে, তোমরা জানো যে, আমরা তোমাদের পিতা-পিতামহ। আর তোমরা (এটিও) জানো আমরা এই লোকের কত ঘোরতর শত্রু ছিলাম! কিন্তু আমরা যখন মারা যাই তখন এর প্রতি শত্রুতার কারণে দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। দেখো! আমাদের দেহ আগুনে ঝলসে কালো হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের সামনে (এই) সাক্ষ্য দেবার জন্য আমরা কবর থেকে বের হয়ে এসেছি যে, এই ব্যক্তি খোদার সত্য নবী। স্মরণ রেখো! এমন বক্তৃতা কখনো কবর থেকে বের হয়ে মৃতরা দেয় নি, আর কখনো কোনো যুগে এমন জলসাও হয় নি। অর্থাৎ কিছু লোকের পিতা-পিতামহ কবর থেকে জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে আর তখন একটি জলসাগাহ নির্ধারিত হবে এবং পুরো শহরবাসীকে সেসব প্রয়াত লোকের সামনে ডাকা হবে এবং সেসব প্রয়াত লোক সহস্র সহস্র মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে এ বক্তৃতা দেবে, "উপস্থিত সুধী! আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আপনারা আমাদের বক্তৃতা শোনার জন্য এসেছেন। আপনারা আমাদের খুব ভালোভাবে জানেন ও চেনেন, আমরা অমুক অমুক পাড়ায় বসবাস করতাম আর অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দাদা ও বড়ো দাদা। কয়েক বছর পূর্বে যখন আমরা প্লেগ বা কলেরায় কিংবা অন্য কোনো রোগের কারণে মৃত্যুবরণ করেছিলাম আর আপনারা আমাদের জানাযায় উপস্থিত ছিলেন আর আপনারাই আমাদের কবর দিয়েছিলেন অথবা (দোয়া করে) ফুঁ দিয়েছিলেন। এরপর আমাদের সামনে সভাপতির আসন অলংকৃতকারী এই সম্মানিত নবীকে চরম তাচ্ছিল্যের সাথে আপনারা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করেছেন। তার কাছে দাবি করেছেন, নিদর্শনমূলকভাবে কতক মৃত লোক জীবিত হওয়া উচিত

তখন আমরা তার দোয়ায় জীবন লাভ করি, যারা এখন আপনাদের সামনে দণ্ডায়মান রয়েছে। বন্ধুগণ! ভালোভাবে দেখুন! আমরা তারাই আর আমাদের কাছে আমাদের পুরো বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করুন। জীবিত হয়ে এখন আমরা চাক্ষুষ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, প্রকৃতপক্ষেই এই ব্যক্তি সত্য আর তাঁকে না মানার কারণে আমরা দোযখে দগ্ধ হয়ে এসেছি, তাই আমাদের সাক্ষ্য স্বচক্ষে দেখা সাক্ষ্য; এটি গ্রহণ করো যেন তোমরা দোযখ থেকে রেহাই পাও। প্রশ্ন হলো, প্রয়াত কোনো ব্যক্তি জীবিত হয়ে এসে এমন বক্তৃতা দিয়েছে আর মানুষ তা গ্রহণ করে নি কোনো মানুষ যার কাণ্ডজ্ঞান আছে সে এবং কোনো বিবেকবান ও আলোকিত হৃদয় (এটি) গ্রহণ করবে কি?

অতএব যে ব্যক্তি এখনও বোঝে না যে, নিদর্শন কতটা (কীভাবে) প্রকাশ পায়, সে নিজেই মৃত। নিদর্শন গণ্য হবার জন্য যদি মৃতদের পক্ষ থেকে এমন বক্তৃতা প্রদান আবশ্যক হয়ে থাকে তাহলে ঈমানের কোনো লাভ নেই। কেননা ঈমান তখনই ঈমান আখ্যায়িত হয় যদি একটি কথা এক দৃষ্টিকোণ থেকে সুস্পষ্ট থাকে এবং অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে থাকে প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে তার প্রমাণ পাওয়া যায় আর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে না দেখলে সত্য অপ্রকাশিত রয়ে যায়। পুরো পর্দা যদি উন্মোচিত হয়ে যায় তাহলে কে আছে যে একথাকে গ্রহণ করবে না? সুতরাং নিদর্শন বলতে সেসব অলৌকিক বিষয়কে বুঝায় যা সূক্ষ্ম ও ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে নিদর্শন প্রমাণিত হয় আর ঐশী সাহায্যপুষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যরা এমন বিষয় প্রদর্শনের ক্ষমতা রাখে না। সে কারণেই এসব বিষয়কে অলৌকিক বলা হয়ে থাকে। কিন্তু চিরহতভাগারা এসব নিদর্শনমূলক বিষয় হতে লাভবান হতে পারে না। যেমন- ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)-এর হাতে সংঘটিত অনেক নিদর্শন দেখেছে কিন্তু সেগুলোকে কাজে লাগায় নি বরং অস্বীকার করার জন্য অন্য একটি অজুহাত দাঁড় করিয়েছে (অর্থাৎ তারা বলতে আরম্ভ করে), এই ব্যক্তির কোনো কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয় নি, যেমন হাওয়ারীদের অনুকূলে কৃত বারোটি সিংহাসন-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী। তাদের একজন মুরতাদ হয়ে যায়। ইহুদীদের বাদশা হবার দাবি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। এরপর আবার ব্যাখ্যা করা হয় যে, আমি এর দ্বারা স্বর্গীয় রাজত্ব বুঝিয়েছি। হযরত মসীহ এ ভবিষ্যদ্‌বাণীও করে ছিলেন যে, এ যুগের মানুষ জীবিত থাকতেই আমি আবার পৃথিবীতে আসব কিন্তু এ ভবিষ্যদ্‌বাণীও স্পষ্টভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া পূর্ববর্তী নবীরাও

মসীহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে, ইলিয়াস পৃথিবীতে পুনরায় না আসা পর্যন্ত মসীহ আসবেন না। কিন্তু ইলিয়াস আসার আগেই মরিয়মের পুত্র ঈসা অযথা মসীহ হবার দাবি করে বসেছে, অথচ ইলিয়াস দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসেন নি। যখন জিজ্ঞেস করা হয় তখন প্রতিশ্রুত ইলিয়াসের স্থানে 'ইউহান্না' অর্থাৎ 'ইয়াহইয়া' নবীকে 'ইলিয়াস' সাব্যস্ত করলেন যেন কোনোভাবে মসীহ মওউদ সাজতে পারেন, অথচ পূর্ববর্তী নবীরা আগমনকারী ইলিয়াস সম্পর্কে মোটেও এ ব্যাখ্যা দিয়ে যান নি বরং স্বয়ং ইয়াহইয়া নবী ইলিয়াস বলতে সেই ইলিয়াসকেই বুঝিয়েছেন যিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু মসীহ অর্থাৎ মরিয়মের পুত্র যীশু নিজের কথা মানানোর জন্য পূর্ববর্তী সকল নবী এবং সকল খোদাভীরু লোকের ইজমা বা সর্ববাদী সম্মত মতের বিরুদ্ধে গিয়ে আগমনকারী ইলিয়াসের অর্থ করেছেন, তার পথপ্রদর্শক বা ইয়াহইয়া। বিস্ময়কর বিষয় হলো, স্বয়ং ইউহান্না বা ইয়াহইয়া– ইলিয়াস হবার কথা অস্বীকার করেন কিন্তু তা সত্ত্বেও মরিয়মের পুত্র যীশু একতরফা তাকে ইলিয়াস আখ্যা দিয়ে বসেছেন।

এখন প্রণিধানের বিষয় হলো, ইহুদীরা হযরত ঈসার নিদর্শনাবলিকে আদৌ কাজে লাগায় নি। অদ্যাবধি বলে যে, তার হাতে কোনো নিদর্শনই প্রকাশ পায় নি। তার সবকাজ ছিল কেবল প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র, এ কারণেই হযরত মসীহ্‌কে বলতে হয়েছে, "এ যুগের পাপিষ্ঠরা আমার কাছে নিদর্শন দাবি করে। তাদের কোনো নিদর্শন দেখানো হবে না"।

সত্যিকার অর্থে, নিদর্শনকে পূর্ণিমার রাতের চন্দ্রালোকের সাথে তুলনা করা যায় যার অংশবিশেষে কিছুটা মেঘও থাকতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি রাতকানা, যে রাতে কিছুই দেখে না তার জন্য এই পূর্ণিমা আদৌ কাজের নয়। এটি আদৌ হতে পারে না আর কখনো হয়ও নি যে, এ পৃথিবীতে নিদর্শন সেভাবেই প্রকাশ পাবে যেভাবে পরকালে প্রকাশিত হবে। উদাহরণস্বরূপ দু-তিনশ মুর্দা জীবিত হয়ে উঠবে, তাদের কাছে জান্নাতের ফল থাকবে আর তারা দোযখের আগুনের স্ফুলিঙ্গও নিজেদের কাছে রাখবে আর শহরে-বন্দরে ঘুরে বেড়াবে। জাতির মাঝে বিদ্যমান এক নবীর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। মানুষ তাদের চিনতে পারবে যে, সত্যিকার অর্থে এরা মারা গিয়েছিল এখন আবার জীবিত হয়ে উঠেছে আর বক্তৃতায় গলা ফাটিয়ে বলবে, নবুওয়তের দাবিদার এ ব্যক্তি সত্যবাদী! অতএব স্মরণ রাখা উচিত এমন নিদর্শন পূর্বে কখনো প্রকাশিত হয়

নি আর ভবিষ্যতেও কিয়ামত পর্যন্ত প্রকাশ পাবে না। কোনো সময় এমন নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে বলে যে ব্যক্তি দাবি করে সে নিছক ভিত্তিহীন কাহিনির হাতে প্রতারিত হয়েছে আর সে খোদার রীতি বা নিয়মের কোনো জ্ঞানই রাখে না। এমন নিদর্শন প্রকাশ পেলে পৃথিবী আর পৃথিবী থাকত না, সকল পর্দা অপসারিত হয়ে যেত আর ঈমান আনায় বিন্দু পরিমাণও পুণ্য লাভ হতো না।

স্মরণ রাখা উচিত, সত্যের অনুসারীদের নিদর্শন প্রদান করা হয়ে থাকে কেবল সত্য-মিথ্যার পার্থক্য তুলে ধরার জন্য। বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণদের দৃষ্টিতে নিদর্শনের আসল উদ্দেশ্য হলো সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করা। নিদর্শন কেবল ততটা প্রকাশ পায় যতটা (এ দুটোর মাঝে) পার্থক্য স্পষ্ট করার জন্য আবশ্যক। নিদর্শন কী পরিমাণ প্রকাশ পাবে, তা নির্ভর করে যুগের প্রয়োজনের ওপর। এছাড়া নিদর্শনের প্রকার ও প্রকৃতি যুগের অবস্থার নিরিখে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এমনটি কখনো ঘটে না যে সকল বিদ্বেষী, অজ্ঞ ও নোংরা প্রকৃতির মানুষ ঐশী প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে ও প্রয়োজনাতীত যত নিদর্শনই দাবি করবে তা অবশ্যই দেখানোও হবে। এ রীতি ঐশী প্রজ্ঞার যেমন পরিপন্থি তেমনটি মানুষের বিশ্বাসগত অবস্থার জন্যও হানিকর; কেননা নিদর্শনের গণ্ডি যদি এতটা বিস্তৃত করে দেওয়া হয় যে, যা কিছু কিয়ামত কালের জন্য থাকতে দেওয়া হয়েছে তা পৃথিবীতেই নিদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে যাবে, তাহলে কিয়ামত ও পৃথিবীর মাঝে আর কোনো পার্থক্য থাকবে না; অথচ এই পার্থক্যের কারণেই পৃথিবীতে কৃত সকল পুণ্যকর্ম ও সঠিক বিশ্বাসের প্রতিদান লাভ হয়। কিয়ামত দিবসে সেসব পুণ্যকর্ম ও সত্য বিশ্বাস অবলম্বনের একবিন্দু পরিমাণ পুণ্যও লাভ হবে না। সকল নবীর গ্রন্থে এবং পবিত্র কুরআনেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামত দিবসে কোনো কথা শিরোধার্য করা অথবা কোনো কর্ম উপকারে আসবে না, আর তখন ঈমান আনা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন হবে, কেননা কোনো অপ্রকাশিত কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকেই ঈমান বলা হয়। কিন্তু যখন পর্দা উন্মোচিত হয়ে যায় এবং আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য উদিত হয়ে যায় আর স্পষ্টভাবে এমন বিষয় দৃশ্যপটে এসে যায়, যার কল্যাণে খোদা ও শাস্তি-পুরস্কার দিবসে সন্দেহ করার আর কোনো অবকাশ থাকে না, তখন এটি বলা যে, আমি ঈমান আনলাম; এটি অর্জিত পুণ্যার্জনের চেষ্টা করার নামান্তর বইকি। বস্তুত নিদর্শন এত স্পষ্ট কোনো বিষয় নয় যে, সারা পৃথিবী কোনো প্রকার মতভেদ ও অজুহাত না

দেখিয়ে আর উচ্চবাচ্য না করেই অবশ্যই গ্রহণ করে নেবে বা এ সম্পর্কে কোনো প্রকৃতির মানুষের আপত্তি থাকবেনা অথবা একান্ত মাথামোটা মানুষের জন্যও সে বিষয়টি অস্পষ্ট থাকবে না।

এককথায় নিদর্শন ও মুজিযা এত স্পষ্ট বিষয় নয় যা দেখতেই সকল প্রকার মানুষের কাছে গ্রহণীয় হবে, বরং নিদর্শনাবলি থেকে সেসব বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ, খোদাভীরু ও সৎপ্রকৃতির মানুষই লাভবান হয়ে থাকে, যারা নিজেদের অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, সূক্ষ্মদৃষ্টি, ন্যায়প্রিয়তা, খোদাভীতি এবং তাকওয়ার দৃষ্টিতে অনুধাবন করে যে, এ নিদর্শনগুলো পৃথিবীর তুচ্ছ বিষয়াদির অন্তর্গত নয় আর একজন মিথ্যাবাদী তা প্রদর্শনের ক্ষমতাও রাখে না। তারা বুঝতে পারে যে, এ বিষয়গুলো মানবীয় কৃত্রিমতার অনেক ঊর্ধ্বে এবং মানবীয় হস্তক্ষেপের বাইরে। সেগুলোতে এমন একটি বিশেষত্ব ও পার্থক্যসূচক লক্ষণ থাকে, যেক্ষেত্রে মানুষের তুচ্ছ ক্ষমতা ও কৃত্রিম পরিকল্পনা অক্ষম। তারা তাদের সূক্ষ্ম বোধবুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির জ্যোতিতে সেই গভীরতাকে উদ্‌ঘাটন করে। অর্থাৎ তাদের মাঝে একটি আলো আছে এবং খোদার হাতের একটি সৌরভও আছে, যে সম্পর্কে কোনো ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও চাতুর্যের ভূমিকা রয়েছে বলে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। অতএব যেভাবে সূর্যের আলোতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য কেবল সেই আলোই যথেষ্ট নয় বরং চোখের জ্যোতিরও প্রয়োজন রয়েছে– যেন সে আলো দেখতে পায়, একইভাবে নিদর্শনের আলোতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নিছক নিদর্শনই যথেষ্ট নয় বরং অন্তর্দৃষ্টির জ্যোতিও অপরিহার্য। যতক্ষণ নিদর্শন প্রত্যক্ষকারীর মাঝে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেকের আলো থাকবে না ততক্ষণ তা গ্রহণ করা অসম্ভব। কিন্তু হতভাগা মানুষ! যাকে অন্তর্দৃষ্টির আলো দেওয়া হয় নি, সে পার্থক্যসূচক এমন নিদর্শনে আশ্বস্ত হয় না আর বার বার একই প্রশ্নই করে যে, কিয়ামততুল্য নিদর্শন ছাড়া আমি অন্য কোনো নিদর্শন গ্রহণ করতে পারি না। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি আমার সামনে আকাশে আরোহণ করবে আর আমার সামনে আকাশ থেকে অবতরণ করবে এবং সাথে করে এমন কোনো গ্রন্থ নিয়ে আসবে যা অবতরণের সময় তার হাতে থাকবে কেবল এটুকুই যথেষ্ট নয় বরং হাতে নিয়ে তা দেখার ও পড়ার পরই আমি মানবো। অথবা তাকে নিজের সাথে করে চাঁদের বা সূর্যের কোনো টুকরো আনতে হবে যা ভূপৃষ্ঠকে আলোকিত করতে সক্ষম হবে অথবা তার সাথে ফেরেশতাদের অবতরণ করতে হবে যারা ফেরেশতার মতো

অলৌকিক কাজ করে দেখাবে অথবা দশ-বিশজন মৃতব্যক্তি তার দোয়ায় জীবিত হতে হবে! অধিকন্তু তাদের যেন শনাক্ত করা যায় যে, অমুক ব্যক্তি অমুকের পিতা-পিতামহ, যে অমুক তারিখে প্রয়াত হয়েছিল; এতটুকুই যথেষ্ট হবে না বরং বিভিন্ন শহরে জলসা বা সমাবেশ করে তাদের বক্তৃতা দিতে হবে। উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিয়ে বলতে হবে, সত্যিকার অর্থে আমরা মৃত যারা পুনর্জীবন লাভ করে পৃথিবীতে এসেছি। আমরা এসেছি এ সাক্ষ্য দেবার জন্য যে, অমুক ধর্ম সত্য বা অমুক ব্যক্তি খোদার পক্ষ থেকে আগমনের দাবিতে সত্যবাদী, কেননা আমরা খোদার মুখে শুনে এসেছি যে, সে সত্যবাদী।

এগুলো হলো মানুষের বানানো সেসব নিদর্শন যা প্রায়শ ঈমানের বাস্তবতা সম্পর্কে অনবহিত অজ্ঞ লোকেরা দাবি করে থাকে বা এমন অনেক অলৌকিক নিদর্শন দাবি করে, যেগুলো খোদার ইচ্ছার সাথে দূরতম সম্পর্কও রাখে না। যেমন- অনেক দিন পূর্বে আর্যদের মধ্য হতে লেখরাম নামের এক ব্যক্তি কাদিয়ান এসে আমার কাছে এমনই নিদর্শন দাবি করেছিল। তাকে যদিও বোঝানো হয়েছে যে, নিদর্শনের উদ্দেশ্য হলো সত্যমিথ্যার মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করা আর কেবল পার্থক্য স্পষ্ট করা পর্যন্তই এর গণ্ডি সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বিদ্বেষ তাকে এতটা অন্ধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন করে রেখেছিল যে, সে এই বাস্তবতাকে বুঝতেই পারল না। অবশেষে সে আল্লাহর নিদর্শনাবলি অস্বীকার করার কারণে লাহোরে আল্লাহর নিদর্শনের লক্ষ্যে পরিণত হয়। তার প্রতারণামূলক ভবিষ্যদ্বাণীর বিপরীতে তার বিরুদ্ধে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে, সে ছয় বছরের মধ্যে মারা যাবে; ঠিক সেভাবেই তা প্রকাশ পেয়েছে। ঐশী নিয়তি প্রকাশিত হওয়াকে কেউ এতটুকুও বাধাগ্রস্ত করতে পারে নি, যে বিষয়ে পাঁচ বছর পূর্বে জনসমক্ষে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। ইসলাম ও আর্য ধর্মের মাঝে একটি পার্থক্যসূচক নিদর্শন প্রকাশ পায়, কেননা আমার পক্ষ থেকে এই দাবি ছিল, 'ইসলাম ধর্ম সত্য' আর লেখরামের পক্ষ থেকে দাবি ছিল 'আর্য ধর্ম সত্য'। লেখরাম তার দাবির সমর্থনে নিজের পুস্তকে যা এখনও বিদ্যমান, আমার সম্পর্কে একথা প্রকাশ করেছিল যে, পরমেশ্বরের এলহাম যোগে সে জানতে পেরেছে, এ ব্যক্তি (অর্থাৎ এই পুস্তকের প্রণেতা) তিন বছরের মধ্যে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। তার বিপরীতে আমি খোদাপ্রদত্ত সত্য সংবাদের ভিত্তিতে এ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলাম যে, লেখরাম ছয় বছরের মধ্যে মারা যাবে এবং তার নিহত হবার

দিন ও তারিখ নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম; আর বাস্তবে তা-ই ঘটেছে। এটি হলো পার্থক্যসূচক নিদর্শন যা ইসলাম ধর্মের সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে, কিন্তু পরিতাপ! আর্যরা এটিকে কাজে লাগায় নি।

অতএব সত্য ধর্ম যুক্তিবুদ্ধির কাছে হাত পাতে না, কেননা এটি এর জন্য অসম্মানের কারণ। এর ফলে সন্দেহ জাগে যে, সেগুলো বুদ্ধিমান লোকদের কথা চুরি করে লেখা হয়েছে। কেননা পৃথিবীতে বুদ্ধিমান খুব কম অতিবাহিত হয় নি। বাস্তব সত্য হলো, সত্যধর্ম যৌক্তিক প্রমাণাদির পাশাপাশি ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরে যা হলো স্বর্গীয় নিদর্শন। এটিই সত্য ধর্মের মূল লক্ষণ। অবশ্য একথা সত্য যে, সাধারণ মানুষ ও অজ্ঞরা কিছু ধর্ম বা ব্যক্তির নামে যে-সব কেরামত ও নিদর্শন প্রচার করে বেড়ায় তা সম্পূর্ণভাবে অতিরঞ্জিত কিছু কথা আর তা কোনোভাবেই কোনো ধর্মের জন্য গর্বের কারণ হতে পারে না বরং লজ্জাকর ও অশোভন। এসব কাল্পনিক নিদর্শনের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-কে যতটা অভিযুক্ত করা হয়েছে, এর দৃষ্টান্ত অন্য কোনো নবীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এমনকি কতক অজ্ঞ মনে করে, হযরত ঈসা (আ.) সহস্র সহস্র বরং লক্ষ লক্ষ মৃতকে জীবিত করেছেন। পরিতাপের বিষয় হলো, ইনজীলেও এসব অতিরঞ্জিত কথাবার্তা লেখা আছে। যেমন একবার নাকি হাজার বছরের পুরোনো এক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত সবাই জীবিত হয়ে গিয়েছিল আর সব মৃতব্যক্তি জীবিত হয়ে শহরে এসে প্রবেশ করেছে।

এখন বুদ্ধিমান মাত্রই ধারণা করতে পারেন যে, কোটি কোটি মানুষ জীবিত হয়ে শহরে চলে আসে আর নিজেদের পুত্র-পৌত্রদের সব কাহিনি শোনায় আর হযরত ঈসা (আ.)-এর সত্যতার সত্যায়ন করে কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহুদীরা ঈমান আনে না; এমন কঠিন পাষণ্ডতার কথা কেউ ভাবতে পারে কি? সহস্র সহস্র মৃত জীবিত করা যদি হযরত ঈসার পেশা হয়ে থাকে তাহলে যুক্তির নিরিখে বলা যায় যে, তারা সবাই বোবা ও বধির হবে না। যাদেরকে এমন নিদর্শন দেখানো হতো এমন মৃতদের মধ্য হতে কেউ তাদের ভাই, কেউ পিতা, কেউ পুত্র কেউ মা আর কেউ দাদা কেউ দাদী এবং কেউ প্রিয় নিকটজন ও স্বজন হবে। সুতরাং হযরত ঈসার জন্য কাফিরদের মুমিন বানানোর একটি প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। ইহুদীদের অনেক প্রয়াত আত্মীয় হয়ত তাঁর সাথে ঘুরাফেরা করে থাকবে আর হযরত ঈসা অনেক শহরে তাদেরকে দিয়ে বক্তৃতাও করিয়ে থাকবেন! এমন বক্তৃতা হয়ত অতি সুন্দর ও আকর্ষণীয় হতো!

একজন মৃত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যখন উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করত যে, সুধী! আপনাদের অনেকেই এখন এমন আছেন যারা আমাকে চেনেন আর যারা স্বহস্তে আমাকে সমাধিস্থ করেছেন! এখন আমি খোদার মুখে শুনে এসেছি যে, ঈসা-মসীহ সত্য; তিনি আমাকে জীবিত করেছেন– সুতরাং স্পষ্টতই এটি অতি বড়ো মজার ব্যাপার হতো। এটি স্পষ্ট যে, এমন বক্তৃতার ফলে ইহুদীদের হৃদয়ে হয়ত সুগভীর প্রভাব পড়তো আর হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ ইহুদী হয়ত ঈমানও আনত। কিন্তু কুরআন ও 'ইনজীল' থেকে জানা যায় যে, ইহুদীরা হযরত ঈসাকে প্রত্যাখ্যান করেছে আর সৃষ্টির সংশোধনের ক্ষেত্রে (সাফল্যের মাপকাঠিতে) নবীদের মাঝে তিনি সবচেয়ে নিম্ন মানে উপনীত ছিলেন। প্রায় পুরো ইহুদী জাতি তাকে একজন প্রতারক ও মিথ্যাবাদী মনে করত।

এখন বুদ্ধিমানের ভাবা উচিত, এমন সুমহান ও অলৌকিক নিদর্শনের ফলাফল কি এটিই হয়ে থাকে? যেখানে সহস্র-সহস্র মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে হযরত ঈসার সত্যতার সাক্ষ্যও দিল আর এটিও বলল যে, আমরা বেহেশত দেখে এসেছি। তাতে কেবল হযরত ঈসার অনুসারী খ্রিষ্টানরা রয়েছে আর দোযখে শুধু হযরত ঈসার অস্বীকারকারী ইহুদীদের দেখেছি! এসব কিছুর পর হযরত ঈসার সত্যতায় সন্দেহ করার ধৃষ্টতা কেউ দেখাতে পারত কি? কেউ সন্দেহ করলে– তাদের বাপদাদা যারা জীবিত হয়ে এসেছে তারা তাদের এ বলে প্রাণে মেরে ফেলতো যে, হে নোংরা লোকেরা! আমাদের সাক্ষ্য দেওয়া সত্ত্বেও সন্দেহ করছ? অতএব নিশ্চিত জেনো, এমন নিদর্শন বাগাড়ম্বরতা ছাড়া আর কিছু নয়। নিদর্শন যে প্রকাশ পেতে পারে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু নিদর্শন কেবল তা-ই হয়ে থাকে যেমনটি কি-না আমরা পরবর্তীতে সবিস্তারে বর্ণনা করব।

এ স্থলে মুসলমানদের জন্য বড়োই পরিতাপ! তারা ঈসা (আ.)-এর প্রতি এমন নিদর্শনাবলি আরোপ করে থাকে যা পবিত্র কুরআন বর্ণিত রীতির পরিপন্থি। তারা সেই রাস্তায় অগ্রসর হয়, যার সামনে যাবার গলি রুদ্ধ। কেবল এটুকুই নয়, হযরত ঈসা সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের পুরোনো কথায় বিশ্বাস করে বসে আছে বরং ভবিষ্যতে বিশ্বজগতের নিয়ম ভঙ্গ করে কোনো সময় আকাশ থেকে তাঁর অবতরণের কথা বিশ্বাস করে আর বলে, ভবিষ্যতে অর্থাৎ শেষ যুগে (অথচ পৃথিবীর বয়স সাত হাজার হবার নিরিখে এটিই শেষ যুগ)

হযরত ঈসা আকাশ থেকে ফেরেশতাদের সাথে অবতরণ করবেন। অনেক বড়ো তামাশা হবে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিড় করবে এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে; মানুষ দূর থেকে দেখে বলবে, তিনি আসছেন, এইতো তিনি আসছেন! দামেস্কের একটি শুভ্র মিনারের পাশে তিনি অবতরণ করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, সেই অসহায় ও দুর্বল মানুষ যিনি নিজের নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণের জন্য ইলিয়াস নবীকে পুনরায় আকাশ থেকে পৃথিবীতে আনতে পারলেন না! এমনকি তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো! তাঁর সম্পর্কে এমনসব অলৌকিক কৃস্মার কথা বলে বেড়ানো হয়! এসব কথা যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে হযরত আব্দুল কাদের জীলানীর এই কেরামত কেন স্বীকার করা হবে না যা মানুষের মাঝে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করছে? বলা হয় বারাতসহ একটি নৌকা নদীতে ডুবে গিয়েছিল, তা তিনি বারো বছর পর উদ্ধার করেছিলেন আর সব মানুষ তখনো জীবিত ছিল এবং তাদের বাদ্য ও ঢোল বাজছিল। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় কেরামত হলো, একবার আজরাইল অনুমতি ছাড়া তাঁর কোনো মুরীদের প্রাণ হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি উড়ে গিয়ে তাকে আকাশে ধরে ফেলেন, তার পায়ে লাঠি মেরে হাড় ভেঙে দেন। সেদিন ফেরেশতা যত রূহ কবজ করেছিল সবাইকে ছেড়ে দেয় এবং তারা সবাই জীবিত হয়ে যায়। ফেরেশতা কাঁদতে কাঁদতে খোদার কাছে যায়। আল্লাহ তা'লা বলেন, আব্দুল কাদের প্রেমাস্পদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আছে, তাঁর কাজে কোনোভাবে নাক গলানো হবে না। সে যদি অতীতের সকল মৃতকে জীবিত করে দিতে চাইত তাহলে সে অধিকারও তাঁর ছিল।

এখন যদি এত প্রসিদ্ধ নিদর্শনকে (সত্য বলে) গ্রহণ করা না হয়, যা মানলে কোনো সমস্যাও ছিল না, তাহলে কেন এমন ব্যক্তির প্রতি সেসব কথা আরোপ করা হয় যা কেবল পবিত্র কুরআনের কথারই পরিপন্থি নয় বরং ঈসাপূজার শিরক, এর মাধ্যমে আরো দৃঢ়তা লাভ করে যা চল্লিশ কোটি মানুষকে খোদা তা'লার একত্ববাদ হতে বঞ্চিত করেছে। আমি বুঝি না, হযরত ঈসার মাঝে অন্যান্য নবীর চেয়ে বেশি এমন কী আছে আর কিবা তাঁর বিশেষত্ব! এছাড়া তাঁকে এমন এক বিশেষত্ব প্রদান করা যা শিরকের মূল, তা কত স্পষ্ট ভ্রষ্টতা যার কারণে একটি বিশাল গোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে গেছে! পরিতাপ! তারা কেবল কৃত্রিম প্রায়শ্চিত্তের ওপর নির্ভর করে নিজেদের ধ্বংস করেছে আর একথা ভাবল না যে, কুপ্রবৃত্তির অগ্নিদরিয়া কেবল সে-ই অতিক্রম করতে

সক্ষম হবে, যে স্বহস্তে নিজের নৌকা বানাবে আর সে-ই পারিশ্রমিক পাবে যে নিজের কাজ নিজে করবে। ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে সে-ই রক্ষা পাবে যে নিজের বোঝা নিজে বহন করবে। এটি কেমন অজ্ঞতা! এক ব্যক্তি আপাদমস্তক অক্ষম হয়ে অন্য মানুষের ওপর নিজের সফলতার জন্য নির্ভর করবে আর কারো দৈহিক শক্তিকে নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য কল্যাণকর মনে করবে! খোদার বিধান হলো, তিনি কোনো মানুষকে কোনো বিষয়ে বিশেষত্ব প্রদান করেন নি আর কেউ বলতে পারে না যে, আমার মাঝে এমন এক বিশেষত্ব রয়েছে যা অন্যদের মাঝে নেই। এমনটি হলে এমন মানুষকে মাবুদ বা উপাস্য বানানোর ভীত রচিত হতো। আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর সময় কতক খ্রিষ্টান হযরত ঈসা (আ.)-এর এই বিশেষত্ব উপস্থাপন করেছিল যে, তিনি বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেছেন! আল্লাহ তা'লা তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেন–

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

(আলে ইমরান: ৬০)

অর্থাৎ ঈসার উপমা আদমের উপমাতুল্য। খোদা তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বলেন, হয়ে যাও, সুতরাং সে হয়ে গেল। একইভাবে ঈসা ইবনে মরিয়ম, মরিয়মের রক্ত ও মরিয়মের ডিম্বাণু হতে সৃষ্টি হয়েছেন এরপর খোদা বলেন, হও আর সে হয়ে গেল! প্রশ্ন হলো, এতে খোদা হবার কী আছে আর এমন কী বিশেষত্ব তার মাঝে সৃষ্টি হলো? বর্ষাকালে সহস্র-সহস্র পোকামাকড় পিতামাতা ছাড়াই ভূমি হতে আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে যায়। কেউ তাদেরকে খোদা আখ্যায়িত করে না, কেউ তাদের উপাসনা করে না আর কেউ তাদের সামনে মাথা নতও করে না। তাই অনর্থক হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এত হইচই করা অজ্ঞতা নয় তো আর কী? আর একথা বলা কুরআনের বিরোধিতা করা যে, অন্য সব নবী মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু তিনি আজও জীবিত আছেন! আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে তাঁর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছেন, তাই তিনি জীবিত কীভাবে থাকতে পারেন? পবিত্র কুরআন থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি পুনরায় কখনো আসবেন না; যেমনটি কিনা আয়াত فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي থেকে এ উভয় বক্তব্য প্রমাণিত। কেননা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ পুরো আয়াতের অর্থ হলো, খোদা কিয়ামত দিবসে হযরত ঈসা

(আ.)-কে বলবেন, তুমিই কি মানুষকে বলেছিলে যে, আমাকে ও আমার মাকে নিজেদের উপাস্য বানাও? তখন তিনি উত্তর দেবেন, আমি যতদিন আমার জাতিতে ছিলাম, স্বজাতির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলাম এবং সাক্ষী ছিলাম। এরপর যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে, তখন তুমিই তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলে, অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অনবহিত।

এখন এই আয়াত দ্বারা দুটো কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, (১) প্রথমত, হযরত ঈসা (আ.) এই আয়াতে স্বীকার করেন যে, যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম আমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম, তারা আমার উপস্থিতিতে নষ্ট হয় নি, বরং আমার মৃত্যুর পর পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব যদি মনে করা হয়, হযরত ঈসা (আ.) এখনও আকাশে জীবিত আছেন তাহলে এটিও মানতে হবে যে, খ্রিষ্টানরাও এখনও বিভ্রান্ত হয় নি; কেননা এ আয়াতে খ্রিষ্টানদের পথভ্রষ্টতাকে فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (আল-মায়েদা: ১১৮) আয়াতের একটি ফলাফল আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর ওপর এর ভিত্তি রাখা হয়েছে। কিন্তু খ্রিষ্টানরা যেহেতু পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তাই স্পষ্টতই মানতে হবে যে, হযরত ঈসা (আ.)-ও মৃত্যুবরণ করেছেন। নতুবা কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করা হবে। (২) দ্বিতীয়ত, আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত ঈসা (আ.) খিষ্টানদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং বলবেন, আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে ততক্ষণ পর্যন্ত অবগত ছিলাম যতক্ষণ আমি তাদের মাঝে ছিলাম। এরপর যখন আমাকে মৃত্যু দেওয়া হলো তখন থেকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণরূপে অনবহিত। আমার অবর্তমানে কী হয়েছে তা আমি জানি না। জানা কথা, কিয়ামতের পূর্বে কোনো সময়ে তিনি পৃথিবীতে এলে আর খ্রিষ্টানদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে অবগত হলে তাঁর একথা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হতো। এমন পরিস্থিতিতে খোদার পক্ষ থেকে এর উত্তর একথা হওয়া উচিত ছিল, হে অশিষ্ট ব্যক্তি! আমার সামনে এবং আমার আদালতে কেন মিথ্যা বলছ এবং কেনইবা নিছক মিথ্যার ছলে বলছ যে, তাদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণরূপে অনবহিত? অথচ তুমি খুব ভালোভাবেই অবগত আছো, আমি তোমাকে কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলাম এবং তুমি খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধও করেছিলে, তাদের ক্রুশ ভেঙেছিলে এবং তাদের শূকর বধ করেছিলে–

এরপরও আমার সামনে এমনভাবে মিথ্যা বলছ যেন তুমি কিছুই জানো না! জানা কথা যে, হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন বলে বিশ্বাস পোষণ করার মাঝে তাঁর কত ভয়াবহ অসম্মান ও অবমাননা নিহিত! আর নাউযুবিল্লাহ্, এর ফলে তিনি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন।

আর যদি বলো, তাহলে সেসব হাদীসের কী অর্থ করব যাতে লেখা আছে, ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন? এর উত্তর হলো, সেভাবে অর্থ করো যেভাবে হযরত ঈসা– ইলিয়াসের দ্বিতীয়বার আগমনের অর্থ করেছেন। এছাড়া হাদীসে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, সেই ঈসা এই উম্মতের মধ্য হতে হবেন অন্য কোনো ব্যক্তি হবেন না। কিন্তু এটি লেখা নেই যে, তিনি দ্বিতীয়বার আসবেন, বরং নাযিল (বা অবতীর্ণ) হবেন লেখা আছে। দ্বিতীয়বার আগমন যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে সেখানে নযূল নয় বরং রজূ বা প্রত্যাবর্তন শব্দ ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল। যদি কোনো হাদীস, কুরআন বিরোধী হয় তবে তা প্রত্যাখ্যাত হবার যোগ্য, এমন নয় যে, কোনো হাদীসের জন্য পবিত্র কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। এখানে স্মর্তব্য যে, কুরআন শরীফ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ভুলভ্রান্তি ও মতভেদ দূর করার জন্য এসেছে। তাই ইহুদী-খ্রিষ্টান সংক্রান্ত কুরআনের কোনো আয়াতের অর্থ করার সময় এটি অবশ্যই দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, তাদের মাঝে কী বিতণ্ডা ছিল? যার নিষ্পত্তি কুরআন করতে চায়। এখন এ নীতির ভিত্তিতে–

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ . بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ

(আন-নিসা: ১৫৮-১৫৯) আয়াতের অর্থ একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি অতি সহজেই বুঝতে পারে। কেননা ইহুদীদের বিশ্বাস অনুসারে যে ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয় সে অভিশপ্ত হয়ে থাকে আর খোদার দিকে তার আধ্যাত্মিক রাফা হয় না; সে শয়তাদের দিকে যায়। খোদার দিকে হযরত ঈসার রাফা হয়েছে কি হয় নি? পবিত্র কুরআনে খোদা তা'লার এই সিদ্ধান্ত দেবার কথা। সুতরাং খোদা তা'লা সর্বপ্রথম হযরত ঈসা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন মর্মে ইহুদীদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করেছেন। তিনি বলেন, এটি কেবল ইহুদীদের একটি সন্দেহ ছিল যা খোদা তা'লা তাদের হৃদয়ে সঞ্চার করেছেন। ঈসাকে অভিশপ্ত বলা যেতে পারে না, কেননা তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যান নি। সত্য কথা হলো, অন্যান্য মু'মিনের ন্যায় তাঁর আধ্যাত্মিক রাফা

হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) আকাশে গিয়েছেন নাকি যান নি– খোদা তা'লার এই বিষয়ে বৃথা বিতর্ক করা ও সিদ্ধান্ত দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না; কেননা এ বিষয়ে ইহুদীদের কোনো বিতর্ক ছিল না। ইহুদীদের বিশ্বাস এটি নয় যে, যে ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যায় সে সশরীরে আকাশে যায় না; যদি এটি হয় তাহলে এর আবশ্যকীয় অর্থ দাঁড়ায় যে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যায় না সে আকাশে চলে যায়। ইহুদীরা এ বিশ্বাসও রাখে না যে, ঈমানহীন ও অভিশপ্ত মানুষ সশরীরে আকাশে যায় না, কিন্তু মুমিন সশরীরে আকাশে চলে যায়। কেননা মূসা (আ.) যিনি ইহুদীদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড়ো নবী ছিলেন তাঁর সম্পর্কেও ইহুদীদের এ বিশ্বাস নেই যে, তিনি সশরীরে আকাশে আরোহণ করেছেন। তাই পুরো বিতর্ক ছিল আধ্যাত্মিক রাফা সংক্রান্ত। ইহুদীদের পক্ষ থেকে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বিতণ্ডা ছিল নাউযুবিল্লাহ্ হযরত ঈসা (আ.) অভিশপ্ত, কেননা তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় নি; এর কারণ হলো, (তাদের ধারণা) তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব এই ভ্রান্তিই আল্লাহ তা'লা দূর করতে চেয়েছেন। তাই আল্লাহ তা'লা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ঈসা (আ.) অভিশপ্ত নন। বরং অন্যান্য মুমিনদের ন্যায় তাঁরও আধ্যাত্মিক রাফা হয়েছে বা আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত হয়েছেন।

স্মরণ রাখবেন, মালঊন (তথা অভিশপ্ত) শব্দটি মারফু শব্দের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। যেখানে মারফু-র অর্থ হলো আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত হওয়া সেখানে যারা হযরত ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ হবার কারণে অভিশপ্ত আখ্যায়িত করে তাদের দৃষ্টিতে মালঊন বা অভিশপ্ত হবার অর্থ কেবল এতটুকু যে, এমন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। খ্রিষ্টানরাও ভুলবশত হযরত ঈসা (আ.)-কে তিন দিনের জন্য অভিশপ্ত জ্ঞান করেছে অর্থাৎ তিন দিন পর্যন্ত তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি বা রাফা হয় নি। তাদের বিশ্বাস অনুসারে হযরত ঈসা অভিশপ্ত অবস্থায় কবরে গিয়েছেন এবং সাথে কোনো দেহ ছিল না। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, মারফু হবার ক্ষেত্রে আবার দেহের প্রয়োজন কেন দেখা দিল? উভয় অবস্থা অভিন্ন হওয়া উচিত। এটি আমাদের পক্ষ থেকে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তারাও রাফা সম্পর্কে ভ্রান্তিতে নিপতিত। তারা আজও একথা স্বীকার করে যে, তওরাতের অনুসারে ক্রুশবিদ্ধ করার ফলাফল একটি আধ্যাত্মিক বিষয় ছিল অর্থাৎ অভিশপ্ত হওয়া, যাকে অন্য ভাষায় রাফাহীনতা বা অধ্যাত্মিক উন্নতি না হওয়া বলা যায়। অতএব তাদের বিশ্বাস অনুসারে রাফা না হবার বিষয়টি যেখানে আধ্যাত্মিকভাবে হয়েছে সেখানে রাফা-ও আধ্যাত্মিকভাবে

হওয়া উচিত ছিল যেন তুলনা সঠিক হয়। খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস হলো, হযরত ঈসা (আ.) অভিশপ্ত অবস্থায় কেবল আধ্যাত্মিকভাবে ভূগর্ভে এবং দোযখের দিকে গিয়েছেন। তখন তাঁর সাথে কোনো দেহ ছিল না। যেখানে এ হলো অবস্থা, সেখানে মারফু বা উন্নীত হবার সময় কেন দেহের প্রয়োজন দেখা দিল আর কেন দেহকে সাথে যুক্ত করা হলো? অথচ আদিকাল থেকে তওরাতের অনুসারী সকল নবী এবং ইহুদীদের সকল ফকীহ ধর্মতাত্ত্বিকরা ক্রুশীয় অভিশাপের অর্থ আধ্যাত্মিক উন্নতি না হওয়াই করে আসছেন। আর এখনও এ অর্থই করে যে, যে ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় তার খোদার দিকে রাফা হয় না; লানত বা অভিশাপের অর্থ হলো রাফা বা আধ্যাত্মিক উন্নতি না হওয়া। অতএব যেখানে খোদা তা'লা ইহুদীদের আপত্তি খণ্ডন করতে চেয়েছেন আর ইহুদীরা আজও রাফা না হবার আধ্যাত্মিক অর্থ করে থাকে, অর্থাৎ তারা বলে, হযরত ঈসা (আ.)-এর আধ্যাত্মিক অর্থে খোদার দিকে রাফা হয় নি এবং তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন! তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, খোদা তা'লা মূল কথা ছেড়ে অন্য দিকে কেন চলে গেলেন? ভাবটা এমন যেন নাঊযুবিল্লাহ, খোদা তা'লা ইহুদীদের আসল বিতর্ক বুঝতেই পারেন নি এবং এমন বিচারকের ন্যায় সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন, যে মামলার মূল নথিভুক্ত বিষয়ের পরিপন্থি সিদ্ধান্ত প্রদান করে। যদি সজ্ঞানে খোদা সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা হয় তাহলে কুফর আর কাকে বলে?

এছাড়াও আমরা বলি, যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, খোদা তা'লা এখানে ইহুদীদের প্রকৃত বিতর্কিত বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা বর্ণনা করা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও বৃথা কাজ ছিল, অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-কে সশরীরে দ্বিতীয় আকাশে বসানো হয়েছে, তাহলে এ ধারণা এভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে, প্রথমত পবিত্র কুরআনের কোথাও লেখা নেই যে, হযরত ঈসাকে সশরীরে দ্বিতীয় আকাশে বসানো হয়েছে, বরং কুরআনের শব্দ হলো, بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (আন-নিসা: ১৫৯) অর্থাৎ, খোদা, ঈসাকে নিজের দিকে তুলে নিয়েছেন। একটু চিন্তা করো! খোদা কি সাকার বস্তুনিচয়ের মতো দ্বিতীয় আকাশে বসে আছেন? এটি জানা কথা যে, খোদার দিকে রাফা (উন্নীত হওয়া) সবসময় আধ্যাত্মিকভাবেই হয়ে থাকে। একইভাবে সব নবীর শিক্ষা হলো, খোদা সাকার কিছু নন যে, তাঁর দিকে দৈহিক রাফা হবে। সমগ্র কুরআনের বাগ্‌ধারা হলো, কোনো বস্তু সম্পর্কে যখন বলা হয়, সে খোদার দিকে গিয়েছে বা খোদার দিকে তার রাফা হয়েছে,

সেক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, আধ্যাত্মিকভাবে তার রাফা হয়েছে; যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন,

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ

(আল-ফাজর: ২৮-২৯)

এ আয়াতের অর্থও একই। অর্থাৎ হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসো। এর অর্থ কি সশরীরে আসো?

এছাড়া এই প্রশ্ন উত্থাপিত হবে যে, এখানে যদি আধ্যাত্মিক রাফার কথা বলা না হয়ে থাকে এবং ইহুদীরা যে হযরত ঈসা (আ.)-এর আধ্যাত্মিক রাফার কথা অস্বীকার করেছে আর নাঊযুবিল্লাহ্ অভিশপ্ত আখ্যা দিয়েছিল, সেই বিবাদের এখানে নিষ্পত্তি না করা হয়ে থাকে, তাহলে পবিত্র কুরআনের কোন স্থানে ইহুদীদের এই আপত্তির খণ্ডন করা হয়েছে, যা খণ্ডন করা খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে আবশ্যক ছিল? অতএব এই পুরো বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হযরত ঈসা (আ.)-এর রাফাকে দৈহিক রাফা আখ্যা দেওয়া নিছক হঠকারিতা ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। বরং এটি সেই রাফা যা খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রত্যেক মু'মিনের ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর সংঘটিত হওয়া আবশ্যক। কাফিরদের জন্য সিদ্ধান্ত হলো,

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ

(আল-আ'রাফ: ৪১)

অর্থাৎ তাদের জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না; অর্থাৎ তাদের রাফা হবে না। অন্যত্র বলেন,

مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ

(সোয়াদ: ৫১)

অর্থাৎ সোজা কথাকে বদলে দেওয়া খোদাভীতি ও পবিত্রতা পরিপন্থি এবং এক দৃষ্টিকোণ থেকে খোদার বাণীতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের শামিল। সবাই অবগত যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময় সকল সাহাবীর মধ্যে ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন। সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যুগেও

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

(আলে ইমরান: ১৪৫)

আয়াতের এই অর্থই করা হয়েছে অর্থাৎ সকল রসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়! হযরত ঈসা (আ.) কি রসূল ছিলেন না যে, মৃত্যুর গণ্ডির বাইরে থেকে গেলেন? এই ইজমা সত্ত্বেও বক্র যুগের অনুকরণ করা সততা বহির্ভূত বিষয়। ইমাম মালেকের বিশ্বাসও এটিই ছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। কাজেই, অতীতের ইমামদের বিশ্বাস যেখানে এটি, সেখানে অন্যদের বিশ্বাসও এটিই হবে। অবশ্য প্রথম সারির যে-সব পুণ্যবান এ সত্য বুঝতে ভুল করেছেন তারা খোদার দৃষ্টিতে ক্ষমার যোগ্য। এ ধর্মে এমন অনেক রহস্যঘন সত্য ছিল যা মধ্যবর্তী যুগে হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মসীহ মওউদ-এর যুগে এসব ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়ে যাওয়া আবশ্যক ছিল, কেননা তিনি ন্যায়বিচারক হিসেবে এসেছেন। মধ্যবর্তী যুগে এসব ভ্রান্তি দেখা না দিলে মসীহ মওউদ-এর আগমন এবং তার অপেক্ষা করা বৃথা ছিল। কেননা মসীহ মওউদ হলেন মুজাদ্দিদ আর মুজাদ্দিদ ভুল সংশোধনের জন্য আসেন। যার নাম মহানবী (সা.) ন্যায়বিচারক বা হাকাম রেখেছেন তাঁর হাতে যদি কোনো সংশোধন না হয় তাহলে তিনি কীসের হাকাম বা ন্যায় বিচারক? সত্য কথা হলো, তারাই আশিসমণ্ডিত, যারা তাঁকে গ্রহণ করবে ও খোদাকে ভয় করবে।

এখন আমরা আবার আমাদের মূল বিষয়ের দিকে ফিরে আসছি, অর্থাৎ যে-সব নিদর্শন মানুষ হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি আরোপ করে তা সম্পূর্ণভাবে খোদার রীতি পরিপন্থি। যেখানে এক পক্ষ নিদর্শনকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে অবহেলা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে, সেখানে অন্য পক্ষ নিদর্শন সম্পর্কে চরম বাড়াবাড়ি করে নিজেদের ধারণাকে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, এভাবে উভয়পক্ষ মধ্যম পন্থা পরিহার করেছে। এখন জানা কথা যে, যদি নিদর্শন বা মুজিযা না থাকে তাহলে খোদার সত্তা সম্পর্কে কোনো অকাট্য ও নিশ্চিত প্রমাণ অবশিষ্ট থাকে না। পক্ষান্তরে নিদর্শন যদি এমন হয় যা এখন বর্ণনা করা হয়েছে তাহলে ঈমানের সুফল হারিয়ে যায় এবং ঈমান আর অবশিষ্ট থাকে না, বরং শিরক বা অংশীবাদিতা পর্যন্ত বিষয় গড়ায়। এছাড়া হযরত ঈসা (আ.) মর্মান্তিকভাবে অজ্ঞদের (অত্যাচারের) লক্ষ্যে পরিণত হয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশায় অধার্মিক ইহুদীরা তাঁর নাম কাফির, মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ ও প্রতারক রেখেছে এবং তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা অস্বীকার

করেছে। এরপর যখন তিনি মারা যান তখন যাদের মধ্যে মানবপূজার স্বভাব প্রকট ছিল তারা তাঁকে খোদা বানিয়ে বসেছে। আর ইহুদীরা তো তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাই অস্বীকার করত। এখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দৈহিকভাবে ওপরে যাবার বিশ্বাস দানা বেঁধেছে আর একথা ছড়ানো হয়েছে যে, তিনি সশরীরে আকাশে আরোহণ করেছেন। বলা যায়, তাদের মতে পূর্বে নবীরা মৃত্যুর পর আধ্যাত্মিকভাবে আকাশে আরোহণ করতেন, কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) জীবিতাবস্থায় শরীর, পোশাক ও সকল দৈহিক অনুষঙ্গসহ আকাশে গিয়ে বসেছেন। অর্থাৎ ইহুদীদের হঠকারিতা ও আধ্যাত্মিক রাফার অস্বীকারের বিপরীতে একটি অতিরঞ্জিত উত্তর প্রস্তুত করা হয়েছে। এ উত্তর ছিল সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক, কেননা দৈহিক রাফা নিয়ে ইহুদীদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তাদের শরীয়তে আছে, যারা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যায় তারা অভিশপ্ত ও কাফির এবং অবিশ্বাসী হয়ে থাকে। খোদা তা'লার দিকে তাদের আধ্যাত্মিক রাফা হয় না। ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল, কোনো মুমিন যখন মারা যায় তখন তার আত্মাকে ফেরেশতা আকাশের দিকে নিয়ে যায় আর তার জন্য আকাশের দ্বারসমূহ খোলা হয়, কিন্তু কাফিরের আত্মা আকাশের দিকে তুলে নেওয়া হয় না। কাফির অভিশপ্ত হয়ে থাকে, তাই তার আত্মা নিচের দিকে যায়। তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ হবার কারণে এবং কিছু মতভেদের কারণে ফতোয়াবাজির বেশাতি করে হযরত ঈসা (আ.)-কে কাফির সাব্যস্ত করেছে। কেননা তাদের দাবি অনুসারে হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। তওরাতে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যে ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যায় সে অভিশপ্ত হয়ে থাকে; এসব কারণে তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে কাফির আখ্যায়িত করেছিল এবং তাঁর আধ্যাত্মিক ঊর্ধ্বারোহণকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব ইহুদীদের কাছে এই কৌশলটি হাস্যকর ছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) সশরীরে আকাশে আরোহণ করেছেন। সত্যিকার অর্থে এ মিথ্যা তারা উদ্ভাবন করেছে যারা তওরাতের শিক্ষা সম্পর্কে অনবহিত ছিল। আর একান্ত এ ধারণাটিই ছিল একেবারে বাজে, যার কারণে খোদা তা'লার বিরুদ্ধেই আপত্তি বর্তায়। কেননা ইহুদীরা– যারা বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত ছিল, হযরত ঈসা (আ.) তখনো তাদেরকে নিজের বাণী পৌঁছাতে সক্ষম হন নি আর তাঁর হাতে একটি ফিরকাও হিদায়াত লাভ করে নি। এমতাবস্থায় তবলীগের কাজকে অসমাপ্ত রেখে হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে উত্থিত হওয়া সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক এবং তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব এড়ানোর নামান্তর। জানা

কথা যে, খোদা তা'লার তাঁকে বিনা কারণে আকাশে বসিয়ে রাখা একটি নিরর্থক ও বাজে কাজ যা আদৌ খোদার প্রতি আরোপিত হতে পারে না।

বস্তুত এটি হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি অপবাদ যে, তিনি সশরীরে আকাশে চলে গেছেন। অতএব যেভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর শত্রুরা শুধু অপবাদ আরোপ করে তাঁকে কাফির ও মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছে, একইভাবে তাঁর প্রশংসায় অতিশয়োক্তিকারী নির্বোধ বন্ধুরা তাকে সশরীরে আকাশে চড়িয়েছে; যেমন- জনৈক ব্যক্তি বলেছে, পীরেরা উড়তে না পারলেও মূর্খ ভক্তরা তাদের উড়িয়েই ছাড়ে। কেবল তা-ই নয় বরং তাঁকে খোদাও বানিয়ে বসেছে। কালের প্রবাহে এ বিশ্বাসও গড়া হয়েছে যে, তিনি এই ভৌত দেহসহ আকাশ থেকে অবতরণ করবেন আর শেষযুগ তাঁরই হবে আর তিনিই খাতামুল আম্বিয়া হবেন। বস্তুত যত মিথ্যা নিদর্শন ও মিথ্যা মুজিযা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি আরোপ করা হয়েছে অন্য কোনো নবীর ক্ষেত্রে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এসব কাল্পনিক নিদর্শন সত্ত্বেও ধর্ম প্রচারে ব্যর্থতা ও বিফলতার মানদণ্ডে যাচাই করলে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করবেন। অন্য কোনো নবীর ক্ষেত্রে এমন ব্যর্থতার নযীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, তাঁর নামে যে ধর্ম পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করছে এটি তাঁর ধর্ম নয়। তাঁর শিক্ষায় শূকরের মাংস খাওয়া ও ত্রিত্ববাদের শিক্ষা এখন পর্যন্ত ইনজীলে দেখা যায় না। বরং এটি সেই পৌত্তলিকতাপ্রসূত শিক্ষা যার বিরোধিতা নবীগণ করেছিলেন। তওরাতের কেবল দুটোই প্রধান ও স্থায়ী নির্দেশ ছিল। প্রধানত মানুষকে খোদা বানাবে না। দ্বিতীয়ত, শূকরের মাংস খাবে না। সুতরাং উভয় নির্দেশকে সাধু পৌলের শিক্ষার মাধ্যমে বিকৃত করা হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

এবার আমরা বর্ণনা করতে চাই যে, মুজিযা তথা অলৌকিক নিদর্শন কী জিনিস আর মুজিযা বা অলৌকিক নিদর্শনের প্রয়োজনইবা কী? অতএব আমরা এ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে মুজিযা বা অলৌকিক নিদর্শনের প্রকৃত স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা কী তা বর্ণনা করব এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিজের দাবি অনুসারে সেসব মুজিযা বা অলৌকিক নিদর্শনের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। এছাড়া তৃতীয় অধ্যায় হবে শেষ অধ্যায়– যার মাধ্যমে পুস্তক সমাপ্ত হবে।

প্রথম অধ্যায়

মুজিযা বা অলৌকিক নিদর্শনের প্রকৃত স্বরূপ ও এর প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গেঃ

মুজিযার প্রকৃত স্বরূপ হলো, মুজিযা এমন অসাধারণ বিষয়কে বলা হয় যা বাহ্যত মানবীয় শক্তির অধীনে মনে হলেও বিরোধী পক্ষ এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অক্ষম থাকে। উদাহরণস্বরূপ- পবিত্র কুরআনের মুজিযা বা নিদর্শনকে উপস্থাপন করা যায়, যা আরবের সব মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল। যেমন- কুরআন বানানো যদিও বাহ্যত মানবীয় শক্তির অন্তর্গত বিষয় বলে মনে হতো কিন্তু আরবের সকল মানুষ এর দৃষ্টান্ত উপস্থানে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব মুজিযা বা অলৌকিক নিদর্শনের মর্ম বুঝার জন্য পবিত্র কুরআনের বাণী অত্যন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অর্থাৎ বাহ্যিক বিবেচনায় সেটি একটি বাণী বা কথা মাত্র যেমনটি কিনা মানুষের কথা হয়ে থাকে। কিন্তু সেটি নিজের আলংকারিক অভিব্যক্তির নিরিখে এবং অত্যন্ত মনোহর, নির্মল ও আকর্ষণীয় বাক্যসম্ভার হবার দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বত্র নিখুঁতভাবে সত্য ও প্রজ্ঞার দাবি মেনে চলে। অধিকন্তু সমুজ্জ্বল যুক্তিপ্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র কুরআন সারা পৃথিবীর বিরোধিতামূলক যুক্তিপ্রমাণের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। এছাড়া পবিত্র কুরআন মহান সব ভবিষ্যদ্‌বাণী হিসেবে এমন এক অদ্বিতীয় মুজিযা বা নিদর্শন যে, তেরশ বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোনো বিরোধী এর সামনে দাঁড়াতে পারে নি আর কারো তা করার শক্তিও নেই। বিশ্বের সমস্ত গন্থাবলির মাঝে পবিত্র কুরআন একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রাখে, তা হলো, এটি নিদর্শনমূলক ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোকে অলৌকিক বাক্যাবলিতে বর্ণনা করে যা সুমহান বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতায় সমৃদ্ধ আর সত্য ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। বস্তুত মুজিযা বা অলৌকিক নিদর্শনের প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য হলো, সত্য ও মিথ্যার বা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মাঝে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য করে দেখানো। এমন স্বতন্ত্র বিষয়ের নাম মুজিযা। নিদর্শন বা মুজিযা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এছাড়া খোদা তা'লার সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব নয় আর সেই ফল লাভ করা সম্ভব নয় যা পূর্ণ বিশ্বাসের ফলে লাভ হতে পারে। এটি জানা কথা যে, ধর্মের প্রকৃত সত্যতা খোদার সত্তাকে চেনার মাঝে নিহিত। সত্যধর্মের অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো, তাতে এমন নিদর্শন বিদ্যমান

থাকা যা খোদার অস্তিত্বের অকাট্য ও সুনিশ্চিত প্রমাণ বহন করবে আর সে ধর্ম নিজের মাঝে এমন অসাধারণ শক্তি রাখবে যা অনুসারীদের হাত খোদার হাতে তুলে দেবে। আমরা বর্ণনা করেছি যে, শিল্প দেখে শিল্পীর শুধু প্রয়োজন অনুভব করা আর তাঁর বাস্তব অস্তিত্বের সংবাদ না পাওয়া খোদাকে পুরোপুরি চেনার জন্য যথেষ্ট নয়। এখানে এসে যে থেমে যায় সে খোদা তা'লার সাথে কোনো সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না আর নিজের প্রবৃত্তিকে হীন কামনা বাসনা থেকে মুক্তও করতে পারে না। এর মাধ্যমে কেবল এতটুকু বুঝা যায় যে, এই সুবিন্যস্ত ও নিখুঁত সৃষ্টির কোনো স্রষ্টা থাকা উচিত, কোনো স্রষ্টা আছেন, তা বুঝার উপায় নেই। এটি জানা কথা যে, প্রয়োজন অনুভব করা কিয়াস বা অনুমান মাত্র, যা দেখার বিকল্প হতে পারে না আর দেখার ফলে যে পবিত্র ফলাফল সৃষ্টি হতে পারে তা এরফলে সৃষ্টি হয় না। অতএব যে ধর্ম মানুষের জন্য খোদাকে চেনার বিষয়কে 'থাকা উচিতের' অসম্পূর্ণ পর্যায়ে ছেড়ে দেয় সেটি তার বাস্তব জীবনের তত্ত্বাবধান করতে পারে না। সুতরাং এমন ধর্ম সত্যিকার অর্থেই একটি মৃত ধর্ম যার কাছে কোনো পবিত্র পরিবর্তনের আশা রাখা যায় না।

জানা কথা, কেবল যৌক্তিক বা বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণাদি ধর্মের সত্যতার জন্য পূর্ণ সাক্ষ্য গণ্য হতে পারে না, আর এটি এমন কোনো সীলমোহর নয় যা কোনো প্রতারক বানাতে সক্ষম হবে না; বরং এটি তো যুক্তি ও বুদ্ধির তুচ্ছ ঝরনাধারার একটি ভিক্ষাবৃত্তি গণ্য হতে পারে। এছাড়া একথার কে সিদ্ধান্ত দেবে যে, যৌক্তিক বিষয়াদি যা কোনো এক পুস্তক লিপিবদ্ধ করেছে তা সত্যিকার অর্থে এলহামী নাকি অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে চুরি করে লেখা হয়েছে? যদি ধরেও নেই যে, তা চোরাই নয় তবুও তা কীভাবে খোদার অস্তিত্বের সুনিশ্চিত প্রমাণ গণ্য হতে পারে? আর কোনো সত্য সন্ধানীর হৃদয় কীভাবে এ বিষয়ে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে যে, কেবল সেসব যৌক্তিক কথাই নিশ্চিতভাবে খোদা দর্শনের নিদর্শন? এছাড়া সেসব কথা যে সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্তিমুক্ত, সেই নিশ্চয়তা কীভাবে লাভ হতে পারে? অতএব কোনো ধর্ম যদি নিছক কয়েকটি কথাকে বিবেক ও দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত করে সেগুলোকে নিজের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরে আর স্বর্গীয় নিদর্শন ও অলৌকিক বিষয়াদি দেখাতে অক্ষম থাকে তাহলে এমন ধর্মের অনুসারী হয় প্রতারিত অথবা প্রতারক; আর সে অমানিশায় মরবে।

এককথায়, নিছক যৌক্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে খোদা তা'লার অস্তিত্বও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে পারে না, কোনো ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হওয়া তো দূরের কথা। যতক্ষণ কোনো ধর্ম খোদার অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে দেখানোর দায়িত্ব না নেবে ততক্ষণ সে ধর্ম অর্থহীন। আর দুর্ভাগা সেই মানুষ যে, এমন ধর্মের মোহে আবিষ্ট। প্রত্যেক এমন ধর্ম অভিশাপের কলঙ্ক বয়ে বেড়ায় যা মানুষের তত্ত্বজ্ঞানকে এমন পর্যায়ে পৌঁছাতে ব্যর্থ যার কল্যাণে বলা যায়, সে খোদার দর্শন লাভ করেছে, অবাধ্য প্রবৃত্তির অমানিশা আধ্যাত্মিক অবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছে এবং খোদার নিত্যনূতন নিদর্শনের মাধ্যমে সতেজ ঈমান লাভ হয়েছে; যা কেবল বুলিসর্বস্ব নয় বরং বাস্তবেই এক পবিত্র জীবন লাভ হয়। মানুষের সত্যিকার পবিত্রতা অর্জনের জন্য সেই জীবন্ত খোদার সংবাদ পাওয়া একান্ত আবশ্যক, যিনি অবাধ্যকে নিমিষে ধ্বংস করতে পারেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির অধীনে জীবন কাটানো একটি নগদ বেহেশত। যেভাবে কোনো ধর্মের জন্য কেবল যৌক্তিক উৎকৃষ্টতা প্রদর্শন করাই যথেষ্ট নয় সেভাবে বাহ্যত যে খোদাভীরু তার জন্য কেবল দাবি করাই যথেষ্ট নয় যে, সে খোদা তা'লার নির্দেশাবলি মেনে চলে, বরং এর জন্য এক স্বতন্ত্র নিদর্শন প্রয়োজন যা তার সঠিক পথে চলার সাক্ষী হবে। কেননা এমন দাবি প্রায় সবাই করতে পারে যে, সে খোদা তা'লাকে ভালোবাসে আর তার জীবন সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার হতে মুক্ত; কিন্তু আশ্বস্ত কীভাবে হওয়া যায় যে, প্রকৃত বিষয় এটিই? কারো মাঝে যদি উদারতা থাকে তবে তা খ্যাতি অর্জনের জন্যও হতে পারে। কেউ ইবাদতকারী ও জগৎবিমুখ হয়ে থাকলে তবে তা লোক দেখানোর জন্যও হতে পারে। আবার অবাধ্যতা ও পাপাচার হতে যদি কেউ নিস্তার লাভ করে তবে তা রিক্তহস্ততার কারণেও হতে পারে। এটিও হতে পারে যে, মানুষের অভিসম্পাতের ভয়ে কেউ পবিত্র প্রকৃতির মানুষ সাজে অথচ, খোদা তা'লার মাহাত্ম্য তার হৃদয়ে আদৌ কোনো দাগ কাটে নি। কাজেই, চালচলন উন্নত হলেও তা সত্যিকার পবিত্রতার প্রমাণ হতে পারে না, হয়ত পর্দার অন্তরালে কোনো ভিন্ন কর্ম লুকানো থাকবে। তাই সত্যিকার পবিত্রতার জন্য অদৃশ্যে জ্ঞাত খোদা তা'লার সাক্ষ্য প্রয়োজন। এমনটি না হলে পৃথিবীতে পবিত্র অপবিত্রের বিষয়টি সন্দেহের আবর্তে নিপতিত হয় এবং শান্তি বিনষ্ট হতে পারে। তাই দুই এর মাঝে পার্থক্য থাকা একান্ত আবশ্যক। এছাড়া যে ধর্ম সঠিক পথে চলার প্রমাণ হিসেবে কোনো পার্থক্যসূচক পোশাক নির্ধারণ

করে নি, নিশ্চিত হতে পারো যে, সেই ধর্ম সঠিক নয় এবং সম্পূর্ণরূপে আলোশূন্য। যে গ্রন্থ খোদার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তা স্বয়ং নিজের মাঝে এক পার্থক্যসূচক লক্ষণ ধারণ করে এবং তার অনুসরণকারীদেরও স্বতন্ত্র নিদর্শনে ধন্য করে।

এককথায় স্বতন্ত্র নিদর্শন ছাড়া সত্য ও মিথ্যা ধর্মের মাঝে কোনো পরিষ্কার পার্থক্য করা সম্ভব নয় আর খোদাভীরু ও প্রতারকের মধ্যকার স্পষ্ট পার্থক্য সামনে আসে না; কেননা হতে পারে, এক ব্যক্তি দুরাচারী, অবাধ্য আর পাপাচারী হওয়া সত্ত্বেও তার দুরাচারিতা দৃশ্যপটে আসে না। অতএব এমতাবস্থায় যদি সে-ও মুত্তাকী হবার দাবি করে, যেমনটি কিনা পৃথিবীতে সচরাচর দেখাও যায়, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সত্যিকার মুত্তাকীর সেই সমুজ্জ্বল লক্ষণ কোনটি যার কল্যাণে এমন প্রতারকদের থেকে সে স্বতন্ত্রভাবে সামনে আসবে আর স্পষ্টভাবে তাকে চেনা যাবে? অথচ পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা থেকে প্রকৃতির নিয়ম যেভাবে চলে আসছে তা হলো, সকল ভালো ও মন্দ জিনিসের মাঝে একটি স্বতন্ত্র পার্থক্য রাখা হয়েছে। যেমন তোমরা দেখে থাকো যে, স্বর্ণ ও পিতল একই রকম হয়ে থাকে এমনকি কোনো কোনো অজ্ঞ এই কারণে প্রতারিতও হয়। কিন্তু নিরঙ্কুশ প্রজ্ঞা খোদা তা'লা, স্বর্ণের মধ্যে একটি পার্থক্যসূচক লক্ষণ রেখেছেন যা স্বর্ণকার তাৎক্ষণিকভাবে চিনতে পারে। আবার বহু সাদা ও উজ্জ্বল এমন পাথর আছে, যেগুলো হীরার সাথে অনেক বেশি সাদৃশ্য রাখে আর কোনো কোনো নির্বোধ সেগুলোকে হীরা মনে করে সহস্র সহস্র টাকার ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা হীরায় একটি পার্থক্যসূচক লক্ষণ রেখেছেন যা একজন জহুরি চিনতে পারে। একইভাবে পৃথিবীর সব মণিমুক্তা ও উৎকৃষ্ট জিনিসগুলোকে দেখো, যদিও বাহ্যত অনেক ফেলে দেবার মতো এবং নিম্নমানের জিনিসও দেখতে সেগুলোর সদৃশ হয়ে থাকে, কিন্তু প্রত্যেক নিখুঁত ও মূল্যবান মণিমুক্তা নিজের স্বতন্ত্র নিদর্শনের মাধ্যমে স্বীয় বিশেষত্ব প্রকাশ করে; এমনটি না হলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। মানুষকেই দেখো! যদিও সে চেহারায় বানরের মতো অনেক পশুর সাথে সামঞ্জস্য রাখে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মাঝে এক স্বতন্ত্র চিহ্ন আছে, যে কারণে আমরা কোনো বানরকে মানুষ বলতে পারি না। এছাড়া এই বস্তুজগৎ যা অতি নড়বড়ে ও ক্ষণস্থায়ী, যার ক্ষয়ক্ষতিও পরকালের মোকাবিলায় কিছুই নয়, প্রত্যেক উত্তম ও উন্নত রত্নের জন্য

মহাপ্রজ্ঞ খোদা তা'লা একটি পার্থক্যসূচক লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন, যে কারণে সেই রত্ন সহজেই চেনা যায়। তাই ধর্ম, যে বিষয়ে ভুলভ্রান্তি জাহান্নাম পর্যন্ত নিয়ে যায়, একইভাবে একজন পুণ্যবান ও খোদাভক্ত মানুষের অস্তিত্ব, যাঁকে অস্বীকার করা চিরদুর্ভাগ্যের গহ্বরে নিক্ষেপ করে, তাঁকে চেনার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট চিহ্ন থাকবে না- তা কীভাবে মানা যেতে পারে? অতএব এমন ব্যক্তির চেয়ে বড়ো হতভাগা ও নির্বোধ আর কে হবে, যে মনে করে, সত্য ধর্ম ও সত্যিকার খোদাভীরুকে চেনার জন্য খোদা তা'লা কোনো স্বতন্ত্র চিহ্ন নির্ধারণ করেন নি? অথচ পবিত্র কুরআনে খোদা তা'লা স্বয়ং বলেছেন, আল্লাহর কিতাব– যা ধর্মের মূলভিত্তি, এর দৃষ্টান্ত কেউ উপস্থাপন করতে পারবে না। এটি নিজের মাঝে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রাখে। এছাড়া তিনি বলেন, সকল মুমিন, ফুরকান তথা পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত হয়, যার ভিত্তিতে তাকে চেনা যায়। তাই নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, সত্য ধর্ম ও প্রকৃত মুত্তাকীর মাঝে অবশ্যই স্বতন্ত্র লক্ষণাবলি থেকে থাকে আর এরই নাম অন্য ভাষায় মুজিযা, নিদর্শন ও অলৌকিক বিষয়।

আমাদের এটুকু লেখাতেই প্রমাণ হলো, সত্য ধর্মে অবশ্যই এমন কোনো নিদর্শনমূলক বিশেষত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় যা অপরাপর ধর্মে থাকবে না। এছাড়া প্রকৃত মুত্তাকীর সাথে এমন নিদর্শনমূলক ঐশী সমর্থন থাকা বাঞ্ছনীয় যার দৃষ্টান্ত অন্যদের মাঝে আদৌ দেখা যাবে না, যেন দুর্বল ভিত্তির মানুষ যে অতি সামান্য সন্দেহের কারণে হোঁচট খায়, সত্য গ্রহণের মতো সম্পদ থেকে বঞ্চিত না থেকে যায়। ভেবে দেখো! যেখানে মানুষের ঔদাসীন্য ও সন্দেহপূজার এই হলো স্বরূপ, অর্থাৎ যদিও খোদার সত্য প্রত্যাদিষ্টদের পক্ষ থেকে শত শত নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং খোদা সকল দিক থেকে তাদের সাহায্য করেন, তা সত্ত্বেও নিজেদের দুর্ভাগ্যের কারণে তারা সন্দেহে নিপতিত হয় এবং সহস্র সহস্র নিদর্শনকে কাজে না লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহের দোলাচলে দুলতে থাকে। এই বাস্তবতার নিরিখে যদি একজন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির জন্য আকাশ থেকে কোনো নিদর্শন প্রদর্শিত না হতো, কেবল অন্তঃসারশূন্য তাকওয়া ও বাহ্যিক ইবাদত প্রদর্শনের ওপরেই ভিত্তি হতো, তাহলে এভাবে কুধারণার দরজা খুলে যেত। অতএব খোদা, যিনি পরম সম্মানিত ও দয়ালু, তিনি পছন্দ করেন নি যে, তাঁর এক গৃহীত ধর্ম অথবা এক মনোনীত বান্দাকে অস্বীকার করে পৃথিবীতেই (মানুষ) ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই, তিনি সত্য ধর্মের ওপর

স্থায়ী নিদর্শনের মোহর খচিত করেছেন এবং সত্যিকার মুত্তাকীদেরকে নিজের অলৌকিক নিদর্শনাবলির মাধ্যমে গ্রহণীয়তার মর্যাদা প্রদান করেছেন। সত্য কথা হলো, খোদা তা'লা (তাঁর) গৃহীত ধর্ম ও মনোনীত বান্দাকে স্বতন্ত্র নিদর্শন দেবার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার কার্পণ্য করেন নি; আর সূর্য থেকেও বেশি তাদেরকে ঔজ্জ্বল্য দান করেছেন এবং তাদের সমর্থনে সে কাজ করে দেখিয়েছেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে শোনা ও দেখা যায় না। খোদা সত্য, কিন্তু তাঁর পবিত্র চেহারা দর্শনের দর্পণ হলো সেসব মুখ, যাদের ওপর তাঁর প্রেমের বারি বর্ষিত হয়েছে। তাঁদের সাথে খোদা সেভাবে বাক্যালাপ করেছেন যেভাবে বন্ধু বন্ধুর সাথে কথা বলে। তাঁরা ভালোবাসার আধিক্যে মন থেকে অন্যদের বের করে দিয়ে একত্ববাদের পরম মর্মকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। কেননা একত্ববাদ কেবল নির্বিকার থেকে খোদাকে 'এক-অদ্বিতীয়' জ্ঞান করার নাম নয়; সেই একত্ববাদে তো শয়তানও বিশ্বাসী। বরং এর সাথে আবশ্যক হলো, ব্যাবহারিকরূপে অর্থাৎ ভালোবাসার পূর্ণ স্পৃহা নিয়ে নিজের সত্তাকে নিশ্চিহ্ন করে নিজের জীবনে একত্ববাদের অনুশাসনকে বরণ করা। মুক্তির কেন্দ্রবিন্দু হলো এই কামিল একত্ববাদ যা খোদাভক্তরা লাভ করে থাকে। অতএব এটি বলা অযথা হবে না যে, খোদা তাদের মাঝে অবতরণ করেন, কেননা শূন্যতা স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে পূরণ করতে চায়। কিন্তু সেই অবতরণ দৈহিক নয়, বরং তা এমনভাবে হয় যার অবস্থা ও প্রকৃতি কল্পনার ঊর্ধ্বে। বস্তুত খোদা তা'লা যখন বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেন তখন সত্যিকার মুত্তাকীদের মাঝে সেসব কল্যাণ পরিলক্ষিত হয় যা খোদার মাঝে বিদ্যমান আর তাদের জীবন নিদর্শনমূলক জীবনে পরিবর্তিত হয়। তাদেরকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। তাদের অস্তিত্ব একটি নতুন অস্তিত্বে রূপ নেয় যা জগৎপূজারিরা শনাক্ত করতে পারে না। কিন্তু পুণ্যবানরা এর লক্ষণাবলি প্রত্যক্ষ করে। এখন যেহেতু সেই বিকাশ বিদ্যমান আর ঐশী সমর্থনের এমনসব প্রভাব স্পষ্টত দৃশ্যমান, যা আমাদের ও অন্যদের মাঝে পার্থক্যসূচক বিষয়, তাই আমরা এমন কিছু নিদর্শন লিপিবদ্ধ করে সত্যান্বেষীদেরকে খোদার পানে আহ্বান করব, যা প্রত্যাদিষ্টদের ক্ষেত্রে খোদার সুন্নত বা রীতি হয়ে থাকে এবং দুষ্কৃতিকারী বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে খোদার নিদর্শনকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে। ওয়া মা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহিল কারীমিল কাদীর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐসব নিদর্শন প্রসঙ্গে যা সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, যা আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখে প্রচার করা হয়েছিল।

স্মরণ রাখা উচিত, বারাহীনে আহমদীয়া আমার রচনাসমগ্রের মাঝে সেই গ্রন্থ যা ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ, ১২৯৭ হিজরী সনে প্রকাশিত হয়েছে। স্বয়ং এই গ্রন্থ দ্বারা এটি সুস্পষ্ট যে, এ গ্রন্থ রচনার যুগে আমি এমন এক অজানা ও অপরিচিত অবস্থায় ছিলাম যে, খুব কম মানুষই ছিল যারা আমার সম্পর্কে জানত। বস্তুত সে যুগে আমি একজন নিসঙ্গ মানুষ ছিলাম যার সাথে কারো কোনো সম্পর্ক ছিল না আর আমার জীবন নির্জনে-নিভৃতে অতিবাহিত হতো আর আমি তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। হঠাৎ অনাদি-অনন্ত সত্তার দানস্বরূপ আমার সঙ্গে এ ঘটনা ঘটে যে, অকস্মাৎ সন্ধ্যার সময়ে সেই বাড়িতে এবং যেখানে এই লাইনগুলো লেখার সময় এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি ঠিক এই যায়গায় খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সামান্য তন্দ্রাভাবের মধ্যে এই ওহী হয়–

يَا اَحْمَدُ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ۔مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى۔ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاءُهُمْ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلَ الْمُجْرِمِيْنَ۔ قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ۔*

(বারাহীনে আহমদীয়া দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ হে আহমদ! খোদা তোমার মাঝে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। যা কিছু তুমি নিক্ষেপ করেছো, তুমি করো নি বরং খোদা নিক্ষেপ করেছেন। সেই খোদা যিনি তোমাকে কুরআন শিখিয়েছেন অর্থাৎ এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করেছেন** যেন তুমি তাদের সতর্ক করতে পারো যাদের

টীকা:

* দেখুন! বারাহীনে আহমদীয়া, পৃ. ২৩৯।

** পবিত্র কুরআনের তিনটি তাজাল্লিয়াত (তথা বিকাশ) রয়েছে। এটি সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে এবং মসীহ মওউদের মাধ্যমে এর অনেক গুপ্ত রহস্য বা ভাণ্ডার উন্মোচিত হয়েছে।

পিতা-পিতামহকে সতর্ক করা হয় নি; যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায় আর তোমাকে অস্বীকার করার কারণে তারা এর পরিণতি প্রত্যক্ষ করে। এদের বলে দাও, আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে এসেছি আর আমিই সে ব্যক্তি, যে সর্বপ্রথম ঈমান এনেছে।

এই ওহী অবতীর্ণ হবার পর একদিকে খোদার অনন্ত পুরস্কারের জন্য আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হলো, যিনি আমার মতো মানুষকে এই মহান দায়িত্ব প্রদান করে সম্মানিত করেছেন, যে নিজের মাঝে কোনো যোগ্যতা রাখে না; অপরদিকে একান্ত খোদার এই ওহীর কারণে আমার চিন্তা হতে থাকে যে, ঐশী রীতি অনুসারে প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির জামা'ত থাকা বাঞ্ছনীয়, যেন তারা তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন জোগাতে পারে। এছাড়া ধনসম্পদ থাকাও অপরিহার্য, যেন উদ্ভূত ধর্মীয় প্রয়োজনে ব্যয়ভার নির্বাহ করা সম্ভব হয়। আল্লাহর রীতি অনুসারে আবশ্যকীয়ভাবে শত্রু থাকবে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করাও আবশ্যক যেন তাদের দুষ্কৃতি থেকে নিরাপদ থাকে। এছাড়া তবলীগের কার্যকারিতা প্রকাশ পাওয়াও আবশ্যক যেন তা সত্যবাদী হবার প্রমাণ গণ্য হয় আর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা দেখতে না হয়।

এসব বিষয়ে যেমনটি ধারণা করা হয়েছিল, অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে আর অনেক বিপজ্জনক অবস্থা সামনে এসেছে। কেননা আমি যখন নিজেকে নিয়ে ভাবলাম, এটি স্পষ্ট যে, আমি নিজেকে একজন খুবই অখ্যাত ও সাধারণ মানুষ পেলাম। কেননা আমি কোনো বংশগত পীরজাদা ও গদ্দীনশীনও ছিলাম না, যার সুবাদে যারা আমার পিতা-পিতামহের ভক্ত ছিল তারা আমার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হতো, আমার প্রতি তাদের বিশ্বাস জন্মাতো আর এর ফলে কাজ সহজ হয়ে যেত। আমি কোনো প্রসিদ্ধ আলেম-ফাযিলের বংশোদ্ভূতও ছিলাম না, যে-কারণে শত শত পৈত্রিক শিষ্যের আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত

চলমান টীকাঃ

وَلِكُلِّ اَمْرٍ وَقْتٌ مَّعْلُوْم- (আর প্রত্যেক বিষয় প্রকাশ পাবার একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে)। যেভাবে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল তেমনি আকাশ পর্যন্ত এর জ্যোতি পৌঁছেছে। মহানবী (সা.)-এর যুগে এর সমস্ত শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করেছিল এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগে এর প্রতিটি দিক প্রচারের ক্ষেত্রে পূর্ণতা পেয়েছে এবং মসীহ মওউদের যুগে এর আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং রহস্যাবলির প্রকাশ পূর্ণতা লাভ করেছে। –লেখক

হতো। কোনো আলেম-ফাযিলের কাছ থেকে যথারীতি শিক্ষাদীক্ষা এবং সনদপ্রাপ্তও ছিলাম না, যে-কারণে আমার নিজের জ্ঞানের পুঁজির ওপর ভরসা করা যেত। আমি কোনো স্থানের বাদশা, নবাব বা শাসকও ছিলাম না যে, আমার শাসন-প্রতাপে সহস্র-সহস্র মানুষ আমার অধীনস্থ হবে। বরং আমি এক গণ্ডগ্রামের একজন দরিদ্র অধিবাসী ছিলাম। আমি সেসব স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, যারা মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে।

বস্তুত এমন কোনো প্রকার সম্মান, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি আমার ছিল না যার নিরিখে আমার হাতে তবলীগের এই কাজ সাধিত হওয়া সম্ভব বলে মনে করতে পারতাম। অতএব স্বাভাবিকভাবে এ কাজ আমার কাছে আপাতঃ অসম্ভব ও অসাধ্য মনে হয়েছে। এছাড়া অন্য যে-সব সমস্যা সামনে এলো তা হলো, এই প্রচারের কাজে কিছু বিষয় এমন ছিল যা আদৌ জাতি গ্রহণ করবে বলে আশা ছিল না। জাতির কাছে এতটুকু আশাও ছিল না যে, তারা মহানবী (সা.)-এর যুগের পর শরীয়তবিহীন ওহীর ধারা বিচ্ছিন্ন হয় নি, বরং কিয়ামত অবধি খোলা রয়েছে মর্মে বিষয়টি গ্রহণ করবে। সত্য কথা হলো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে, তাদের পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্তির দাবির পর কুফরী ফতওয়ার পুরস্কারপ্রাপ্ত হবো আর সব আলেম সর্বসম্মতভাবে যাতনা দেওয়া ও নির্মূল করার জন্য ওঠে পড়ে লেগে যাবে; কেননা তাদের মতে আমাদের নেতা খাতামান নাবিয়্যীন (সা.)-এর পর ঐশী ওহীর ওপর চিরতরে মোহরাঙ্কিত করে দেওয়া হয়েছে। এখন কিয়ামত পর্যন্ত কারো সাথে খোদার কথোপকথন সম্ভব নয়। খোদা কথোপকথনের মাধ্যমে উম্মতের তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি করবেন এবং সরাসরি নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন– এই হতভাগা উম্মত এখন কিয়ামত পর্যন্ত এমন কৃপা হতে বঞ্চিত? প্রকৃত বিষয় হলো, তারা অন্ধ অনুকরণ করছে আর গলায় ঝোলানো ঢোল বাজাচ্ছে। অথচ বাস্তবে তিল পরিমাণ তত্ত্বজ্ঞানও তাদের মাঝে নেই। অবশ্য তাদের মাঝে কিছু লোকের এমন অর্থহীন বিশ্বাস রয়েছে যে, এলহাম কেবল পুণ্যবানদের প্রতিই হয়ে থাকে, কিন্তু এটি নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, সেই এলহাম খোদার পক্ষ থেকে নাকি শয়তাদের পক্ষ থেকে। জানা কথা, এমন এলহাম যা শয়তানের প্রতিও আরোপিত হতে পারে তা খোদার সেসব পুরস্কাররাজির অন্তর্ভুক্ত গণ্য হতে পারে না যা মানুষের ঈমানের জন্য উপকারী হবে, বরং সন্দেহযুক্ত হওয়া ও শয়তানের কথার সাথে মিল রাখা, সেই এলহামের গায়ে এমন একটি

অভিশাপের কলঙ্ক; যা জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। খোদা যদি কোনো বান্দার অনুকূলে صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -এর দোয়া গ্রহণ করে থাকেন এবং তাকে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন তাহলে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অবশ্যই তাকে সেই আধ্যাত্মিক পুরস্কার থেকে অংশ দিয়ে থাকবেন যা নিশ্চিতভাবে খোদার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথন।

বস্তুত এটিই ছিল সেই বিষয় যা এই অন্ধ জগতে জাতির রাগ ও ক্রোধ প্রদর্শনের কারণ ছিল। কাজেই আমার মতো অসহায় (ও) নিঃসঙ্গ ব্যক্তির জন্য এসব বিষয় এক স্থানে একত্রিত হয়ে যাওয়া বাহ্যত ব্যর্থতার একটি লক্ষণ ছিল*, বরং এক চরম ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে হয়, কেননা কোনোকিছুই নিয়ন্ত্রণে ছিল না। প্রধানত অর্থের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন ওহী হয় (তার পূর্বেই) আমাদের সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং এমন একজন লোকও আমার সাথে ছিল না, যে আর্থিক সাহায্য করতে পারত। দ্বিতীয়ত, আমি এমন কোনো বিশিষ্ট পরিবারের সদস্য ছিলাম না যার কারণে কারো প্রতি আমার কোনো প্রভাব থাকতে পারত। সব দিক থেকে ডানা-পালক ভেঙে গিয়েছিল। অতএব এই ঐশী ওহী লাভের পর আমার যে দিশেহারা অবস্থা হয়েছিল সেটা হওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল। প্রাণবায়ু ধরে রাখার জন্য আমি আল্লাহ তা'লার মহান প্রতিশ্রুতিসমূহের মাধ্যমে সান্ত্বনা

---

* **টীকা:** আমার দাবির অন্যতম কঠিন দিক ছিল রসূল হবার দাবি, ওহী লাভের দাবি এবং মসীহ মওউদ হবার দাবি। এ বিষয়ে আমার উদ্‌বেগ প্রকাশের জন্য এই এলহাম হয়েছিল:

فَاَجَآءَه الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا

'মাখায' দ্বারা এখানে সেই বিষয়গুলি বোঝানো হয়েছে, যার ভয়াবহ ফলাফল সামনে আসে। আর 'জিযউন নাখলা' বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা মুসলমানদের সন্তান কিন্তু শুধুমাত্র নামেই মুসলমান। বাগ্‌ধারাসিদ্ধ অনুবাদ হলো, প্রচারের কঠিন দায়িত্ব যার পরিণতি ছিল জাতির কাছে হত্যাযোগ্য শত্রু হয়ে যাওয়া, এই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিকে জাতির সেসকল লোকের কাছে নিয়ে এল যারা খেজুর গাছের শুকনো ডাল বা শিকড়ের মতো। তখন তিনি ভয়ে বললেন, হায়! যদি আমি এর আগেই মারা যেতাম এবং বিস্মৃত হয়ে যেতাম। –লেখক

লাভের মুখাপেক্ষী ছিলাম যেন কোথাও দুঃখের আতিশয্যে আমি ধ্বংস হয়ে না যাই। অতএব করুণাময় ও সর্বশক্তিমান প্রভুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই, কেননা তিনি তেমনটিই করেছেন।

আমার অসহায়ত্ব ও চরম উৎকণ্ঠার যুগে তিনি আমাকে সুসংবাদমূলক ভবিষ্যদ্‌বাণীর মাধ্যমে সমর্থন যুগিয়েছেন আর তারপর তাঁর সকল প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। যদি আল্লাহ তা'লার সেই সাহায্য ও সহযোগিতা ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্বাভাস ছাড়া এমনিতেই প্রকাশিত হতো, তবে তা ভাগ্য ও কাকতালীয় বিষয় বলে চালিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু এখন সেগুলি এমন অলৌকিক নিদর্শন, যার মধ্যে শয়তানী স্বভাব রয়েছে সে-ই কেবল সেগুলি অস্বীকার করবে। এরপর আল্লাহ তাঁর সেসব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন যা বহুকাল পূর্বে ভবিষ্যদ্‌বাণী আকারে দিয়েছিলেন এবং নানা ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। যে-সব কষ্টের কল্পনায় আমার কোমর ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল এবং যে-সব দুঃখের কারণে আমার ভয় ছিল যে, আমি ধ্বংস হয়ে যাব, সেসব দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করেছেন আর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তা প্রকাশও করেছেন। যদিও ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্বেও তিনি আমার সাহায্য ও সমর্থন করতে পারতেন কিন্তু তিনি এমনটি করেন নি, বরং এমন যুগ ও এমন নৈরাশ্যের সময় আমার সাহায্য ও সমর্থনে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন যা মহানবী (সা.)-এর সেই যুগের সদৃশ ছিল, যখন তিনি মক্কার অলি-গলিতে নিঃসঙ্গ চলাফেরা করতেন আর যখন তিনি ছিলেন একা আর সাফল্যের কোনো লক্ষণও দৃশ্যমান ছিল না। একইভাবে আমার অপরিচিতির যুগে কৃত ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো সে যুগে বিরাজমান অবস্থার নিরিখে ছিল হাস্যকর এবং অসম্ভব বিষয় এবং এক উন্মাদের প্রলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণীতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে কে জানত বাস্তবেই কোনো যুগে সহস্র-সহস্র মানুষ কাদিয়ানে আমার কাছে আসবে, আর কয়েক লক্ষ মানুষ আমার হাতে বয়আত করবে এবং আমি একা থাকব না, যেমনটি কিনা সে যুগে ছিলাম। খোদা তা'লা অপরিচিতি ও নিঃসঙ্গতার যুগে এসব সংবাদ দিয়েছেন যেন তা সত্যান্বেষী ও বুদ্ধিমানের দৃষ্টিতে এক মহান নিদর্শন গণ্য হয় আর সত্যসন্ধানীরা দৃঢ়বিশ্বাসে উপনীত হয় যে, এ বিষয়টি মানুষের পক্ষ থেকে নয় আর মানুষের পক্ষ থেকে হওয়াও অসম্ভব। সে যুগে যখন আমি একজন অপরিচিত, নিঃসঙ্গ ও খুবই নগণ্য মানুষ ছিলাম আর এতই তুচ্ছ

ছিলাম যে, উল্লেখ করার মতোও ছিলাম না এবং আমি এমন কোনো বিশেষ পরিবারের সদস্যও ছিলাম না যার সম্পর্কে আশা করা যেতে পারত যে, এর পক্ষে সহজেই লোক একত্রিত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় এবং এমন সময়ে কে এমন ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারত যা আজ থেকে পঁচিশ বছর* পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্য হতে কতক আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি।

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَانْتَهٰى اَمْرُ الزَّمَانِ اِلَيْنَا اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ۔ وَلَا تَيْئَسْ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ۔ اَلَا اِنَّ رَوْحَ اللّٰهِ قَرِيْب۔ اَلَا اِنَّ نَصْرَاللّٰهِ قَرِيْب۔ يَاْتِيْكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْق۔ يَاْتُوْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْق۔ يَنْصُرُكَ اللّٰهُ مِنْ عِنْدِهٖ يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُوْحِىْ اِلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا۔ يَرْفَعُ اللّٰهُ ذِكْرَكَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَة۔ اَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيْدِىْ وَتَفْرِيْدِىْ فَخَانَ اَنْ تُعَانَ وَتُعْرَفَ بَيْنَ النَّاسِ۔ هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا۔ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَاْتُلْ عَلَيْهِمْ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ۔ وَلَا تُصَعِّرْ لِخَلْقِ اللّٰهِ وَلَا تَسْئَمْ مِّنَ النَّاسِ۔ اَصْحَابُ الصُّفَّةِ۔ وَمَا اَدْرَاكَ مَا اَصْحَابُ الصُّفَّةِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ يُصَلُّوْنَ عَلَيْكَ۔ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ۔ اٰمَلُوا۔

(বারাহীনে আহমদীয়া, পৃ. ২৪০-২৪২ দ্রষ্টব্য)

অনুবাদ: খোদার সাহায্য ও বিজয় যখন আসবে আর যুগ (অর্থাৎ যুগের মানুষ) আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন বলা হবে, এ কাজটি কি খোদার পক্ষ থেকে ছিল না? আর খোদার রহমত সম্পর্কে নিরাশ হয়ো না অর্থাৎ একথা মনে কোরো না যে, আমি একজন অপরিচিত, নিঃসঙ্গ এবং একজন সাধারণ মানুষ, এটি কীভাবে হতে পারে যে, আমার সাথে এক বিশাল জনগোষ্ঠী সমবেত হবে? কেননা খোদা সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন, এমনটিই হবে আর তাঁর সাহায্য সন্নিকটে। যে-সব পথে সেই আর্থিক সাহায্য এবং ভালোবাসামূলক পত্র আসবে সেসব রাস্তা ভেঙে যাবে এবং তা পথিকের

* **টীকা:** প্রকৃতপক্ষে বারাহীনে আহমদীয়ায় অনেক এমন ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে যেগুলো অবতীর্ণ হবার পর আজ ত্রিশ বছর কেটে গেছে, তবে পঁচিশ (২৫) বছর বলতে বারাহীনে আহমদীয়া লেখার সময়কাল বোঝায়, ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রকৃত বয়স নয়। –লেখক

পদভারে গর্তবহুল হয়ে পড়বে। অর্থাৎ সকল প্রকার সম্পদ অঢেল পরিমাণে আসবে এবং দূরদূরান্ত হতে আসবে। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তের অনুরাগভরা পত্র আসবে। এত লোক আসবে যে, তারা যে পথে হাঁটবে সেসব রাস্তা খানাখন্দে পরিণত হবে। খোদা নিজের পক্ষ থেকে তোমায় সাহায্য করবেন। তারা তোমায় সাহায্য করবে, যাদের হৃদয়ে আমরা স্বয়ং আকাশ হতে এলহাম করব। তুমি আমার স্নেহদৃষ্টিতে রয়েছ। খোদা তোমার নামকে সমুন্নত করবেন। ইহকাল ও পরকালে তোমার প্রতি স্বীয় অনুগ্রহরাজি পূর্ণ করবেন। আমার একত্ববাদ ও অদ্বিতীয় হওয়া যতটা আমার কাছে প্রিয় তুমি তেমনিই প্রিয়। অতএব সেই সময় ঘনিয়ে আসছে যখন তোমায় সাহায্য করা হবে আর বিশ্বজগতে তোমাকে সুখ্যাতি দেওয়া হবে। খোদা যে এমনটি করবেন সে বিষয়ে তোমার বিস্ময় প্রকাশের কারণ কী? তোমার ক্ষেত্রে কি এমন সময় আসে নি যখন তোমার কোনো অস্তিত্বই ছিল না আর পৃথিবীতে তোমার অস্তিত্বের কোনো নামচিহ্নও ছিল না? সুতরাং তোমাকে এভাবে সাহায্য-সমর্থন যোগানো ও এসব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখানো কি খোদার জন্য অসম্ভব? যারা ঈমান এনেছে তুমি তাদের এ সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে খোদার দরবারে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। সুতরাং তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও। স্মরণ রেখো! সে যুগ সন্নিকটে যখন মানুষ ব্যাপকহারে তোমার কাছে আসবে; তাই তোমার জন্য আবশ্যক হবে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার না করা এবং তোমার জন্য আবশ্যক হলো তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে ক্লান্ত না হওয়া। এমন মানুষও থাকবে যারা স্বদেশ থেকে হিজরত করে তোমার গৃহে এসে বসবাস করবে। তারাই খোদার দৃষ্টিতে 'আসহাবুস-সুফফা'। আর তুমি জানো, তারা কত মর্যাদাবান ও উন্নত ঈমানের লোক হবেন যারা আসহাবে সুফফা নামে পরিচিত হবেন! তারা দৃঢ় ঈমানের অধিকারী হবেন। তুমি তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে দেখবে। তারা তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে আর বলবে, হে আমাদের খোদা! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি, যে ঈমানের দিকে আহ্বান জানায়; সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। এসব ভবিষ্যদ্‌বাণী লিখে নাও, এগুলো সময়মতো পূর্ণ হবে।

এ কয়েকটি লাইনে যে-সব ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে তা এত পরিমাণ নিদর্শন-সংবলিত যা দশ লাখের বেশি হবে আর নিদর্শনও এত স্পষ্ট যে, তা সবচেয়ে

উন্নত মানের অলৌকিক বিষয়। সুতরাং আমরা বর্ণনার স্বচ্ছতার জন্য প্রথমে এসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রকারভেদ তুলে ধরছি। এরপর প্রমাণ দেবো যে, এসব ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে আর সত্যিকার অর্থে এগুলো অসাধারণ অলৌকিক নিদর্শন। যদি কম করেও ধরা হয় আর সর্বোচ্চ সাবধানতার সাথে সেগুলো গণনা করা হয় তাহলেও যে-সব নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে তা দশ লাখের অধিক হবে।

ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রকারভেদের মাঝে প্রথমত সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে যার প্রতি আল্লাহর ওহী وَانْتَهٰى اَمْرُ الزَّمَانِ اِلَيْنَا -তে ইশারা রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা বলছেন, বিরোধীদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হবে। বিরোধীরা চাইবে এ জামা'ত যেন ব্যর্থ হয় আর মানুষ যেন এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ না করে ও গ্রহণ না করে। কিন্তু আমরা চাইব, মানুষ যেন মনোযোগ নিবদ্ধ করে আর অবশেষে আমাদের ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হবে। মানুষের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হবে এবং তারা ক্রমাগতভাবে গ্রহণ করতে থাকবে। (২) দ্বিতীয় প্রকার ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোতে এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, খোদা তা'লা বলছেন, দূরদূরান্ত থেকে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করা হবে আর দূরদূরান্ত থেকে পত্রাবলি আসবে এবং এতটা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ও এত বেশি পরিমাণে আর্থিক সাহায্য আসবে যে, যে-সব পথে সে আর্থিক সাহায্য আসবে সেসব পথ গর্তবহুল হয়ে যাবে। (৩) তৃতীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী হলো, খোদা তা'লা বলেন, এত বেশি লোক ভালোবাসা ও আন্তরিকতা নিয়ে কাদিয়ানে আসবে যে, যেপথে তারা আসবে সেই রাস্তাগুলো ভেঙে যাবে। (৪) চতুর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী হলো, খোদা তা'লা বলেন, মানুষ তোমাকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করবে কিন্তু আমরা তোমায় রক্ষা করব। (৫) পঞ্চম ভবিষ্যদ্‌বাণী হলো, খোদা তা'লা বলেন, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খ্যাতি দান করব, তুমি দূরদূরান্তে খ্যাতি লাভ করবে এবং তোমায় সাহায্য করা হবে (৬) ষষ্ঠ ভবিষ্যদ্‌বাণী হলো, খোদা তা'লা বলেন, মানুষ এত বেশি সংখ্যায় আসবে যে, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে বা মানুষের ভিড়ের কারণে তাদের সাথে দুর্ব্যবহারের আশঙ্কা থাকবে। (৭) সপ্তম ভবিষ্যদ্‌বাণী হলো, আল্লাহ তা'লা বলেন, অনেক লোক স্ব স্ব অঞ্চল থেকে হিজরত করে তোমার কাছে কাদিয়ানে আসবে আর তোমার গৃহগুলোর কোনো একপ্রান্তে বসবাস করবে। তারা আসহাবে সুফফা আখ্যায়িত হবে।

এ হলো সাতটি ভবিষ্যদ্‌বাণী, যেগুলোর সংবাদ খোদা তা'লার ওহীতে

দেওয়া হয়েছে। সকল বিবেকবান বুঝবে যে, এ যুগে এ সাতটি ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয়েছে, কেননা আলেম ও পীরযাদারা কুফরী ফতোয়া প্রস্তুত করে এবং বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র এঁটে সর্বশক্তি ব্যয় করেছে, যেন আমার কাছে কেউ না আসে। লজ্জাবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে খোদার সাথে যুদ্ধ করেছে আর ধোঁকা দেবার ও প্রতারণার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করে নি। কেউ কেউ আমার সম্পর্কে মিথ্যা গোয়ান্দাগিরি করেছে যেন কোনোভাবে সরকারকে উত্তেজিত করতে পারে আর কেউ কেউ অজ্ঞ মুসলমানদের উত্তেজিত করেছে, যেন তারা কষ্ট ও যাতনা দেওয়া অব্যাহত রাখতে পারে। কিন্তু পরিশেষে তারা সবাই ব্যর্থ হয়েছে এবং এই চারাগাছটি ভূপৃষ্ঠে গোপন ও অজানা থাকে নি আর তা একটি জামা'তে রূপ নিয়েছে, যা প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন নেই; কেননা এটি স্পষ্ট বিষয়। দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল, সকল দিক হতে আর্থিক সাহায্য আসবে। এই আর্থিক সাহায্য যা এখানে পৌঁছেছে তা এখন পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। বরং আমি মনে করি এক লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এর প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন ডাকখানার রেজিস্টারই যথেষ্ট। তৃতীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল, বহু মানুষ আসবে। এত ব্যাপকহারে লোক এসেছে যে, যদি লোকজনের দৈনিক আগমন এবং বিশেষ সময়ের জনসমাগমের ধারণা করা হয় তাহলে এ সংখ্যা কয়েক লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পুলিশ বিভাগের মানুষ এটি ভালোভাবে জানে, যাদের এদিকে দৃষ্টি দেবার নির্দেশ রয়েছে; এছাড়া কাদিয়ানের লোকদের সবারই এটি জানা। চতুর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী এটি ছিল যে, খোদা তা'লা বলেছেন, মানুষের আক্রমণ থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করব এবং তুমি আমার চোখের সামনে আছো। এটিও পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন ড. মার্টিন ক্লার্কের মামলায় আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর দুরভিসন্ধি ছিল। আর করম দীন অন্যায়ভাবে ও বিনা কারণে আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করেছে। তারও অভিসন্ধি এটিই ছিল যে, আমি যেন কঠিন কারাশাস্তি ভোগ করি। এ মামলাবাজির পেছনে সে একা ছিল না, বরং অনেক মৌলবি ও হিংসাপরায়ণ জগৎপূজারি তার সাথে ছিল; এ উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহ করা হতো। অতএব খোদা আমাকে রক্ষা করেছেন এবং নিজের ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য প্রমাণ করেছেন। পঞ্চম ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল, খোদা তোমাকে পৃথিবীতে সম্মান দেবেন এবং খ্যাতিও দান করবেন। এর পূর্ণতা কোনো ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নয়। ষষ্ঠ ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল, এত লোক আসবে যে, তাদের সাথে সাক্ষাৎ

করতে করতে তোমার ক্লান্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে বা অনেক বেশি আতিথেয়তার কারণে (মানুষের সাথে) রুক্ষ ব্যবহারেরও আশঙ্কা দেখা দেবে। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। যাদের কাদিয়ান আসার সুযোগ হয়েছে তারা ব্যাপকহারে অতিথিদের আগমন দেখে সাক্ষ্য দিতে পারে যে, অনেক সময় সত্যিই এত মেহমান একত্রিত হয় আর এত বেশি সাক্ষাতের চাপ পড়ে যে, এ তাকিদপূর্ণ নির্দেশ সবসময় সামনে না রাখলে মানবিক দুর্বলতা দুর্ব্যবহারে রূপ নেবার আশঙ্কা রয়ে যায় বা আতিথেয়তায় ত্রুটি দেখা দিতে পারে। সবার সাথে হাসিমুখে করমর্দন করা এবং শত শত লোকের সমাগম সত্ত্বেও সবার সাথে পূর্ণ সৌজন্য প্রদর্শন করা, খোদার সাহায্য ছাড়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। সপ্তম ভবিষ্যদ্‌বাণী সেসব আসহাবে সুফফা সম্পর্কে যারা কাদিয়ানে হিজরত করেছেন। অতএব যার ইচ্ছা হয় এসে দেখে নিক।

এ হলো সাত প্রকার নিদর্শন যার প্রত্যেকটি সহস্র সহস্র নিদর্শনের সমাহার। যেমন-

يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْق

ভবিষ্যদ্‌বাণীটি– যার অর্থ হলো সকল স্থান থেকে এবং দূরদূরান্তের বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য আকারে অর্থ ও সম্পদ আসবে এবং পত্রও আসবে। এভাবে (যেভাবে বলা হয়েছে) সকল স্থান থেকে এখন পর্যন্ত যে-সব রূপি বা কাপড়চোপড় ও অন্যান্য উপহার-উপঢৌকন আসে এগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি নিদর্শন। কেননা এসব কথার এমন সময়ে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যখন মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে এত ব্যাপক সাহায্য-সহযোগিতা অকল্পনীয় ও অসম্ভব মনে হতো। একইভাবে এই দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী অর্থাৎ,

يَأْتُوْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْق

এর অর্থ হলো দূর-বহুদূর থেকে মানুষ তোমার কাছে আসবে, এমনকি তারা যেপথ বেয়ে আসবে সেসব রাস্তা ভেঙে যাবে। সে যুগে এ ভবিষ্যদ্‌বাণীও পূর্ণ হয়েছে। আজ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ মানুষ কাদিয়ানে এসেছে। এর সাথে যদি পত্রও যোগ করা হয় তাহলে এ সংখ্যা কোটি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যার সংখ্যাধিক্যতার সংবাদ সময়ের পূর্বে তখন দেওয়া হয়েছে

যখন আমাকে কেউ জানত না। কিন্তু আমরা কেবল আর্থিক সাহায্য ও বয়আতকারীদের আগমন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থেকে এ নিদর্শনের সংখ্যা দশ লক্ষ আখ্যা দিয়েছি। নির্লজ্জ মানুষের মুখে লাগাম পরানো কোনো নবীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু যারা সত্যান্বেষী তারা বুঝতে পারবে যে, এমন অপরিচিতির যুগে, যার পর প্রায় ২৫ বছর কেটে গেছে, যখন আমি কিছুই ছিলাম না আর কোনো প্রকার খ্যাতিও রাখতাম না, অধিকন্তু পীরযাদাদের কোনো সম্মানিত পরিবারের অন্তর্ভুক্তও ছিলাম না যে-কারণে মানুষ সহজেই এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারত; এত স্পষ্ট ভাষায় ভবিষ্যতে উন্নতির সংবাদ প্রদান করা আর দীর্ঘ যুগাবসানে সেসব বিষয় হুবহু সেভাবে সংঘটিত হওয়া কোনো মানুষের হাতে সংঘটিত হতে পারে কি? কোনো মিথ্যাবাদী ও প্রতারক এমনটি করতে পারে কি? আমি ভাবতেই পারি না যে, যখন বারাহীনে আহমদীয়া লেখা হয়েছে, তা ছাপার পূর্বের যুগের প্রতি যে ব্যক্তি লক্ষ করবে এবং একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার আদলে নিজে গিয়ে অকুস্থলে খবরাখবর নেবে যে, সে যুগে আমি কী ছিলাম আর কতটা নির্ভৃতে ও অপরিচিত অবস্থায় পড়ে ছিলাম এবং পরিত্যক্ত ও সহায়হীন লোকদের ন্যায় জনমানব হতে কীরূপ বিচ্ছিন্ন ছিলাম। এরপর সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণীকে যে পুরো মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং চিন্তা করবে যা বর্তমান যুগে পূর্ণ হয়েছে, তার সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর সত্যতায় এমন বিশ্বাস অর্জন হবে, যেমনটি সূর্য উদিত হলে বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কার্পণ্য, বিদ্বেষ ও হৃদয়ে লালিত অহম ও আত্মম্ভরিতার ঘোরে কারো এত পরিশ্রম করার সময় কোথায়? বরং সে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যানের পন্থা অবলম্বন করবে, যা খুবই সহজ কাজ আর চেষ্টা করবে যেন কোনোভাবে এসব নিদর্শন গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকে।

بجز فضل خداوندی چہ درمانے ضلالت را نہ بخشد سود اعجاز ے تہیدستان قسمت را

খোদার কৃপা ছাড়া ভ্রষ্টতার কোনো চিকিৎসা নেই,
এমনকি নিদর্শনও দুর্ভাগাদের কোনো উপকার সাধন করে না।

اگر برآسمان صد ماہتاب و صد خورے تابد نہ بیند روز روشن آنکہ گم کردہ بصارت را

আকাশে শত শত চন্দ্র ও সূর্য ঝলমল করলেও
যাদের দৃষ্টিশক্তি নেই তাদের জন্য আলো দেখা সম্ভব নয়।

تو اے دانابترس از آنکہ سوئے اوبخواہی رفت بہ دنیا دل چہ مے بندی چہ دانی و قتِ رحلت را

হে বুদ্ধিমান মানুষ! তাঁকে ভয় করো যার পানে তোমাকে যেতেই হবে,
পৃথিবীকে কেন ভালোবাসো, তুমি কি জানো তোমার মৃত্যু কখন
আঘাত হানবে?

مشو از بہرِ دنیا سرکشِ فرمانِ احدیّت مخراز بہرِ روزے چند اے مسکیں تو شقوت را

এই জগতের খাতিরে এক-অদ্বিতীয় খোদার কথাকে অবজ্ঞা কোরো না,
হে হতভাগা! সাময়িক ভোগবিলাসের জন্য দুর্ভাগ্যকে ক্রয় কোরো না।

اگر خواہی کہ یابی در دو عالم جاہ و دولت را خدا را باش و از دل پیشۂ خود گیر طاعت را

যদি উভয় জগতে সম্মান ও সম্পদ লাভ করতে চাও,
তাহলে নিজেকে খোদার হাতে তুলে দাও আর পুরো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার
সাথে তাঁর আনুগত্য করো।

غلام درگہش باش و بعالم بادشاہی کُن نباشد بیم از غیرے پرستاران حضرت را

তাঁর দরবারের ভিখারী হয়ে যাও আর সমগ্রবিশ্বের বাদশাহী পাও,
কেননা, যারা খোদার ইবাদতকারী তারা কাউকে ভয় করে না।

تواز دل سوئے یارِ خود بیا تا نیز یار آید محبت مے کشدباجذبِ روحانی محبت را

পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে তুমি প্রেমাস্পদের দিকে অগ্রসর হও, যেন তিনি তোমার
দিকে এগিয়ে আসেন।
ভালোবাসা, আধ্যাত্মিকতার আকর্ষণে ভালোবাসাকে আকর্ষণ করে।

خدا در نصرتِ آنکس بود کو ناصرِ دین ست ہمیں اُفتاد آئین از ازل درگاہِ عزّت را

খোদা তাদের সাহায্য করেন, যারা তাঁর ধর্মকে সাহায্য করে,
আদি থেকে খোদার নিয়ম এটিই চলে আসছে।

اگر باورنے آید بخواں ایں واقعاتم را کہ تا بینی تو درہر مشکلم انواعِ نُصرت را

যদি তুমি বিশ্বাস না করো তাহলে আমি যে উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করলাম তা
পড়ো,
যেন তুমি দেখতে পাও যে, আমার সকল সমস্যায় কীভাবে খোদা আমাকে
সাহায্য করেছেন!

ہر آں کو یابد از درگاہ از خدمت ہے یابد کہ غفلت راسزائے ہست واجرے ہست خدمت را

যে ব্যক্তি তাঁর দরবার থেকে কোনো সাহায্য পায় তা খেদমতের মাধ্যমে পায়, কেননা ঔদাসীন্যের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে আর খেদমতের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়।

من اندر کارِ خود حیرانم و رازش نے دانم کہ من بے خدمتے دیدم چنیں نعماء وحشمت را

নিজের বিষয়ে আমি বিস্ময়াভিভূত–
আমি এর রহস্য বুঝি না যে, কোনো খেদমত না করেও আমি এসব নিয়ামত ও সম্মান লাভ করছি।

نہاں اندرنہاں اندر نہاں اندر نہاں ہستم کجا باشد خبر از ماگرفتارانِ نخوت را

আমি পর্দার অন্তরালে উপর্যুপরি পর্দায় লুক্কায়িত,
তাই অহংকারী লোকদের জন্য আমার খবর রাখা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে?

ندا ئے رحمت از درگاہِ باری بشنوم ہردم اگر کرمے کند لعنت چہ وزن آں ہرزہ لعنت را

আমি প্রতিটি মুহূর্তে খোদার দরবার হতে রহমতের বাণী শুনতে পাই,
যদি কোনো কীট আমাকে অভিশাপও দেয়, এর কোনো গুরুত্ব নাই।

اگر در حلقۂ اہلِ خدا داخل شوی یانے نوشتیم از رہِ شفقت کہ ماموریم دعوت را

তুমি খোদাপ্রেমিকদের দলে প্রবেশ করবে কি করবে না, তা তোমার ব্যাপার;
দয়ার বশে আমরা এটি লিখেছি, কেননা আমরা তবলীগের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি।

এ ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো যা এখনই আমরা লিখলাম তা কেবল বারাহীনে আহমদীয়ার সে স্থানেই উল্লিখিত নেই, বরং খোদা তা'লা গুরুত্বারোপের জন্য এবং একথা প্রকাশের জন্য যে, ঊর্ধ্বলোকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে, বারাহীনে আহমদীয়ার বিভিন্ন স্থানে পুনঃপুন এগুলোর উল্লেখ করেছেন। এছাড়া অন্য কিছু ভবিষ্যদ্‌বাণীও আছে, সত্যসন্ধানীদের পিপাসা নিবারণের জন্য সেসব

ভবিষ্যদ্‌বাণী এখন আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি। স্মরণ রাখা উচিত, নিদর্শনের এখানেই শেষ নয়। সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী শত্রুদের কঠিন বিরোধিতা সত্ত্বেও দীর্ঘকালের অবসানে পূর্ণতা লাভ করেছে। এর সাথে এ নিদর্শনও রয়েছে অর্থাৎ প্রারম্ভে আমার প্রতি খোদার ওহী يَا اَحْمَدُ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ অবতীর্ণ হয়েছে যা এ পুস্তকে উল্লিখিত রয়েছে। অর্থাৎ হে আহমদ! খোদা তোমার আয়ুষ্কাল ও কাজে কল্যাণ সৃষ্টি করবেন। একইভাবে যতক্ষণ সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ করে না দেখিয়েছেন খোদা আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন। সেসব রোগ-ব্যাধি সত্ত্বেও যাতে আমি আক্রান্ত, যা দুটো হলুদ চাদরের ন্যায় দেহের ওপরের অংশে একটি আর অপরটি দেহের নীচের অংশে, আমার জীবনের অংশ হয়ে আছে; যেমনটি কিনা সঠিক হাদীসগুলোতে মসীহ মওউদের এসব লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তবুও খোদা তা'লা নিজ কৃপায় প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমার বয়সে বরকত দিয়েছেন, বড়ো বড়ো রোগ-ব্যাধি হতে আমি রক্ষা পেয়েছি। অনেক শত্রুও ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করেছে যেন আমি কোনো সমস্যায় পড়ে এ ক্ষণস্থায়ী নিবাস হতে বিদায় নেই। কিন্তু তারা তাদের ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয় আর আমার খোদার সাহায্য আমার সাথে ছিল। তাঁর পবিত্র ওহী প্রতিদিন আমাকে ক্রমাগতভাবে আশ্বস্ত করতে থাকে, যার প্রতি আমি সেভাবে বিশ্বাস রাখি যেভাবে খোদা তা'লার সমুদয় গ্রন্থের প্রতি রাখি। তাই সারকথা হলো, এসব খোদার নিদর্শন যা দেখা তাঁর পবিত্র চেহারা দেখার নামান্তর। আশিসমণ্ডিত সে যে এসব নিয়ে চিন্তা করে এবং খোদার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে ভয় পায়। এসব কার্যকলাপ যদি মানুষের সৃষ্ট হতো তাহলে এটি সেভাবে ধ্বংস হয়ে যেত যেভাবে একটি কাগজকে গুটিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু এ সবকিছু সে-ই খোদার পক্ষ থেকে যিনি আকাশ বানিয়েছেন এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। মানুষের তাঁর বিরুদ্ধে এ আপত্তি করার কোনো অধিকার আছে কি যে, এমনটি কেন করলে আর অমনটি কেন করো নি? তিনি কি এমন যে, তাঁকে তাঁর নিজের কাজের জন্য প্রশ্ন করা হবে? মানুষের জ্ঞান কি তাঁর জ্ঞানের চেয়ে বেশি? মসীহর অবতরণ করা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণীর অর্থ কি তিনি জানেন না!

এখন নিম্নে সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে যা পূর্বের ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোর ওপর জোর দেওয়া ও সেগুলোর সমর্থনের জন্য করা হয়েছে আর তা হলো,

بوركت يا احمد وكان ما بارك الله فيك حقًّا فيك۔ شانك عجيب واجرك قريب۔ الارض والسّماء معك كما هو معى۔ سبحان الله تبارك وتعالى زاد مجدك ينقطع اٰبَاءَك ويبدء منك۔ و ما كان الله ليتركك حتّٰى يميز الخبيث من الطيّب۔ والله غالب على امرهٖ ولكن اكثر النّاس لا يعلمون۔ اذا جاء نصر الله والفتح وتَمَّت كلمة ربّك هٰذا الذى كنتم به تستعجلون۔ أَردتُ ان استخلف فخلقتُ اٰدم۔ دنٰى فتدلّٰى فكان قاب قوسين او أدنٰى۔ يُحْيِى الدّين ويقيم الشريعة۔

(বারাহীনে আহমদীয়া, পৃ. ৪৮৬-৪৯৬)

অর্থাৎ হে আহমদ! তোমাকে আশিসমণ্ডিত করা হয়েছে আর এই আশিস তোমারই প্রাপ্য। তোমার মর্যাদা বিস্ময়কর আর তোমার প্রতিদান সন্নিকটে। অর্থাৎ যে-সকল প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অচিরেই পূর্ণতা লাভ করবে আর তা বাস্তবেই পূর্ণ হয়েছে। পুনরায় তিনি বলেন, স্বর্গ-মর্ত্য তোমার সাথে আছে যেমনটি আছে আমার সাথে। এটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত যে, ভবিষ্যতে গ্রহণীয়তার অনেক নিদর্শন প্রকাশ পাবে এবং পৃথিবীর মানুষ আমার কাছে ফিরে ফিরে আসবে এবং ঊর্ধ্বলোকের ফেরেশতা সাথে থাকবে, যেমনটি বর্তমানে প্রকাশ পেয়েছে। পুনরায় বলেন, পবিত্র সেই খোদা যিনি বহু কল্যাণের আধার এবং অতীব মহান। তিনি তোমার সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। তোমার পিতা-পিতামহের নাম মুছে যাবে আর এখন থেকে সেই ধারা তোমার মাধ্যমে সূচিত হবে। পৃথিবীতে তোমার বংশ ছড়িয়ে পড়বে। বিভিন্ন জাতির মাঝে তুমি সুখ্যাতি লাভ করবে। এছাড়া বংশরূপী অট্টালিকার প্রথম ইঁট তুমি হবে। খোদা এমন নন যে, যতক্ষণ পবিত্র ও অপবিত্রের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট না করবেন তোমাকে পরিত্যাগ করবেন। খোদা সকল বিষয়ে পরাক্রমশালী কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ খোদার শক্তিমত্তা সম্পর্কে অনবহিত। এসব ভবিষ্যদ্‌বাণীতে বহু বংশধরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেমনটি কিনা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির পূর্ণতাস্বরূপ আমাকে এই চার পুত্রসন্তান দিয়েছেন যারা এখনও জীবিত আছে। 'আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব না যতক্ষণ পবিত্র ও অপবিত্রের মাঝে পার্থক্য না করব' মর্মে সব ভবিষ্যদ্‌বাণী এ যুগে পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন তোমরা দেখছ! তোমাদের কঠিন বিরোধিতা ও বিরোধিতাপূর্ণ দোয়া সত্ত্বেও তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন নি আর সকল ক্ষেত্রে তিনি আমায় সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রত্যেক পাথর যা আমাকে

মারা হয়েছে তিনি তা নিজ হাতে নিয়েছেন আর প্রত্যেক তির যা আমাকে লক্ষ করে নিক্ষেপ করা হয়েছে, সেই তির তিনি শত্রুর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি অসহায় ছিলাম তিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আমি একা ছিলাম তিনি আমাকে স্বীয় আঁচলে স্থান দিয়েছেন। আমি কিছুই ছিলাম না তিনি আমাকে সসম্মানে খ্যাতি দিয়েছেন আর লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে আমার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। পুনরায় তিনি সেই পবিত্র ওহীতে বলেন, যখন আমার সাহায্য তুমি লাভ করবে আর আমার মুখের কথাগুলো পূর্ণ হবে অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টি বা মানুষ আকৃষ্ট হবে এবং আর্থিক সাহায্য দৃশ্যমান হবে তখন অস্বীকারকারীদের বলা হবে যে, দেখো! সেসব কথা কি পূর্ণ হয়ে যায় নি যা সম্পর্কে তোমরা তাড়াহুড়া করতে? অতএব দেখো! আজ সেসব কথা পূর্ণতা লাভ করেছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমার ভক্ত বানিয়ে দিয়েছেন আর এত পরিমাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন যা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। অতএব হে বিরোধীরা! খোদা তোমাদের প্রতি করুণা করুন এবং তোমাদের দৃষ্টি উন্মোচন করুন। একটু চিন্তা করো! এসব কি মানুষের ষড়যন্ত্র হতে পারে? এসব প্রতিশ্রুতি বারাহীনে আহমদীয়া লেখার যুগে প্রদান করা হয়েছে, যখন জাতির সামনে এগুলো উল্লেখ করাও হাস্যকর বিষয় ছিল আর তুচ্ছ কোনো মর্যাদাও আমার ছিল না। তোমাদের কে আছে যে আমাকে আমার একথার সত্যতার বিষয়ে অভিযুক্ত করতে পারে? তোমাদের কে একথা প্রমাণ করতে পারবে যে, তখন সহস্র সহস্র লোকের মাঝে কেউ আমার কাছে আসত? বারাহীনে আহমদীয়া ছাপার যুগে আমি এতটা অপরিচিত ছিলাম যে, অমৃতসরে রজব আলী নামে এক পাদরি ছিল, যার ছাপাখানায় আমার বই বারাহীনে আহমদীয়া মুদ্রিত হতো। আমি এর প্রুফ দেখার জন্য এবং বই ছাপানোর উদ্দেশ্যে একা অমৃতসরে যেতাম এবং একাই ফিরে আসতাম। কেউ আসতে যেতে আমাকে জিজ্ঞেসও করত না যে, তুমি কে? কারো সাথে আমার জানাশোনাও ছিল না, আমার কোনো মাহাত্ম্যও ছিল না। আমার এ অবস্থা সম্পর্কে কাদিয়ানের আর্যরাও সাক্ষী, যাদের মাঝে শরমপত নামের এক ব্যক্তি এখনও কাদিয়ানে থাকে, যে কোনো কোনো সময় আমার সাথে পাদরি রজব আলীর ছাপাখানায় গিয়েছে, যেখানে আমার বই মুদ্রিত হয়েছে। আর এসব ভবিষ্যদ্‌বাণী তার লিপিকার লিপিবদ্ধ করত আর পাদরি নিজে বিস্ময়ের সাথে

সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী পড়ে বলত যে, এসব কীভাবে হতে পারে যে, এমন একজন সামান্য মানুষের কাছে এক বিশাল জনগোষ্ঠী আসবে! কিন্তু সেসব কথা যেহেতু খোদার পক্ষ থেকে ছিল, আমার ছিল না, তাই সেগুলো যথাসময়ে পূর্ণ হয়েছে এবং পূর্ণতা লাভ করছে। এক সময় মানব চক্ষু সেগুলো সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করেছে আর অন্য সময় পূর্ণ হতেও দেখেছে। বাকি অংশের অনুবাদ হলো, খোদা তা'লা বলেন, আমি পৃথিবীতে আমার এক খলীফাকে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা করলাম তাই আমি আমার এই আদম সৃষ্টি করলাম। খোদার এই ওহীতে আমার নাম আদম রাখা হয়েছে, কেননা মানব প্রজন্মের নষ্ট হয়ে যাবার যুগে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে; যেন সে যুগে ভূপৃষ্ঠ ছিল জনমানবশূন্য। আদমের ন্যায় আমিও যমজ জন্মগ্রহণ করেছি। আমার সাথে এক মেয়ে ছিল যে আমার পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে আর আমি পরে। এটি একথার প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, এখন আমার মাধ্যমে পূর্ণ মানবের ধারার সমাপ্তি ঘটছে। এছাড়া আমার নাম আদম রাখার মাঝে আরো একটি ইঙ্গিত ছিল, যার সেই দ্বিতীয় এলহামে অর্থাৎ খোদার সেই ওহীতে বিশদ বিবরণ রয়েছে যা কুরআনের ভাষায় আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সেই ওহী হলো,

قال اِنّی جاعل فی الارض خلیفۃ۔ قالوا اَتجعل فیھا من یفسد فیھا۔ قَالَ اِنّی اعلم ما لا تعلمون۔

অর্থাৎ আমার সম্পর্কে খোদা আমার মাধ্যমেই বারাহীনে আহমদীয়াতে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি আদমের আদলে এক খলীফা সৃষ্টি করছি। তখন সে খবর শুনে কতক বিরোধী আমার অবস্থাকে নিজেদের বিশ্বাসের পরিপন্থি পেয়ে নিজেদের অন্তরে বলে, হে খোদা! তুমি কি এমন মানুষকে নিজের খলীফা বানাবে– যে এক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী মানুষ আর যে অন্যায়ভাবে জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং আলেমদের স্বীকৃত গৃহীত বিষয়াদির বাইরে যায়। তখন খোদা উত্তর দিয়েছেন, আমি যা জানি তা তোমরা জানো না। এটি খোদার বাণী যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সত্যিকার অর্থে আমার ও আমার খোদার মাঝে এমন সূক্ষ্ম রহস্য বিদ্যমান যা পৃথিবী জানে না। খোদার সাথে আমার একটি গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক রয়েছে যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, আর এ যুগের মানুষ এ সম্পর্কে অনবহিত। সুতরাং খোদার ওহী قَالَ اِنّی اَعلم ما لا تَعلمون۔-এর এটিই অর্থ।

বাকি অংশের অনুবাদ হলো, খোদা তা'লা বলেন, এ ব্যক্তি আমার নিকটবর্তী হয়েছে এবং আমার পূর্ণ নৈকট্য পেয়েছে। এরপর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য তাদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে আর আমার ও সৃষ্টির মাঝে একটি মাধ্যম হয়ে গিয়েছে, যেমনটি কিনা দুটো ধনুকের একটি তন্ত্রী হয়ে থাকে। আর সে যেহেতু এই মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে তাই সে ধর্মকে নতুনভাবে জীবিত করবে ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করবে। অর্থাৎ কিছু ভুলভ্রান্তি যা মুসলমানদের মাঝে প্রচলন লাভ করেছে আর যে-সব ভুলভ্রান্তি অন্যায়ভাবে মহানবী (সা.)-এর প্রতি আরোপ করা হয়, সেসব ভুলভ্রান্তিকে এক বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দূর করবে এবং শরীয়ত, সূচনাতে যেমন বক্রতামুক্ত ছিল সেভাবে বক্রতামুক্ত করে দেখাবে।

এছাড়া সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়ায় আরো এলহাম রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন,

نُصرتَ وقالوا لَاتَ حين مناص۔ اَمْ يقولون نحن جميع منتصر۔ سَيُهزم الجمع ويولون الدبر۔ وان يروا اٰيةً يُعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله۔ واعلموا اَنّ الله يحيى الارض بعد موتها۔ ومن كان لِلّٰه كان الله له۔ قل ان افتريته فعلىّ اجرام شديد۔ يا احمدى انت مرادى ومعى غرستك*১ كرامتك بيدى۔ أكان للنّاس عجبًا۔ قل هو الله عجيب۔ لا يُسئل عمّا يفعل وهم يُسْئَلون۔ وقالوا انّى لك هٰذا ان هٰذا الّا اختلاق۔ قل الله ثمّ ذرهُم فِىْ خوضهم يلعبون۔ وَلا تخاطبنى فى الذين ظلموا انهم مغرقون۔ يظلّ ربّك عليك ويغيثك ويرحمك۔ وان لم يعصمك الناس يعصمك الله من عندہٖ۔ يعصمك الله من عنده وان لم يعصمك الناس۔ واذ يمكر بك الّذى كفّر۔*২ اوقد لي ياهامان۔ تبّت يدا ابى لهبٍ وتبّ ما كان له ان يدخل فيها اِلّا

---

* **টীকা-১:** বারাহীনে আহমদীয়া ৫ম খণ্ডের ১ম সংস্করণে লিপিকারের ভুলে 'গারাসতুকা' লেখা হয়েছে অথচ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এসব এলহাম বারাহীনে আহমদীয়া ১ম খণ্ডের ৪৯৭-৫১১ পৃষ্ঠায় বলে উল্লেখ করেছেন। পৃ. ৫০৫-এর ৩ নম্বর টীকা-পাদটীকাতে এই এলহাম 'গারাসতু কারামাতাকা বিইয়াদি' লেখা হয়েছে। –প্রকাশক

* **টীকা-২:** এই শব্দের কাফফারা ও কাফারা উভয় কিরাআতই বিদ্যমান। কারণ যে ব্যক্তি (কাউকে) কাফির বলে সে অবশ্যই অস্বীকারকারীও বটে এবং যে ব্যক্তি এই দাবি অস্বীকার করে সে অবশ্যই কাফিরও আখ্যা দেবে। আর হামান শব্দটি 'হীমান' শব্দের দিকে ইঙ্গিত করে এবং হীমান বলা হয় তাকে– যে কোনো উপত্যকায় একাকী হাবুডুবু খায়। –লেখক

خائفًا وَمَا اصابك فمن الله۔ الفتنة هٰهنا فاصبر كما صبر اولوا العزم۔ اَلا انّها فتنة من الله ليحبّ حبًّا جمًّا عطاءً غير مجذوذ۔ شاتان تذبحان۔ وكلّ من عليها فان۔ عسٰى ان تكرهوا شيئًا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৭-৫১১ দ্রষ্টব্য)

অনুবাদ: তোমাকে সাহায্য করা হবে আর ঐশী সাহায্য তোমার সাথে থাকবে। এমন সাহায্য প্রদান করা হবে যে, তাকওয়ার মর্ম স্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন বিরোধীরা বলবে, এখন পলায়নের আর কোনো পথ নেই। তারা বলবে, আমরা একটি বড়ো জামা'ত, যারা প্রতিশোধ নিতে পারে। কিন্তু অচিরেই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। খোদার নিদর্শন দেখে বলবে, এটি অত্যন্ত ভয়াবহ একটি চক্রান্ত।* তুমি তাদের বলে দাও, যদি খোদা তা'লাকে ভালোবাসো তাহলে আসো আমার অনুসরণ করো, যেন খোদাও তোমাদের ভালোবাসতে পারেন।

আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, এ ভূমিকে অর্থাৎ এ দেশবাসীদের আবার জীবিত করবেন যারা মৃত্যুবরণ করেছে অর্থাৎ অনেক লোক হিদায়াত পাবে আর এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হবে। অনেকেই এ জামা'তে প্রবেশ করবে। যে খোদার হয়ে যায় খোদা তার হয়ে যান। তাদের বলে দাও, যদি আমি খোদার নাম নিয়ে মিথ্যা বলে থাকি তাহলে আমি কঠিন পাপ করেছি যার শাস্তি আমি পাবোই অর্থাৎ আল্লাহর নামে যে মিথ্যা রচনা করে বা আল্লাহর নাম নিয়ে যে মিথ্যা বলে সে এ পৃথিবীতে শাস্তি পায়, সে সফল হয় না। তার সকল কাজ অবশেষে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু সত্যবাদী সাফল্য লাভ করে। সত্যের মূল মাটির গভীরে প্রোথিত থাকে। পুনরায় তিনি বলেন, হে আমার আহমদ! তুমি আমার অভীষ্ট এবং আমার সাথে আছো। তোমার

---

* **টীকা:** এই আয়াত অর্থাৎ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ (আল-কামার: ০৩) পবিত্র কুরআনের সেই স্থানে রয়েছে যেখানে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হবার (তথা শাক্কুল কমর) নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে। অতএব এ আয়াত এই উপলক্ষ্যে উল্লেখ করা এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত যে, এখানেও কোনো চন্দ্র-সংক্রান্ত নিদর্শন প্রকাশিত হবে। সেই নিদর্শন ছিল এক বিস্ময়কর চন্দ্রগ্রহণ, যা রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। কিছু আলেম লিখেছেন যে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হবার নিদর্শনও এক প্রকার চন্দ্রগ্রহণই ছিল। –লেখক

সম্মানের বৃক্ষ আমি আমার নিজের হাতে রোপণ করেছি অর্থাৎ তুমি সত্যবাদী এবং তুমি আমার পক্ষ থেকে তাই, আমি তোমাকে অনেক সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রদান করব আর এ বিশেষ কাজ আমার হাতে সাধিত হবে, অন্য কারো হাতে নয়। সুতরাং এ কাজকে কেউ বিনষ্ট করতে পারবে না। এটি পরবর্তী সময়ের জন্য একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল যা এখন পূর্ণতা লাভ করেছে। পুনরায় তিনি বলেন, মানুষ কি এ কারণে বিস্ময়াভিভূত? এটি যে ঘটবে এ বিষয়ে কি তারা সন্দিহান? সুতরাং তুমি তাদের উত্তর দাও যে, বিস্ময়কর বিষয়াদি ঘটানো খোদার কাজ। তিনি নিজের কাজের জন্য জিজ্ঞাসিত হন না কিন্তু মানুষ জিজ্ঞাসিত হয়। তারা বলে, এ মর্যাদা তুমি কীভাবে পেতে পারো? এটি তোমার মনগড়া বলে মনে হয়। তুমি বলো, না, এসব প্রতিশ্রুতি খোদার পক্ষ থেকে; এরপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়াকৌতুকের মাঝে ছেড়ে দাও অর্থাৎ তারা যে কুধারণা করছে তা করতে দাও। এগুলো খোদার কথা নাকি মানুষের তা তারা অবশেষে প্রত্যক্ষ করবে। যারা সীমালঙ্ঘনকারী আর সীমালঙ্ঘন করা পরিত্যাগ করে না তাদের সম্পর্কে আমার সাথে কথা বলো না। এটি অত্যন্ত ভীতিপ্রদ একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী কেননা এতে নিমজ্জিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জানা নেই কীভাবে নিমজ্জিত করা হবে, নূহের জাতির ন্যায় নাকি লূতের জাতির মতো, যারা ভয়াবহ ভূমিকম্পের মাধ্যমে ভূমিতে তলিয়ে গিয়েছে। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমার ওপর তোমার প্রভু ছায়াদান করবেন এবং তোমার ফরিয়াদ শুনবেন এবং তোমার প্রতি কৃপা করবেন। যদিও মানুষ তোমাকে বাঁচানো পছন্দ করবে না কিন্তু খোদা তোমাকে রক্ষা করবেন। খোদা তোমাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন মানুষ তোমাকে ফাঁসানোর বিষয়ে যতই দৃঢ়সংকল্প হোক না কেন।

এ ভবিষ্যদ্‌বাণী সেসব ফৌজদারি মামলা-সংক্রান্ত যা মার্টিন ক্লার্ক ও করম দীন প্রমুখের পক্ষ থেকে আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে এবং লেখরাম নিহত হবার সময়ও আমাকে জড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এসব মামলা মোকদ্দমায় আমাকে ফাঁসি দেওয়া বা জেলে দেবার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। সুতরাং খোদা তা'লা এই ভবিষ্যদ্‌বাণীতে বলেন, আমি তাদেরকে তাদের ষড়যন্ত্র চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বিফলমনোরথ করব আর তাদের হামলা থেকে তোমাকে অবশ্যই রক্ষা করব। দেখো! ২৪ বছর পর সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয়েছে। পুনরায় তিনি বলেন, সেই ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্রকে

স্মরণ করো যে তোমাকে কাফির আখ্যায়িত করবে এবং তোমার দাবিকে অস্বীকার করবে। সে তার বন্ধুর নিকট থেকে ফতোয়া গ্রহণ করবে, যেন মানুষকে সেই দাবির অজুহাতে উত্তেজিত করতে পারে। আবু লাহাবের* উভয় হাত ধ্বংস হয়ে গেছে যা দ্বারা সে ফতোয়া লিখেছে। লেখা যদিও এক হাতের কাজ কিন্তু দ্বিতীয় হাতও এতে সাহায্য করে। ধ্বংস হবার অর্থ হলো, সে ফতোয়া সংগ্রহের বিষয়ে ব্যর্থ থাকবে। আবার বলেন, সে-ও ধ্বংস হয়ে গেছে অর্থাৎ সে ভয়াবহ পাপ করেছে যা বাস্তবে ধ্বংস হবারই নামান্তর। তাই বস্তুবাদিতার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে আর ঈমানের স্বাদ তার জীবন থেকে লোপ পেতে থাকে। এ বিষয়ে তার কেবল ভয়ে ভয়ে কথা বলা উচিত ছিল অর্থাৎ কোনো সন্দেহ থাকলে শত্রু হিসেবে ময়দানে না এসে গোপনে ও শিষ্টতার সাথে তা দূরীভূত করা উচিত ছিল। পুনরায় তিনি বলেন, তুমি যে কষ্ট পাবে তা খোদার পক্ষ থেকে অর্থাৎ খোদা না চাইলে এ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার ধৃষ্টতা তার ছিল না। পুনরায় তিনি বলেন, তখন পৃথিবীতে অনেক হট্টগোল হবে এবং ভয়ংকর নৈরাজ্য দেখা দেবে; সুতরাং তোমার উচিত ধৈর্য-ধারণ করা যেমনটি কিনা দৃঢ়প্রত্যয়ী নবীরা করে আসছেন। কিন্তু স্মরণ রেখো! এই পরীক্ষা সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে হবে না বরং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হবে, যেন তিনি তোমার জন্য বেশি ভালোবাসা প্রকাশ করেন। এই স্নেহ খোদার পক্ষ থেকে সেই আশিস যা তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। এরপর আরেকটি ভবিষ্যদ্‌বাণী করে বলেন যে, দুটি ছাগল জবাই করা হবে। অর্থাৎ মিয়া আবদুর রহমান ও মৌলবি আব্দুল লতীফ সাহেব, যাদেরকে কাবুলে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। ভুপৃষ্ঠে যারা আছে তারা সকলেই অবশেষে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু তাদের উভয়ের জবাই হওয়া অবশেষে তোমার জন্য উত্তম ফলাফল বহন করবে। শাহাদতের এসব ঘটনার যৌক্তিকতা খোদার জানা আছে কিন্তু তোমার তা জানা নেই। অর্থাৎ এ দুটো মৃত্যুর ফলে কাবুলে কী কী ভালো দিক সামনে আসবে তা খোদা-ই ভালো জানেন। এর পূর্বের ভবিষ্যদ্‌বাণী সেই ফতোয়াবাজি-সংক্রান্ত যা মৌলবি

*** টীকা:** এই স্থানে আবু লাহাবের অর্থ হলো প্রজ্বলিত আগুনের পিতা, অর্থাৎ এই দেশে যে কাফির আখ্যায়িত করার বা তাকফিরের আগুন জ্বলবে সেদিকে ইঙ্গিত। আসলে এর পিতা হবে সে যে এই ফতোয়া লিখেছে। –লেখক

মুহাম্মদ হোসাইন ও মৌলবি নযীর হোসাইন-এর লেখার ফলে দৃশ্যপটে এসেছে আর যার কারণে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে হট্টগোল দেখা দেয়, এমনকি সবাই আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা আর কাফির ও বেঈমান এবং দাজ্জাল বলা পুণ্যের কারণ মনে করে।

এরপর খোদা অনেক স্নেহ করবেন মর্মে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা মানুষের আমার প্রতি আকৃষ্ট হবার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে; কেননা খোদার ভালোবাসা সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার দাবি রাখে। খোদার সন্তুষ্টির দাবি হলো পৃথিবীর পুণ্যবানদের সন্তুষ্ট হওয়া। শেষে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্‌বাণীতে যে দুটি ছাগল জবাই করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এটি সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে যা কাবুলের বুকে সংঘটিত হয়েছে; অর্থাৎ আমার জামা'তের একজন ধার্মিক যুবক সদস্য আবদুর রহমান, এছাড়া অপরজন হলেন মৌলবি আব্দুল লতিফ, যিনি একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। কাবুলের আমীরের নির্দেশে কেবল আমার জামা'তভুক্ত হবার অপরাধে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছিল। এই ঘটনার পর প্রায় দুই বছর কেটে গেছে।* এখন এ বিষয়টি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা প্রয়োজন যে, এটা কীভাবে সম্ভব যে, মহাপর্দার

*** টীকা:** আমার ভাই মৌলবি আব্দুল লতিফ সাহেব মরহুম এবং শেখ আব্দুর রহমান সাহেব মরহুমের শাহাদতের এই ঘটনা এমন একটি অকল্পনীয় ঘটনা ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি সংঘটিত না হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এদিকে আমার মনোযোগ নিবদ্ধ হয় নি যে, আসলে আল্লাহর ওহীর অর্থ ছিল আমাদের দুইজন সত্যনিষ্ঠ অনুসারীকে সত্যিই জবাই করা হবে। পূর্বে এই অবস্থাকে অসম্ভব মনে করে শুধুমাত্র ইজতিহাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যার আশ্রয় নেই এবং ব্যাখ্যামূলক অর্থ মাথায় ঘুরপাক খেত। কারণ মানুষের নিজস্ব জ্ঞান এবং ব্যাখ্যা ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু যখন এই দুটি ঘটনা হুবহু বাস্তবে ঘটে গেল এবং এই জামা'তের দুইজন সম্মানিত ও পুণ্যবান লোককে কাবুলে চরম নিষ্ঠুরভাবে শহীদ করা হলো, তখন আমরা হাক্কুল ইয়াকিন বা নিশ্চিত বিশ্বাসভিত্তিক জ্ঞানের ভিত্তিতে খোদার ওহীর প্রকৃত অর্থ অবগত হলাম। যখন সেই ওহীর পুরো বাক্য পুনরায় পাঠ করলাম, তখন আমাদের চোখ খুলে গেল এবং এক অভাবনীয় আনন্দ অনুভব করলাম। বুঝতে পারলাম যে, যতটা স্পষ্টভাবে বলা সম্ভব ছিল, আল্লাহ তা'লা ততটাই স্পষ্টভাবে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী বর্ণনা করে দিয়েছিলেন এবং এমন শব্দ ও বাক্যাংশ নির্বাচন করেছেন যা অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। সুবহানাল্লাহ! এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কীভাবে তিনি এসব গোপন বিষয় দীর্ঘকাল পূর্বেই 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। –লেখক

অন্তরালে লুক্কায়িত অদৃশ্য বিষয়াদি সে ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হতে হবে যে মিথ্যা রচনাকারী! অথচ খোদা তা'লা স্বীয় প্রিয় বাণীতে বলেন, সকল মু'মিনের নিকট অদৃশ্য বিষয়াদি পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয় না, বরং কেবল সেসব বান্দার প্রতি প্রকাশ করা হয়, যারা মনোনীত ও নির্বাচিত হবার মর্যাদা রাখেন যেমনটি কিনা আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনের একস্থানে বলেন,

لَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(আল-জিন: ২৭-২৮)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা স্বীয় অদৃশ্য সংবাদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কেবল তাদের দান করেন যারা তাঁর রসূল ও তাঁর দরবারে পছন্দনীয়।

পরিতাপ! কিছু নির্বোধ মৌলবি, আলেম আখ্যায়িত হয়ে কতক শাস্তিমূলক বা সতর্কীকরণমূলক ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে, যার কিছু পূর্ণ হয়ে গেছে আর কিছু পূর্ণ হবার বাকি আছে, আপত্তি করে আর জানে না যে, খোদা তা'লা স্বীয় শাস্তিমূলক সংবাদ সম্পর্কে তা পূর্ণতা দানের বা স্থগিত করার স্বাধীনতা রাখেন। সব নবীর এটিই বিশ্বাস আর এর ওপরই শাস্তি টলানোর বিষয়টির ভিত্তি রাখা হয়েছে। কেননা খোদা তা'লা কাউকে যদি শাস্তি দেবার ইচ্ছা রাখেন, তা তিনি কোনো নবীর কাছে ভবিষ্যদ্‌বাণীরূপে প্রকাশ করুন বা গোপন রাখুন তা শাস্তি বা বিপদই। অতএব তা যদি টলতে না পারে তাহলে সদকা, খয়রাত ও দোয়ার প্রেরণা কেন যোগানো হয়েছে?

এরপর অন্যান্য ভবিষ্যদ্‌বাণীও রয়েছে যা সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর সমর্থক, যা আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি।

وَلا تهنوا وَلا تحزنوا اليس الله بكاف عبده۔ الم تعلم انّ الله على كلّ شيءٍ قدير۔ وان يتخذونك اِلّا هزوا۔ أَهٰذا الّذى بعث الله۔ قل انّما أنا بشر مثلكم يوحٰى اِلىّ انّما اِلٰهُكُمْ اِله وَّاحدٌ والخَيْر كلّهُ فى القراٰن۔ قل ان هُدَى الله هو الهُدٰى۔ رَبِّ اِنّىْ مغلوبٌ فانتصر۔ ايلى ايلى لما سبقتنى۔ يا عبد القادر اِنّى معك غرست لك بيدَى رحمتى وقدرتى۔ ونجّيناك من الغمّ وفتّاك فتونا۔ انا بُدّك اللازم۔ اَنَا مُحْيِيْكَ نَفختُ فيك مِن لّدنّى روح الصّدق۔ وَأَلقيت عليك محبّة مّنّى وَلتصنع على عينى۔ كزرع اخرج شَطْأَهُ فَاستغلظ فاستوٰى على سوقهٖ۔ اِنّا فتحنا لك فتحا مُّبِيْنًا ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وَمَا تَأَخّر۔

(বারাহীনে আহমদীয়া, পৃ. ৫১১-৫১৫)

অর্থাৎ তোমরা শিথিল হয়ো না আর দুঃখ কোরো না। খোদা কি নিজের বান্দার জন্য যথেষ্ট নন অর্থাৎ সবাই যদি শত্রুও হয়ে যায় খোদা নিজের পক্ষ থেকে সাহায্য করবেন। পুনরায় বলেন, তুমি কি জানো না খোদা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান? তাঁর জন্য কোনোকিছু অসম্ভব নয়। অতএব তিনি একজন নিঃসঙ্গ অপরিচিত ব্যক্তিকে এতটা উন্নতি দেবার শক্তি রাখেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ তার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করবে ও তাকে ভালোবাসবে। এটি সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী যা পঁচিশ বছর পর আজকে পূর্ণ হয়েছে। পুনরায় বলেন, তারা তোমাকে হাসিঠাট্টার লক্ষ্যস্থল বানিয়ে রেখেছে। আবার উপহাসের ছলে বলে এ-ই কি সে ব্যক্তি যাকে খোদা আমাদের মধ্য হতে তবলীগের জন্য বেছে নিয়েছেন? তাদের বলে দাও, আমি কেবল তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, এক খোদাই তোমাদের খোদা। সকল প্রকার পুণ্য কুরআনে নিহিত। তাদের বলো, তোমাদের ধারণা কিবা গুরুত্ব রাখে? হিদায়াত সেটিই যা খোদা স্বয়ং সরাসরি প্রদান করেন পক্ষান্তরে মানুষ এমন যারা নিজেদের ভ্রান্ত ব্যখ্যার মাধ্যমে ঐশী গ্রন্থের অর্থ পরিবর্তন করে দেয় আর এক কথাকে অন্যভাবে নেয়। একমাত্র খোদা-ই কোনো ভুল করেন না। তাই তাঁর প্রদত্ত হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। মানুষের নিজের কল্পনাপ্রসূত অর্থ নির্ভরযোগ্য নয়। পুনরায় বলেন, এ দোয়া করো যে, হে খোদা! আমি পরাজিত। তারা অগণিত আর আমি একা এবং তারা এক দল। তাই তুমি আমার পক্ষ থেকে মোকাবিলার জন্য দাঁড়াও। হে আমার খোদা! হে আমার খোদা! তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করেছ? এটি ভবিষ্যৎ পরীক্ষা সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী যে, এমন একটি যুগ আসবে যখন বিরোধিতামূলক অনেক হট্টগোল মাথাচাড়া দেবে আর তা অপরিচিতি ও নিঃসঙ্গতার যুগ হবে। এক বিশাল জনগোষ্ঠী বিরোধিতায় উঠেপড়ে লাগবে। বাহ্যিক ভূমিকম্প দেখে মানবিক সীমাবদ্ধতার কারণে ধারণা হবে যে, খোদা সাহায্য করা ছেড়ে দিয়েছেন। অতএব খোদা তা'লা আগামীকে স্মরণ করাচ্ছেন যে, তিনি সেসময় দোয়াগুলো কবুল করবেন আর সেই অবস্থা স্থায়ী হবে না। মানুষ এ দিকে আকৃষ্ট হবে আর বাস্তবে তা-ই হয়েছে। অনেক বিশৃঙ্খলার পর যা কাফির আখ্যায়িত করার কারণে সৃষ্টি হয়েছিল অবশেষে মানুষ এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। পুনরায় বলেন, হে আব্দুল কাদের! আমি তোমার সাথে আছি। আমি তোমার জন্য আমার কৃপা ও শক্তির বৃক্ষ রোপণ করেছি আর আমি তোমাকে

সকল দুঃখ থেকে পরিত্রাণ দেবো। কিন্তু এটি ঘটার পূর্বে তোমার পথে অনেক পরীক্ষা বা সমস্যা সৃষ্টি করব যেন তোমাকে ভালোভাবে যাচাই করা যায় আর যেন পরীক্ষার সময় তোমার অবিচলতা প্রকাশ পায়। আমিই তোমার একমাত্র আবশ্যকীয় মুক্তির পথ। আমি তোমার দুঃখ-বেদনার নিরাময় আর আমিই তোমাকে জীবিত করেছি। আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার মাঝে সত্যের প্রেরণা সঞ্চার করব। আমি তোমার সমূহ বেদনার নিরাময় আর আমিই তোমাকে জীবিত করেছি। আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার মাঝে সত্যের প্রেরণা সঞ্চার করেছি আর নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছি। অর্থাৎ তোমাতে এমন একটি বিশেষত্ব অন্তর্নিহিত রেখেছি যে, প্রত্যেক পুণ্যবান তোমাকে ভালোবাসবে এবং তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে। আমি এমনটি করেছি যেন তুমি আমার চোখের সামনে লালিত পালিত হও আর আমার চোখের সামনে তোমার বৃদ্ধি ঘটে। তুমি সেই বীজের মতো যা ভূমিতে বপন করা হয়েছে। তা একটি ছোট্ট শস্যদানা ছিল যা মাটিতে লুক্কায়িত ছিল। এরপর তা অঙ্কুরিত হয় এবং ক্রমাগতভাবে বড়ো হতে থাকে। একপর্যায়ে তা অনেক মোটা (কাণ্ডবিশিষ্ট) হয়ে যায় এবং এর শাখাগুলো বিস্তার লাভ করে এবং এর কাণ্ড নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে যায়। এটি ভবিষ্যৎ উন্নতি-সংক্রান্ত একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী আর এতে বলা হয়েছে যে, এখন তুমি একটি বীজের ন্যায় যা জমিতে বপিত হয়েছে এবং মাটিতে হারিয়ে গেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে সেই বীজ অঙ্কুরিত হওয়া ও বৃদ্ধি পাওয়া অবধারিত যতক্ষণ না একটি বড়ো বৃক্ষে পরিণত হয় এবং মোটা হয়ে যায় এবং নিজ কাণ্ডে দণ্ডায়মান হয় আর যাকে কোনো তুফান ক্ষতি করতে পারবে না। এ ভবিষ্যদ্‌বাণী এখন থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। পুনরায় বলেন, খোদা তোমাকে একটি প্রকাশ্য বিজয় দান করবেন যেন তোমার পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন। এখানে খোদার এই ওহী সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে যে, বিজয়ের সাথে পাপ ক্ষমা করার কী সম্পর্ক রয়েছে? বাহ্যত এ উভয় বাক্যের পারস্পরিক কোনো সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এ উভয় বাক্যের পরস্পর নিবিড় সম্পর্ক আছে। খোদার এ ওহীর ব্যখ্যা হলো, এ অন্ধ জগতে খোদার প্রত্যাদিষ্ট নবী ও রসূলদের যত সমালেচনা হয়, তাদের মর্যাদা ও কর্ম সম্পর্কে যত আপত্তি ও কুধারণা করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের আলোচনা-সমালোচনা করা হয় তা পৃথিবীর কারো সম্পর্কে করা হয়

না। তাই খোদা এমন করেছেন যেন তাদেরকে দুর্ভাগা লোকদের দৃষ্টির বাইরে রাখা যায় এবং সে তাদের আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত না হয়। তারা একটি মহান সম্পদ হয়ে থাকেন আর মহান সম্পদকে অজ্ঞ-অযোগ্যদের দৃষ্টির বাইরে রাখাই ভালো। এ কারণে খোদা তা'লা চিরদুর্ভাগাদের সেই মনোনীত দল সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহে নিপতিত করেন যেন তারা সেই সম্পদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকে। খোদার এই রীতি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে যারা খেদার পক্ষ থেকে ইমাম, রসূল ও নবী হয়ে আসেন। এ কারণেই মূসা (আ.), ঈসা (আ.) ও আমাদের নবী (সা.) সম্পর্কে সত্যের শত্রুরা যে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করেছে এবং যেভাবে ছিদ্রান্বেষণ করেছে তা কোনো সাধারণ পুণ্যবান সম্পর্কে আদৌ করা হয় নি। হেন কোনো অপবাদ নেই যা তাদের প্রতি আরোপ করা হয় নি আর এমন কোনো সমালোচনা নেই যা তাদের করা হয় নি। যেহেতু সব অপবাদের যৌক্তিক উত্তর প্রদান করা একটি তাত্ত্বিক বিষয় ছিল আর তাত্ত্বিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত কঠিন হয়ে থাকে আর তমসাচ্ছন্ন প্রকৃতির লোক এর মাধ্যমে আশ্বস্ত হয় না, এ কারণে খোদা তা'লা তাত্ত্বিক পথ অবলম্বন করেন নি বরং নিদর্শনের পথ বেছে নিয়েছেন। আর নিজের নবীদের দায়মুক্ত করার জন্য স্বীয় সমর্থনসূচক নিদর্শনাবলি ও সুমহান সাহায্যকে যথেষ্ট জ্ঞান করেছেন; কেননা সকল মোটাবুদ্ধি এবং নোংরা লোকও খুব সহজে বুঝতে পারে যে, তারা যদি তেমনিই অবাধ্য প্রবৃত্তির পূজারি, মিথ্যা রচনাকারী ও অপবিত্র প্রকৃতির লোক হতো তাহলে তাদের সাহায্যের জন্য এত বড়ো বড়ো নিদর্শন প্রদর্শন করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং খোদা তা'লা নিজের আদি রীতি অনুসারে বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্বের অংশগুলোতে আমার সম্পর্কে সেই ওহী করেছেন যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। যার অর্থ হলো, খোদা তোমার সমর্থনে বড়ো বড়ো নিদর্শন প্রদর্শন করবেন যেন পৃথিবীর অন্ধ লোকেরা তোমার জীবনের প্রথম বা শেষ অংশ সম্পর্কে যে-সব আপত্তি করেছে সেসবের খণ্ডন হয়ে যায়;* কেননা রহস্যপূর্ণ জগতের সাক্ষ্য থেকে বড়ো কোনো সাক্ষ্য নেই। এছাড়া ذَنْب শব্দ এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে

*** টীকা:** আল্লাহ তা'লা আমার কাছে প্রকাশ করেছেন যে জীবনের শেষ অংশ এটিই যা এখন অতিবাহিত হচ্ছে। এ বিষয়ে আরবি ভাষায় ওহী হলো:

قَرُبَ اَجَلُكَ الْمُقَدّر وَلا نُبْقِيْ لك من المخزياتِ ذِكرا۔

যে, আপত্তিকারী ও সমালোচক যে-সব আক্রমণ করে তারা প্রত্যাদিষ্টদের ক্ষেত্রে এসব সমালোচনাকে ذَنْب আখ্যা দিয়েই আক্রমণ করে। সুতরাং এর অর্থ এই নয় যে বাস্তবেই কোনো ذَنْب বা পাপ হয়েছে, বরং এর অর্থ হলো, যে ذَنْب বা পাপ তোমার প্রতি আরোপ করা হয়েছে তার কথা বলা হচ্ছে। সত্য কথা হলো এটি শিষ্টাচার বিবর্জিত বিষয় যে, মানুষ খোদার সে ওহীর মর্ম আক্ষরিক অর্থে পাপ বা ذَنْب করবে যা খোদা তা'লা ক্ষমা করে দিয়েছেন। বরং এর অর্থ হলো ذَنْب বা পাপের নামে তাদের প্রতি যা আরোপ করা হয়েছে এবং ছড়ানো হয়েছে সেই অন্যায় দুর্নামকে ও বিভ্রান্তিকর বদনামকে এক মহান নিদর্শনের মাধ্যমে ঢেকে দেওয়া হবে। নির্বোধ মানুষ জানে না যে, কোন অর্থে খোদা তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতি ذَنْب শব্দ অর্থাৎ পাপ আরোপ করেন। কেননা প্রকৃত পাপ হলো খোদার অবাধ্যতা যা তওবা না করলে শাস্তিযোগ্য হয়। বিষয় এমন নয় যে, খোদা তা'লা নিজেই কোনো এমন নিদর্শন দেখানোর বিষয়ে চিন্তিত হবেন যেন সমালোচনামূলক ধ্যানধারণা ও অস্পষ্ট সন্দেহ নিজেই দূর হয়ে যায় বা ঢাকা পড়ে যায় আর যারা এর উল্লেখ করবে তারা লাঞ্ছিত হয়।

এ কারণে ইমাম ও সূফীরা লিখেছেন, নবীগণের ক্ষেত্রে খোদা তা'লা যে-সব দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন যেমন আদম (আ.)-এর গন্ধম খাওয়া ইত্যাদি যদি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখ করা হয় তাহলে তা কুফরী ও ঈমান নষ্ট হবার কারণ। কেননা তারা সম্মানিত, পৃথিবী যে কথাকে পাপ মনে করে তারা তা হতে মুক্ত। তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা খোদা তা'লার হামলার লক্ষ্যে পরিণত হবার নামান্তর যেমনটি সহীহ হাদীসে রয়েছে যে,

---

*** চলমান টীকা:** অর্থাৎ: তোমার নির্ধারিত মৃত্যু এখন সন্নিকটে এবং আমরা তোমার সম্পর্কে এমন একটি বিষয়ও অবশিষ্ট রাখব না, যা লাঞ্ছনা, তিরস্কার বা নিন্দার কারণ হতে পারে। এই ভিত্তিতেই তিনি আমাকে বারাহীন আহমদীয়ার পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ করার সামর্থ্য দান করেছেন।

একইভাবে মহান আল্লাহ তাঁর এই ওহীতে আমার মৃত্যুর ক্ষণ নিকটবর্তী হবার দিকেও ইঙ্গিত করেছেন: 'সব দৈবদুর্বিপাক ও খোদা তা'লার ক্ষমতার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শনের পর তোমার (মৃত্যুর) ঘটনা ঘটবে।' –লেখক

ومن عَادٰى وَلِيًّا لى فقد اٰذنته للحرب

অর্থাৎ, যে আমার ওলীর শত্রুতা করে আমি তাকে সতর্ক করছি যে, আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। বস্তুত মনোনীতরা খোদা তা'লার অনেক প্রিয়ভাজন হয়ে থাকেন এবং তাঁর সাথে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রাখেন। তাদের দুর্বলতা খুঁজে বেড়ানো ও তাদের ছিদ্রান্বেষণ করা অশুভ বিষয়। ধ্বংসের জন্য এর চেয়ে সহজতর অন্য কোনো পথ নাই যে, মানুষ অন্ধের ন্যায় সকল খোদাপ্রেমিক ও খোদার প্রেমাস্পদের শত্রু হয়ে যাবে।

এছাড়া স্মরণ রাখা উচিত, পাপ সংঘটিত হয়ে গেলে ক্ষমা করে দেওয়াকেই কেবল মাগফিরাত বলা হয় না, বরং এর একটি অর্থ হলো– যে পাপ হবার সম্ভাবনা আছে সেটিকে কার্যত পাপে রূপান্তরিত হতে না দেওয়া আর এমন ধারণাও হৃদয়ে সৃষ্টি হতে না দেওয়া। এসব ভবিষ্যদ্‌বাণীতেও খোদা তা'লা বার বার সংবাদ দিয়েছেন যে, অপরিচিতির অবস্থাকে তিনি পরিচিতির অবস্থায় বদলে দেবেন। এককথায় যতই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হোক না কেন খোদা তা'লা সেসব থেকে মুক্তি দেবেন আর যেভাবে সূচনাতে ছিদ্রান্বেষণকারী ও সমালোচক ছিল জীবনের শেষ অংশেও এমনই হবে, কিন্তু খোদা এমন সুস্পষ্ট বিজয় দান করবেন যে, এসব সমালোচক ও ছিদ্রান্বেষণরীদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে বা তাদের প্রভাব থেকে মানুষ নিরাপদ থাকবে। মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো সহস্র নিদর্শন দেখলেও ততটাও সত্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয় না যতটা একজন ছিদ্রান্বেষণকারীর দুষ্কৃতিতে প্রভাবিত হয়ে অস্বীকারে প্রবৃত্ত হয়। এ কারণে খোদা এ ওহীতে এ দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলেন নি যে, আমি নিদর্শন দেখাবো বরং বলেন আমি তোমাকে এক মহান বিজয় দান করব অর্থাৎ, এমন কোনো নিদর্শন প্রদর্শন করব যা মানুষের মন জয় করবে এবং তোমার মাহাত্ম্য প্রকাশ করবে। তিনি আরো বলেন, এটি জীবনের শেষ প্রান্তে হবে। সুতরাং আমি দৃপ্তকণ্ঠে বলছি, এ ভবিষ্যদ্‌বাণী সে যুগের জন্যই। আমি দেখছি যে, সমালেচনা ও ছিদ্রান্বেষণ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই আমি আশা রাখি, অচিরেই একটি বড়ো নিদর্শন প্রকাশ পাবে যা লোকদের মন জয় করবে এবং বার বার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী হৃদয়গুলোকে পুনরায় জীবিত করবে। অতএব এর সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য।

এছাড়া এসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর সমর্থনে বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্বের

খণ্ডগুলোতে অন্যান্য ভবিষ্যদ্‌বাণীও আছে যা পঁচিশ বছর পরে এখন পূর্ণ হয়েছে আর তা হলো, আনন্দিত হও কেননা তোমার সময় সন্নিকটে আর মুহাম্মদীদের পা সুউচ্চ মিনারে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত আছে। পবিত্র মুহাম্মদ (সা.) নবীগণের সর্দার। খোদা তোমার সকল কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সমাধা করবেন আর তোমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ করবেন।

اليس الله بكافٍ عبده فبرّأه الله ممّا قالوا وكان عند الله وجيها۔ اليس الله بكافٍ عبده فلمَّا تجلّٰى ربّه للجبل جعله دكّا۔ والله موهن كيد الكافرين۔ اليس الله بكافٍ عبده ولنجعلهُ اٰية للناس ورحمةً منّا وكان امرًا مقضيّا قول الحق الّذى فيه تمترون۔ لا يُصدّق السفيه اِلّا سيفة الهلاك عدوٌّ لى وعدوٌّ لكَ قل أَتٰى امر الله فلا تستعجلوه اذا جاء نصر الله الست بربّكم قالوا بلٰى۔ بخرام کہ وقتِ تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افتاد۔ پاک محمد مصطفٰی نبیوں کا سردار۔ خدا تیرے سب کام درست کر دے گا۔ اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ هو الّذى ينزل الغيث* بعد ما قنطوا وينشر رحمته ۔يجتبى اليه من يشاء من عبادهٖ۔ وكذالك مَنَنَّا عَلٰى يوسف لنصرف عنه السُّوء والفحشاء ولتنذر قومًا مَّا اُنذر اٰباءهم فهم غافلون۔ قل عندى شهادة من الله فهل انتم مؤمنون۔ انّ مَعِى ربّى سيهدين۔ ربّ السِّجنُ احبّ الىَّ ممّا يدعوننى اليه ربِّ نجّنى من غَمِّى۔

(বারাহীনে আহমদীয়া পৃ. ৫১৬-৫৫৪ দ্রষ্টব্য)

অনুবাদ: খোদা কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অতএব তিনি সেসকল অপবাদ থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন যা তাঁর প্রতি আরোপ করা হবে আর সে খোদার নৈকট্যভাজন। খোদা কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? সুতরাং তিনি তাকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য পাহাড়কে সাক্ষী হিসেবে আনবেন। পাহাড়ে যখন তাঁর জ্যোতির্বিকাশ ঘটবে তখন তিনি সেটিকে টুকরো টুকরো করে দেবেন আর সেই নিদর্শনের মাধ্যমে শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবেন। তিনি কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অর্থাৎ খোদার নিদর্শন যথেষ্ট, অন্য কারো সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। পাহাড় টুকরো টুকরো করাকে আমরা মানুষের জন্য একটি নিদর্শনস্বরূপ উপস্থাপন করব আর আমাদের এ নিদর্শন রহমতের

---

* **টীকা:** বারাহীনে আহমদীয়া ৪র্থ খণ্ডের ৬৬১ নম্বর পৃষ্ঠায় এ স্থলে 'মিন' শব্দটিও বিদ্যমান।

কারণ হবে। অনেকেই এ থেকে উপকৃত হবে* আর এ বিষয়টি পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। এটি সেই সত্য কথা যা প্রকাশিত হবার পূর্বে তোমরা সন্দেহে লিপ্ত ছিলে। নীচ লোক মৃত্যুর নিদর্শন ছাড়া অন্য কোনো নিদর্শনকেই স্বীকার করে না। সে তোমার ও আমার শত্রু। এসব হীনদের বলে দাও মৃত্যুর নিদর্শনও প্রকাশ পাবে। পৃথিবীতে মহামারি দেখা দেবে সুতরাং আমার কাছে তড়িঘড়ি করে এসব কামনা কোরো না। এসব কিছু যথাসময়ে প্রকাশ পাবে। এ ভবিষ্যদ্‌বাণীটি প্লেগ ও ভয়াবহ ভূমিকম্প-সংক্রান্ত যা আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় ছেপে গেছে। এরপর খোদা তা'লা বলেন, যখন** আমি ভীতিপ্রদ ও ধ্বংসাত্মক নিদর্শন ধরাপৃষ্ঠে প্রেরণ করে স্বীয় প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিতকে সাহায্য করব তখন অস্বীকারকারীদের বলা হবে, এখন বলো আমি কি তোমাদের প্রভু নই? অর্থাৎ সে দিনগুলো বড়ো কঠিন ও বিপজ্জনক দিন হবে এবং সে দিনগুলোতে বড়ো বড়ো ভীতিপ্রদ নিদর্শন প্রকাশ পাবে। এসব নিদর্শন দেখে অনেক কুৎসিত হৃদয়ের লোক ও বক্র প্রকৃতির

---

* **টীকা:** স্মরণ রাখা উচিত বারাহীনে আহমদীয়ায় ঐশীবাণীর যে অনুবাদ রয়েছে তা সময়ের পূর্বে করার কারণে কোনো কোনো স্থানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে অর্থ করা হয়েছে আর কোনো স্থানে যৌক্তিক কারণে কোনো কোনো শব্দের আক্ষরিক অর্থ এড়ানো হয়েছে অর্থাৎ, আক্ষরিক অর্থ করা হয় নি। যেহেতু খোদার বাণী বা মূল এলহাম বিদ্যমান রয়েছে তাই পাঠকের উচিত এমন ব্যাখ্যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা যা ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকাশিত হবার পূর্বে করা হয়েছে বরং উচিত হবে এটিকে ব্যাখ্যাগত ভ্রান্তি মনে করা, কেননা ভবিষ্যদ্‌বাণীর সত্যিকার তফসীর করার সময় সেটি হয়ে থাকে যখন উক্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয়। –লেখক

** **টীকা:** এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সেই সকল লোকের সম্পর্কে যারা এই প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত ব্যক্তির ওহীকে মানুষের বানোয়াট বা শয়তানের কুমন্ত্রণা মনে করে এবং বিশ্বাস করে না যে তিনি আমাদের সেই আল্লাহ্, যিনি বারাহীন আহমদীয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই লেখকের উপর তাঁর ওহী অবতীর্ণ করে চলেছেন। এই আয়াতে আল্লাহ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে মানিয়ে ছাড়ব। তাদেরকে স্বীকার করতে হবে, যিনি বারাহীনে আহমদীয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই লেখকের প্রতি ওহী করে এসেছেন, তিনিই এই পৃথিবীর খোদা। তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। এতে এই ইঙ্গিতও বিদ্যমান যে, কোনো মহান নিদর্শন প্রকাশিত হবে, যার কারণে বড়ো বড়ো অস্বীকারকারীদের মাথা ঝুঁকে যাবে। –লেখক

মানুষ সত্যের দিকে ফিরে আসবে আর তাদের মাঝে যে প্রত্যাদিষ্ট এসেছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এরপর মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদা উল্লিখিত ওহীতে আমাকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি উৎফুল্ল ও প্রফুল্ল চিত্তে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করো কেননা তোমার সময় সন্নিকটবর্তী আর মুহাম্মদীদের পা এক দৃঢ় ও সুউচ্চ মিনারে অধিষ্ঠিত। মুহাম্মদী বলতে এ জামা'তের মুসলমানদের বুঝায় কেননা বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারে অন্যান্য ফিরকার মুসলমানরা ক্রমশ অধঃপাতে যাবে। একই অবস্থা ইসলাম বহির্ভূত দলগুলোরও হবে যেমনটি কিনা খোদা তা'লা স্বীয় ওহীতে স্পষ্টভাবে বলেন যা বারাহীনে আহমদীয়ায় উল্লিখিত আছে যে,

يا عيسٰى انّى متوفيك ورافعك الىّ ومطهّرك من الّذين كفروا* وجاعل الّذين اتّبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة۔

অর্থাৎ, হে ঈসা আমি তোমাকে মৃত্যু দেবো এবং আমার দিকে উঠাবো আর তোমার দায়মুক্তির প্রমাণ দেবো এবং যারা তোমার অনুসারী আমি তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত তোমার অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করব। এখানে এ ওহীতে ঈসা বলতে আমাকে বোঝানো হয়েছে আর অনুসারী হলো আমার জামা'ত। কুরআন শরীফে হযরত ঈসা সম্পর্কে এ ভবিষ্যদ্‌বাণী বিদ্যমান রয়েছে আর পরাজিত জাতি বলতে সেক্ষেত্রে ইহুদীদের বুঝিয়েছে যাদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত কমতে থাকে। সুতরাং এ আয়াত পুনরায় আমার জন্য ও আমার জামা'তের জন্য অবতীর্ণ করা একথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, যারা এ জামা'তের বাইরে তাদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত হ্রাস পাবে আর মুসলমানদের সকল ফিরকা যারা এ জামা'তের বাইরে রয়েছে তারা ধীরে ধীরে এ জামা'তে প্রবেশ করবে বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যেভাবে ইহুদীদের সংখ্যা কমতে কমতে এমন হয়েছে যে খুব কমই রয়ে গেছে, একই অবস্থা এ জামা'তের বিরোধীদেরও হবে। এ জামা'তের মানুষ তাদের সংখ্যা ও ধর্মীয় শক্তির নিরিখে সবার বিরুদ্ধে

---

* **টীকা:** এই বাক্যটি লিপিকারের ভুলে বারাহীন থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল, যার অর্থ হলো– অস্বীকারকারীদের প্রতিটি অভিযোগ ও অপবাদ থেকে তোমাকে পবিত্র প্রমাণ করব। এই এলহাম বেশ কয়েকবার হয়েছে। –লেখক

বিজয় লাভ করবে। এ ভবিষ্যদ্‌বাণী অসাধারণভাবে পূর্ণতা লাভ করছে। কেননা বারাহীনে আহমদীয়ায় যখন এ ভবিষ্যদ্‌বাণী ছেপে ছিল তখন আমার অপরিচিতির চিত্র এমন ছিল যে, একজনও বলতে পারবে না সে আমার অনুসারী ছিল। এখন খোদা তা'লার কৃপায় এ জামা'তের সদস্য সংখ্যা কয়েক লক্ষে উপনীত হয়েছে। এই জামা'তের ব্যাপক উন্নতির কারণ সেই ঐশ্বরিক বিপদাবলি যা এদেশকে মৃত্যুর গ্রাসে পরিণত করছে।

এরপর ওহীর অবশিষ্ট অংশ হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র নবীকুলের সর্দার। এরপর বলেন, খোদা তোমার সকল কাজ সুসম্পন্ন করবেন এবং তোমার সকল লক্ষ্য পূর্ণ করবেন। স্পষ্ট থাকা উচিত যে, এসব ভবিষ্যদ্‌বাণী অতি উন্নত মানের কেননা এগুলো এমন সময়ে করা হয়েছে যখন কোনোকিছুই সঠিক এবং সুবিন্যস্ত ছিল না এবং সকল লক্ষ্য ছিল অপূর্ণ। এখন পঁচিশ বছর পর এ যুগে এত লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে যা গণনা করে শেষ করা কঠিন। খোদা এ বিরাণভূমি অর্থাৎ কাদিয়ানকে বিভিন্ন দেশের মিলনমেলা বানিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ, সকল দেশের লোক এখানে এসে একত্রিত হয় আর সে কাজ করে দেখিয়েছেন যা সম্পর্কে যুক্তির নিরিখে বলা সম্ভব ছিল না যে তা হয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাকে গ্রহণ করেছে আর এ দেশের সর্বত্র আমাদের জামা'ত বিস্তার লাভ করেছে। শুধু এখানেই নয়, বরং আরব, সিরিয়া, মিশর, তুরস্ক, পারস্য, আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে এ বীজ বপন করা হয়েছে আর এসব দেশের অনেকেই এ জামা'তভুক্ত হয়েছে। আশা করা যায়, সে সময় আসছে বরং সন্নিকটে, উল্লিখিত দেশগুলোর মানুষও এ ঐশী জ্যোতি থেকে পরিপূর্ণভাবে লাভবান হবে। নির্বোধ শত্রুদল যাদেরকে মৌলবি আখ্যায়িত করা হতো, তাদের কোমর ভেঙে গেছে আর তারা ঐশী অভিপ্রায়কে নিজেদের প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত করতে পারে নি আর তারা এ জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করার বিষয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছে। তারা যে-সকল কাজকে ব্যর্থ করতে চাইত সেসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়েছে। সুতরাং সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর।

এরপর খোদা তা'লা পরবর্তী যুগের লোকদের অযথা সব অপবাদ সম্পর্কে একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্‌বাণী করে আমাকে ইউসুফ আখ্যায়িত করেছেন। যেমন- তিনি বলেন,

هو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته يجتبى اليه من يشاء من عبادهٖ وكذالك منّا علٰى يوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء ولتنذر قومًا مّا اُنذر اٰباءهم فهم غافلون۔ قل عندى شهادة من الله فهل انتم مؤمنون انّ معى ربّى سيهدين ۔ ربّ السجن احبّ الىّ ممّا يدعوننى اليه ۔ ربّ نجّنى من غمّى۔

এসব আয়াত যা বারাহীনে আহমদীয়ার ৫১৬-৫৫৪ তে লিপিবদ্ধ রয়েছে; আমি কিছুটা পূর্বেও লিখে এসেছি কিন্তু কথা স্পষ্ট করার জন্য পুনরায় এ স্থানে লেখা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যদ্‌বাণীর অর্থ বুঝতে কোনো সমস্যা না হয়। আল্লাহ তা'লার এই ওহীর অনুবাদ হলো, খোদা তিনি যিনি তখন বৃষ্টি বর্ষণ করেন যখন মানুষ বৃষ্টি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যায়। নৈরাশ্যের পর তিনি স্বীয় কৃপা বিস্তৃত করেন আর নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে পছন্দ করেন নবুওয়ত ও রিসালতের জন্য মনোনীত করেন। এভাবে আমরা এ ইউসুফের প্রতিও অনুগ্রহ করেছি যেন সেসব মন্দ ও অশ্লীলতাপূর্ণ কথাগুলোকে প্রতিহত ও দূরীভূত করতে পারি যা তার প্রতি অপবাদস্বরূপ আরোপ করা হবে। অর্থাৎ, নবী ও রসূলদের প্রতি যখন কোনো অপবাদ আরোপ করা হয় তখন খোদার নিয়ম হলো,

প্রথমে সেই ছিদ্রান্বেষণকারী, সমালোচনাকারী ও কুধারণা পোষণকারীদের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করেন, যেন তারা যাচ্ছেতাই অপলাপ করতে পারে আর ইচ্ছেমতো অপবাদ আরোপ করতে পারে। অতএব তারা মহা আনন্দের সাথে আক্রমণ করে আর নিজেদের আক্রমণের ওপর অনেক ভরসা করে। এমনকি সত্যবাদীদের জামা'ত এরূপ আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত হয় আর মানবীয় দুর্বলতার কারণে ঐশী কৃপাবারি যে এই প্রতারণামূলক কলঙ্ককে দূরীভূত করতে পারে সে বিষয়ে তারা আশাহত হয়। অপরদিকে খোদা তা'লার রীতি হলো, তিনি কৃপাবারি বর্ষণ করেন আর স্বীয় কৃপার গণ্ডিও বিস্তৃত করেন, কিন্তু প্রথমে কিছু কাল পর্যন্ত লোকদের ঈমানের পরীক্ষা নেবার জন্য তাদের নৈরাশ্যের দোলাচলে দোদুল্যমান রাখেন। অতএব খোদার নবী ও প্রেরিতদের প্রতি যারা ঈমান আনে তাদের এভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়। দুষ্ট লোকদের পক্ষ থেকে খোদার নবীদের ওপর অনেক অন্যায় হামলা করা হয়ে থাকে এমনকি তাদের দুষ্কৃতকারী ও পাপাচারী আখ্যায়িত করা হয়। খোদা তা'লার রীতি হলো তিনি আপত্তিকারীদের আপত্তি করার যথেষ্ট সুযোগ দেন আর তারা নিজেদের ছিদ্রান্বেষণ ও সমালোচনামূলক কার্যকলাপকে অনেক শক্তিশালী মনে করা

আরম্ভ করে দেয় আর সেগুলো নিয়ে উৎফুল্ল হয় ও গর্ব করে। পক্ষান্তরে সেসব কথার কারণে মুমিনদের হৃদয়ে বড়ো আঘাত লাগে আর তাদের মনোবল হারিয়ে যায়। তাদের কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত করা হয়, অতঃপর খোদার কৃপাবারি বর্ষিত হয় এবং তা সকল অপবাদ ধুয়ে মুছে দেয়। তিনি স্বীয় নবীদের মনোনীত ও নির্বাচিত হবার বিষয়ের যথার্থতা প্রমাণ করেন। এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর সারকথা হলো, এভাবে আমরা এ ইউসুফের নির্দোষ হওয়া প্রমাণ করব। প্রধানত দুষ্কৃতকারীরা তার প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ করবে যেভাবে ইয়াকূবের পুত্র ইউসুফের ওপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল, কিন্তু অবশেষে খোদা তাকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য এক ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়েছেন আর সেই সাক্ষ্য ইউসুফকে সেই অপবাদ হতে মুক্ত করেছে। অতএব খোদা বলছেন, এখানেও আমি এমনই করব যেমনটি কিনা তিনি বলেছেন,

قل عندی شهادةٌ من الله فهل انتم مؤمنون۔ ان معی ربّی سیهدین۔

অর্থাৎ হে ইউসুফ! যারা তোমার প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাদের বলে দাও, আমার দোষমুক্ত হবার ব্যাপারে আমার কাছে খোদা তা'লার সাক্ষ্য রয়েছে; সুতরাং তোমরা কি সে সাক্ষ্য গ্রহণ করবে নাকি করবে না? তাদেরকে এ-ও বলে দাও, আমি তোমাদের কোনো অপবাদে অভিযুক্ত হতে পারি না, কেননা আমার সাথে আমার খোদা আছেন। তিনি আমাকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য কোনো না কোনো পথ বের করবেন।* স্মরণ রাখা উচিত, যখন ইয়াকূবের পুত্র ইউসুফের প্রতি জুলেখা অন্যায় অপবাদ আরোপ করেছিল সেই ঘটনা সম্পর্কে খোদা তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

---

* **টীকা:** এই আয়াত অর্থাৎ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (সূরা আশ-শুআরা: ৬৩) যার অনুবাদ হলো, আমার সাথে আমার প্রভু রয়েছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে মুক্তির কোনো পথ দেখাবেন। এটি কুরআন শরীফে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনিতে তখন বর্ণিত হয়েছে, যখন ফেরাউন তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল আর বনী ইসরাইল যখন ভেবেছিল যে, তারা এখন ধরা পড়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা ইঙ্গিত করেন যে, এই জামা'তেও এমন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি থাকবে যাদের সান্ত্বনার জন্য বলা হবে, ভয় পেয়ো না! আল্লাহ তোমাদেরকে সেসব অপবাদ থেকে মুক্তি লাভের একটি পথ দেখাবেন যেমনটি তিনি ইয়াকূবের পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখিয়েছিলেন, যখন এক চতুর নারী নিজেই প্রথমে সুযোগ নিয়ে ইউসুফের বিরুদ্ধে অবাস্তব কথা তার স্বামীকে বলেছিল। –লেখক

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا

(ইউসুফ: ২৭)

অর্থাৎ জুলেখার কাছের কোনো লোক ইউসুফের নির্দোষ হবার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে, কিন্তু এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, তিনি স্বয়ং এ ইউসুফের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। এর চেয়ে বড়ো সাক্ষ্য আর কী হবে যে আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে খোদা তালা সেসব অপবাদের সংবাদ দিয়েছিলেন যা সীমালঙ্ঘনকারী ও দুষ্কৃতকারীরা আমার প্রতি আরোপ করে থাকে। ইয়াকূবের পুত্র ইউসুফের অনুকূলে কেবল একজন মানুষ সাক্ষ্য প্রদান করেছে, কিন্তু আমার জন্য খোদা নিজে সাক্ষ্য দেওয়া পছন্দ করেছেন। আর ইয়াকূবের পুত্র ইউসুফের প্রতি অপবাদ আরোপের জন্য একজন মহিলা ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু আমার ওপর তারা অপবাদ আরোপ করে যারা নারীর চেয়েও হীন আর اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ (ইউসুফ: ২৯)-এর সত্যায়নকারী। এ ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ অংশ হলো–

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ۔

(ইউসুফ: ৩৪)

অর্থাৎ হে আমার খোদা! এসব নারী আমার কাছে যার প্রত্যাশা রাখে সেসব বিষয় হতে আমার কাছে কারাগারই প্রিয়।

সারকথা হলো, কোনো নারী এমন বাসনা রাখলে আমি এ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বন্দি হওয়া বেশি পছন্দ করি। এটি ইয়াকূবের পুত্র ইউসুফের দোয়া ছিল যে কারণে তিনি বন্দি হয়েছেন আর আমার উক্তিও এটিই যা খোদা তা'লা আজ হতে ২৫ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখে দিয়েছেন। একমাত্র পার্থক্য হলো, ইয়াকূবের পুত্র ইউসুফ নিজের এ দোয়ার কারণে বন্দি হয়ে গেছেন, কিন্তু খোদা বারাহীনে আহমদীয়ার ৫১০ নম্বর পৃষ্ঠায় আমার সম্পর্কে বলেন,

يعصمك الله من عنده وان لم يعصمك النّاس ۔

অর্থাৎ, মানুষ তোমাকে ফাঁসানোর বিষয়ে সচেষ্ট হলেও খোদা তোমাকে নিজেই রক্ষা করবেন। অতএব এমনই হয়েছে। অর্থাৎ করম দীন নামের এক ব্যক্তির দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলায় এক হিন্দু ম্যাজিস্ট্রেট-এর আমাকে কারাদণ্ড দেবার দুরভিসন্ধি ছিল, কিন্তু খোদা তা'লা কোনো অদৃশ্য উপায়ে তার

হৃদয়কে এ অভিসন্ধি চরিতার্থ করা হতে বিরত রাখেন আর এটিও প্রকাশ করেন যে, সে অবশেষে শাস্তি দেবার বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে। সুতরাং এ উম্মতের ইউসুফ অর্থাৎ, এ অধম ইসরাঈলী ইউসুফ থেকে বড়ো কেননা এ অধম কারাগারে যাবার দোয়া করেও কারাদণ্ড থেকে রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু ইয়াকূবের পুত্র ইউসুফকে কারাগারে আটক করা হয়েছে। এ উম্মতের ইউসুফের জন্য খোদা তা'লা আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে সাক্ষ্য দিয়েছেন এছাড়াও অনেক নিদর্শন দেখিয়েছেন, কিন্তু ইয়াকূবের পুত্র ইউসুফ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য মানবীয় সাক্ষ্যের মুখাপেক্ষী হয়েছেন। এসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর সাক্ষ্যের পর ভয়াবহ ভূমিকম্পও সাক্ষ্য দিয়েছে, এগারো মাস পূর্বেই সে বিষয়ে আমি খবর দিয়েছিলাম। কেননা ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণীর সাথে খোদার পক্ষ থেকে قل عندی شهادة من الله فهل انتم مؤمنون۔ ওহীও হয়েছিল।* অতএব এ হলো দুটো সাক্ষী, আর জানা নেই এরপর কত সাক্ষী রয়েছে।

বস্তুত সে খোদা– যিনি কুধারণা পোষণকারীদের নোংরা ধ্যানধারণা সম্পর্কেও অবগত তিনি আমাকে ইউসুফ আখ্যা দিয়ে আর আমার সম্পর্কে আমার ভাষায় ইউসুফের সে কথা উদ্ধৃত করিয়ে যা সূরা ইউসুফে অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ,

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَیَّ مِمَّا یَدْعُوْنَنِیْٓ اِلَیْهِ۔

তিনি আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থা মানুষের সামনে প্রকাশ করার জন্য ভবিষ্যৎ যুগ সম্পর্কে একটি সংবাদ দিয়েছেন। যদিও আমার এ অভ্যাস নেই আর প্রকৃতিগতভাবে মানুষের সামনে আমার হৃদয়ের পবিত্রতা প্রকাশ করাকে আমি ঘৃণা করি বরং ইউসুফের মতো আমার কথাও অভিন্ন আর তা হলো,

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِیْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیْ

কিন্তু খোদার স্নেহ ও দয়া আমি কীভাবে গোপন করব আর তা কীভাবে

---

* **টীকা:** এই স্থানে আল্লাহ তা'লার قل عندی شهادة من الله فهل انتم مؤمنون۔ বলা, অর্থাৎ তুমি বলো, আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সাক্ষ্য রয়েছে, যা মানুষের সাক্ষ্যের ওপর প্রধান্য রাখে। সেই সাক্ষ্য হলো আল্লাহ বহু আগেই এই মিথ্যা অপবাদগুলোর বিষয়ে সংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন। –লেখক

লুকিয়ে রাখব। তাঁর স্নেহ ও দয়া এত বেশি যে, আমার পক্ষে গণনা করা সম্ভব নয়। কত বিস্ময়কর দয়া প্রদর্শন করেছেন! যখন কুধারণা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এমন যুগে খোদা আমার জন্য ভীতিপ্রদ নিদর্শন প্রদর্শন করেন। যেমন চিন্তা করো, সেই ভয়াবহ ভূমিকম্প– যার বিষয়ে আমাকে ১৯০৪ সনের ৩১ মে তারিখে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সহস্র সহস্র মানুষকে নিমিষেই ধ্বংস করে দিয়েছে আর পাহাড়গুলোকে গুহাসদৃশ বানিয়ে দিয়েছে- তা যে সংঘটিত হবে তা কে জানত? কোন জ্যোতিষী আমার পূর্বে এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছে? খোদাই ছিলেন যিনি প্রায় এক বছর পূর্বে এ সংবাদ দিয়েছেন। তখন লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে তা প্রচার করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি নিদর্শনস্বরূপ এ ভূমিকম্প প্রকাশ করব যেন পুণ্যবানদের চোখ খুলে। কিন্তু আমার মতে বারাহীনে আহমদীয়ার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো এর চেয়ে কম নয় যাতে এ ভয়াবহ ভূমিকম্পের সংবাদও রয়েছে। আর ইউসুফ আখ্যা দেওয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে এ যুগের নোংরা সব আক্রমণের সংবাদ দিয়েছে। এগুলো সেসব নোংরা আক্রমণ যা নির্বোধ বিরোধীদের শেষ অস্ত্র আর এরপর রয়েছে সিদ্ধান্তের দিন। আর যেমনটি কিনা আমি বর্ণনা করেছি যে, এক্ষেত্রে খোদা তা'লার قل عندی شهادة من الله فهل انتم مؤمنون বাক্য বলা সেই সাক্ষ্য হতে বেশি শক্তিশালী যা সূরা ইউসুফের وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا (ইউসুফ: ২৭) আয়াতে স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ খোদার সাক্ষ্য ও মানুষের সাক্ষ্য সমান হতে পারে না। সুতরাং সেই সাক্ষ্যটি হলো, সেই সত্তা যিনি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত, তিনি আজ হতে পঁচিশ বছর পূর্বে আমাকে ইউসুফ আখ্যা দিয়ে তাঁর ঘটনাবলি আমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেন আর এমন বিশেষত্বপূর্ণ শব্দ বর্ণনা করেন যার মাধ্যমে সত্য প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন তাঁর আমার পক্ষ থেকে

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَیَّ مِمَّا یَدْعُوْنَنِیْٓ اِلَیْهِ۔

বলা প্রকাশ করছে যে, এটি কোনো ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত। যেহেতু ইউসুফও দুষ্কৃতকারীদের কুধারণা থেকে রক্ষা পান নি তাই এমন লোক যারা আমার সম্পর্কে কুধারণা রাখে তাদের জন্যও পরিতাপ করা বৃথা। প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে আমার ওপর আক্রমণ করে সে জ্বলন্ত অগ্নিতে হাত দেয় কেননা তা আমার ওপর নয়, বরং তাঁর ওপর আক্রমণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন,

اِنِّیْ مھینٌ من اراد اھانتك۔

অর্থাৎ আমি তাকে লাঞ্ছিত করব– যে তোমাকে অপদস্থ করতে চায় আর এমন ব্যক্তি খোদা তা'লার দৃষ্টি এড়াতে পারবে না।* একথা ভেব না যে, তিনি আমার জন্য নিদর্শন দেখানো বন্ধ করে দেবেন। না, বরং তিনি নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখাবেন আর আমার জন্য সেসব সাক্ষ্য প্রদান করবেন যার মাধ্যমে ভূমি পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি ভীতিপ্রদ নিদর্শন দেখাবেন আর ভীতিকর কাজ করবেন। তিনি দীর্ঘদিন সেসব অবস্থা লক্ষ করেছেন আর ধৈর্য ধরেছেন, কিন্তু এখন তিনি সেই মেঘের ন্যায় গর্জন করবেন যা আকাশে গর্জন করে আর দুষ্কৃতকারীদের ওপর স্বীয় বজ্রপাতের আযাব নিপতিত করবেন। সেসব দুষ্কৃতকারী যারা তাকে ভয় করে না আর দাম্ভিকতায় সীমাতিক্রম করে তারা নিজেদের নোংরা ধ্যানধারণা ও অপকর্মকে মানুষের কাছে গোপন করে, কিন্তু খোদা তা দেখেন। দুষ্কৃতকারী মানুষ কি খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হতে পারে? তারা কি তাঁর সাথে লড়াই করে বিজয়ী হতে পারে?

খোদা যে আমাকে ইউসুফ আখ্যা দিয়ে قل عندی شھادۃ من اللہ فھل انتم مؤمنون বলেছেন, এর অর্থ হলো, তুমি এদের বলে দাও আমার কাছে খোদার সাক্ষ্য আছে যা মানুষের সাক্ষ্যের ওপর প্রাধান্য রাখে। সুতরাং তোমরা সে সাক্ষ্য মানবে কিনা? এ বাক্যের অর্থ হলো, হে দুষ্কৃতকারীর দল! হে অপবাদ আরোপকারীর দল! তোমরা যদি খোদার এ সাক্ষ্যকে গ্রহণ না করো যা তিনি আজ হতে পঁচিশ বছর পূর্বে প্রদান করেছেন তাহলে খোদা অন্য কোনো এরূপ নিদর্শনের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেবেন যার কারণে তোমরা এক কঠিন পরিস্থিতিতে নিপতিত হবে। তখন ক্রন্দন ও দন্তপেষণ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। অতএব আমি দেখছি যে, খোদার অন্যান্য সাক্ষ্য প্রদানও আরম্ভ হয়ে গেছে। আমাকে খোদা স্বীয় এলহামে এ সংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি তির ছুড়বে আমি সেই তিরের মাধ্যমে তাকে ধ্বংস করব। আর খোদার এ ওহীতে আমাকে যে ইউসুফ আখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে একটি বাক্য

---

* **টীকা:** এই আয়াত অর্থাৎ اِنَّ مَعِیَ رَبِّیْ سَیَھْدِیْنِ (আশ-শুআরা: ৬৩) ডঙ্কার চোটে ঘোষণা করছে যে, ফেরাউনী স্বভাবের লোকেরা তাদের মিথ্যা অপবাদ নিয়ে গর্ব করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাকে অবশ্যই মুক্তি দেবেন। এরপর আক্রমণকারীদের সামনে এমন এক সমুদ্র রয়েছে যাতে তারা ধ্বংস হবে। –লেখক

ولتنذر قومًا ما انذر اٰباءهم فهم غافلون- ও রয়েছে। প্রথম আয়াতকে সাথে যুক্ত করলে এ আয়াতের অর্থ হবে, আমরা এ ইউসুফের ওপর এ অনুগ্রহ করেছি অর্থাৎ নিজেই তার নির্দোষ হবার সাক্ষ্য দিয়েছি যেন সেই পাপ ও নির্লজ্জতা যা তার প্রতি আরোপ করা হবে তা তার ওপর থেকে দূরীভূত ও প্রতিহত করতে পারি। আমরা এটি এজন্য করব যেন সতর্ক করা যায় এবং তবলীগের কাজে যেন কোনো বাধা না আসে। কেননা খোদার রসূল, নবী ও প্রত্যাদিষ্টদের ওপর এই অন্ধজগৎ যে-সকল অপবাদ আরোপ করে থাকে তা যদি প্রতিহত করা না হয় তাহলে এর মাধ্যমে তবলীগ ও সতর্ক করার কাজ গতি হারিয়ে বসে, বরং থেমে যায় এবং তাদের কথা হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে না। আর যৌক্তিক উত্তর ভালোভাবে হৃদয়ের মরিচা দূর করতে পারে না। এর ফলে আশঙ্কা দেখা দেয় যে, কোথাও মানুষ তাদের কুধারণার কারণে ধ্বংস না হয়ে যায় এবং দোযখের ইন্ধন না হয়ে যায়। সুতরাং সেই খোদা যিনি দয়ালু ও কৃপালু, যিনি স্বীয় সৃষ্টিকে নষ্ট করতে চান না, তিনি নিজের অসাধারণ নিদর্শনাবলির মাধ্যমে নিজের নবীদের স্বচ্ছতা আর মনোনীত ও নির্বাচিত হবার সাক্ষ্য দেন। যে ব্যক্তি এসব সাক্ষ্য দেখেও নিজের কুধারণা হতে বিরত হয় না তার ধ্বংস হওয়া দেখে খোদা আদৌ ভ্রূক্ষেপ করেন না। খোদা তার শত্রু হয়ে যান, যে তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। দুষ্কৃতকারী মনে করে আমার ষড়যন্ত্র পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, কিন্তু খোদা বলেন, হে নির্বোধ! তোমার ষড়যন্ত্র কি আমার পরিকল্পনা থেকেও বেশি শক্তিশালী? আমি তোমার হাতকে তোমার লাঞ্ছনার কারণ বানিয়ে ছাড়ব আর তোমাকে তোমার বন্ধুদের সামনে লাঞ্ছিত করে দেখাব। এখানে আমাকে ইউসুফ আখ্যা দেবার পেছনে আরো একটি রহস্য আছে আর তা হলো ইউসুফ মিশরে পৌঁছে বেশ কয়েক ধরনের অসম্মানের সম্মুখীন হয়েছেন যা তাঁর পদমর্যাদার উন্নতির একটি ভিত্তি ছিল। কিন্তু প্রথমদিকে তিনি নির্বোধদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত হয়ে গিয়েছিলেন আর অবশেষে খোদা তাঁকে সম্মানিত করে সে দেশের বাদশা বানিয়ে দিয়েছেন। একই লোকদের যারা তাকে দাস হবার খোঁটাও দিত দুর্ভিক্ষের দিনে তাঁর দাসতুল্য বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব খোদা তা'লা আমাকে ইউসুফ আখ্যা দিয়ে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানেও আমি এমনই করব। ইসলাম ও ইসলাম-বহির্ভূত জগতে আধ্যাত্মিক খাদ্যের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করব আর আধ্যাত্মিক জীবন সন্ধানীরা এ জামা'ত ছাড়া কোনো স্থানে

প্রশান্তি খুঁজে পাবে না। সকল ফিরকা হতে আধ্যাত্মিক কল্যাণ তুলে নেওয়া হবে। খোদার এই বান্দাকে সকল নিদর্শনরূপী পুরস্কার প্রদান করা হবে। সুতরাং যারা এই আধ্যাত্মিক মৃত্যু হতে রক্ষা পেতে চাইবে তারা খোদার এই মহান বান্দার কাছে ফিরে আসবে। ইউসুফের ন্যায় আমাকে এ সম্মান সেই অসম্মানের বিনিময়ে দেওয়া হবে বরং দেওয়া হয়েছে, যে অসম্মানকে বর্তমানে নির্বোধরা চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে। যদিও আমি পৃথিবীতে রাজত্ব করার জন্য আসি নি, কিন্তু আমার জন্য স্বর্গে রাজত্ব রয়েছে যা জগদ্‌বাসী দেখতে পায় না। খোদা আমাকে অবগত করেছেন যে, পরিশেষে বড়ো বড়ো নৈরাজ্যবাদী ও দুষ্কৃতকারী তোমাকে চিনতে পারবে যেমনটি কিনা তিনি বলেন,

يَخِرُّون عَلَى الْاَذْقان سُجَّدًا۔ ربّنا اغفرلنا انا كنا خاطئين۔ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الرّاحمين *

আর আমি দিব্যদর্শনে দেখেছি যে, ভূমি আমার সাথে কথা বলেছে আর বলেছে, يا ولى الله كُنْتُ لا اَعْرِفك۔ অর্থাৎ হে ওলীউল্লাহ! আমি তোমাকে ইতিপূর্বে চিনতাম না। এখানে ভূমি বা দেশ বলতে ভূমির অধিবাসীদের বোঝায়। কল্যাণমণ্ডিত সে যে ভীতিকর দিন আসার পূর্বে আমাকে গ্রহণ করবে, কেননা সে নিরাপত্তা বেষ্টনিতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে জোরালো নিদর্শনাবলি প্রকাশিত হবার পর আমাকে গ্রহণ করবে তার ঈমান কণা পরিমাণ মূল্যও রাখে না।

اکنوں ہزار عُذر بیارے گناہ را مرشوئے کردہ را نبود زیب دخترے

নিজের পাপের জন্য তুমি হয়ত হাজার অজুহাত দেখাতে পারো
কিন্তু বিবাহিত নারীর কুমারী হবার দাবি মানায় না

---

* **টীকা:** তারা পরম অনুশোচনা বা গভীর লজ্জার সাথে সিজদাবনত হয়ে বলবে, হে আমাদের প্রভু, আমরা অপরাধী ছিলাম, আমরা পাপাচার করেছিলাম। আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, কারণ তোমরা ঈমান এনেছ। আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন, কেননা তিনি পরম করুণাময়। এই স্থানেও আল্লাহ তা'লা 'তাসরীব' শব্দের মাধ্যমে আমাকে ইউসুফ আখ্যায়িত করেছেন। –লেখক

উল্লিখিত ভবিষ্যদ্‌বাণীর সমর্থনে বারাহীনে আহমদীয়ায় অন্যান্য ভবিষ্যদ্‌বাণীও লিপিবদ্ধ রয়েছে, যেমনটি কিনা আল্লাহ তা'লা বলেন,

هو شعنا نَعْسا

I Love You, I Shall give you a large party of Islam.

ثلّة من الاولين وثلّة من الاٰخرين۔

আমি আমার ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করব, আমার শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমাকে উত্থিত করব। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং জোরালো সব আক্রমণের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন।

الفتنة ھٰھنا فاصبر کما صبر اولو العزم ۔ یا داود عامل بالناس رفقًا واحسانًا وامّا بنعمة ربّك فحدّث۔ اشکر نعمتی رئیت خدیجتی۔ انك الیوم لذو حظٍ عظیم۔ ما ودّعك ربّك وما قلٰی۔ الم نشرح لك صدرك۔ الم نجعل لك سھولةً فی کلّ امر۔ بیت الفکر وبیت الذکر ومن دخلہ کان اٰمنا۔ مبارك و مبارك وکل امرٍ مبارك یجعل فیہ۔ یریدون ان یطفئُوا نور اللّٰہ قل اللّٰہ حافظہ۔ عنایة اللّٰہ حافظك۔ نحن نزّلناہ وانا لہ لحافظون۔ اللّٰہ خیر حافظا وھو ارحم الراحمین۔ ویُخوّفونك من دونہ ائمّة الکفر۔ لا تخف انك انت الاعلٰی۔ ینصرك اللّٰہ فی مواطن۔ کتب اللّٰہ لأَغلبن انا ورسلی۔ اعمل ماشئت فانی قد غفرت لك۔ انت منّی بمنزلة لا یعلمھا الخلق۔ وقالوا ان ھو الّا افك افترٰی۔ وما سمعنا بھٰذا فی اٰبائنا الاولین۔ ولقد کرمنا بنی اٰدم و فَضَّلنا بعضھم علٰی بعض۔ اجتبیناھم واصطفیناھم کذالك لیکون اٰیةً للمؤمنین۔ ام حسبتم انّ اصحابَ الکھف والرقیم کانوا من اٰیاتنا عجبًا۔ قل ھو اللّٰہ عجیب۔ کلّ یوم ھو فی شان ففھّمناھا سلیمان۔ وجحدوا بھا واستیقنتھا انفسھم ظلمًا وعلوّا۔ قل جاءکم نورٌ من اللّٰہ فلا تکفروا ان کنتم مؤمنین۔ سلام علٰی ابراھیم۔ صافیناہ ونجیناہ من الغم۔ تفردنا* بذالك ۔ فاتخذوا من مقام ابراھیم مُصلًّی۔

(দেখুন! বারাহীনে আহমদীয়া, পৃ. ৫৫৬-৫৬১)

অনুবাদ: হে খোদা! আমি দোয়া করছি, তুমি আমাকে মুক্তি দাও। সমস্যাবলি থেকে পরিত্রাণ দাও। আমরা পরিত্রাণ দিয়েছি। এ বাক্য দুটি হিব্রু

ভাষায় আর এটি একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী যা দোয়ার আকারে পূর্ণতা লাভ করেছে। এরপর দোয়া গৃহীত হবার বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে আর এর সারকথা হলো, বর্তমান সমস্যাবলি অর্থাৎ একাকীত্ব, অসহায়ত্ব, নিঃস্বতা ইত্যাদি ভবিষ্যতে কোনো সময় দূরীভূত করা হবে। দেখুন পঁচিশ বছর পর এ ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে আর এ যুগে সেসব সমস্যার নামচিহ্নও নেই। এরপর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী হলো ইংরেজি ভাষায় আর আমি সে ভাষা সম্পর্কে অবহিত নই। এ ভাষায় ওহী অবতীর্ণ হওয়া একটি নিদর্শন। এর অনুবাদ হলো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে মুসলমানদের একটি বড়ো জামা'ত দান করব। তাদের একটি দল প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্য থেকে হবে আর দ্বিতীয় দল তাদের মধ্য থেকে হবে যারা ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ হিন্দু, ইউরোপ বা আমেরিকার খ্রিষ্টানদের মধ্য হতে অথবা অন্য কোনো জাতিভুক্ত হবে। যেমন- হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে আমাদের জামা'তভুক্ত হয়েছে যাদের একজন হলেন শেখ আবদুর রহীম যিনি এখানে কাদিয়ানেই অবস্থান করছেন। যিনি আরবী পুস্তক-পুস্তিকাও পড়া শেষ করেছেন। কুরআন শরীফ ও পাঠ্য বই তথা হাদীস ইত্যাদি পড়ে নিয়েছেন আর আরবীতে ভালো দক্ষতা অর্জন করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন, শেখ ফযল হক যিনি এ জেলার একজন প্রধান। তাঁর পিতা একজন ভূস্বামী বা জমিদার। তৃতীয়জন হলেন, শেখ আবদুল্লাহ্ (দিওয়ান চান্দ) যিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রাখেন আর কাদিয়ানে তিনি একই কাজ করছেন এবং এই জামা'তের জন্য কাদিয়ানে সে কাজেই তিনি নিযুক্ত রয়েছেন। একইভাবে আরো অনেকেই রয়েছেন যারা স্ব স্ব অঞ্চলে অবস্থান করছেন। অনুরূপভাবে আমেরিকা ও ইউরোপের আদি খ্রিষ্টানদের মাঝেও কিছুদিন থেকে আমাদের জামা'ত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করছে। যেমন- অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্কের ২০০-২০২ ওয়ার্থ স্ট্রিট নিবাসী একজন সম্মানিত খ্রিষ্টান আমাদের জামা'তভুক্ত হয়েছেন যার পূর্বের নাম হলো, এফ. এল. এন্ডারসন আর ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম হাসান রাখা হয়েছে। তিনি স্বহস্তে

---

* **টীকা:** অনুবাদ: অর্থাৎ আমাদের এ বান্দার প্রতি আমাদের যে সত্য, প্রকৃত এবং নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা রয়েছে তা অন্য কারো প্রতি নাই। আমি এ বিষয়ে অনন্য। প্রকৃত কথা হলো, ভালোবাসা তত্ত্বজ্ঞান অনুপাতে হয়ে থাকে। –লেখক

পত্র লিখে এ জামা'তে তাঁর নাম লিখিয়েছেন আর ইংরেজিতে অনুদিত আমাদের বই পুস্তক পড়েছেন। কুরআন আরবীতে পড়তে পারেন এবং লিখতেও পারেন। সেসব দেশে অনেক ইংরেজ এমন আছে যারা এ জামা'তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর এ জামা'তের সাথে নিজেদের সহমত হবার কথা প্রকাশ করেন। যেমন আমেরিকার ৪০৪ নং সিসকোহিনা ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার ব্যাকার যার নাম হলো এ জর্জ ব্যাকার, তিনি রিভিউ অফ রিলিজিয়ন পত্রিকায় আমার নাম দেখে নিজের পত্রে লিখেছেন যে, আমি আপনাদের ইমামের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত। তিনি ইসলামকে হুবহু সেভাবে উপস্থাপন করেছেন যেভাবে হযরত নবী মুহাম্মদ সাহেব উপস্থাপন করেছেন। আমেরিকা থেকে একজন মহিলা আমার সম্পর্কে তাঁর পত্রে লেখেন, আমি সর্বদা তাঁর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকা পছন্দ করি। এ ছবি শতভাগ মসীহ্‌র ছবি মনে হয়। একইভাবে আমাদের এক বন্ধুর স্ত্রী আমাদের জামা'তভুক্ত হয়েছেন যার পূর্ব নাম ইংল্যাণ্ডের মহারাণীর নাম অনুসারে এলিজাবেথ।

অনুরূপভাবে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশ থেকে অনবরত বেশ কিছু পত্র আসছে আর সেসব পত্র বিদ্বেষপরায়ণ বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার জন্য সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে; একটিও নষ্ট করা হয় নি। প্রতিনিয়ত আমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সেসব দেশে স্বাভাবিকভাবে এক উচ্ছ্বাস দানা বাঁধছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা নিজে থেকেই আমাদের জামা'ত সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে। দয়ালু ও কৃপালু এবং প্রজ্ঞাবান খোদা তাদের হৃদয়ে একটি ভালোবাসা ও প্রীতি এবং সুধারণা সৃষ্টি করে চলেছেন আর পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষ আমাদের জামা'তে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আর তারা এ জামা'তকে গভীর মাহাত্ম্যের দৃষ্টিতে দেখে। একজন একান্ত পিপাসার্ত বা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি, যে চরম ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে থাকে আর হঠাৎ পানি ও খাবার পেয়ে যায় ঠিক সেভাবে তারা এ জামা'তের আবির্ভাবে আনন্দ প্রকাশ করে। আসল কথা হলো, এ যুগে ইসলামের চেহারাকে অত্যুৎসাহিতা বা নিরুৎসাহিতার বন্যা বিকৃত করে দিয়েছিল। এক ফিরকা যারা নিছক মৌখিকভাবে মুসলমান হবার দাবি করত তারা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী আশিসকে অস্বীকার করে বসেছিল, নিদর্শন ও ভবিষ্যদ্‌বাণীকে শুধু অস্বীকারই করে নি, বরং দিবারাত্র হাসিতামাশা ও তিরস্কার করত, পারলৌকিক বাস্তবতার প্রকৃত ও সত্য জ্ঞান অর্জন না করে সে

সম্পর্কেও হাসিতামাশা ও অস্বীকারমূলক আচরণ করত আর ইসলামী ইবাদত হতে অব্যাহতি পেতে চাইত যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার দ্বার উন্মোচিত হয়। এককথায় নাস্তিকতার ফাঁদে পা দিচ্ছিল, কেবল নামে মাত্র মুসলমান ছিল। যে-সব বিষয় ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মাঝে পারস্পরিক পার্থক্যসূচক আর যা কোনো ব্যক্তি নিজ শক্তিবলে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিজের ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না, এ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণভাবে অনবহিত ছিল। এ ছিল তফরীত বা হীনতার স্বীকার লোকদের চিত্র। অপরদিকে অন্যপক্ষ বাড়াবাড়ির রীতি অবলম্বন করে নিয়েছিল অর্থাৎ, ভিত্তিহীন কাহিনি ও গল্প যা খোদার কিতাবের পরিপন্থি যেমন হযরত ঈসার পুনরায় আগমনকে নিজেদের ধর্মের অংশ বানিয়ে বসেছিল। অথচ খোদা তা'লা স্পষ্ট ভাষায় কুরআন শরীফে তাঁর মৃত্যুর ঘোষণা দিচ্ছেন আর মহানবীর হাদীসে পরিষ্কারভাবে লেখা হয়েছে যে, আগমনকারী মসীহ এ উম্মত হতে আসবেন যেভাবে মূসায়ী ধারার মসীহ সেই উম্মত হতে আগমন করেছেন; আকাশ থেকে নয়। অতএব এ বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য দূরীভূত করার জন্য খোদা তা'লা পৃথিবীতে এ জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা স্বীয় সত্যতা, সৌন্দর্য ও ভারসাম্যের নিরিখে সকল বিবেকবানের কাছে পছন্দনীয়। বস্তুত পুরোনো মুসলমানদের একটি দল এবং নবদীক্ষিত মুসলমান তথা ইউরোপ ও আমেরিকা এবং অন্যান্য অবিশ্বাসী জাতিগোষ্ঠীর একটি দলের এ জামা'তভুক্ত হওয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণীটি সংবাদ প্রদানের পঁচিশ বছর পর পূর্ণ হয়েছে। স্মরণ রেখো! যেমনটি আমরা এখন লিপিবদ্ধ করেছি, আরবী ভাষায় এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর শব্দ যা খোদার ওহী আমার কাছে প্রকাশ করেছে আর যা আজ হতে পঁচিশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছে তাহলো,

ثُلَّةٌ من الاوّلين وثُلَّةٌ من الاٰخرين

অর্থাৎ এ জামা'তে প্রবেশকারীরা দুটি দল হবে। একটি হলো পুরোনো মুসলমানদের দল যাদের নাম আউয়ালীন রাখা হয়েছে। তাদের সংখ্যা এখন পর্যন্ত তিন লক্ষের মতো হবে যারা এ জামা'তে প্রবেশ করেছে। আর অন্যরা নবদীক্ষিত মুসলমান যারা অন্যান্য জাতি হতে এ জামা'তে প্রবেশ করবে অর্থাৎ হিন্দু, শিখ এবং ইউরোপ ও আমেরিকার খ্রিষ্টানদের মধ্য হতে। তাদের একটি দল এ জামা'তভুক্ত হয়েছে আর হচ্ছে। এ যুগ সম্পর্কে খোদা তা'লা

কুরআন শরীফে সংবাদ দেন যা আমার যুগ। যার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ হলো শেষ যুগে বিভিন্ন ধর্মের উন্মেষ ঘটবে, যেভাবে এক ঢেউ অন্য ঢেউয়ের ওপর আছড়ে পড়ে সেভাবে এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওপর আক্রমণ করবে অর্থাৎ, বিদ্বেষ অনেক বেড়ে যাবে আর মানুষ সত্য সন্ধানের পরিবর্তে বৃথা নিজ ধর্মের গীত গাইবে। হিংসা-বিদ্বেষে এতটা ভারসাম্য হারিয়ে বসবে যে এক জাতি অন্য জাতিকে গ্রাস করতে চাইবে। তখন আকাশ হতে এক ফিরকার ভিত রচিত হবে আর খোদা নিজ মুখে সে জামা'তের সমর্থনে শিঙায় ফুৎকার দেবেন আর সেই ফুৎকারে সকল পুণ্যবান এ জামা'তের উদ্দেশ্যে ছুটে আসবে, কেবল চিরহতভাগারা ব্যতীত যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে দোযখ পরিপূর্ণ করার জন্য। এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত হলো,

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا۔

(আল-কাহাফ: ১০০)

অতএব সেই ফুৎকার কী, আর এর স্বরূপ কী হবে তার বিস্তারিত রূপ যথাসময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে। সংক্ষেপে কেবল এতটুকু বলতে পারি যে, সুপ্ত গুণাবলিকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে কিছু স্বর্গীয় কর্মকাণ্ড সামনে আসবে এবং ভীতিপ্রদ নিদর্শনাবলি প্রকাশ পাবে। তখন পুণ্যবানরা জেগে উঠবে (আর প্রশ্ন করবে) যে, এটি কী হতে যাচ্ছে? এটি কী সেই কিয়ামত-সন্নিকটবর্তী যুগ নয় যার সংবাদ নবীরা দিয়েছেন? আর তিনি কি সে ব্যক্তি নন যার সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়েছিল যে, এ উম্মত হতেই তিনি মসীহ হিসেবে আবির্ভূত হবেন আর ঈসা ইবনে মরিয়ম আখ্যায়িত হবেন? তখন যার হৃদয়ে বিন্দু পরিমাণও পুণ্য ও হিদায়াতের উপকরণ থাকবে সে খোদা তা'লার ক্রোধমূলক নিদর্শনাবলি দেখে ভয় পাবে আর ঊর্ধ্বলোকের আকর্ষণ তাকে টেনে সত্যের দিকে নিয়ে আসবে। তার সকল বিদ্বেষ ও হিংসা সেভাবে ভস্মীভূত হয়ে যাবে যেভাবে শুষ্ক খড়কুটো জ্বলন্ত অগ্নিতে পড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বস্তুত তখন সকল সুস্থ চিন্তাধারার মানুষ খোদার কথা শুনবে আর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে আর দেখবে যে, এখন আকাশ ও পৃথিবী বদলে গেছে। পূর্বের ভূমি ও পূর্বের আকাশ আর নেই যেমনটি আমাকে ইতিপূর্বে দিব্যদর্শনে দেখানো হয়েছিল যে, আমি একটি নূতন জমিন ও নূতন আকাশ সৃষ্টি করেছি তেমনটি অচিরেই ঘটতে যাচ্ছে। দিব্যদর্শনে এর নির্মাণ আমার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে

কেননা খোদা এ যুগের জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন; তাই এই নূতন জমি ও নূতন আকাশের কারণ আমিই। এমন রূপকের ব্যবহার খোদার বাণীতে অনেক রয়েছে, কিন্তু এ স্থানে কতক নির্বোধের জন্য অনুধাবন করা কঠিন হতে পারে যে, যদিও বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, আগমনকারী মসীহ এ উম্মতের মধ্য হতে হবেন আর কুরআনের মিনকুম শব্দ এ দিকেই ইঙ্গিত করে যে, সব খলীফা এ উম্মত হতে হবে এবং

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

(আন-নূর: ৫৬)

আয়াতও এ দিকেই ইঙ্গিত করছে, যা হতে স্পষ্ট যে কোনো অস্বাভাবিক বিষয় ঘটবে না, বরং যেভাবে ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে আমাদের নবী (সা.) মূসার মসীল ছিলেন, আয়াত

كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا

(আল-মুযযাম্মিল: ১৬)

দ্বারাও যা স্পষ্ট; একইভাবে ইসলামের শেষ যুগে মূসায়ী ও মুহাম্মদী ধারার সূচনা ও সমাপ্তির পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঈসার মসীল বা প্রতিচ্ছায়ার প্রয়োজন ছিল যে বিষয়ে বুখারীর হাদীসে اِمَامُكُمْ مِنْكُم এবং মুসলিমে اَمَّكُمْ مِنْكُم পরিষ্কারভাবে সংবাদ দিচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো, এ উম্মতে জন্মগ্রহণকারী ঈসা, ইবনে মরিয়ম কীভাবে আখ্যায়িত হতে পারেন? তিনি তো মরিয়মের পুত্র নন অথচ হাদীসে ইবনে মরিয়ম শব্দ রয়েছে। অতএব স্মরণ রাখা উচিত, নির্বোধদের হৃদয়ে এই যে সন্দেহ দানা বাঁধে, পবিত্র কুরআনের সূরা তাহরীমে এই সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে। যেমন- সূরা তাহরীমে এই উম্মতের কিছু লোককে মরিয়মের সাথে তুলনা করা হয়েছে আর তার মধ্যে ঈসার রূহ ফুৎকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই উম্মতের কোনো এক ব্যক্তি প্রথমে মরিয়মের মর্যাদায় উপনীত হবে। এরপর সেই মরিয়মের মাঝে রূহ ফুৎকার করা হবে। তখন তিনি সেই মার্গ থেকে উন্নতি করে ইবনে মরিয়ম আখ্যায়িত হবেন। কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে যে, যদি আপনার কথাই সত্য হয়ে থাকে তাহলে আপনার এলহামে এদিকে ইঙ্গিত থাকা উচিত ছিল। এর জবাবে আমি বলব যে, আজ থেকে ২৫ বছর পূর্বে আমার গ্রন্থ বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে এ ব্যাখ্যা

বিদ্যমান রয়েছে। বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে কেবল ইঙ্গিত নয়, বরং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অথচ এক সূক্ষ্ম, রূপক ভাষায় আমাকে ইবনে মরিয়ম আখ্যায়িত করা হয়েছে। তোমার উচিত প্রথমে সেই পুস্তক সংগ্রহ করা। এরপর দেখো, এর প্রারম্ভিক পৃষ্ঠাগুলোতে আল্লাহ তা'লা আমার নাম মরিয়ম রেখেছেন এবং তিনি বলেছেন,

يا مريم اسكن انت وزوجك الجنة

অর্থাৎ, হে মরিয়ম! তুমি এবং তোমার সাথি জান্নাতে প্রবেশ করো। এর বেশ কয়েক পৃষ্ঠা পরে যা বেশ কিছুকাল পূর্বে লিখা হয়েছিল, আল্লাহ তা'লা বলেন,

يا مريم نفختُ فيك من لدنى روح الصدق

অর্থাৎ, হে মরিয়ম! আমি তোমার মাঝে নিষ্ঠা ও সততার রূহ ফুৎকার করেছি। অতএব এই আত্মার ফুৎকার আধ্যাত্মিক গর্ভধারণ বইকি। কেননা এখানে সেই শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে যা মরিয়ম সিদ্দিকা সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছিল। মরিয়ম সিদ্দিকার মাঝে রূহ ফুৎকার করা হয়েছিল যার অর্থ হলো, তিনি অন্তঃসত্তা হয়েছিলেন আর সে গর্ভ থেকে ঈসার জন্ম হয়েছিল। অতএব এখানেও একইভাবে (আল্লাহ তা'লা) বলেন, তোমাতে আত্মার ফুৎকার করা হয়েছে। অন্য ভাষায় এটি একটি আধ্যাত্মিক গর্ভধারণ বটে। পরবর্তীতে পুস্তকের শেষের দিকে আমাকে ঈসা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা ঐশী ফুৎকারের পর মরিয়মি অবস্থা ঈসাতে রূপ নেবার জন্য প্রস্তুত ছিল যাকে রূপক ভাষায় গর্ভধারণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অবশেষে সেই মরিয়মি অবস্থা থেকে ঈসা জন্মগ্রহণ করেছেন। এ দিকে ঈঙ্গিত করার জন্য বইয়ের শেষের দিকে আমার নাম ঈসা রাখা হয়েছে আর বইয়ের প্রথম দিকে আমার নাম রাখা হয়েছে মরিয়ম। এখন লজ্জাশীলতা, শালীনতা, ন্যায়বিচার ও তাকওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথমে সূরা তাহরীমের এই আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করো যাতে এই উম্মতের কিছু ব্যক্তিকে মরিয়মের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরপর মরিয়মের মাঝে রূহ বা আত্মার ফুৎকার করার কথা বলা হয়েছে। যা সেই গর্ভধারণের দিকে ইঙ্গিত করে যা থেকে ঈসার জন্মগ্রহণ করার কথা। এরপর বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোর সেসব বাক্যগুলো পাঠ করো এবং খোদাকে ভয় করো যে, কত পরিষ্কারভাবে তিনি প্রথমে আমার নাম মরিয়ম

রেখেছেন এবং এরপর মরিয়মে আত্মার ফুৎকারের কথা উল্লেখ করেছেন এবং গ্রন্থের শেষদিকে সেই মরিয়মের রূপক গর্ভধারণ থেকে আমাকে ঈসার মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। যদি এটি মানবীয় কোনো কাজ হতো তাহলে কোনো মানুষের জন্য দাবি করার দীর্ঘকাল পূর্বে এই সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা পূর্বসংবাদ হিসেবে নিজের গ্রন্থে অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্ভব ছিল না। তোমরা স্বয়ং সাক্ষী, আমি সে যুগে এ আয়াত সম্পর্কে জানতামই না যে, আমাকে ঈসা মসীহ নিযুক্ত করা হবে। বরং আমি তোমাদের মতো মানবীয় সীমাবদ্ধতার কারণে এই বিশ্বাসই রাখতাম যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। যদিও খোদা তা'লা বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে আমার নাম ঈসা রেখেছেন আর পবিত্র কুরআনের যে-সকল আয়াত ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ ঈসার প্রতি আরোপিত ছিল সেসব আয়াত আমার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন আর এটিও বলেছেন যে, তোমার আগমনের পূর্বসংবাদ কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান অথচ আমি তা বুঝতে পারি নি। বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসই আমার মতামত হিসেবে লিখে দিয়েছি এবং ছাপিয়ে দিয়েছি যে, ঈসা (আ.) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। আমার চোখ এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তা'লা বার বার আমাকে পরিষ্কারভাবে বুঝান নি যে, বনী ইসরাঈলী ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন আর তিনি ফিরে আসবেন না। এই যুগ এবং এই উম্মতের জন্য তুমিই ঈসা ইবনে মরিয়ম। এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি যা বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে লেখা হয়েছে এটিও আল্লাহ তা'লার একটি নিদর্শন ছিল এবং আমার নিষ্পাপ সরলতা ও অকৃত্রিমতার সাক্ষী ছিল। কিন্তু যে জাতির হৃদয় পাষাণ আমি তাদের কী চিকিৎসা করব! যারা কোনো কসমে আস্থা রাখে না আর নিদর্শনেও বিশ্বাস করে না, খোদা তা'লার কোনো দিক নির্দেশনা সম্পর্কে প্রণিধান করে না। স্বর্গ মর্ত্য উভয়ই নিদর্শন প্রদর্শন করেছে, কিন্তু তাদের চোখ বন্ধ। এখন জানি না খোদা তা'লা তাদের কী নিদর্শন দেখাবেন।

এখানে একথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'লা আমার নাম কেবল ঈসাই রাখেন নি বরং আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যত নবী এসেছেন তাদের সবার নামে আমাকে অভিহিত করেছেন। যেমন- আল্লাহ বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী অংশগুলোতে আমার নাম আদম রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তা'লা বলেন,

اردتُ اَن استخلف فخلقتُ اٰدم

পুনরায় অন্যত্র বলেছেন,

سبحان الذی اسری بعبده لیلًا خلق اٰدم فاکرمه۔

উভয় বাক্যের অর্থ হলো আমি স্থলাভিষিক্ত বানানোর পরিকল্পনা করেছি তাই আমি আদমকে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ এই অধমকে। পুনরায় বলেন, পবিত্র সেই সত্তা যিনি স্বীয় বান্দাকে একই রাতে আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ সফর করিয়ে দিয়েছেন এবং এই আদমকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গে উপনীত করেছেন। একই রাতে ভ্রমণ করানোর অর্থ হলো, একই রাতে তার সকল উৎকর্ষ সাধন করিয়েছেন। কেবল চার প্রহরে আধ্যাত্মিকতার সফরকে পরাকাষ্ঠা দান করেছেন। আল্লাহ যে আমার নাম আদম রেখেছেন এর একটি কারণ হলো, এই যুগে মোটের ওপর আদম সন্তানদের আধ্যাত্মিক অবস্থার ওপর মৃত্যু এসে গিয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'লা আমাকে নব জীবনের এই ধারায় আদম আখ্যায়িত করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্নিহিত আছে, যেভাবে আদমের বংশ সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছিল একই ভাবে আমার এই আধ্যাত্মিক ও দৈহিক প্রজন্ম সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে। দ্বিতীয় কারণ হলো, যেভাবে ফেরেশতারা আদমকে খলীফা নিযুক্ত করার কারণে আপত্তি করেছিল আর খোদা তা'লা তাদের আপত্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, আদম সম্পর্কে আমি যা জানি তা তোমরা জানো না; এ ঘটনা আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে আল্লাহ তা'লার এই ওহী লিখিত আছে যে, মানুষ আমার বিরুদ্ধে সেভাবেই আপত্তি করবে যেভাবে আদম সম্পর্কে করা হয়েছিল। যেমন- আল্লাহ তা'লা বলেন,

وان یتخذونك اِلا هزوًا أهٰذا الذی بعث الله۔ جاهل او مجنون

অর্থাৎ মানুষ তোমাকে হাসিঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করবে আর বলবে যে, এই ব্যক্তিকেই কি আল্লাহ তা'লা প্রেরণ করেছেন? এ-যে অজ্ঞ অথবা উন্মাদ। এরই প্রত্যুত্তরে বারাহীনে আহমদীয়ার খণ্ডগুলোতে আল্লাহ তা'লা বলেন,

انتَ منّی بمنزلةٍ لا یعلمها الخلق ۔

অর্থাৎ আমার দৃষ্টিতে তুমি সে মর্যাদা রাখো যা পৃথিবীর মানুষ জানে না। এ উত্তরটি তেমনই যেমনটি আদম সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যে,

قَالَ اِنِّیۡۤ اَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ

(আল-বাকারা: ৩১)

বরং এ আয়াতগুলো যদিও বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে নেই, কিন্তু অন্যান্য পুস্তকাবলিতে আমার সম্পর্কে হুবহু এই আয়াতগুলোই আল্লাহর ওহী (হিসেবে) অবতীর্ণ হয়ে প্রচারিত হয়েছে। তৃতীয়ত আদমের সাথে আমার এ সাদৃশ্যও রয়েছে যে, আদম যমজ জন্মগ্রহণ করেছেন আর আমিও যমজ জন্মগ্রহণ করেছি। প্রথমে এক মেয়ের জন্ম হয় তারপর আমার। এসব কিছু সত্ত্বেও আমি আমার পিতার জন্য খাতামুল ওয়ালাদ বা সর্বশেষ সন্তান ছিলাম, আমার পর কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে নি। আমি জুমুআর দিন জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আদমের, হাওয়ার পূর্বে জন্মগ্রহণ করায় এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে এটি পৃথিবীর (ধর্মীয়) পরম্পরার সূচনা। আমার যমজ বোনের পরে জন্মগ্রহণ করা এ দিকে ইঙ্গিত ছিল যে, আমি পৃথিবীর (সকল) ধারার সমাপ্তিতে এসেছি। অতএব ষষ্ঠ সহস্রের সমাপ্তিতে আমার জন্ম হয়। চান্দ্র হিসাব অনুসারে এখন সপ্তম হাজার চলছে।

একইভাবে বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে খোদা তা'লা আমার নাম নূহও রেখেছেন আর আমার সম্পর্কে বলেছেন,

ولا تخاطبنی فی الّذین ظلموا اِنّھم مُغْرقون۔

অর্থাৎ আমার চোখের সামনে নৌকা বানাও আর সীমালঙ্ঘনকারীদের শাফায়াত সম্পর্কে আমার সাথে কোনো কথা বলবে না কেননা আমি তাদের নিমজ্জিত করব। খোদা তা'লা নূহের যুগে সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রায় একহাজার বছর পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন। এখন শ্রেষ্ঠ শতাব্দীগুলোর তিনটি শতাব্দীকে পৃথক রেখে সহস্র বছর দাঁড়ায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগটি এখন সেসময়ে গিয়ে উপনীত হয় যখন নুহের জাতিকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। আর খোদা তা'লা আমাকে বলেছেন,

اصنع الفلك باعيننا ووحينا۔ انّ الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم۔

অর্থাৎ আমার চোখের সামনে এবং আমার নির্দেশ অনুসারে নৌকা বানাও।

যারা তোমার হাতে বয়আত করে তারা তোমার হাতে নয় বরং খোদার হাতে বয়আত করে। তাদের হাতের ওপর খোদার হাত রয়েছে। মানুষের প্রাণ ও ঈমান রক্ষার জন্য বয়আতের নৌকা রয়েছে। কিন্তু বয়আত বলতে কেবল মৌখিক বয়আতকে বুঝায় না যার প্রতি হৃদয় উদাসীন বরং বিমুখ থাকবে। বয়আতের অর্থ হলো বিক্রি করে দেওয়া। অতএব যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ, সম্পদ ও সম্মান এ পথে বিক্রি করে না, আমি সত্য করে বলছি, সে খোদার দৃষ্টিতে বয়আতের গণ্ডিভুক্ত নয়। বরং আমার অভিজ্ঞতা হলো অনেক এমন বাহ্যিক অর্থে বয়আতকারী রয়েছে যাদের মাঝে সুধারণার বৈশিষ্ট্য এখন পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করে নি আর এক দুর্বল শিশুর ন্যায় প্রত্যেক পরীক্ষায় তারা হোঁচট খায়। কিছু দুর্ভাগা এমন আছে যারা দুষ্কৃতিকারীদের কথায় অতি দ্রুত প্রভাবিত হয় এবং কুধারণার প্রতি এমনভাবে ধাবিত হয় যেভাবে কুকুর মৃত প্রাণীর মাংস খাওয়ার জন্য ছুটে যায়। সুতরাং আমি কীভাবে বলব যে, তারা প্রকৃত অর্থে বয়আত করেছে? আমাকে বিভিন্ন সময়ে এমন লোকদের সম্পর্কে জানানোও হয় কিন্তু তাদেরকে (সে সম্পর্কে) বলার অনুমতি দেওয়া হয় না। অনেক এমন (বাহ্যত) ছোটো আছে যাদের বড়ো করা হবে আর অনেক বড়ো আছে যাদের ছোটো করা হবে। সুতরাং এটি এমন বিষয় যা সম্পর্কে সাবধান থাকা উচিত।

একইভাবে বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে আমার নাম ইবরাহীম রাখা হয়েছে যেমন তিনি বলেন سلام عليك يا ابراهيم (দ্রষ্টব্য বারাহীনে আহমদীয়া, পৃ. ৫৫৮) অর্থাৎ হে ইবরাহীম! তোমার প্রতি শান্তিবর্ষিত হোক। ইবরাহীম (আ.)-কে খোদা তালা প্রভূত কল্যাণে ভূষিত করেছিলেন আর তিনি সদা শত্রুদের হামলা থেকে নিরাপদ ছিলেন। সুতরাং আমার নাম ইবরাহীম রেখে খোদা তা'লা এদিকে ইঙ্গিত করেন যে, এ ইবরাহীমকেও এমনই কল্যাণরাজি দান করা হবে আর বিরোধীরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন এ বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেন,

بوركت يا احمد وكان ما بارك الله فيك حقًّا فيك

অর্থাৎ হে আহমদ! তোমাকে আশিসমণ্ডিত করা হয়েছে আর এটি তোমারই অধিকার ছিল। এই বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে খোদা তা'লা একস্থানে আমাকে সম্বোধনপূর্বক বলেন, আমি তোমাকে এত পরিমাণ

কল্যাণরাজিতে ভূষিত করব যে, বাদশা তোমার পোশাকে আশিস অন্বেষণ করবে। যেভাবে ইবরাহীমের মাধ্যমে খোদা তা'লা বংশের সূত্রপাত করেছেন সেভাবে বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে আল্লাহ তা'লা আমার সম্পর্কে বলেন,

سبحان الله زاد مجدك ينقطع اٰباءك و يبدء منك۔

অর্থাৎ খোদা পবিত্র– যিনি তোমার সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। তিনি তোমার পিতা-পিতামহের স্মৃতি মুছে দেবেন এবং বংশের সূচনা তোমার মাধ্যমে করবেন। ইবরাহীমের প্রতি খোদার ভালোবাসা এত পরিষ্কার ছিল যে, তাঁর নিরাপত্তার জন্য তিনি বড়ো বড়ো নিদর্শন দেখিয়েছেন আর দুঃখের সময় তিনি স্বয়ং ইবরাহীমকে আশ্বস্ত করেছেন। একইভাবে বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে আল্লাহ তা'লা আমার নাম ইবরাহীম রেখে বলেন,

سلام علٰی ابراهيم صافيناه ونجّيناه من الغمّ تفرّدنا بذالك

অর্থাৎ এ ইবরাহীমের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তাঁর প্রতি আমাদের স্বচ্ছ ভালোবাসা রয়েছে, যাতে কোনো পঙ্কিলতা নেই। আমরা তাঁকে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ দেবো। এ ভালোবাসা বিশেষভাবে আমাদের জন্য, অন্য কেউ এভাবে তাঁকে ভালোবাসে না। এছাড়া আরো একস্থানে বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে আমার নাম ইবরাহীম রেখেছেন যেমন তিনি বলেন,

يا ابراهيم أَعرِضْ عن هٰذا اِنَّه عمل غير صالح۔ إنما أنت مذكّر وما انت عليهم بمصيطر۔

(দ্রষ্টব্য পৃ. ৫১০)

অর্থাৎ হে ইবরাহীম! এ ব্যক্তি হতে পৃথক হয়ে যাও, এ ভালো মানুষ নয়। আর তোমার কাজ হলো স্মরণ করানো, তুমি তাদের ওপর দারোগা নিযুক্ত হও নি। হযরত ইবরাহীকে জাতির কিছু লোকের সাথে এবং নিকট আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছে। অতএব আমার সম্পর্কে এ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তোমাকেও বংশের কিছু নিকট আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে আর বাস্তবে এমনটিই হয়েছে। পুনরায় বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে আমার নাম ইবরাহীম রেখেছেন। যেমন তিনি বলেন,

و نظرنا اليك وقلنا يا ناركونى بردًا و سلامًا علٰى ابراهيم۔

(দ্রষ্টব্য পৃ. ২৪০)

অর্থাৎ আমরা এ ইবরাহীমের প্রতি স্নেহদৃষ্টি দিলাম আর বললাম, হে আগুন ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। এটি পরবর্তীকালের জন্য একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী। এখন আমি যতটা ভাবতে পারি– এটি সেসব ভয়াবহ মকদ্দমার পরিণতি সম্পর্কে সুসংবাদ, যার কারণে প্রাণ ও সম্মান বিনষ্ট হবার আশঙ্কা ছিল। যেমন ডা. মার্টিন ক্লার্কের আমার বিরুদ্ধে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছি মর্মে অভিযোগ দায়ের করা, একইভাবে রয়েছে করম দীনের মামলা। এখানে অগ্নি বলতে সে আগুন বুঝায় যা শাসকদের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির ফলে সৃষ্টি হয়। সারকথা হলো, আমরা ক্রোধ ও উত্তেজনার আগুনকে শীতল করে দেবো আর সসম্মানে মুক্তি লাভ হবে। একইভাবে বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে আমার নাম রাখা হয়েছে ইউসুফ।

এ সাদৃশ্যের বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে আমার নাম মূসা রাখা হয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন,

تلطّف بالناس وترحّم عليهم انت فيهم بمنزلة موسٰى واصبر علٰى ما يقولون

(দ্রষ্টব্য পৃ. ৫০৮ বারাহীনে আহমদীয়া পূর্ববর্তী খণ্ডগুলো) অর্থাৎ মানুষের সাথে কোমল ও ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করো। তুমি তাদের মাঝে মূসাতুল্য। তাদের মর্মপীড়াদায়ক কথাগুলো শুনে ধৈর্যধারণ করো। অর্থাৎ মূসা অনেক কোমলমতি ছিলেন। বনী ইসরাঈল প্রায়শ মুরতাদ হতো এবং মূসার ওপর হামলা করত। অনেক সময় তার ওপর অপবাদ আরোপ করত। কিন্তু মূসা সবসময় ধৈর্যধারণ করতেন এবং তাদের শাফায়াতকারী ছিলেন। মূসা তাদের এক জ্বলন্ত চুল্লী থেকে বের করে আনেন এবং ফেরাউনের হাত থেকে মুক্ত করেন। মূসা, ফেরাউনের সামনে অনেক বড়ো বড়ো নিদর্শন দেখিয়েছেন। অতএব উক্ত নাম রাখার মাঝে এ ভবিষ্যদ্‌বাণীও অন্তর্নিহিত আছে যে, এখানেও এমনটিই হবে। একইভাবে বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে খোদা তা'লা আমার নাম দাউদও রেখেছেন যার ব্যাখ্যা অচিরেই যথাস্থানে প্রদত্ত হবে। বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে খোদা তা'লা আমার নাম সোলেমানও রেখেছেন। এর ব্যাখ্যাও সত্বর দেওয়া হবে। বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে খোদা তা'লা আমার নাম আহমদ

ও মুহাম্মদ রেখেছেন। এটি একথার প্রতি ইঙ্গিত– যেভাবে মহানবী (সা.) খাতামে নবুয়্যত সেভাবে এ অধম খাতামে ওলায়েত। এরপর আমার সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে বলেছেন যে,

جرى الله فى حُلَلِ الانبياء

অর্থাৎ পূর্ববর্তী সব নবীর আদলে খোদার রসূল। খোদার এ ওহীর অর্থ হলো, আদম থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইসরাঈলী-অইসরাঈলী যত নবী পৃথিবীতে এসেছেন– তাদের সবার বিশেষ ঘটনাবলি ও বৈশিষ্ট্যাবলি হতে অধমকে কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে। একজন নবীও এমন অতীত হন নি যার বিশেষত্ব ও ঘটনাবলি হতে এ অধমকে অংশ দেওয়া হয় নি। সব নবীর প্রকৃতির ছাপ এ অধমের প্রকৃতিতে রয়েছে। এ সম্পর্কেই খোদা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন। এতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, সকল নবীর জীবনের শত্রু আর চরম বিরোধী, যারা শত্রুতায় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যাদের বিভিন্ন প্রকার শাস্তির মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিল, তাদের সাথে এ যুগের বেশিরভাগ মানুষ সাদৃশ্য রাখে। বস্তুত খোদার এ ওহীর মাধ্যমে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, এ যুগে পুণ্যবান ও পাপাচারীদের সকল পরাকাষ্ঠার সমাহার ঘটবে। খোদা তা'লা যদি কৃপা না করেন তাহলে এ যুগের দুষ্কৃতিকারীরা অতীতের সকল আযাবে ক্লিষ্ট হবার যোগ্য। অর্থাৎ এ যুগে অতীতের সকল শাস্তি একত্রিত হতে পারে। যেভাবে অতীতের কোনো জাতি প্লেগে ধ্বংস হয়েছে আবার কোনো জাতি বজ্রপাতের আঘাতে আর কোনো জাতি ভূমিকম্পের কারণে আবার কোনো জাতি সামুদ্রিক তুফানের কারণে আর কোনো জাতি ধুলিঝড়ের কারণে আবার কোনো জাতি ধ্বংস হয়েছে মাটিতে চাপা পড়ে; একইভাবে এ যুগের লোকেরা যদি নিজেদের সংশোধন না করে তাহলে তাদেরও এমনসব শাস্তির ভয় করা উচিত। শুধু খোদার সহনশীলতা তাদের অবকাশ দিয়ে রেখেছে। বস্তুত جرى الله فى حُلَلِ الانبياء বিশদ ব্যাখ্যার দাবি রাখে। বারাহীনের পঞ্চম খণ্ডে যার সংকুলান সম্ভব নয়। সংক্ষেপে কেবল এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, অতীতের সকল নবীর অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য এবং ঘটনাবলির কিছু আমার মাঝে রয়েছে। অতীতের নবীদের সাথে খোদা তা'লা নানাভাবে সাহায্য ও সমর্থনের যে-সব আচরণ করেছেন, সেসব ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আমার ক্ষেত্রেও প্রদর্শন করা হয়েছে এবং করা হবে। বিষয়টি কেবল

ইসরাঈলী নবীদের বিশেষত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং সারাবিশ্বে যত নবী অতীত হয়েছেন তাদের সবার দৃষ্টান্ত ও ঘটনাবলি আমার ভেতর ও আমার সাথে বিদ্যমান। হিন্দুদের মাঝে কৃষ্ণ নামে যে একজন নবী অতীত হয়েছেন, তিনিও এতে অন্তর্ভুক্ত। পরিতাপের বিষয় হলো, যেভাবে দাউদ নবীর ওপর দুস্কৃতকারীরা পাপাচার ও কদাচারের অপবাদ আরোপ করেছে, একই প্রকার অপবাদ কৃষ্ণের প্রতিও আরোপ করা হয়েছে। দাউদ যেভাবে খোদার বড়ো পালোয়ান ও সাহসী বীর ছিলেন, খোদাকে ভালোবাসতেন, আর্যাবর্তে তেমনই ছিলেন কৃষ্ণ। সুতরাং একথা বলা সঠিক হবে যে, আর্যাবর্তের দাউদ ছিলেন কৃষ্ণ আর ইসরাঈলী নবীদের কৃষ্ণ দাউদই ছিলেন। আমাদের একথা বলা একান্ত সঠিক যে, দাউদ কৃষ্ণ ছিল আর কৃষ্ণ দাউদ ছিল। কেননা কালের পরিক্রমা যেহেতু বৃত্তাকারে হয় তাই পুণ্যবান হোক বা পাপী, পৃথিবীতে বার বার তাদের মতো লোক জন্ম নিতে থাকে। যত পুণ্যবান ও সদাত্মা পবিত্র নবী গত হয়েছেন, একই ব্যক্তির সত্তায় তাদের সবার নমুনা প্রকাশ পাবে– এটিই খোদার ইচ্ছা। সুতরাং আমিই সে-ই ব্যক্তি। একইভাবে ফেরাউন হোক বা ইহুদী, যারা হযরত ঈসাকে ক্রুশে দিয়েছে বা আবু জাহলই হোক, এ যুগে সকল পাপাচারীর দৃষ্টান্তও বিদ্যমান, যেমনটি কিনা আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে ইয়াজুজ-মাজুজের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

একইভাবে খোদা তা'লা আমার নাম যুল-কারনাইনও রেখেছেন, কেননা আমার সম্পর্কে পবিত্র ওহী جرى الله فى حُلَلِ الانبياء রয়েছে– যার অর্থ হলো, খোদার রসূল সকল নবীর পোশাকে– এর দাবি হলো আমার মাঝে যুল-কারনাইনের বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান থাকা। কেননা সূরা কাহাফ থেকে প্রমাণিত যে, যুল-কারনাইনও ওহী লাভ করতেন। খোদা তা'লা তাঁর সম্পর্কে বলেন,

قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ

অতএব খোদার সেই ওহী جرى الله فى حُلَلِ الانبياء অনুসারে এ উম্মতের যুল-কারনাইন আমি। কুরআন শরীফে আমার সম্পর্কে রূপকভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে কিন্তু তাদের জন্য, যারা অন্তর্দৃষ্টি রাখে। এটি জানা কথা যে, যুল-কারনাইন সে হয়ে থাকে, যে দুটি শতাব্দী পায়। আমার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিষয় হলো, এ যুগের লোকেরা নিজস্ব হিসাব অনুসারে যেভাবে বিভিন্ন শতাব্দীকে বিভাজন করে রেখেছে, সেসবের বণ্টনের নিরিখে দেখলে বুঝা যাবে যে, আমি

প্রত্যেক জাতির দুটো শতাব্দী পেয়েছি। আমার বয়স এখন আনুমানিক ৬৭ বছর, এ হিসাব অনুসারে যেভাবে আমি দুটি খ্রিষ্টীয় শতাব্দী পেয়েছি। একইভাবে দুটি হিন্দী শতাব্দীও পেয়েছি, যাদের বর্ষগণনা বিক্রমাদিত্য থেকে আরম্ভ হয়। যতটা সম্ভব ছিল, আমি প্রাচীন কালের প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নির্ধারিত শতাব্দীগুলো খতিয়ে দেখেছি (আর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে,) এমন কোনো জাতি নেই যাদের নির্ধারিত শতাব্দীগুলোর দুটি শতাব্দী আমি পাই নি। কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, আগত মসীহর একটি লক্ষণ হলো, তিনি যুল-কারনাইন হবেন। বস্তুত খোদা তা'লার ওহীর শব্দাবলি অনুসারে আমিই যুল-কারনাইন। আর কুরআনের সূরা কাহাফ-এ উল্লিখিত যুল-কারনাইনের কাহিনি সম্পর্কিত আয়াতগুলোর, মহান আল্লাহ ভবিষ্যদ্‌বাণীর আদলে আমার নিকট যে নিগূঢ় অর্থ উন্মোচন করেছেন, আমি নীচে তা বর্ণনা করছি। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, (ঐ আয়াগুলোর) পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাগুলোকে অস্বীকার করা হচ্ছে না; সেগুলো অতীতের সাথে সম্পর্কিত ছিল আর এগুলো ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্ক রাখে। (স্মরণ রাখতে হবে,) কুরআন শরীফ কেবল কোনো নিছক কাহিনিবেত্তার মতো কাহিনি বর্ণনা করে না, বরং এর প্রতিটি কাহিনির অন্তরালে রয়েছে একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী। যুল-কারনাইনের কাহিনি মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের জন্য একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী নিজের মাঝে রাখে। যেমন- কুরআনের আয়াত হলো,

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا

(আল-কাহাফ: ৮৪)*

অর্থাৎ এরা তোমার কাছে যুল-কারনাইন সম্পর্কে জানতে চায়, তাদের বলো, আমি তোমাদেরকে এখন কিছুটা যুল-কারনাইনের বৃত্তান্ত শোনাবো। এরপর বলেন,

اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا

(আল-কাহাফ: ৮৫)

---

* **টীকা:** এটি এই বাস্তবতার দিকেই ইঙ্গিত করে যে, যুল-কারনাইনের ঘটনা কেবল অতীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ভবিষ্যতেও একজন যুল-কারনাইনের আবির্ভাব ঘটবে। অতীতের যুল-কারনাইনের উল্লেখ এখানে কেবল (মূল বিষয়ের) একটি সামান্য অংশ মাত্র। –লেখক

আমরা তাকে অর্থাৎ মসীহ মওউদকে 'যে যুল-কারনাইনও আখ্যায়িত হবে' পৃথিবীতে এমন দৃঢ়তা দান করব যে, কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না আর আমরা তাকে সকল প্রকার সাজসরঞ্জাম দান করব এবং তার কার্যক্রম সহজ করে দেবো। স্মর্তব্য, বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতেও আমার সম্পর্কে এই ওহী হয়েছে যেমনটি কিনা আল্লাহ তা'লা বলেন,

الم نجعل لك سهولةً فى كلّ امرٍ

আমরা কি সকল বিষয়ে তোমার জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করি নি? অর্থাৎ আমরা কি তোমার জন্য সে-সব উপকরণ সৃষ্টি করি নি, যা তবলীগ ও সত্য প্রচারের জন্য আবশ্যক ছিল। এটি স্পষ্ট যে, তিনি আমার জন্য তবলীগ ও সত্য প্রচারের সে-সব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যা কোনো নবীর সময় বিদ্যমান ছিল না। সকল জাতির জন্য যোগাযোগ ও ভ্রমণের পথ উন্মুক্ত করা হয়েছে। পথ পাড়ি দেবার জন্য এমনসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে যে, বছরের পথ দিনে অতিক্রম হচ্ছে আর সংবাদ পৌঁছানোর সেসব মাধ্যম সৃষ্টি হয়েছে যে, সহস্র সহস্র মাইল দূর থেকে কয়েক মিনিটে সংবাদ আসছে। সকল জাতির সেসব গ্রন্থ ছেপেছে, যা গোপন ও লুক্কায়িত ছিল। সবকিছু নাগালের ভেতর আনার জন্য বা সরবরাহ করার জন্য একটি উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। বইপুস্তক লেখার ক্ষেত্রে যে-সব সমস্যা ছিল তা ছাপাখানার মাধ্যমে দূরীভূত হয়েছে। সত্য কথা হলো, এমনসব মেশিন (মুদ্রণযন্ত্র) আবিষ্কার হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে দশ দিনে কোনো প্রবন্ধ এত অজস্র ধারায় ছাপা সম্ভব যা পূর্ববর্তী যুগে দশ বছরেও লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হতো না। এছাড়া এগুলো প্রচার ও প্রসারের এমন আশ্চর্যজনক উপকরণ বেরিয়ে এসেছে যে, একটি রচনা শুধু চল্লিশ দিনে পৃথিবীর সমগ্র মানবমণ্ডলীর মাঝে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ যুগের পূর্বে এক ব্যক্তি শতবছর দীর্ঘায়ু পেলেও সেই ব্যাপক পরিসরে প্রচারে সক্ষম হতো না।

এরপর আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

فَاَتْبَعَ سَبَبًا حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ِالْحُسْنٰى ۚ وَ سَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا۔

(আল-কাহাফ: ৮৬-৮৯)

অর্থাৎ যুল-কারনাইন যিনি মসীহ মওউদও, তাকে সকল প্রকার উপকরণ দেওয়া হবে। অতএব তিনি একটি উপায় অবলম্বন করবেন অর্থাৎ তিনি পাশ্চাত্যের সংশোধনের জন্য সোচ্চার হবেন আর তিনি দেখবেন যে, সততা ও সত্যতার সূর্য এক কাদার ঝরনায় ডুবে গেছে আর এই নোংরা ঝরনা ও অমানিশার কাছে এক জাতিকে পাবেন, যারা পশ্চিমা আখ্যায়িত হবে অর্থাৎ পাশ্চাত্যের দেশসমূহে খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখবেন। তাদের সামনে সূর্যও থাকবে না, যা হতে তারা আলো পেতে পারে আর তাদের সামনে পরিষ্কার পানিও থাকবে না, যা তারা পান করবে অর্থাৎ তাদের জ্ঞানগত ও কর্মগত অবস্থা শোচনীয় হবে। তারা আধ্যাত্মিক আলো ও আধ্যাত্মিক পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে। তখন আমরা যুল-কারনাইন অর্থাৎ মসীহ মওউদকে বলব (যেভাবে হাদীসে বর্ণীত হয়েছে যে,) তুমি চাইলে তাদের শাস্তি দিতে পারো অর্থাৎ শাস্তি অবতীর্ণ হবার দোয়া করতে পারো বা তাদের প্রতি সদয় ব্যবহারের পন্থাও অবলম্বন করতে পারো। তখন যুল-কারনাইন অর্থাৎ মসীহ মওউদ উত্তর দেবেন, আমরা তাকে শাস্তি দিতে চাই, যে অত্যাচারী। সে পৃথিবীতেও আমাদের অভিশাপের শিকার হবে আর পরকালেও কঠিন শাস্তি পাবে। যে-ব্যক্তি সত্য হতে মুখ ফেরাবে না আর পুণ্যকর্ম করবে তাকে নেক প্রতিদান দেওয়া হবে আর তাকে সে-সব কাজের নির্দেশ দেওয়া হবে যা সহজ আর সহজে করা যেতে পারে। বস্তুত মসীহ মওউদ সম্পর্কে এটি একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী অর্থাৎ, সে এমন সময়ে আসবে যখন পাশ্চাত্যের লোক চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে আর সত্যের সূর্য তাদের সামনে সম্পূর্ণভাবে ডুবে যাবে এবং একটি নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত ঝরনায় অস্তমিত হবে অর্থাৎ সত্যের পরিবর্তে দুর্গন্ধযুক্ত বিশ্বাস ও কর্ম তাদের মাঝে সর্বত্র বিরাজমান থাকবে। সেটিই তাদের পানি হবে, যা তারা পান করবে। আলোর নামগন্ধও থাকবে না, অন্ধকারে পড়ে থাকবে। জানা কথা, বর্তমানে খ্রিষ্টধর্মের অবস্থা ঐরূপ যা কুরআন শরীফ প্রকাশ করেছে আর খ্রিষ্টধর্মের মূলকেন্দ্র পশ্চিমা দেশগুলোর অবস্থা এমনই।

পুনরায় আল্লাহ তা'লা বলেন,

ثُمَّ اَتۡبَعَ سَبَبًا حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطۡلِعَ الشَّمۡسِ وَجَدَهَا تَطۡلُعُ عَلٰى قَوۡمٍ لَّمۡ نَجۡعَلۡ لَّهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهَا سِتۡرًا
كَذٰلِكَ وَقَدۡ اَحَطۡنَا بِمَا لَدَيۡهِ خُبۡرًا

(আল-কাহাফ: ৯০-৯২)

অর্থাৎ যুল-কারনাইন যিনি মসীহ মওউদ, যাকে সকল উপকরণ দেওয়া হবে, তিনি আরেকটি উপায় অবলম্বন করবেন অর্থাৎ প্রাচ্যের লোকদের অবস্থার ওপর দৃষ্টিপাত করবেন। আর সে স্থান– যেখানে সত্যের সূর্য উদিত হয় তাকে এমন এক নির্বোধ জাতির ওপর উদিত হতে দেখবেন, যাদের কাছে রোদ হতে বাঁচার কোনো উপকরণ নেই। অর্থাৎ তারা বাহ্যিকতার পূজা ও বাড়াবাড়ির রোদে পুড়বে এবং বাস্তবতা সম্পর্কে উদাসীন হবে। যুল-কারনাইন তথা মসীহ মওউদ-এর কাছে প্রকৃত প্রশান্তির সব উপকরণ থাকবে, যাকে আমরা খুব ভালো জানি কিন্তু তারা গ্রহণ করবে না আর তারা রোদ থেকে বাঁচার জন্য কোনো আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না। ঘরও না, ছায়াবহুল বৃক্ষও না আর কাপড়ও না– যা রোদ থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে; তাই সত্যের যে সূর্য উদিত হবে, তা তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। এটি তাদের জন্য একটি উপমা, যাদের সামনে সত্যের সূর্য বিদ্যমান, তারা সে শ্রেণির মতো নয় যাদের সূর্য ডুবে গিয়েছে; কিন্তু সত্যের সেই সূর্যের মাধ্যমে রোদের কারণে তাদের চামড়া পুড়ে যাওয়া এবং রঙ কালো হয়ে যাওয়া অধিকন্তু দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া ছাড়া আর কোনো লাভ তাদের হয় না।* এ বণ্টনে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মসীহ মওউদের নিজের দায়িত্ব পালনের জন্য তিন প্রকার সফর হবে। প্রথমে তিনি সে জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন যারা সত্যের সূর্য হারিয়ে বসেছে আর এক অমানিশা ও কাদার ঝরনার মাঝে নিপতিত। তাঁর দ্বিতীয় সফর তাদের মাঝে হবে– যারা সূর্যের সামনে উলঙ্গ বসে থাকবে অর্থাৎ যারা শিষ্টাচার, লজ্জাবোধ ও বিনয় এবং পূত ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করে না; নিছক বাহ্যিকতার পূজারি; যেন সূর্যের সাথে যুদ্ধ করতে চায়। অতএব তারাও সূর্য থেকে বঞ্চিত। সূর্যের তাপে দগ্ধ হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো লাভ নেই। এটি সেসব

*** টীকা:** এই স্থানে আল্লাহ তা'লার উদ্দেশ্য এটি প্রকাশ করা যে, মসীহ মওউদের সময়ে তিনটি দল থাকবে। একটি দল অবহেলার পথ বেছে নেবে, যারা আলো সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলবে। আর দ্বিতীয় দল অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির পথ অবলম্বন করবে, যারা বিনয় ও নম্রতা সহকারে আলো থেকে লাভবান হবার চেষ্টা করবে না, বরং নির্লজ্জ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো আধ্যাত্মিক রৌদ্রের সামনে কেবল উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু তৃতীয় দল মধ্যমপন্থি হবে। তারা মসীহ মওউদের কাছে কোনোভাবে ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাকুতি-মিনতি করবে। ইয়াজুজ-মাজুজ 'আজীজ' শব্দ থেকে উদ্ভূত, অর্থাৎ সেই জাতি– যারা আগুন ব্যবহারে দক্ষ। –লেখক

মুসলমানের প্রতি ইঙ্গিত যাদের মাঝে মসীহ মওউদ আবির্ভূত হয়েছেন কিন্তু তারা অস্বীকার করেছে ও বিরোধিতায় দণ্ডায়মান হয়েছে আর শিষ্টাচার, লজ্জাবোধ ও সুধারণার ভিত্তিতে কাজ করে নি, ফলে তারা পুণ্য হতে বঞ্চিত হয়ে গেছে। এরপর আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

ثُمَّ اَتۡبَعَ سَبَبًا حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيۡنَ السَّدَّيۡنِ وَجَدَ مِنۡ دُوۡنِهِمَا قَوۡمًا ۙ لَّا يَكَادُوۡنَ يَفۡقَهُوۡنَ قَوۡلًا قَالُوۡا يٰذَا الۡقَرۡنَيۡنِ اِنَّ يَاۡجُوۡجَ وَ مَاۡجُوۡجَ مُفۡسِدُوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ فَهَلۡ نَجۡعَلُ لَكَ خَرۡجًا عَلٰۤى اَنۡ تَجۡعَلَ بَيۡنَنَا وَ بَيۡنَهُمۡ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّىۡ فِيۡهِ رَبِّىۡ خَيۡرٌ فَاَعِيۡنُوۡنِىۡ بِقُوَّةٍ اَجۡعَلۡ بَيۡنَكُمۡ وَ بَيۡنَهُمۡ رَدۡمًا ۙ اٰتُوۡنِىۡ زُبَرَ الۡحَدِيۡدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيۡنَ الصَّدَفَيۡنِ قَالَ انۡفُخُوۡا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوۡنِىۡۤ اُفۡرِغۡ عَلَيۡهِ قِطۡرًا فَمَا اسۡطَاعُوۡۤا اَنۡ يَّظۡهَرُوۡهُ وَ مَا اسۡتَطَاعُوۡا لَهٗ نَقۡبًا قَالَ هٰذَا رَحۡمَةٌ مِّنۡ رَّبِّىۡ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعۡدُ رَبِّىۡ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَ كَانَ وَعۡدُ رَبِّىۡ حَقًّا وَ تَرَكۡنَا بَعۡضَهُمۡ يَوۡمَئِذٍ يَّمُوۡجُ فِىۡ بَعۡضٍ وَّ نُفِخَ فِى الصُّوۡرِ فَجَمَعۡنٰهُمۡ جَمۡعًا ۙ وَّ عَرَضۡنَا جَهَنَّمَ يَوۡمَئِذٍ لِّلۡكٰفِرِيۡنَ عَرۡضَا ۙ الَّذِيۡنَ كَانَتۡ اَعۡيُنُهُمۡ فِىۡ غِطَآءٍ عَنۡ ذِكۡرِىۡ وَ كَانُوۡا لَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ سَمۡعًا اَفَحَسِبَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اَنۡ يَّتَّخِذُوۡا عِبَادِىۡ مِنۡ دُوۡنِىۡۤ اَوۡلِيَآءَ ؕ اِنَّاۤ اَعۡتَدۡنَا جَهَنَّمَ لِلۡكٰفِرِيۡنَ نُزُلًا۔

(আল-কাহাফ: ৯৩-১০৩)

এরপর যুল-কারনাইন অর্থাৎ মসীহ মওউদ অপর একটি উপায় অবলম্বন করবেন আর যখন তিনি এমন এক স্থানে পৌঁছাবেন তথা এমন এক যুগ পাবেন যাকে **بين السدّين** বলা উচিত অর্থাৎ দুই পাহাড়ের মাঝে; এর অর্থ হলো, এমন সময় পাবেন যখন দ্বিমুখী ভয়ের মাঝে পড়ে থাকবেন। ভ্রষ্টতার অপশক্তি রাষ্ট্র-শক্তির হাতে হাত মিলিয়ে ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করবে। সেই দুই শক্তির অধীনে এক জাতিকে পাবেন যারা তার কথা কমই বুঝবে অর্থাৎ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত হবে আর ভুল বিশ্বাসের কারণে তিনি যে পথনির্দেশনা উপস্থাপন করবেন, প্রথমে তারা বুঝতে সক্ষম হবে না কিন্তু অবশেষে বুঝতে পারবে ও হিদায়াত পাবে। তারা হবে তৃতীয় জাতি যারা মসীহ মওউদের কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হবে। তারা তখন যুলকারনাইনকে বলবে, হে যুল-কারনাইন! ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে তাই আপনি যদি চান তাহলে আমরা আপনার জন্য চাঁদা তুলব, যেন আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক দাঁড় করতে পারেন। উত্তরে তিনি বলবেন, যে বিষয়ে খোদা আমাকে শক্তি দিয়েছেন তা তোমাদের চাঁদার চেয়ে উত্তম। অবশ্য তোমরা যদি সাহায্য করতে চাও তাহলে তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে করো যেন আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি দেয়াল

টেনে দিতে পারি। অর্থাৎ এমনভাবে তাদের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করব যেন তারা কোনো তীর্যক আক্রমণ ও আপত্তিকর হামলা করতে না পারে। আমাকে লোহার রড এনে দাও যাতে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া যায় অর্থাৎ নিজেদেরকে দৃঢ়ভাবে আমার শিক্ষার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করো আর পূর্ণ অবিচলতা প্রদর্শন করো। এভাবে লোহার রড হয়ে বিরোধী হামলাকে প্রতিহত করো, এরপর লোহায় আগুন ফুৎকার করো যতক্ষণ না তা আগুনে পরিণত হয়। অর্থাৎ নিজেদের হৃদয়ে এত পরিমাণ খোদাপ্রেম সৃষ্টি করো যেন স্বয়ং ঐশী রঙে রঙিন হয়ে যেতে পারো। স্মরণ রাখা উচিত, খোদার সাথে পরম ভালোবাসার লক্ষণ হলো খোদার প্রেমিকের মাঝে রূপকভাবে খোদার গুণাবলি সৃষ্টি হওয়া। যতদিন এমনটি না হয় ততদিন ভালোবাসার দাবি মিথ্যা। পূর্ণ ভালোবাসার উদাহরণ একান্ত লোহার উদাহরণ। যখন তা আগুনে নিক্ষেপ করা হয় আর তাতে আগুনের এত প্রভাব পড়ে যে, তা আগুন হয়ে যায়। অতএব যদিও মূলত তা লোহা, আগুন নয় কিন্তু আগুন যেহেতু এর ওপর পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার করেছে তাই আগুনের গুণাবলি তা হতে প্রকাশিত হয়। তা আগুনের ন্যায় দগ্ধীভূত করতে পারে, আগুনের মতো তাতে আলো থাকে। সুতরাং খোদাপ্রেমের অন্তর্নিহিত বাস্তবতা হলো, মানুষের সেই রঙে রঙিন হওয়া। ইসলাম যদি এ বাস্তব পর্যায়ে পৌঁছাতে না পারত তাহলে তা অর্থহীন থেকে যেত। কিন্তু ইসলাম এ সত্য পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকে। প্রধানত মানুষের উচিত ঈমানের দৃঢ়তার ক্ষেত্রে লোহার ন্যায় হয়ে যাওয়া। কেননা ঈমানের অবস্থা যদি খড়কুটোর ন্যায় হয়ে থাকে তাহলে আগুন তাকে স্পর্শ করতেই ভস্মীভূত করে দেবে ফলে তা কীভাবে আগুনের বিকাশস্থল হতে পারে? পরিতাপের বিষয় হলো, কতক নির্বোধ– বান্দার সাথে খোদার যে সম্পর্ক আছে, যার ফলে বান্দার ভেতর প্রতিচ্ছায়ারূপে ঐশী গুণাবলি সৃষ্টি হয়– তা না বুঝে আমার ওহী إِنَّما امرك اذا اردتَ شيئًا ان تقول له كُنْ فيكون۔ সম্পর্কে আপত্তি করেছে অর্থাৎ তোমার বিষয় হলো, যখন তুমি কোনোকিছুকে বলো হও, তা হয়ে যায়। এটি খোদার বাণী যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এটি আমার পক্ষ থেকে নয় আর ইসলামের প্রবীণ সূফীরা এর সত্যায়ন করেছেন, যেমনটি কিনা সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী ফতূহুল গাইবে লিখেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনিও একই আয়াত উপস্থাপন করেছেন। পরিতাপ! মানুষ কেবল প্রথাগত ঈমানকে যথেষ্ট মনে করে বসে আছে আর পুরো

তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান তাদের দৃষ্টিতে কুফরী। তারা মনে করে এটিই আমাদের জন্য যথেষ্ট; অথচ তা কিছুই নয়। তারা একথা অস্বীকার করে যে, মহানবী (সা.)-এর পর কারো সাথে সত্যিকার অর্থে ও বাস্তবে খোদা তা'লার বাক্যালাপ হতে পারে। তবে তারা এতটা ধারণা রাখে যে, হৃদয়ে এলকা হয় কিন্তু জানার উপায় নেই যে, সেই এলকা শয়তানী না রহমানী। এরা এটি বুঝে না– এমন এলকায় ঈমানের লাভ কী হলো আর কিবা উন্নতি হলো? বরং এমন এলকা একটি কঠিন পরীক্ষা যার ফলে পাপের আশঙ্কা থাকে বা ঈমান হারিয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। কেননা যদি এমন সন্দেহযুক্ত ওহীতে– যা সম্পর্কে বুঝা যায় না যে, তা শয়তানের পক্ষ থেকে নাকি রহমানের পক্ষ থেকে; কারো প্রতি জোরালো নির্দেশ থাকে যে, এ কাজ করো, কিন্তু শয়তান এ নির্দেশ দিয়েছে ভেবে যদি সে কাজ না করে অথচ সত্যিকার অর্থে তা খোদার নির্দেশ ছিল; এমতাবস্থায় নির্দেশ মানা হতে বিমুখ থাকা পাপ বইকি। আর সত্যিকার অর্থে সেই নির্দেশ যদি শয়তাদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আর তা মান্য করা হয় তাহলে এতে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এমন এলহামপ্রাপ্ত লোকদের তুলনায় এমন মানুষ ভালো ও নিরাপদ থাকল– যাদের প্রতি এমন ভয়াবহ এলহাম হয় না। এমন বিশ্বাস পোষণ করলে বিবেক কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। হতে পারে, খোদার কোনো এলহাম মূসার মায়ের এলহামের মতো হবে যা বাস্তবায়ন করার ফলে তার সন্তানের প্রাণ হুমকির মুখে পড়বে, অথবা যেমনটি খিযর (আ.)-এর এলহাম ছিল, যে কিনা বাহ্যত এক পবিত্র ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল!

এমন বিষয় যেহেতু বাহ্যত শরীয়তের পরিপন্থি তাই শয়তানী হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় কে এগুলোর ওপর আমল করবে? অপরদিকে আমল না করার কারণে আবার পাপিষ্ঠও হবে। হতে পারে, অভিশপ্ত শয়তান এমন কোনো নির্দেশ দেবে যা বাহ্যত শরীয়ত পরিপন্থি মনে হবে না কিন্তু বাস্তবে তা অনেক নৈরাজ্য ও ধ্বংসের কারণ বা অজানা এমন বিষয়াদি হবে– যা হয়ত ঈমান বিনষ্টের কারণ হতে পারে। অতএব খোদার সাথে এমন বাক্যালাপ বা কথোপকথনে লাভ কী?

উল্লিখিত আয়াতের পর আল্লাহ তা'লা পুনরায় বলেন, যে জাতি ইয়াজুজ-মাজুজকে ভয়, করে যুল-কারনাইন বা মসীহ মওউদ তাদেরকে বলবেন, আমাকে তামা এনে দাও যেন আমি তা গলিয়ে দেয়ালে ঢেলে দিতে পারি।

এরপর ইয়াজুজ-মাজুজ এমন দেয়ালে আরোহণের বা তাতে ছিদ্র করার শক্তি রাখবে না। স্মরণ রাখা উচিত, যদিও লোহা দীর্ঘসময় আগুনে থেকে আগুনের রূপধারণ করে কিন্তু তা তত সহজে গলে না; কিন্তু তামা তাড়াতাড়ি গলে যায়। পুণ্যপথের পথিকের জন্য খোদার পথে বিগলিত হওয়া আবশ্যক। অতএব এটি এদিকে ইঙ্গিত যে, এমন সোচ্চার ও কোমল প্রকৃতি নিয়ে আসো যা খোদা তা'লার নিদর্শনাবলি দেখে গলে যাবে, কেননা পাষাণ হৃদয়ে খোদার কোনো প্রভাব পড়ে না। কিন্তু মানুষ শয়তানী হামলা হতে তখন রক্ষা পায় যখন প্রধানত অবিচলতায় সে লোহাসদৃশ হয়ে যায়। আর সেই লোহা– যা খোদার ভালোবাসার আগুনে অগ্নি-রূপধারণ করে আর মন গলে– সেই লোহার ওপর পড়ে এবং সেটিকে বিক্ষিপ্ততা ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করে। আধ্যাত্মিকতার পথে পরম মার্গে উপনীত হওয়ার জন্য শর্ত কেবল এ তিনটি যা শয়তানী আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকার জন্য আলেকজাণ্ডারের প্রাচীর তুল্য। শয়তানী আত্মা এই প্রাচীরে আরোহণ করতে পারে না আর তাতে ছিদ্রও করতে পারে না। পুনরায় বলেন, এটি খোদার কৃপায় হবে এবং তাঁর হাত এ সবকিছু করবে। মানবীয় পরিকল্পনার তাতে কোনো ভূমিকা থাকবে না। কিয়ামতকাল যখন সন্নিকটবর্তী হবে তখন পুনরায় ফিতনা মাথাচাড়া দেবে– এটি খোদার প্রতিশ্রুতি। পুনরায় বলেন, যুল-কারনাইন– যিনি মসীহ মওউদ, তাঁর যুগে প্রতিটি জাতি স্বীয় ধর্মের সমর্থনে দণ্ডায়মান হবে– যেভাবে এক তরঙ্গ অন্য তরঙ্গের ওপর আঁছড়ে পড়ে সেভাবে এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওপর হামলা করবে। তখন আকাশে শিঙায় ফুঁকা হবে অর্থাৎ আকাশের খোদা মসীহ মওউদকে প্রেরণ করে তৃতীয় একটি জাতি সৃষ্টি করবেন এবং তাদের সাহায্যের জন্য বড়ো বড়ো নিদর্শন দেখাবেন, এমনকি সকল পুণ্যবানকে একমাত্র ধর্ম ইসলামে সমবেত করবেন। তারা মসীহর আহ্বান শুনবে এবং তাঁর দিকে ছুটে আসবে। তখন একই রাখাল এবং একই পাল হবে আর সে দিনগুলো হবে খুবই কঠিন। খোদা ভীতিপ্রদ নিদর্শনাবলির মাধ্যমে নিজের চেহারা প্রদর্শন করবেন। যারা কুফরীতে অনড় থাকে তারা বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদের আকারে জাহান্নাম দেখতে পাবে। খোদা বলেন, এরা তারা– যাদের চোখ আমার বাণীর বিষয়ে অন্ধ ছিল আর যাদের কান আমার নির্দেশ শোনার সামর্থ্য রাখত না। এসব অস্বীকারকারী কি ভেবেছিল যে, দুর্বল বান্দাদের খোদা বানানো একটি সামান্য বিষয় আর আমি এভাবে পরিত্যক্ত

হবো? সুতরাং আমরা আতিথেয়তাস্বরূপ তাদের জন্য এ পৃথিবীতে জাহান্নামকে প্রকাশ করব অর্থাৎ অনেক বড়ো বড়ো ভীতিপ্রদ নিদর্শন প্রকাশ পাবে। এসব নিদর্শন তাঁর মসীহ মওউদ-এর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করবে। সেই বদান্যশীল সত্তার কৃপা দেখো, এসব পুরস্কার সেই মাটির ঢেলার (অর্থাৎ এই অধমের) ওপর বর্ষিত হচ্ছে, যাকে বিরোধীরা কাফির এবং দাজ্জাল বলে।

اے خدا اے کارساز و عیب پوش و کردگار　　اے مرے پیارے مرے محسن مرے پروردگار

হে খোদা! হে কার্যনির্বাহক এবং দোষত্রুটি গোপনকারী ও স্রষ্টা!
হে আমার প্রিয়, আমার অনুগ্রহকারী ও লালন-পালকারী প্রভু!

کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس　　وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار

হে অনুগ্রহের আধার! কী করে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন করব!
সে ভাষাই বা পাবো কোথায় যা দ্বারা এ কাজ সাধিত হতে পারে?

بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ　　کر دیا دشمن کو اک حملہ سے مغلوب اور خوار

কুধারণা পোষণকারীদের হাত থেকে তুমি স্বয়ং সাক্ষী হয়ে আমাকে রক্ষা করেছ,
আর শত্রুকে এক আঘাতেই পরাজিত ও লাঞ্ছিত করেছ।

کام جو کرتے ہیں تیری رہ میں پاتے ہیں جزا　　مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار

তোমার ধর্মের জন্য যারা কাজ করে তারা প্রতিদান পায়,
আমার মাঝে এমন কী দেখেছ যে, আমার প্রতি বার বার এমন স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করছ?

تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے اے میرے کریم　　کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلعتِ قرب و جوار

হে আমার সম্মানিত খোদা! তোমার ব্যবহারে আমি বিস্ময়াভিভূত,
আমার কোন কর্মের প্রতিদানস্বরূপ তুমি আমাকে তোমার নৈকট্য ও সান্নিধ্যে ধন্য করেছ?

کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

হে আমার প্রিয়! আমি মাটির কীট, মানুষ আখ্যা পাবারও যোগ্য নই,
আমি মানুষের ঘৃণার লক্ষ্যস্থল আর মানুষের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়।

یہ سراسر فضل و احساں ہے کہ میں آیا پسند ورنہ درگہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گذار

এটি তোমার একান্ত কৃপা ও অনুগ্রহ যে, আমাকে মনোনীত করা হয়েছে,
নতুবা তোমার দরবারে সেবকের কোনো অভাব ছিল না।

دوستی کا دم جو بھرتے تھے وہ سب دشمن ہوئے پر نہ چھوڑا ساتھ تو نے اے میرے حاجت برار

যারা বন্ধু হবার দাবি করত তারা সবাই শত্রু হয়ে গেছে,
কিন্তু হে আমার অভাবমোচনকারী বন্ধু! তুমি কখনো আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করো নি।

اے مرے یارِ یگانہ اے مری جاں کی پنہ بس ہے تو میرے لئے مجھ کو نہیں تجھ بن بکار

হে আমার অনন্য বন্ধু! হে আমার আশ্রয়স্থল!
তুমি আমার জন্য যথেষ্ট, তুমি ছাড়া আমার কাজ চলে না।

میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار

তোমার স্নেহ যদি না হতো তাহলে আমি মারা যেতাম এবং ধুলায় মিশে যেতাম,
এরপর না জানি কোথায় এই ধুলা ফেলে দেওয়া হতো।

اے فدا ہو تیری راہ میں میرا جسم و جان و دل میں نہیں پاتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار

আমার তনুমন তোমার পথে নিবেদিত হোক,
আমি এমন কাউকে খুঁজে পাই না যে তোমার মতো ভালোবাসে।

ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے گود میں تیری رہا میں مثلِ طفلِ شیر خوار

জীবনের সূচনা হতে তোমার ছায়ায় আমার দিন কেটেছে,
তোমার কোলে আমি দুধের শিশুতুল্য ছিলাম।

نسلِ انساں میں نہیں دیکھی وفا جو تجھ میں ہے تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یارِ غمگسار

তোমার মাঝে যে বিশ্বস্ততা রয়েছে তা আমি মানব প্রজন্মে দেখি নি,
তোমার ন্যায় সহানুভূতিশীল কোনো বন্ধু আমি পাই নি।

لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول میں تو نالائق بھی ہوکر پاگیا درگہ میں بار

মানুষ বলে যে, অযোগ্য লোক গৃহীত হয় না–
আমি তো অযোগ্য হয়েও তোমার দরবারে অনুগ্রহভাজন হয়েছি।

اس قدر مجھ پر ہوئیں تیری عنایات و کرم جن کا مشکل ہے کہ تاروزِ قیامت ہو شمار

আমার প্রতি তোমার এত অনুগ্রহ ও আশিস বর্ষিত হয়েছে যে,
কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তা গুণে শেষ করা যাবে না।

آسماں میرے لئے تو نے بنایا اِک گواہ چاند اور سورج ہوئے میرے لئے تاریک و تار

আকাশকে তুমি আমার জন্য সাক্ষী বানিয়েছ,
চন্দ্র ও সূর্য আমার জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে (অর্থাৎ গ্রহণ লেগেছে)।

تو نے طاعوں کو بھی بھیجا میری نصرت کے لئے تا وہ پورے ہوں نشاں جو ہیں سچائی کا مدار

তুমি আমার সাহায্যার্থে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছ,
যেন সেসব নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করে যার ওপর সত্য নির্ভরশীল।

ہوگئے بیکار سب حیلے جب آئی وہ بلا ساری تدبیروں کا خاکہ اُڑ گیا مثلِ غبار

সেই বিপদ যখন এসে গেল তখন বিরোধীদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেল,
সকল ষড়যন্ত্র ধুলার ন্যায় উড়ে গেল।

سرزمین ہند میں ایسی ہے شہرت مجھ کو دی جیسے ہووے برق کا اک دم میں ہر جا انتشار

তুমি আমাকে সমগ্র ভারতে এমন খ্যাতি দান করেছ,
যেন নিমিষে সর্বত্র বিদ্যুতের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

پھر دوبارہ ہے اُتارا تو نے آدم کو یہاں تا وہ نخلِ راستی اس ملک میں لاوے ثمار

তুমি পুনরায় আদমকে এখানে প্রেরণ করেছ,
যেন সত্যের সেই বৃক্ষ এখানে ফল দিতে পারে।

لوگ سَو بک بک کریں پر تیرے مقصد اور ہیں تیری باتوں کے فرشتے بھی نہیں ہیں راز دار

মানুষ শত বকবক করতে পারে কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য ভিন্ন;
এমনকি ফেরেশতারাও তোমার গোপন বিষয়াদি জানে না।

ہاتھ میں تیرے ہے ہر خسران و نفع و عُسر و یُسر تو ہی کرتا ہے کسی کو بے نوا یا بختیار

সকল লাভ-লোকসান ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য তোমার হাতে,
তুমিই কাউকে অসহায় আর কাউকে ক্ষমতাধর করে থাকো।

جس کو چاہے تختِ شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو جس کو چاہے تخت سے نیچے گرادے کر کے خوار

যাকে চাও তুমি রাজ সিংহাসনে বসাও আর
যাকে চাও লাঞ্ছিত করে রাজ সিংহাসন থেকে ফেলে দাও।

میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں اک نشاں جس کو تو نے کر دیا ہے قوم و دیں کا افتخار

আমিও পৃথিবীর মাঝে তোমার নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি নিদর্শন,
যাকে তুমি জাতি ও ধর্মের গৌরব হিসেবে সৃষ্টি করেছ।

فانیوں کی جاہ و حشمت پر بلا آوے ہزار سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار

নশ্বর লোকদের প্রতিপ্রত্তি-ঐশ্বর্যের ওপর সকল প্রকার বিপদ নেমে আসুক!
কেবল তোমার রাজত্বই চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

عزت و ذلّت یہ تیرے حکم پر موقوف ہیں تیرے فرماں سے خزاں آتی ہے اور بادِ بہار

সম্মান ও লাঞ্ছনা তোমার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল,
তোমার নির্দেশেই শরৎ ও বসন্ত এসে থাকে।

میرے جیسے کو جہاں میں تو نے روشن کر دیا کون جانے اے مرے مالک ترے بھیدوں کی سار

আমার মতো একজন মানুষকে তুমি পৃথিবীতে আলোকিত করে দিয়েছ,
হে আমার প্রভু! তোমার রহস্যের গভীরতা কে উদ্‌ঘাটন করতে পারে?

تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہیں گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار

হে আমার প্রতিপালক! তোমার কাজ কত বিস্ময়কর!
কেউ না চাইলেও তুমি তাকে জোরপূর্বক ফলে ধন্য করে থাকো।

ابتدا سے گوشۂ خلوت رہا مجھ کو پسند شہرتوں سے مجھ کو نفرت تھی ہر اک عظمت سے عار

শুরু থেকে নির্জনতাই আমার পছন্দ ছিল।
খ্যাতিকে আমি ঘৃণা করতাম আর সকল মাহাত্ম্যকে অপছন্দ করতাম।

پر مجھے تو نے ہی اپنے ہاتھ سے ظاہر کیا میں نے کب مانگا تھا یہ تیرا ہی ہے سب برگ و بار

কিন্তু তুমি নিজ হাতে আমাকে প্রকাশ করেছ,
আমি কখনো তা যাচনা করি নি, এ ফল ও বাগান তোমারই অনুগ্রহ।

اس میں میرا جرم کیا جب مجھ کو یہ فرماں ملا کون ہوں تا رد کروں حکمِ شہِ ذِی الاقتدار

আমি প্রত্যাদিষ্ট হলে এতে আমার কী দোষ!
সর্বক্ষমতাধর বাদশার নির্দেশ অমান্য করার ধৃষ্টতা আমার নেই।

اب تو جو فرماں ملا اُس کا ادا کرنا ہے کام گرچہ میں ہوں بس ضعیف و ناتواں و دل فگار

আমি যেহেতু প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি তাই সেই দায়িত্ব পালন করা হলো আমার কর্তব্য,
আমি যদিও দুর্বল অসহায় আর আমার হৃদয় ব্যথিত।

دعوتِ ہر ہرزہ گو کچھ خدمتِ آساں نہیں ہر قدم میں کوہِ ماراں ہر گذر میں دشتِ خار

কোনো অপলাপকারীকে তবলীগ করা সহজ কাজ নয়,
প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষ পরীক্ষা ও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়।

چرخ تک پہنچے ہیں میرے نعرہ ہائے روز و شب پر نہیں پہنچی دلوں تک جاہلوں کے یہ پکار

আমার দিনরাতের কাকুতি-মিনতি আকাশে পৌঁছে গিয়েছে,
কিন্তু এই আহাজারি অজ্ঞদের হৃদয়ে স্থান পায় নি।

قبضۂ تقدیر میں دل ہیں اگر چاہے خدا پھیر دے میری طرف آجائیں پھر بے اختیار

হৃদয় ঐশী তকদীরের মুঠোয়– যদি খোদা চান
সেগুলোকে আমার দিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন যা তখন অবলীলায় আমার দিকে ছুটে আসবে।

گر کرے مُعجز نمائی ایک دم میں نرم ہو وہ دلِ سنگیں جو ہووے مثلِ سنگ کوہسار

তিনি যদি নিদর্শন প্রদর্শন করেন তাহলে সে-সব হৃদয়ও নিমিষে কোমল হতে পারে,
যা পাহাড়ের পাথরের মতো শক্ত।

ہائے میری قوم نے تکذیب کرکے کیا لیا زلزلوں سے ہوگئے صدہا مساکن مثلِ غار

পরিতাপ! আমার জাতি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে কী পেল?
ভূমিকম্পের কারণে শত শত ঘর গুহাসদৃশ হয়ে গিয়েছে।

شرط تقویٰ تھی کہ وہ کرتے نظر اس وقت پر شرط یہ بھی تھی کہ کرتے صبر کچھ دن اور قرار

তাকওয়ার দাবি ছিল তাদের সে সময়ের ওপর দৃষ্টি রাখা,
তাকওয়ার দাবি ছিল ধৈর্য ধরা ও ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করা।

کیا وہ سارے مرحلے طے کر چکے تھے علم کے کیا نہ تھی آنکھوں کے آگے کوئی رہ تاریک و تار

তারা কি জ্ঞানের সকল মার্গ অতিক্রম করে ফেলেছে?
তাদের চোখের সামনে কি কোনো অন্ধকার ও অমানিশায় আচ্ছন্ন রাস্তা ছিল না?

دل میں جو ارماں تھے وہ دل میں ہمارے رہ گئے دشمن جاں بن گئے جن پر نظر تھی بار بار

আমাদের হৃদয়ে যে বাসনা ছিল তা হৃদয়েই রয়ে গেল,
যাদের কাছ থেকে সমর্থন পাবার আশা ছিল তারা আমার প্রাণের শত্রু হয়ে গেল।

ایسے کچھ بگڑے کہ اب بننا نظر آتا نہیں آہ کیا سمجھے تھے ہم اور کیا ہوا ہے آشکار

তারা এতটা বিকৃতির শিকার হয়েছে যে, এখন আর শুধরানোর কোনো উপায় দেখা যায় না,
পরিতাপ! কী ভেবেছিলাম আর কী প্রকাশ পেল!

کس کے آگے ہم کہیں اِس دردِ دل کا ماجرا اُن کو ہے ملنے سے نفرت بات سننا درکنار

এই ব্যথিত হৃদয়ের কথা কাকে সুধাই?
তারা আমার সাথে সাক্ষাৎকেই ঘৃণা করে– কথা বলা তো দূরের কথা!

کیا کروں کیونکر کروں مَیں اپنی جاں زیر و زبر کس طرح میری طرف دیکھیں جو رکھتے ہیں نقار

আমি কী করব, কীভাবে প্রাণ বিসর্জন দেবো?
যারা বিদ্বেষ রাখে তারা যাতে আমার প্রতি কর্ণপাত করতে পারে।

اِس قدر ظاہر ہوئے ہیں فضل حق سے معجزات دیکھنے سے جن کے شیطاں بھی ہوا ہے دلفگار

খোদার কৃপায় এত বেশি নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে যে,
তা দেখে শয়তানও মনোবল হারিয়ে বসেছে।

پر نہیں اکثر مخالف لوگوں کو شرم و حیا دیکھ کر سو سو نشاں پھر بھی ہے تو ہیں کاروبار

কিন্তু বেশিরভাগ বিরোধীর লাজলজ্জা নেই,
শত শত নিদর্শন দেখেও গালমন্দ করাই তাদের কাজ।

صاف دل کو کثرتِ اعجاز کی حاجت نہیں اِک نشاں کافی ہے گر دل میں ہے خوف کردگار

স্বচ্ছ হৃদয় অনেক বেশি নিদর্শনের মুখাপেক্ষী নয়,
হৃদয়ে খোদাভীতি থাকলে একটি নিদর্শনই যথেষ্ট।

دن چڑھا ہے دشمنانِ دیں کا ہم پر رات ہے اے مرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بیقرار

ধর্মের শত্রুদের এখন দিন আর আমাদের রাত,
হে আমার সূর্য! উদিত হও, কেননা আমি ব্যাকুল।

اے مرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرّہ مرا پھیر دے میری طرف اے ساربان جگ کی مہار

হে আমার প্রিয়! আমার অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দু তোমার জন্য উৎসর্গীত হোক।
হে বিশ্বের চালিকাশক্তি! তুমি জনশ্রোতকে আমার অনুকূলে করে দাও।

کچھ خبر لے تیرے کوچہ میں یہ کس کا شور ہے خاک میں ہوگا یہ سر گر تو نہ آیا بن کے یار

কিছুটা খবর নাও তোমার গলিতে এটি কার ক্রন্দন?
এ মাথা ধুলায় লুটিয়ে পড়বে যদি তুমি বন্ধু সেজে না আসো।

فضل کے ہاتھوں سے اب اِسوقت کر میری مدد کشتیٔ اسلام تا ہو جائے اس طوفاں سے پار

দয়ার হাত আমার সাহায্যের জন্য প্রসারিত করো,
যেন ইসলামের তরী সফলভাবে এই তুফান কাটিয়ে উঠতে পারে।

میرے سُقم و عَیب سے اب کیجئے قطعِ نظر تا نہ خوش ہو دشمنِ دیں جس پہ ہے لعنت کی مار

আমার দুর্বলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি দয়া করে উপেক্ষা করো,
যেন ইসলামের অভিশপ্ত শত্রু উল্লসিত হবার সুযোগ না পায়।

میرے زخموں پر لگا مرہم کہ میں رنجور ہوں　　میری فریادوں کو سن میں ہو گیا زار و نزار

আমার ক্ষতে মলমের প্রলেপ দাও, কেননা আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত;
আমার ফরিয়াদ শোনো! কেননা আমাকে চরমভাবে অপদস্ত করা হয়েছে।

دیکھ سکتا ہی نہیں میں ضُعفِ دینِ مصطفی　　مجھ کو کر اے میرے سلطاں کامیاب و کامگار

মুস্তফা (সা.)-এর ধর্মের দুর্বলতা আমার কাছে অসহনীয়,
হে আমার বাদশা! তুমি আমাকে সফল ও কৃতকার্য করো।

کیا سُلائے گا مجھے تو خاک میں قبل از مراد　　یہ تو تیرے پر نہیں امید اے میرے حصار

তুমি কি আমাকে আমার অভিষ্ট অর্জনের পূর্বেই মৃত্যু দেবে?
হে আমার আশ্রয়দাতা! তোমার কাছে এটি আশা করি না,

یا الٰہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا　　اس شکستہ ناؤ کے بندوں کے اب سن لے پکار

হে আমার প্রভু! ইসলামের প্রতি কৃপা করো আর নিজেই রক্ষা করো।
এই পরাজিত ও শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন তরির আরোহীদের আহাজারি গ্রহণ করো,

قوم میں فسق و فجور و معصیت کا زور ہے　　چھا رہا ہے ابرِ یاس اور رات ہے تاریک و تار

জাতি পাপাচার ও অবাধ্যতায় সীমাতিক্রম করেছে,
নৈরাশ্যের মেঘমালা ছড়িয়ে পড়ছে আর রাত গভীর অমানিশায় আচ্ছন্ন হয়ে চলেছে।

ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر　　پھیر دے اب میرے مولیٰ اس طرف دریا کی دھار

এক বিশাল জনগোষ্ঠী তোমার স্বর্গীয় পানির জন্য হাহাকার করে বিদায় নিয়েছে,
হে আমার প্রভু! তুমি নদীর প্রবাহ এ মুখী করে দাও।

اب نہیں ہیں ہوش اپنے اِن مصائب میں بجا　　رحم کر بندوں پہ اپنے تا وہ ہوویں رستگار

এসব সমস্যার মুখে চিন্তাভাবনার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাচ্ছে,
তোমার বান্দাদের প্রতি কৃপা করো, যেন তারা মুক্তি পেতে পারে।

کس طرح پٹیں کوئی تدبیر کچھ بنتی نہیں بے طرح پھیلی ہیں یہ آفات ہر سو ہر کنار

কীভাবে কেউ পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে, কেননা কোনো পরিকল্পনা সফল হতে দেখছি না।
সর্বত্র এই সমস্যাবলি নৈরাজ্যরূপে বিরাজমান।

ڈوبنے کو ہے یہ کشتی آمرے اے ناخدا آگیا اِس قوم پر وقتِ خزاں اندر بہار

হে আমার ত্রাতা! এই নৌকা নিমজ্জমান– ছুটে আসো,
বসন্তে এ জাতির ওপর শরৎ নেমে এসেছে।

نورِ دل جاتا رہا اور عقل موٹی ہوگئی اپنی کج رائی پہ ہردل کر رہا ہے اعتبار

হৃদয়ের জ্যোতি হারিয়ে যাচ্ছে আর বিবেকবুদ্ধি বিলুপ্ত প্রায়,
সবাই নিজের বক্র ধ্যানধারণার ওপর নির্ভর করে বসে আছে।

جس کو ہم نے قطرۂ صافی تھا سمجھا اور تقی غور سے دیکھا تو کیڑے اُس میں بھی پائے ہزار

যাকে আমরা পরিষ্কার পানি ও মুত্তাকী জ্ঞান করেছিলাম,
গভীরভাবে দেখে তাতেও সহস্র পোকামাকড় দেখতে পেলাম।

دوربینِ معرفت سے گند نکلا ہر طرف اس وبا نے کھالئے ہر شاخِ ایمان کے ثمار

তত্ত্বজ্ঞানের দূরবীণে সর্বত্র নোংরামিই দেখলাম,
এই মহামারি ঈমানের সকল শাখার ফলগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

اے خدا بن تیرے ہو یہ آبپاشی کس طرح جل گیا ہے باغِ تقویٰ دیں کی ہے اب اک مزار

হে খোদা! তুমি ছাড়া এই পানি সিঞ্চন সম্ভব নয়,
তাকওয়ার বাগান জ্বলে গেছে আর ধর্মের সমাধি রচিত হয়েছে।

تیرے ہاتھوں سے مرے پیارے اگر کچھ ہو تو ہو ورنہ فتنہ کا قدم بڑھتا ہے ہر دم سیل وار

হে আমার প্রিয়! তোমার হাতেই কিছু হওয়া সম্ভব;
নতুবা নৈরাজ্য চুতুর্দিকে প্রবল বন্যার রূপধারণ করেছে।

اِک نشاں دکھلا کہ اب دیں ہو گیا ہے بے نشاں اِک نظر کر اس طرف تا کچھ نظر آوے بہار

একটি নিদর্শন দেখাও, কেননা ধর্ম এখন নিশ্চিহ্নপ্রায়;
এদিকে দৃষ্টি দাও যেন বসন্ত দৃশ্যমান হয়।

کیا کہوں دنیا کے لوگوں کی کہ کیسے سوگئے کسقدر ہے حق سے نفرت اور ناحق سے پیار

মানুষের কথা আর কী বলব! সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে,
সত্যের প্রতি কত গভীর ঘৃণা আর অসত্যের জন্য রয়েছে গভীর ভালোবাসা।

عقل پر پردے پڑے سوسو نشاں کو دیکھ کر نور سے ہوکر الگ چاہا کہ ہوویں اہلِ نار

শত শত নিদর্শন দেখেও তাদের বিবেকে পর্দা পড়ে আছে,
আলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের আগুনের অধিবাসী হওয়া পছন্দ।

گر نہ ہوتی بدگمانی کفر بھی ہوتا فنا اُس کا ہووے ستیاناس اِس سے بگڑے ہوشیار

তাদের পক্ষ থেকে যদি এমন কুধারণা না হতো তাহলে কুফর মিটে যেত,
সেটির ওপর অভিশাপ! কেননা এর কারণে বুদ্ধিমান মানুষও নষ্ট হয়ে গেছে।

بدگمانی سے تو رائی کے بھی بنتے ہیں پہاڑ پَر کے اک ریشہ سے ہوجاتی ہے کوّوں کی قطار

কুধারণার বশে মানুষ তিলকে তাল করে,
ডানার একটি পালক অনেক সময় কাকের সারি হয়ে যায়।

حد سے کیوں بڑھتے ہو لوگو کچھ کرو خوفِ خدا کیا نہیں تم دیکھتے نصرت خدا کی بار بار

হে লোকসকল! কেন সীমাতিক্রম করছ? খোদাকে ভয় করো,
তোমরা কি বার বার খোদার সাহায্য দেখতে পাচ্ছো না?

کیا خدا نے اتقیا کی عون و نصرت چھوڑ دی ایک فاسق اور کافر سے وہ کیوں کرتا ہے پیار

খোদা কি মুত্তাকীদের সাহায্য-সহযোগিতা করা ছেড়ে দিয়েছেন?
একজন পাপিষ্ঠ ও কাফিরকে তিনি কেন সাহায্য করেন?

ایک بدکردار کی تائید میں اتنے نشاں کیوں دکھاتا ہے وہ کیا ہے بدکنوں کا رشتہ دار

একজন পাপাচারির সমর্থনে এত নিদর্শন কেন প্রকাশ করেন?
তিনি কি পাপীদের আত্মীয় হন?

کیا بدلتا ہے وہ اب اس سنت و قانون کو جس کا تھا پابند وہ از ابتدائے روزگار

তিনি কি তার সেই রীতি ও নিয়ম এখন পরিবর্তন করেছেন,
যা তিনি সৃষ্টির সূচনা থেকে অনুসরণ করে আসছেন?

آنکھ گر پھوٹی تو کیا کانوں میں بھی کچھ پڑ گیا کیا خدا دھوکے میں ہے اور تم ہو میرے راز دار

চোখ অন্ধ হলো মানলাম– কানের কী হয়েছে?
খোদা কি প্রতারিত হলেন, আর তোমরা আমার হৃদয়ের রহস্য অবগত?

جس کے دعویٰ کی سراسر افترا پر ہے بِنا اُس کی یہ تائید ہو پھر جھوٹ سچ میں کیا نکھار

যার দাবির পুরো ভিত্তি হলো মিথ্যা ও প্রতারণার ওপর,
তাকে যদি এভাবে সাহয্য-সমর্থন করা হয় তাহলে মিথ্যা ও সত্যের পার্থক্য কী থাকল?

کیا خدا بھولا رہا تم کو حقیقت مل گئی کیا رہا وہ بے خبر اور تم نے دیکھا حالِ زار

খোদা জানতেন না আর তোমরা সত্য উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছ?
তিনি অনবহিত ছিলেন আর তোমরা গোপন বিষয়াদি জেনে গেছ?

بدگمانی نے تمہیں مجنون و اندھا کر دیا ورنہ تھے میری صداقت پر براہیں بیشمار

কুধারণা তোমাদের উন্মাদ ও অন্ধ করে দিয়েছে,
নতুবা আমার সত্যতার পক্ষে অগণিত প্রমাণ রয়েছে।

جہل کی تاریکیاں اور سوء ظن کی تند باد جب اکٹھے ہوں تو پھر ایماں اُڑے جیسے غبار

অজ্ঞতার অন্ধকার আর কুধারণার প্রবল বায়ু যখন একাকার হয়ে যায়,
তখন ঈমান ধুলাবালির ন্যায় উড়ে যায়।

زہر کے پینے سے کیا انجام جز موت و فنا بدگمانی زہر ہے اس سے بچو اے دیں شعار

বিষপানের পরিণাম মৃত্যু ও বিলুপ্তি ছাড়া আর কী হতে পারে?
কুধারণা হলো বিষ– হে ধর্মানুসারীরা! এটি এড়িয়ে চলো।

کانٹے اپنی راہ میں بوتے ہیں ایسے بدگمان جن کی عادت میں نہیں شرم و شکیب و اصطبار

এমন কুধারণা পোষণকারীরা নিজেদের পথে কাঁটাগাছ রোপণ করে,
যাদের মাঝে লজ্জাবোধ, ধৈর্য ও সহনশীলতা নেই।

یہ غلط کاری بشر کی بدنصیبی کی ہے جڑ پر مقدر کو بدل دینا ہے کس کے اختیار

এই অপকর্ম মানুষের দুর্ভাগ্যের মূল;
কিন্তু ভাগ্য কে পরিবর্তন করতে পারে?

سخت جاں ہیں ہم کسی کے بغض کی پروا نہیں دل قوی رکھتے ہیں ہم دردوں کی ہے ہم کو سہار

আমরা কঠোর পরিস্থিতির মোকাবিলা করে অভ্যস্ত কারো বিদ্বেষের ভ্রূক্ষেপ করি না,
আমরা শক্তিশালী হৃদয়ের অধিকারী আর বেদনা সয়ে অভ্যস্ত।

جو خدا کا ہے اُسے للکارنا اچھا نہیں ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبۂ زار و نزار

যে খোদার– তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ভালো নয়,
হে ভীতু শিয়াল! সিংহের গায়ে হাত দিস না।

ہے سرِ رہ پر مرے وہ خود کھڑا مولیٰ کریم پس نہ بیٹھو میری رہ میں اے شریرانِ دیار

পথে আমার সম্মানিত প্রভু দাঁড়িয়ে আছেন,
সুতরাং হে দেশের দুষ্কৃতকারীরা! আমার পথে বাধ সেধো না।

سنت اللہ ہے کہ وہ خود فرق کو دکھلائے ہے تا عیاں ہو کون پاک اور کون ہے مُردار خوار

খোদার এটি রীতি অর্থাৎ তিনি স্বয়ং পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন,
যেন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কে পবিত্র আর কে মৃত লাশ ভক্ষণকারী।

مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے اِک میرا معیں تیغ کو کھینچے ہوئے اُس پر جو کرتا ہے وہ وار

পর্দার অন্তরালে আমি আমার একজন সাহায্যকারীকে দেখতে পাচ্ছি,
তিনি তার জন্য তরবারি উঁচিয়ে রেখেছেন যে হামলা করে।

دشمنِ غافل اگر دیکھے وہ بازو وہ سلاح ہوش ہو جائیں خطا اور بھول جائے سب نقار

উদাসীন শত্রু সেই হাত ও সেই অস্ত্র যদি দেখত,
তাহলে বিস্ময়ের কোনো সীমা থাকত না আর সব বাজনা ভুলে যেত।

اس جہاں کا کیا کوئی داور نہیں اور داد گر پھر شریرالنفس ظالم کو کہاں جائے فرار

এই জগতে কি কোনো বিচারক নেই ও ন্যায়ের রক্ষক কি কেউ নেই?
(অবশ্যই আছে)
তাই দুষ্কৃতকারী সীমালঙ্ঘনকারীর পালানোর কোনো পথ নেই।

کیوں عجب کرتے ہو گر میں آگیا ہو کر مسیح خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ بادِ بہار

আমি মসীহ হয়ে আগমন করলে অবাক আশ্চর্য হবার কী আছে?
স্বয়ং এই বসন্ত সমীরণ একজন মসীহকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

آسمان پر دعوتِ حق کیلئے اک جوش ہے ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اُتار

ঊর্ধ্বলোকে সত্যের প্রচারের জন্য এক উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে,
পুণ্য স্বভাবের লোকদের ওপর ফেরেশতা অবতীর্ণ হচ্ছে।

آرہا ہے اس طرف احرارِ یورپ کا مزاج نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگہ زندہ وار

ইউরোপের স্বাধীনচেতাদের দৃষ্টিও এর প্রতি নিবদ্ধ হচ্ছে,
মৃতদেহে অকস্মাৎ প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে।

کہتے ہیں تثلیث کو اب اہل دانش الوداع پھر ہوئے ہیں چشمۂ توحید پر از جاں نثار

বিজ্ঞজনরা এখন ত্রিত্ববাদ পরিহার করছে,
এরপর একত্ববাদের ঝরনার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে।

باغ میں ملّت کے ہے کوئی گل رعنا کھلا آئی ہے بادِ صبا گلزار سے مستانہ وار

ধর্ম-কাননে মনোরম এক ফুল ফুটেছে,
পুষ্পোদ্যান থেকে পাগলা প্রভাত-সমীরণ ধেয়ে আসছে।

آرہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اُس کا انتظار

এখন আমি আমার ইউসুফের সুঘ্রাণ পাচ্ছি,
আমাকে যতই উন্মাদ বলো না কেন, আমি তাঁর অপেক্ষা করছি।

ہر طرف ہر ملک میں ہے بت پرستی کا زوال کچھ نہیں انساں پرستی کو کوئی عزّ و وقار

সর্বত্র সকল দেশে মুর্তিপূজা হ্রাস পাচ্ছে,
মানবপূজার কোনো সম্মান ও মাহাত্ম্য নেই।

آسماں سے ہے چلی توحیدِ خالق کی ہوا دل ہمارے ساتھ ہیں گو مُنہ کریں بک بک ہزار

আকাশ থেকে খোদার একত্ববাদের সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে,
তারা মুখে সহস্রবার বকবক করতে পারে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমাদের কথার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

اسمعوا صوت السّماء جاء المسیح جاء المسیح　　نیز بشنو از زمیں آمد امامِ کامگار

মসীহ এসে গিয়েছেন, মসীহ এসে গিয়েছেন, স্বর্গীয় এই ধ্বনি শোনো!
একই সাথে ধরা থেকে উদ্ভূত কথাও শোনো যে, বিজয়ী ইমাম এসে
গিয়েছেন।

آسماں بارد نشان الوقت مے گوید زمیں　　ایں دو شاہد از پئے من نعرہ زن چوں بیقرار

আকাশ থেকে নিদর্শনের বৃষ্টি হচ্ছে আর ধরা বলছে যে, এটিই সময়–
এই দুটি সাক্ষী ব্যাকুল হয়ে আমার পক্ষে চিৎকার করছে।

اب اِسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے　　وقت ہے جلد آؤ اے آوارگانِ دشتِ خار

হে লোকসকল! এখন এই বাগানেই প্রশান্তি ও আরাম বিদ্যমান,
হে যারা কণ্টকময় জঙ্গলে হাবুডুবু খাচ্ছো! এখনও সময় আছে সত্বর আসো।

اِک زماں کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا　　پھر خدا جانے کہ کب آویں یہ دن اور یہ بہار

দীর্ঘকাল পর এই সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে,
এমন সময় আর এমন বসন্ত কখন আসবে– তা খোদা-ই ভালো জানেন।

اے مکذّب کوئی اس تکذیب کا ہے انتہا　　کب تلک تو خوئے شیطاں کو کرے گا اختیار

হে সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী! এভাবে মিথ্যা আখ্যা দেবার শেষ কোথায়?
আর কতকাল শয়তানের চরিত্রে অভ্যস্ত থাকবে?

ملّت احمد کی مالک نے جو ڈالی تھی بِنا　　آج پوری ہو رہی ہے اے عزیزانِ دیار

আহমদ (আ.)-এর জামা'তের মালিকের প্রভু যে গৃহ নির্মাণ করেছেন,
আজ এটি পূর্ণতা লাভ করছে হে আমার স্বদেশবাসীগণ!

گلشنِ احمد بنا ہے مسکنِ بادِ صبا　　جس کی تحریکوں سے سنتا ہے بشر گفتارِ یار

আহমদের বাগান বসন্ত সমীরণে সুরভিত,
যার প্রেরণায় মানুষ প্রেমাস্পদের আলাপচারিতা শুনতে পায়।

ورنہ وہ ملّت وہ رہ وہ رسم وہ دیں چیز کیا　　سایہ افگن جس پہ نور حق نہیں خورشید وار

নতুবা সেই ধর্ম, সেই পথ ও সেই ঈমান কোন কাজের?
যার ওপর সত্যের আলো সমুজ্জ্বল সূর্যের মতো পড়ে না।

دیکھ کر لوگوں کے کینے دل مرا خوں ہو گیا قصد کرتے ہیں کہ ہو پامال درِّ شاہوار

মানুষের বিদ্বেষ দেখে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়,
তারা চায় মূল্যবান মোতি পদপিষ্ট হোক।

ہم تو ہر دم چڑھ رہے ہیں اک بلندی کی طرف وہ بلاتے ہیں کہ ہو جائیں نہاں ہم زیرِ غار

আমরা প্রতিটি মুহূর্ত উচ্চতার দিকে আরোহণ করছি,
তারা আমাদের ডাকছে যেন আমরা গুহার অতলে হারিয়ে যাই।

نُورِ دل جاتا رہا اِک رسم دیں کی رَہ گئی پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی مصلحِ دیں کیا بکار

হৃদয়ের জ্যোতি ক্রমাগতভাবে হারিয়ে যেতে থাকে আর ধর্মের কেবল একটি প্রথা অবশিষ্ট রয়ে যায়,
তবুও তারা বলে যে, ধর্মের সংস্কারকের এখানে কাজ কী?

راگ وہ گاتے ہیں جس کو آسماں گاتا نہیں وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلافِ شہریار

তারা সেই বাদ্য বাজায় যা স্বর্গে অনুরণিত হয় না,
তাদের ইচ্ছা খোদার ইচ্ছার বিরোধী।

ہائے مارِ آستیں وہ بن گئے دیں کے لئے وہ تو فربہ ہو گئے پر دیں ہوا زار و نزار

পরিতাপ! তারা ধর্মের জন্য আস্তিনের সাপ হয়ে গেছে,
তারা অহংকারী বা স্থূল হয়ে উঠেছে কিন্তু ধর্মের অবস্থা শোচনীয়।

اِن غموں سے دوستو خم ہو گئی میری کمر میں تو مر جاتا اگر ہوتا نہ فضل کردگار

হে বন্ধুগণ! এসব বেদনায় আমার কোমর বাঁকা হয়ে গেছে,
যদি খোদার কৃপা না হতো তাহলে আমি মারা যেতাম।

اِس تپش کو میری وہ جانے کہ رکھتا ہے تپش اِس اَلَم کو میرے وہ سمجھے کہ ہے وہ دِلفگار

আমার এই অন্তর্জ্বালা তিনি বুঝেন কেননা তিনি আমার জন্য ভালোবাসা রাখেন,
আমার এই বেদনাকে তিনি বুঝেন কেননা তিনি আমার জন্য দুঃখিত।

کون روتا ہے کہ جس سے آسماں بھی رو پڑا مہر و ماہ کی آنکھ غم سے ہوگئی تاریک و تار

এমন কে কাঁদছে যার কারণে আকাশও কেঁদে উঠেছে,
চন্দ্র-সূর্যের চোখ দুঃখের কারণে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

مفتری کہتے ہوئے ان کو حیا آتی نہیں کیسے عالِم ہیں کہ اُس عالَم سے ہیں یہ برکنار

আমাকে মিথ্যা রটনাকারী বলতে এদের লজ্জা হয় না,
এরা কেমন আলেম যে, সে জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞ।

غیر کیا جانے کہ دلبر سے ہمیں کیا جوڑ ہے وہ ہمارا ہو گیا اس کے ہوئے ہم جاں نثار

প্রিয়তমের সাথে আমাদের সম্পর্কবন্ধন কেমন তা অন্যরা কী বুঝবে?
তিনি আমাদের হয়ে গেলেন আর আমরা তাঁর জন্য নিবেদিত।

میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بیشمار

আমি কখনো আদম কখনো মূসা আর কোনো সময় ইয়াকূব,
আর কোনো সময় আমি ইবরাহীম; আমার প্রজন্ম অগণিত।

اِک شجر ہوں جس کو داؤدی صفت کے پھل لگے میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار

আমি একটি বৃক্ষ যাতে দাউদের বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ ফল ধরেছে,
আমি দাউদ আর জালুত আমার শিকার।

پر مسیحا بن کے میں بھی دیکھتا روئے صلیب گر نہ ہوتا نام احمد جس پہ میرا سب مدار

মসীহ হিসেবে আমাকেও ক্রুশবিদ্ধ করা হতো,
যদি আমার নাম আহমদ না রাখা হতো; এর ওপরই আমার সবকিছুর ভিত্তি।

دشمنوں! ہم اس کی رہ میں مر رہے ہیں ہر گھڑی کیا کرو گے تم ہماری نیستی کا انتظار

হে আমার শত্রুগণ! আমরা প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর পথে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছি,
তোমরা কি আমাদেরকে নিঃশেষ করার জন্য নিরর্থক অপেক্ষা করছ?

سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں اے مرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار

আপাদমস্তক সেই বন্ধু আমার মাঝে বিরাজমান,
হে আমার ধ্বংসকামী! একটু ভেবেচিন্তে আমার ওপর হামলা করো।

کیا کروں تعریف حُسنِ یار کی اور کیا لکھوں اک ادا سے ہو گیا میں سیلِ نفس دوں سے پار

বন্ধুর সৌন্দর্যের গুণগান গাওয়া আর এ সম্পর্কে সবকিছু লেখা আমার জন্য সম্ভব নয়?
যার একটিমাত্র অনুগ্রহের কল্যাণে আমি অবাধ্য প্রবৃত্তির বন্যা হতে মুক্তি লাভ করেছি।

اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا　　آنکھ میں اس کی کہ ہے وہ دور تر از صحنِ یار

আমার তত্ত্বজ্ঞান এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে,
আমি তাদের দৃষ্টিতে কাফির হয়ে গেলাম যে কিনা খোদার দরবার থেকে বিতাড়িত।

اُس رُخِ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی　　ہو گئے اسرار اس دلبر کے مجھ پر آشکار

সেই উজ্জ্বল চেহারার কল্যাণে আমার চোখও উজ্জ্বল হয়ে গেল,
সেই বন্ধুর রহস্য আমার কাছে প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে।

قوم کے لوگو! اِدھر آؤ کہ نکلا آفتاب　　وادیٔ ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار

হে আমার জাতির লোকেরা! এদিকে আসো কেননা সূর্য উদিত হয়েছে,
তোমরা দিনরাত কেন অন্ধকার উপত্যকায় বসে আছ?

کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے　　پھر بھی اس کافر کا حامی ہے وہ مقبولوں کا یار

এটি কত অদ্ভুত কথা যে, আমি কাফির আর তোমরা মুমিন!
তা সত্ত্বেও সেই গৃহীতজনদের বন্ধু এই কাফিরকে সমর্থন করেন।

کیا اچنبھی بات ہے کافر کی کرتا ہے مدد　　وہ خدا جو چاہیئے تھا مومنوں کا دوستدار

কত অদ্ভুত কথা যে, সে খোদা কাফিরকে সাহায্য করেন!
যার উচিত ছিল মুমিনদের বন্ধুপ্রতিম হওয়া।

اہلِ تقویٰ تھا کرم دیں بھی تمہاری آنکھ میں　　جس نے ناحق ظلم کی رہ سے کیا تھا مجھ پہ وار

তোমাদের চোখে করমদীনও মুত্তাকী ছিল,
যে নিছক অন্যায়ভাবে আমার ওপর হামলা করেছে।

بے معاون مَیں نہ تھا تھی نُصرتِ حق میرے ساتھ　　فتح کی دیتی تھی وحیِ حق بشارت بار بار

আমি সাহায্য-সমর্থনশূন্য ছিলাম না, খোদার সাহায্য আমার সাথে ছিল;
খোদার ওহী আমাকে বার বার বিজয়ের সুসংবাদ দিত,

پر مجھے اُس نے نہ دیکھا آنکھ اُس کی بند تھی　　پھر سزا پاکر لگایا سرمۂ دُنبالہ دار

কিন্তু সে আমাকে দেখে নি কেননা তার চোখ বন্ধ ছিল;
এরপর তার শাস্তি হয় আর স্থায়ী লজ্জা তার সাথি হয়।

نام بھی کذّاب اس کا دفتروں میں رہ گیا　　اب مٹا سکتا نہیں یہ نام تا روزِ شمار

সরকারি নথিতে তার নাম বড়ো মিথ্যবাদী রেকর্ড হয়েছে,
হিসাব-নিকাশ দিবস পর্যন্ত সে এই নাম পরিবর্তন করতে পারবে না।

اب کہو کس کی ہوئی نُصرت جنابِ پاک سے　　کیوں تمہارا متقی پکڑا گیا ہو کر کے خوار

এখন বলো, পবিত্র খোদার পক্ষ থেকে কাকে সাহায্য করা হয়েছে?
তোমাদের মুত্তাকী কেন লাঞ্ছিত অবস্থায় ধরা পড়ল?

پھر اِدھر بھی کچھ نظر کرنا خدا کے خوف سے　　کیسے میرے یار نے مجھ کو بچایا بار بار

খোদাকে ভয় করো আর একবার এদিকে তাকিয়ে দেখো,
আমার বন্ধু কীভাবে আমকে বার বার রক্ষা করেছেন।

قتل کی ٹھانی شریروں نے چلائے تیرِ مکر　　بن گئے شیطاں کے چیلے اور نسلِ ہونہار

দুষ্কৃতকারীরা আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে আর ষড়যন্ত্রের তির নিক্ষেপ করেছে;
তারা শয়তানের চেলা ও তার ধূর্ত বংশ হয়ে গেছে।

پھر لگایا ناخنوں تک زور بن کر اک گروہ　　پر نہ آیا کوئی بھی منصوبہ اُن کو ساز وار

দলবদ্ধ হয়ে তারা আমার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে,
কিন্তু তাদের কোনো ষড়যন্ত্র কার্যকর হয় নি।

ہم نگہ میں اُن کی دجّال اور بے ایماں ہوئے　　آتشِ تکفیر کے اُڑتے رہے پیہم شرار

তাদের দৃষ্টিতে আমি দাজ্জাল ও অবিশ্বাসী,
কুফরী ফতোয়ার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়তে থাকে।

اب ذرہ سوچو دیانت سے کہ یہ کیا بات ہے　　ہاتھ کس کا ہے کہ ردّ کرتا ہے وہ دشمن کا وار

একটু সততার সাথে ভাবো ব্যাপারটি কী?
সেই হাত কার– যা শত্রুর হামলাকে প্রতিহত করে?

کیوں نہیں تم سوچتے کیسے ہیں یہ پردے پڑے　　دل میں اُٹھتا ہے مرے رہ رہ کے اب سَو سَو بخار

তোমরা কেন ভাবো না, তোমাদের হৃদয়ে কেমন পর্দা পড়ে আছে?
আমি হৃদয়ে বার বার চরম ব্যথা ও বেদনা অনুভব করি।

یہ اگر انساں کا ہوتا کاروبار اے ناقصاں ایسے کاذب کے لئے کافی تھا وہ پروردگار

হে দুর্বল ঈমানের মানুষ! এটি যদি মানুষের কাজ হতো,
তাহলে এমন মিথ্যাবাদীর (শক্তির) জন্য সেই প্রভুই যথেষ্ট ছিলেন।

کچھ نہ تھی حاجت تمہاری نے تمہارے مکر کی خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہریار

তোমাদের বা তোমাদের ষড়যন্ত্রের কোনো প্রয়োজন ছিল না,
সারাবিশ্বের সর্বাধিপতি স্বয়ং আমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেন।

پاک و برتر ہے وہ جھوٹوں کا نہیں ہوتا نصیر ورنہ اُٹھ جائے اماں پھر سچے ہوویں شرمسار

তিনি পবিত্র ও মহান আর তিনি কখনো মিথ্যাবাদীদের সাহায্য করেন না,
নতুবা শান্তি উঠে যেত আর সত্যবাদীরা লজ্জিত হতো।

اس قدر نصرت کہاں ہوتی ہے اک کذّاب کی کیا تمہیں کچھ ڈر نہیں ہے کرتے ہو بڑھ بڑھ کے وار

একজন মিথ্যাবাদী কীভাবে এত সাহায্য পেতে পারে?
তোমরা যে ধৃষ্টতার সাথে হামলা করো, তোমাদের কি খোদার ভয় নেই?

ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نظیر میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار

পৃথিবীতে যদি এমন কোনো মিথ্যাবাদী থেকে থাকে
তাহলে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করো–
যাকে আমার মতো এভাবে বার বার সাহায্য করা হয়েছে।

آفتابِ صُبح نکلا اب بھی سوتے ہیں یہ لوگ دن سے ہیں بیزار اور راتوں سے وہ کرتے ہیں پیار

প্রভাকর উদিত হয়েছে কিন্তু এরা এখনও ঘুমিয়ে আছে,
তারা দিনকে ঘৃণা করে আর রাতকে পছন্দ করে।

روشنی سے بغض اور ظلمت پہ وہ قربان ہیں ایسے بھی شپر نہ ہوں گے گرچہ تم ڈھونڈو ہزار

আলোর প্রতি রয়েছে তাদের বিদ্বেষ আর আঁধারের জন্য তারা উৎসর্গীত,
তোমরা হাজার সন্ধান করো, বাদুড়ের মাঝেও এমন অভ্যাস দেখবে না।

سر پہ اک سورج چمکتا ہے مگر آنکھیں ہیں بند مرتے ہیں بن آب وہ اور در پہ نہر خوشگوار

তাদের মাথার ওপর একটি সূর্য ঝলমল করে কিন্তু তাদের চোখ বন্ধ,
তারা পিপাসায় মরছে অথচ তাদের গৃহদোরে সুপেয় পানির নহর প্রবহমান।

طرفہ کیفیت ہے اُن لوگوں کی جو منکر ہوئے یوں تو ہر دم مشغلہ ہے گالیاں لیل و نہار

যারা আমাকে অস্বীকার করেছে, তাদের অবস্থা শোচনীয়,
এমনিতে তাদের কাজ হলো অহর্নিশি গালি দেওয়া।

پر اگر پوچھیں کہ ایسے کاذبوں کے نام لو جن کی نصرت سالہا سے کررہا ہو کردگار

কিন্তু তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, আমার মতো কয়েকজন মিথ্যবাদীর নাম বলো তো,
যাদেরকে খোদা তা'লা বছরের পর বছর সাহায্য করছেন?

مردہ ہو جاتے ہیں اس کا کچھ نہیں دیتے جواب زرد ہو جاتا ہے منہ جیسے کوئی ہو سوگوار

এরা লাশ হয়ে যায় আর কথার কোনো উত্তর দেয় না,
তাদের মুখ শোকগ্রস্ত লোকের ন্যায় ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

اُن کی قسمت میں نہیں دیں کے لئے کوئی گھڑی ہوگئے مفتونِ دنیا دیکھ کر اُس کا سنگار

ধর্মের জন্য ব্যয় করার মতো একটা মুহূর্তও তাদের কাছে নেই,
জগতের চাকচিক্য দেখে তারা এর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

جی چُرانا راستی سے کیا یہ دیں کا کام ہے کیا یہی ہے زہد و تقویٰ کیا یہی راہ خیار

সঠিক পথ থেকে দূরে সরে পড়া কি ধার্মিকতা হতে পারে?
এটিই কি তাকওয়া ও পুণ্য? এটিই কি পুণ্যের পথ?

کیا قسم کھائی ہے یا کچھ پیچ قسمت میں پڑا روزِ روشن چھوڑ کر ہیں عاشقِ شب ہائے تار

তারা কি কসম খেয়েছে নাকি তাদের ভাগ্যই অপ্রসন্ন?
উজ্জ্বল দিন ছেড়ে তারা তমসাচ্ছন্ন রাতের সাথে প্রেমলীলায় মত্ত।

انبیاء کے طور پر حجت ہوئی اُن پر تمام اُن کے جو حملے ہیں اُن میں سب نبی ہیں حصہ دار

নবীদের সত্যতার প্রমাণের ন্যায় তাদের ক্ষেত্রে সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে,
(আমাদের বিরুদ্ধে) তাদের আক্রমণে সব নবীরাই লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছেন।

میری نسبت جو کہیں کیں سے وہ سب پر آتا ہے چھوڑ دیں گے کیا وہ سب کو کفر کر کے اختیار

আমার সম্পর্কে বিদ্বেষবশত তারা যা বলেছে– তা সব নবীর বিরুদ্ধে যায়,
তারা কি কুফরী করে তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করবে?

مجھ کو کافر کہہ کے اپنے کفر پر کرتے ہیں مہر یہ تو ہے سب شکل اُن کی ہم تو ہیں آئینہ وار

আমাকে কাফির আখ্যা দিয়ে নিজেদের অবিশ্বাসের ওপর তারা মোহরাঙ্কিত করে,
এ হলো তাদের চেহারা– আমরা কেবল আয়না হয়ে তা তাদের দেখিয়ে দেই।

ساٹھ سے ہیں کچھ برس میرے زیادہ اس گھڑی سال ہے اب تیسواں دعوے پہ از روئے شمار

এখন আমার বয়স ষাট-এর কিছু বেশি,
গণনা অনুসারে এটি আমার দাবির ত্রিংশ বছর।

تھا برس چالیس کا مَیں اس مسافر خانہ میں جبکہ میں نے وحیِ ربّانی سے پایا افتخار

এ ক্ষণভঙ্গুর জগতে তখন আমার বয়স ছিল চল্লিশ বছর,
যখন আমি খোদার ওহীর মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছি।

اس قدر یہ زندگی کیا افترا میں کٹ گئی پھر عجب تر یہ کہ نصرت کے ہوئے جاری بحار

এ পুরোটা সময় কি আমি একজন প্রতারক হিসেবে কাটিয়ে দিলাম?
আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ সময় আমার জন্য সাহায্যের সমুদ্র প্রবাহিত হয়।

ہر قدم میں میرے مولیٰ نے دیئے مجھ کو نشاں ہر عدو پر حجتِ حق کی پڑی ہے ذوالفقار

আমার মনিব প্রতিটি পদক্ষেপে আমাকে নিদর্শন দিয়েছেন,
প্রত্যেক শত্রুর গায়ে ঐশী যুক্তিপ্রমাণের তরবারির আঘাত এসেছে।

نعمتیں وہ دیں مرے مولیٰ نے اپنے فضل سے جن سے ہیں معنیٔ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ آشکار

আমার প্রভু নিজ অনুগ্রহে আমাকে সে-সব নিয়ামত দান করেছেন,
যার মাধ্যমে 'আতমামতু আলাইকুমের' অর্থ স্পষ্ট।

سایہ بھی ہو جائے ہے اوقاتِ ظلمت میں جدا پر رہا وہ ہر اندھیرے میں رفیق و غمگسار

অমানিশার সময় মানুষের নিজের ছায়াও মানুষকে একা ছেড়ে চলে যায়,
কিন্তু সকল অমানিশায় তিনি আমার বন্ধু ও দুঃখের সাথি ছিলেন।

اس قدر نصرت تو کاذب کی نہیں ہوتی کبھی گر نہیں باور نظیریں اس کی تم لاؤ دو چار

এত সাহায্য কোনো মিথ্যাবাদী কখনো লাভ করে না,
বিশ্বাস না হলে তোমরা এর দু-একটি প্রমাণ উপস্থাপন করো।

پھر اگر ناچار ہو اس سے کہ دو کوئی نظیر اُس مہیمن سے ڈرو جو بادشاہ ہر دو دار

এর কোনো উদাহরণ যদি উপস্থাপন করতে না পারো,
তাহলে সেই তত্ত্বাবধায়ককে ভয় করো যিনি উভয় জগতের বাদশা।

یہ کہاں سے سن لیا تم نے کہ تم آزاد ہو کچھ نہیں تم پر عقوبت گو کرو عصیاں ہزار

এটি কোথায় শুনেছ যে, তোমরা স্বাধীন?
তোমরা সহস্র অবাধ্যতা প্রদর্শন করলেও তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন না?

نَعُوْذُ اِنَّا ظَلَمْنَا سنتِ ابرار ہے زہر منہ کی مت دکھاؤ تم نہیں ہو نسلِ مار

আমরা নিজ প্রাণের প্রতি অন্যায় করেছি বলা পুণ্যবানদের রীতি,
বিষোদগার কোরো না, তোমরা সাপের বংশ নও।

جسم کو مَل مَل کے دھونا یہ تو کچھ مشکل نہیں دل کو جو دھووے وہی ہے پاک نزدِ کردگار

দেহকে ডলে ডলে ধৌত করা কঠিন কোনো কাজ নয়,
যে হৃদয়কে ধৌত করে, খোদার দৃষ্টিতে সে-ই পবিত্র।

اپنے ایماں کو ذرا پردہ اُٹھا کر دیکھنا مجھ کو کافر کہتے کہتے خود نہ ہوں از اہلِ نار

পর্দা সরিয়ে নিজের ঈমানকে একটু খতিয়ে দেখো,
আমাকে কাফির বলতে বলতে নিজে অগ্নিবাসী হয়ে যেয়ো না।

گر حیا ہو سوچ کر دیکھیں کہ یہ کیا راز ہے وہ مری ذلّت کو چاہیں پا رہا ہوں مَیں وقار

যদি লজ্জাবোধ থাকে তাহলে একটু ভেবে দেখো, ব্যাপারটা কী?
তারা আমার লাঞ্ছনা দেখতে চায় অথচ আমি সম্মানিত হচ্ছি।

کیا بگاڑا اپنے مکروں سے ہمارا آج تک اژدہا بن بن کے آئے ہوگئے پھر سُوسمار

আজ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র করে তোমরা আমার কী ক্ষতি করতে পেরেছ?
তোমরা অজগরের মতো এসেছ আর শুই সাঁপের মতো হয়ে গেছ।

اے فقیہو عالمو مجھ کو سمجھ آتا نہیں یہ نشانِ صدق پاکر پھر یہ کیں اور یہ نقار

হে আলেম ও জ্ঞানীরা! আমি বুঝি না,
সত্যের এসব নিদর্শন দেখার পরও এত বিদ্বেষ এবং এত ঘৃণা কেন?

صدق کو جب پایا اصحابِ رسول اللہ نے اُس پہ مال و جان و تن بڑھ بڑھ کے کرتے تھے نثار

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা যখন সত্য পেলেন,
এর জন্য তারা সম্পদ ও তনুমন উৎসর্গ করতেন।

پھر عجب یہ علم۔ یہ تنقیدِ آثار و حدیث دیکھ کر سَو سَو نشاں پھر کر رہے ہو تم فرار

তোমাদের এই জ্ঞান এবং হাদীসের আলেমসুলভ সমালোচনা বড়ো হাস্যস্কর!
তোমরা শত শত নিদর্শন দেখেও অবজ্ঞাভরে পালাচ্ছো।

بحث کرنا تم سے کیا حاصل اگر تم میں نہیں رُوحِ انصاف و خدا ترسی کہ ہے دیں کا مدار

তোমাদের সাথে বিতর্ক করে লাভ কী যদি তোমাদের মাঝে
ন্যায়ের চেতনা ও খোদাভীতি না থাকে– যা ধর্মের ভিত্তি?

کیا مجھے تم چھوڑتے ہو جاہِ دنیا کے لئے جاہِ دنیا کب تلک دُنیا ہے خود ناپائیدار

তোমরা কি জগতের যশ ও খ্যাতির জন্য আমাকে পরিত্যাগ করছ?
জাগতিক যশ-খ্যাতি কত দিনের? স্বয়ং দুনিয়াই তো ক্ষণভঙ্গুর।

کون در پردہ مجھے دیتا ہے ہر میدان میں فتح کون ہے جو تم کو ہر دم کر رہا ہے شرمسار

কে আমাকে সবার দৃষ্টির অগোচরে বিজয় দান করছে?
কে তোমাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে লজ্জিত করছে?

تم تو کہتے تھے کہ یہ نابود ہو جائے گا جلد یہ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے اِک اَدنیٰ شکار

তোমরা বলতে, এ ব্যক্তি অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে,
সে আমাদের হাতের থাবায় একটি তুচ্ছ শিকার ছাড়া কিছু নয়।

بات پھر یہ کیا ہوئی کس نے مری تائید کی خائب و خاسر رہے تم۔ ہو گیا مَیں کامگار

তাই উত্তর দাও, হলো কী? কে আমাকে সাহায্য করেছে?
তোমরা ব্যর্থ ও বিফলমনোরথ হলে আর আমি সাফল্য পেলাম।

اِک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا قادیاں بھی تھی نہاں ایسی کہ گویا زیرِ غار

একটি সময় এমন ছিল যখন আমার নামও কেউ জানত না,
কাদিয়ান এতটা অজানা স্থান ছিল যেন কোনো গুহার অতলে প্রচ্ছন্ন স্থান।

کوئی بھی واقف نہ تھا مجھ سے نہ میرا معتقد لیکن اب دیکھو کہ چرچا کس قدر ہے ہر کنار

আমাকে কেউ জানত না আর আমার কোনো অনুসারীও ছিল না,
কিন্তু এখন দেখো সর্বত্র কীভাবে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে?

اُس زمانہ میں خدا نے دی تھی شہرت کی خبر جو کہ اب پوری ہوئی بعد از مرورِ روزگار

সে যুগে খোদা তা'লা খ্যাতি লাভের সংবাদ দিয়েছেন,
যা আজ দীর্ঘকাল পর পূর্ণতা লাভ করেছে।

کھول کر دیکھو براہیں جو کہ ہے میری کتاب اُس میں ہے یہ پیشگوئی پڑھ لو اُس کو ایک بار

আমার পুস্তক বারাহীনে আহমদীয়া খুলে দেখো,
তা পড়ে নাও, তাতে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী বিদ্যমান।

اب ذرہ سوچو کہ کیا یہ آدمی کا کام ہے اِس قدر امر نہاں پر کس بشر کو اقتدار

একটু চিন্তা করে বলো, এ কাজ কি কোনো মানুষের দ্বারা করা সম্ভব?
বিপুল পরিমাণ অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হওয়া কোনো মানুষের পক্ষে
কী করে সম্ভবপর হতে পারে?

قدرتِ رحمان و مکرِ آدمی میں فرق ہے جو نہ سمجھے وہ غبی از فرق تا پا ہے حمار

রহমান খোদার শক্তিমত্তা ও মানুষের ষড়যন্ত্রের মাঝে পার্থক্য আছে,
যে বুঝে না সে-ই নির্বোধ, আপাদমস্তক গাধা।

سوچ لو اے سوچنے والو کہ اب بھی وقت ہے راہِ حرماں چھوڑ دو رحمت کے ہو امیدوار

হে যারা চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাতে চাও! এখনও সময় আছে, ভালোভাবে
চিন্তা করো,
বঞ্চনার পথ পরিত্যাগ করো আর রহমত প্রত্যাশী হও।

سوچ لو یہ ہاتھ کس کا تھا کہ میرے ساتھ تھا کس کے فرماں سے میں مقصد پاگیا اور تم ہو خوار

একটু ভাবো এই হাতটি কার যা আমার সাথে ছিল,
কার নির্দেশে আমি আমার অভীষ্ট অর্জন করলাম আর তোমরা ব্যর্থ হলে?

یہ بھی کچھ ایماں ہے یارو ہم کو سمجھائے کوئی جس کا ہر میداں میں پھل حرماں ہے اور ذلّت کی مار

হে বন্ধুগণ! আমাকে বুঝাও এটি কেমন ঈমান?
যার ফল হলো সর্বত্র বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা।

غل مچاتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور دجّال ہے　　میں تو خود رکھتا ہوں اُن کے دیں سے اور ایماں سے عار

তারা হইচই করে যে, এ ব্যক্তি কাফির ও দাজ্জাল;
সত্যিকার অর্থে তাদের ধর্ম ও ঈমানের বিষয়ে আমি বীতশ্রদ্ধ।

گر یہی دیں ہے جو ہے اُن کی خصائل سے عیاں　　مَیں تو اِک کوڑی کو بھی لیتا نہیں ہوں زینہار

তাদের অভ্যাস থেকে যা প্রকাশিত হয় যদি তা-ই ধর্ম হয়ে থাকে,
তাহলে শোনো! আমি কানাকড়ির বিনিময়েও তা ক্রয় করব না।

جان و دل سے ہم نثارِ ملّتِ اسلام ہیں　　لیک دیں وہ رہ نہیں جس پر چلیں اہلِ نقار

আমরা মনেপ্রাণে ইসলাম ধর্মের জন্য নিবেদিত,
ধর্ম সেই পথকে বলা হয় না– যা বিদ্বেষীরা অনুসরণ করছে।

واہ رے جوشِ جہالت خوب دکھلائے ہیں رنگ　　جھوٹ کی تائید میں حملے کریں دیوانہ وار

অজ্ঞতার আতিশয্য দেখো! এর অত্যন্ত ঘৃণ্যরূপ প্রকাশ পেয়েছে,
তারা মিথ্যার সমর্থনে উন্মাদপ্রায় হয়ে হামলা করে।

نازمت کر اپنے ایماں پر کہ یہ ایماں نہیں　　اس کو ہیرا مت گماں کر ہے یہ سنگِ کوہسار

নিজের ঈমান নিয়ে গর্ব কোরো না, কেননা এটি ঈমান নয়;
এটিকে হীরা মনে কোরো না, বরং এটি পাহাড়ি পাথর।

پیٹنا ہو گا دو ہاتھوں سے کہ ہے ہے مر گئے　　جب کہ ایماں کے تمہارے گند ہوں گے آشکار

তোমাদের হা-হুতাশ করতে হবে যে, হায়! আমরা ধ্বংস হয়ে গেলাম,
যখনকিনা তোমাদের ঈমানের নোংরামি প্রকাশ পেয়ে যাবে।

ہے یہ گھر گرنے پہ اے مغرور لے جلدی خبر　　تا نہ دب جائیں ترے اہل و عیال و رشتہ دار

এ ঘর অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়তে যাচ্ছে হে অহংকারী! দ্রুত সাবধান হও,
পাছে তোমার পরিবারপরিজন ও আত্মীয়স্বজন চাপা পড়ে যায়।

یہ عجب بدقسمتی ہے کس قدر دعوت ہوئی　　پر اُترتا ہی نہیں ہے جامِ غفلت کا خُمار

কত বিস্ময়কর বিষয় যে, এত ডাকা সত্ত্বেও
ঔদাসীন্যরূপী মদের নেশা যে কাটেই না।

ہوش میں آتے نہیں سو سو طرح کوشش ہوئی ایسے کچھ سوئے کہ پھر ہوتے نہیں ہیں ہوشیار

শত শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা চেতনা ফিরে পায় না,
এমনভাবে ঘুমিয়ে আছে যে, তাদের জাগানো সম্ভব নয়।

دن بُرے آئے اکٹھے ہوگئے قحط و وبا اب تلک توبہ نہیں اب دیکھئے انجام کار

মন্দ সময় এসে গেছে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি একযোগে দেখা দিয়েছে,
এখনও তারা তওবা করে নি, দেখুন এর পরিণাম কী হয়!

ہے غضب کہتے ہیں اب وحیِ خدا مفقود ہے اب قیامت تک ہے اِس اُمت کا قصوں پر مدار

তারা বলে, খোদার ওহী করা বন্ধ হয়ে গেছে! এটি কত বড়ো একটি সর্বনাশা বিশ্বাস!
এখন কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতের কেবল অতীতের কাহিনির ওপরই নির্ভর করতে হবে।

یہ عقیدہ برخلافِ گفتۂ دادار ہے پر اُتارے کون برسوں کا گلے سے اپنے ہار

এ বিশ্বাসটি খোদার কথার বিরোধী,
কিন্তু যে হার তাদের গলায় শত শত বছর ধরে বিরাজমান,
তা কে খুলতে পারে?

وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم اب بھی اُس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار

সেই খোদা এখনও যার সাথে ইচ্ছা বাক্যালাপ করে থাকেন,
এখনও তিনি যাকে ভালোবাসেন তার সাথে কথা বলেন।

گوہرِ وحیِ خدا کیوں توڑتا ہے ہوش کر اِک یہی دیں کے لئے ہے جائے عزّ و افتخار

একটু বিবেক খাটাও, খোদা ওহীর মতো রত্ন কেন প্রত্যাহার করবেন?
ধর্মের জন্য একমাত্র এটিই সম্মান ও গর্বের কারণ।

یہ وہ گُل ہے جس کا ثانی باغ میں کوئی نہیں یہ وہ خوشبو ہے کہ قرباں اس پہ ہو مشکِ تتار

এটি সেই ফুল যার সমতুল্য বাগানে অন্য কিছু নেই,
এটি সেই সুগন্ধি যার সামনে তাতারের কস্তুরীও কিছুই নয়।

یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسماں کے در کھلیں یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھ لیں روئے نگار

এটি সেই চাবি যার মাধ্যমে আকাশের দ্বার উন্মোচিত হয়,
এটি সেই আয়না যার মাধ্যমে প্রেমাস্পদের চেহারা দেখা যায়।

بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے بس یہی اِک قصر ہے جو عافیت کا ہے حصار

আমাদের বিজয় লাভের একমাত্র অস্ত্র এটিই–
এটিই একমাত্র প্রাসাদ যা নিরাপত্তার দুর্গ।

ہے خدا دانی کا آلہ بھی یہی اسلام میں محض قصوں سے نہ ہو کوئی بشر طوفاں سے پار

ইসলামে খোদাকে জানার এটিই একমাত্র মাধ্যম,
শুধু কাহিনির ওপর ভিত্তি করে কেউ ঝড়-তুফান অতিক্রম করতে পারে না।

ہے یہی وحیِ خدا عرفانِ مولیٰ کا نشاں جس کو یہ کامل ملے اُس کو ملے وہ دوستدار

খোদার এই ওহীই প্রভুকে চেনার মাধ্যম,
যারা এটি থেকে পুরো অংশ পায় তারা বন্ধুকে পায়।

واہ رے باغِ محبت موت جس کی رہ گذر وصلِ یار اُس کا ثمر۔ پر ارد گرد اُس کے ہیں خار

ভালোবাসার বাগান বড়ো অদ্ভুত– যা অর্জনের উপায় হলো মৃত্যুবরণ করা,
এর ফল হলো বন্ধুকে পাওয়া কিন্তু তা কাঁটা পরিবেষ্টিত।

ایسے دل پر داغِ لعنت ہے ازل سے تا ابد جو نہیں اس کی طلب میں بیخود و دیوانہ وار

এমন হৃদয় অনাদি অনন্তকাল থেকে অভিশাপগ্রস্ত,
সে আত্মহারা ও উন্মাদের ন্যায়– যে তাঁকে সন্ধান করে না।

پر جو دنیا کے بنے کیڑے وہ کیا ڈھونڈیں اُسے دیں اُسے ملتا ہے جو دیں کیلئے ہو بیقرار

কিন্তু যারা দুনিয়ার পোকা তারা তাঁকে কীভাবে সন্ধান করতে পারে?
ধর্ম সে-ই লাভ করে, যে ধর্মের জন্য ব্যাকুল হয়।

ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار

আমাদের কাজ হলো সর্বত্র সত্যের বাণী পৌঁছানো,
পুণ্য প্রকৃতির মানুষ অবশেষে আমাদের ডাকে সাড়া দেবেই।

یاد وہ دن جب کہ کہتے تھے یہ سب ارکانِ دیں　　مہدیٔ موعودِ حق اب جلد ہوگا آشکار

সে-কথা স্মরণ করো যখন ধর্মের জ্যেষ্ঠরা বলত,
প্রতিশ্রুত মাহদী অচিরেই আবির্ভূত হবেন।

کون تھا جس کی تمنّا یہ نہ تھی اک جوش سے　　کون تھا جس کو نہ تھا اُس آنے والے سے پیار

এমন কেউ ছিল কি– যে গভীর আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে তার অপেক্ষায় ছিল না?
এমন কে ছিল– যার সেই আগমনকারীর প্রতি ভালোবাসা ছিল না?

پھر وہ دن جب آگئے اور چودھویں آئی صدی　　سب سے اوّل ہوگئے منکر یہی دیں کے منار

এরপর যখন সে-দিন এসে গেল আর চতুর্দশ শতাব্দী এসে পড়ল,
তখন সর্বপ্রথম ধর্মের এই তথাকথিত আলোকবর্তিকারাই অস্বীকার করে বসল।

پھر دوبارہ آگئی احبار میں رسمِ یہود　　پھر مسیح وقت کے دشمن ہوئے یہ جُبّہ دار

আবার আলেমদের মাঝে ইহুদীদের প্রথা অনুপ্রবেশ করেছে,
এসব জুব্বাধারী যুগ-মসীহর শত্রু হয়ে গেল।

تھا نوشتوں میں یہی از ابتدا تا انتہا　　پھر مٹے کیونکر کہ ہے تقدیر کے نقشِ جدار

ঐশী গ্রন্থাবলিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটিই লেখা ছিল,
তাই তা কীভাবে মুছতে পারে? এটি তকদীরের লিখন দেয়ালের চিকা নয়।

میں تو آیا اس جہاں میں ابنِ مریم کی طرح　　میں نہیں مامور از بہرِ جہاد و کارزار

আমি পৃথিবীতে ইবনে মরিয়মের ন্যায় এসেছি,
আমি যুদ্ধবিগ্রহের জন্য প্রেরিত হই নি।

پر اگر آتا کوئی جیسی انہیں امید تھی　　اور کرتا جنگ اور دیتا غنیمت بے شمار

কেউ যদি তাদের প্রত্যাশা অনুসারে আসত,
আর যদি যুদ্ধ করত এবং অঢেল গনিমত প্রদান করত।

ایسے مہدی کے لئے میداں کھلا تھا قوم میں　　پھر تو اس پر جمع ہوتے ایک دم میں صد ہزار

এমন মাহদীর জন্য জাতির মাঝে ময়দান উন্মুক্ত ছিল,
এমনটি হলে নিমিষে লক্ষ লোক একত্রিত হয়ে যেত।

پر یہ تھا رحم خداوندی کہ مَیں ظاہر ہوا آگ آتی گرنہ میں آتا تو پھر جاتا قرار

কিন্তু এটি খোদার কৃপা যে, আমি আবির্ভূত হয়েছি;
আমি না আসলে আগুন ছড়িয়ে পড়ত আর শান্তি চলে যেত।

آگ بھی پھر آگئی جب دیکھ کر اتنے نشاں قوم نے مجھ کو کہا کذّاب ہے اور بدشعار

এত নিদর্শন দেখার পরও যখন আগুন বর্ষিত হলো,
জাতি আমাকে মিথ্যাবাদী ও পাপাচারী আখ্যায়িত করল।

ہے یقیں یہ آگ کچھ مدت تلک جاتی نہیں ہاں مگر توبہ کریں با صد نیاز و انکسار

আমি নিশ্চিত এই আগুন কিছুদিন পিছু ছাড়বে না,
এটি অপসারিত হতে পারে যদি মানুষ পরম বিনয় ও নম্রতার সাথে তওবা করে।

یہ نہیں اِک اتفاقی امر تا ہوتا علاج ہے خدا کے حکم سے یہ سب تباہی اور تبار

এটি কাকতালীয় কোনো বিষয় নয় যে, সহজে এর চিকিৎসা হয়ে যাবে,
এসব ধ্বংসযজ্ঞ খোদার নির্দেশে হচ্ছে।

وہ خدا جس نے بنایا آدمی اور دیں دیا وہ نہیں راضی کہ بے دینی ہو ان کا کاروبار

সেই খোদা– যিনি মানুষ বানিয়েছেন আর ধর্ম দিয়েছেন,
তিনি তাদেরকে অধর্মে লিপ্ত দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

بے خدا بے زہد و تقویٰ بے دیانت بے صفا بَن ہے یہ دنیائے دوں طاعوں کرے اُس میں شکار

যে-জগতে খোদা, পুণ্য, তাকওয়া, সততা ও স্বচ্ছতা নেই,
সেই হীন জগৎ, জঙ্গল বৈ কিছু নয়– যাতে প্লেগ মহামারি স্বাধীনভাবে শিকার খেলে চলেছে।

صیدِ طاعوں مت بنو پورے بنو تم متقی یہ جو ایماں ہے زباں کا۔کچھ نہیں آتا بکار

প্লেগের শিকার হয়ো না বরং তোমরা পুরো মুত্তাকী হয়ে যাও,
ঈমানের মৌখিক দাবি কোনো কাজের নয়।

موت سے گر خود ہو بے ڈر کچھ کرو بچوں پہ رحم امن کی رہ پر چلو بَنْ کو کرو مت اختیار

তুমি নিজে যদি মৃত্যুকে ভয় না করো তাহলে অন্ততপক্ষে সন্তানসন্ততির প্রতি করুণা করো,
নিরাপদ রাস্তায় পথ চলো জঙ্গলে যেয়ো না।

بَنْ کے رہنے والو تم ہرگز نہیں ہو آدمی کوئی ہے روبہ کوئی خنزیر اور کوئی ہے مار

হে বুনোরা! তোমরা কোনোভাবে মানুষ আখ্যায়িত হবার যোগ্য নও,
কেউ শিয়াল কেউ শূকর আর কেউ হলো সাঁপ।

ان دلوں کو خود بدل دے اے مرے قادر خدا تُو تو ربّ العالمیں ہے اور سب کا شہریار

হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! এ হৃদয়গুলোকে পরিবর্তন করে দাও,
তুমি বিশ্বপ্রতিপালক এবং সর্বাধিপতি।

تیرے آگے محو یا اثبات نا ممکن نہیں جوڑنا یا توڑنا یہ کام تیرے اختیار

সৃষ্টি করা ও ধ্বংস করা তোমার জন্য অসম্ভব নয়,
যুক্ত ও বিযুক্ত করার সকল ক্ষমতা তোমার রয়েছে।

ٹوٹے کاموں کو بناوے جب نگاہِ فضل ہو پھر بنا کر توڑ دے اک دم میں کر دے تار تار

তোমার কৃপাদৃষ্টি হলে তুমি ভগ্ন জিনিসকে অখণ্ড জিনিসে রূপ দিতে পারো,
আবার তুমি চাইলে নিমিষে তাকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারো।

توہی بگڑی کو بناوے توڑدے جب بن چکا تیرے بھیدوں کو نہ پاوے سو کرے کوئی بچار

তুমি সাজানো বাগান ধ্বংস করে দিতে পারো বা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাগান গুছিয়ে দিতে পারো,
তোমার রহস্য কারো পক্ষে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়, সে যতই চিন্তাপ্রণিধান করুক না কেন।

جب کوئی دل ظلمت عصیاں میں ہووے مبتلا تیرے بن روشن نہ ہووے گو چڑھے سورج ہزار

যখন কোনো হৃদয় পাপের অমানিশায় নিমজ্জিত হয়ে যায়,
হাজার সূর্য উদিত হলেও তোমার সাহায্য ছাড়া তা আলোকিত হয় না।

اس جہاں میں خواہشِ آزادگی بے سود ہے اِک تری قیدِ محبت ہے جو کردے رستگار

এ পৃথিবীতে স্বাধীনতার বাসনা কোনো কাজের নয়,
তোমার ভালোবাসায় বন্দি হওয়াই মুক্তি দিতে পারে।

دل جو خالی ہو گدازِ عشق سے وہ دل ہے کیا دل وہ ہے جس کو نہیں بے دلبرِ یکتا قرار

যে হৃদয় প্রেমানলে জ্বলে না তা কোনো হৃদয়ই নয়,
প্রকৃত হৃদয় সেটি যা অনন্য বন্ধুর প্রেমে ব্যাকুল।

فقر کی منزل کا ہے اوّل قدم نفیِ وجود پس کرو اس نفس کو زیرو زبر از بہرِ یار

আধ্যাত্মিক সফরের প্রথম পদক্ষেপ হলো আত্মবিলোপ,
সুতরাং বন্ধুর খাতিরে তোমার আমিত্বকে পদতলে দলিতমথিত করো।

تلخ ہوتا ہے ثمر جب تک کہ ہو وہ ناتمام اس طرح ایماں بھی ہے جب تک نہ ہو کامل پیار

ফল যতক্ষণ না পাকে ততক্ষণ টকই থাকে,
একইভাবে প্রেম যতক্ষণ না জমে ততক্ষণ ঈমানও অসম্পূর্ণ।

تیرے مُنہ کی بھوک نے دل کو کیا زیروزبر اے مرے فردوسِ اعلیٰ اب گرا مجھ پر ثمار

তোমার পবিত্র চেহারার ভালোবাসা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে,
হে আমার সুমহান বেহেশত! তুমি এখন আমায় ফলফলাদিতে ভরে দাও।

اے خدا اے چارہ سازِ درد ہم کو خود بچا اے مرے زخموں کے مرہم دیکھ میرا دلفگار

হে খোদা! হে বেদনার নিরাময়! তুমি নিজে আমাদেরকে রক্ষা করো,
হে আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের নিরাময়! তুমি আমার ব্যথিত হৃদয়ের প্রতি একটিবার তাকাও।

باغ میں تیری محبت کے عجب دیکھے ہیں پھل ملتے ہیں مشکل سے ایسے سیب اور ایسے انار

বাগানে তোমার ভালোবাসার অদ্ভুত ফলফলাদি দেখেছি,
এমন আপেল ও ডালিম পাওয়া খুবই দুষ্কর।

تیرے بن اے میری جاں یہ زندگی کیا خاک ہے ایسے جینے سے تو بہتر مرکے ہو جانا غبار

হে আমার প্রিয়! তোমাকে বাদ দিয়ে এ জীবনের কোনো অর্থ হয় না,
এমন জীবনযাপন করার চেয়ে মরে মাটি হয়ে যাওয়া ভালো।

گر نہ ہو تیری عنایت سب عبادت ہیچ ہے فضل پر تیرے ہے سب جہد و عمل کا انحصار

তোমার অনুগ্রহ না হলে সব ইবাদত অর্থহীন,
সব চেষ্টাপ্রচেষ্টার ফলাফল তোমার অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল।

جن پہ ہے تیری عنایت وہ بدی سے دور ہیں رہ میں حق کی قوتیں اُن کی چلیں بن کر قطار

তোমার প্রতি যাদের অনুগ্রহ রয়েছে কেবল তারাই পাপ থেকে মুক্ত,
তাদের শক্তিবৃত্তি সত্যের পথে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে থাকে।

چھٹ گئے شیطاں سے جو تھے تیری اُلفت کے اسیر جو ہوئے تیرے لئے بے برگ وبَر۔ پائی بہار

শয়তানের হাত থেকে তারা পরিত্রাণ লাভ করেছে যারা তোমার ভালোবাসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ,
যারা তোমার জন্য ফল ও পাতা হারিয়েছে, তারা বসন্ত ফিরে পেয়েছে।

سب پیاسوں سے نکوتر تیرے منہ کی ہے پیاس جس کا دل اس سے ہے بریاں پاگیا وہ آبشار

সব পিপাসা থেকে তোমাকে পাবার পিপাসা হলো বেশি পবিত্র,
যার হৃদয় এর জন্য জ্বলে, সে সেই জলপ্রপাতের উত্তরাধিকারী হয়ে যায়।

جس کو تیری دھن لگی آخر وہ تجھ کو جاملا جس کو بے چینی ہے یہ وہ پاگیا آخر قرار

যে আকুল হয়ে তোমাকে সন্ধান করে, সে অবশেষে তোমাতে গিয়ে মিলিত হয়,
যার মাঝে এ ব্যাকুলতা আছে, সে অবশেষে প্রশান্তি লাভ করেছে।

عاشقی کی ہے علامت گریہ و دامانِ دشت کیا مبارک آنکھ جو تیرے لئے ہو اشکبار

প্রেমের পরিচয় হলো ক্রন্দন ও মরুতে ঘুরে বেড়োনো,
সে চোখ কত সৌভাগ্যবান, যা তোমার প্রেমে অশ্রুসিক্ত হয়!

تیری درگہ میں نہیں رہتا کوئی بھی بے نصیب شرط رہ پر صبر ہے اور ترکِ نامِ اضطرار

তোমার দরবার থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে যায় না,
শর্ত হলো ধৈর্যধারণ করা এবং সকল প্রকার অধৈর্য পরিহার করা।

میں تو تیرے حکم سے آیا مگر افسوس ہے چل رہی ہے وہ ہوا جو رخنہ اندازِ بہار

আমি তোমার নির্দেশে এসেছি কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো,
সেই বাতাস বইছে যা বসন্তের পথকে প্রতিরোধ করে।

جیفۂ دنیا پہ یکسر گر گئے دنیا کے لوگ زندگی کیاخاک اُن کی جو کہ ہیں مُردار خوار

পৃথিবীর লোকেরা দুনিয়ারূপী লাশ ভক্ষণে বা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন,
তাদের জীবন কোনো জীবন নয়– যারা লাশ ভক্ষণ করে।

دیں کو دے کر ہاتھ سے دنیا بھی آخر جاتی ہے کوئی آسودہ نہیں بن عاشق و شیدائے یار

ধর্মকে বিসর্জন দিলে অবশেষে দুনিয়াও হাতছাড়া হয়,
বন্ধুকে ভালোবাসা ছাড়া কেউ উন্নতি করতে পারে না।

رنگ تقویٰ سے کوئی رنگت نہیں ہے خوب تر ہے یہی ایماں کا زیور ہے یہی دیں کا سنگار

তাকওয়ার রং হতে অন্য কোনো উত্তম রং নেই,
এটিই ঈমানের সৌন্দর্য আর এটিই ধর্মের রূপসজ্জা।

سو چڑھے سورج نہیں بن رُوئے دلبر روشنی یہ جہاں بے وصلِ دلبر ہے شب تاریک و تار

শত সূর্য উদিত হলেও প্রেমাস্পদের চেহারা দেখা ছাড়া কোনো আলো চোখে পড়ে না,
বন্ধু না পেলে এ পৃথিবী একটি অমানিশাপূর্ণ রাত ছাড়া আর কিছু নয়।

اے مرے پیارے جہاں میں تو ہی ہے اک بے نظیر جو ترے مجنوں حقیقت میں وہی ہیں ہوشیار

হে আমার প্রিয়! বিশ্বে তুমিই একমাত্র অনন্য,
যারা তোমার জন্য দিওয়ানা তারাই সত্যিকার অর্থে বুদ্ধিমান।

اس جہاں کو چھوڑنا ہے تیرے دیوانوں کا کام نقد پالیتے ہیں وہ اور دوسرے امیدوار

পৃথিবীকে পরিত্যাগ করা তোমার প্রেমে মত্তদের কাজ,
তারা নগদ পেয়ে যায় আর অন্যরা সেটির আশায় থাকে।

کون ہے جس کے عمل ہوں پاک بے انوارِ عشق کون کرتا ہے وفا بن اس کے جس کا دِل فگار

এমন কে আছে– ভালোবাসার আলো ছাড়া যার কর্মের সংশোধন সম্ভব?
যার হৃদয় ব্যাকুল– সে ছাড়া কে আছে যে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করবে?

غیر ہوکر غیر پر مرنا کسی کو کیا غرض کون دیوانہ بنے اس راہ میں لیل و نہار

একজন অপরিচিত ব্যক্তির জন্য মানুষ কীভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে?
কে আছে এ পথে– যে দিবারাত্র এমন উন্মাদ প্রেমিক সাজবে?

کون چھوڑے خواب شیریں کون چھوڑے اکل و شرب　　کون لے خارِ مغیلاں چھوڑ کر پھولوں کے ہار

সুমিষ্ট স্বপ্ন কে পরিত্যাগ করবে আর কে পানাহার ছাড়তে পারে?
ফুলের মালা পরিত্যাগ করে কে আছে যে কাঁটার মালা বরণ করবে?

عشق ہے جس سے ہوں طے یہ سارے جنگل پُر خطر　　عشق ہے جو سر جھکاوے زیرِ تیغِ آب دار

এই বিপৎসংকুল অরণ্য কেবল প্রেমের মাধ্যমে অতিক্রান্ত হতে পারে,
প্রেমই ধারালো তরবারির সামনে মাথা ঝুঁকাতে বাধ্য করতে পারে।

پر ہزار افسوس دنیا کی طرف ہیں جھک گئے　　وہ جو کہتے تھے کہ ہے یہ خانۂ ناپائدار

কিন্তু পরিতাপ! তারা জগতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে,
যারা বলত– এ পৃথিবী হলো একটি ক্ষণস্থায়ী নিবাস।

جس کو دیکھو آجکل وہ شوخیوں میں طاق ہے　　آہ رحلت کر گئے وہ سب جو تھے تقویٰ شعار

আজকে যাকেই দেখবে তাকেই তুমি অহংকারে ধৃষ্ট পাবে,
আক্ষেপ! যারা ছিল খোদাভীরু, তারা সবাই ইন্তেকাল করেছে।

ممبروں پر اُن کے سارا گالیوں کا وعظ ہے　　مجلسوں میں اُن کی ہر دم سبّ و غیبت کاروبار

মিম্বরে তাদের পুরো বক্তৃতা হলো গালিসর্বস্ব,
সভায় তাদের কাজ হলো সবসময় গালমন্দ ও পরচর্চা করা।

جس طرف دیکھو یہی دُنیا ہی مقصد ہوگئی　　ہر طرف اس کے لئے رغبت دلائیں بار بار

যেদিকেই তাকাও, দুনিয়াই তাদের উদ্দেশ্য বলে মনে হয়,
সর্বত্র এর প্রতিই মানুষকে বার বার আকৃষ্ট করতে দেখা যায়।

ایک کانٹا بھی اگر دیں کے لئے اُن کو لگے　　چیخ کر اس سے وہ بھاگیں شیر سے جیسے حمار

ধর্মের জন্য তাদের গায়ে যদি একটি কাঁটাও ফুটে,
এটিকে এড়িয়ে চিৎকার করে সেভাবে পালায়–
যেভাবে সিংহ দেখে গাধা পালায়।

ہر زماں شکوہ زباں پر ہے اگر ناکام ہیں　　دیں کی کچھ پروا نہیں دنیا کے غم میں سوگوار

ব্যর্থ হলে সবসময় হা-হুতাশ করে,
ধর্ম নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই, শুধু দুনিয়া নিয়ে চিন্তিত।

لوگ کچھ باتیں کریں میری تو باتیں اور ہیں میں فدائے یار ہوں گو تیغ کھینچے صد ہزار

মানুষ যা বলে– তা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই, আমার কথা ভিন্ন–
আমি আমার বন্ধুর জন্য নিবেদিত, তারা শত তরবারি হানলেও।

اے مرے پیارے بتا تو کس طرح خوشنود ہو نیک دن ہو گا وہی جب تجھ پہ ہوویں ہم نثار

হে আমার প্রিয়! আমাকে বলো, তুমি কী করলে সন্তুষ্ট হবে?
সে-দিনটিই শুভ হবে যে-দিন আমরা তোমার চরণে নিবেদিত হবো।

جس طرح تو دور ہے لوگوں سے میں بھی دور ہوں ہے نہیں کوئی بھی جو ہو میرے دل کا راز دار

যেভাবে তুমি মানুষ থেকে দূরে, সেভাবে আমিও মানুষ হতে দূরে,
এমন কেউ নেই যে আমার হৃদয়ের গোপন কথা জানে।

نیک ظن کرنا طریقِ صالحانِ قوم ہے لیک سو پردے میں ہوں اُن سے۔ نہیں ہوں آشکار

জাতির পুণ্যবানদের রীতি হলো অন্যদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা,
কিন্তু আমি তাদের দৃষ্টি থেকে যোজন যোজন দূরে, আমি তাদের কাছে
প্রকাশিত নই।

بے خبر دونوں ہیں جو کہتے ہیں بد یا نیک مرد میرے باطن کی نہیں ان کو خبر اک ذرّہ وار

যারা আমাকে ভালো বা মন্দ বলে তাদের উভয়ই আমার সম্পর্কে অনবহিত,
তারা বিন্দুমাত্রও আমার হৃদয়ের খবর রাখে না।

ابن مریم ہوں مگر اُترا نہیں مَیں چَرخ سے نیز مہدی ہوں مگر بے تیغ اور بے کار زار

আমি ইবনে মরিয়ম কিন্তু আকাশ থেকে অবতরণ করি নি,
আমি মাহদীও বটে কিন্তু তরবারি বা যুদ্ধের সাথে
আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

ملک سے مجھ کو نہیں مطلب نہ جنگوں سے ہے کام کام میرا ہے دلوں کو فتح کرنا نَے دیار

রাজত্ব নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই আর যুদ্ধ নিয়ে আমার কোনো
কাজ নেই,
আমার কাজ হলো মন জয় করা– দেশ নয়।

تاج و تختِ ہند قَیصر کو مبارک ہو مدام اُن کی شاہی میں مَیں پاتا ہوں رفاہِ روزگار

ভারতের সিংহাসন ও মুকুট ভারতের মহারানির জন্য থাক,
কেননা তার রাজত্বে আমি জীবনের সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করি।

مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جُدا مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوانِ یار

রাজত্ব নিয়ে আমার কাজ কী– আমার রাজত্ব সবচেয়ে আলাদা,
মুকুটের সাথে আমার কী সম্পর্ক– আমার মুকুট হলো খোদার সন্তুষ্টি।

ہم تو بستے ہیں فلک پر اس زمیں کو کیا کریں آسماں کے رہنے والوں کو زمیں سے کیا نِقار

আমরা স্বর্গে বসবাস করি, এই পৃথিবী আমাদের কোনো কাজের নয়,
যারা ঊর্ধ্বলোকে বসবাস করে তাদের এই পৃথিবীর সাথে কিবা সম্পর্ক থাকতে পারে!

ملکِ روحانی کی شاہی کی نہیں کوئی نظیر گو بہت دنیا میں گذرے ہیں امیر و تاجدار

আধ্যাত্মিক রাজ্যের রাজত্বের কোনো তুলনা হয় না,
যদিও পৃথিবীতে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি ও মুকুটধারী অতীত হয়েছে।

داغِ لعنت ہے طلب کرنا زمیں کا عزّوجاہ جس کا جی چاہے کرے اس داغ سے وہ تن فگار

পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি সন্ধান করা অভিশাপের কলঙ্ক ছাড়া কিছু নয়,
যে চায়– সে সেই দাগে নিজের দেহ কলঙ্কিত করতে পারে।

کام کیا عزت سے ہم کو شہرتوں سے کیا غرض گر وہ ذلّت سے ہو راضی اس پہ سو عزّت نثار

সম্মান দিয়ে আমরা কী করব আর খ্যাতির সাথে আমাদের কিবা সম্পর্ক!
তিনি যদি আমার লাঞ্ছনায় সন্তুষ্ট হন তাহলে আমি এর খাতিরে শত সম্মান জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত।

ہم اُسی کے ہوگئے ہیں جو ہمارا ہوگیا چھوڑ کر دنیائے دوں کو ہم نے پایا وہ نگار

যিনি আমাদের– আমরাও তাঁরই হয়ে গেলাম,
এই তুচ্ছ জগৎকে ত্যাগ করে আমরা সেই পরম প্রিয়বন্ধুকে পেলাম।

دیکھتا ہوں اپنے دل کو عرشِ ربّ العالمیں قرب اتنا بڑھ گیا جس سے ہے اُترا مجھ میں یار

আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বপ্রতিপালকের আরশ দেখতে পাচ্ছি।
নৈকট্য এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এর কল্যাণে সেই বন্ধু আমাতে প্রবেশ করেছেন।

دوستی بھی ہے عجب جس سے ہوں آخر دو اِک آملی اُلفت سے اُلفت ہو کے دو دل پر سوار

বন্ধুত্বও আজব জিনিস যার ফলে দুই এক হয়ে যায়,
দুই হৃদয়ের ওপর ভর করে ভালোবাসার সাথে ভালোবাসা এসে মিলিত হয়েছে।

دیکھ لو میل و محبت میں عجب تاثیر ہے ایک دل کرتا ہے جھک کر دوسرے دل کو شکار

দেখো! স্নেহ ও ভালোবাসার প্রভাব কত গভীর।
এক হৃদয় অন্য হৃদয়কে জয় করার জন্য ঝুঁকে যায়।

کوئی رہ نزدیک تر راہِ محبت سے نہیں طے کریں اس راہ سے سالک ہزاروں دشتِ خار

ভালোবাসার পথ থেকে নিকটতর কোনো পথ নেই,
এর মাধ্যমে পুণ্য পথের সন্ধানী সহস্র কণ্টকাকীর্ণ মরু অতিক্রম করে।

اس کے پانے کا یہی اے دوستو اک راز ہے کیمیا ہے جس سے ہاتھ آجائے گا زر بے شمار

হে বন্ধুগণ! তাঁকে পাবার এটিই একটি রহস্য,
এটি একটি কিমিতি– যার মাধ্যমে অগণিত সম্পদ হস্তগত হতে পারে।

تیر تاثیرِ محبت کا خطا جاتا نہیں تیر اندازو! نہ ہونا سست اس میں زینہار

ভালোবাসার তির অব্যর্থ,
হে তিরন্দাজ! এতে এক মুহূর্তের জন্য আলস্য প্রদর্শন কোরো না।

ہے یہی اک آگ تا تم کو بچاوے آگ سے ہے یہی پانی کہ نکلیں جس سے صدہا آبشار

এটিই একটি আগুন– যা তোমাদের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে,
এটিই সেই পানি– যা হতে শত শত জলপ্রপাত উৎসারিত হয়েছে।

اِس سے خود آکر ملے گا تم سے وہ یارِ ازل اس سے تم عرفانِ حق سے پہنو گے پھولوں کے ہار

এর ফলে সেই অনাদি-অনন্ত বন্ধু এসে তোমার সাথে মিলিত হবেন,
এর কল্যাণে খোদার তত্ত্বজ্ঞান লাভের মাধ্যমে তুমি ফুলের হার পরবে।

وہ کتابِ پاک و برتر جس کا فرقاں نام ہے　　وہ یہی دیتی ہے طالب کو بشارت بار بار

সেই গ্রন্থ পবিত্র ও মহান– যার নাম হলো কুরআন,
এর সন্ধানীকে এই শুভসংবাদই প্রদান করে বার বার।

جن کو ہے انکارِ اس سے سخت ناداں ہیں وہ لوگ　　آدمی کیونکر کہیں جب اُن میں ہے حُمقِ حمار

যারা এটি অস্বীকার করে তারা চরম নির্বোধ,
তারা যেখানে গাধার মতো অথর্ব সেখানে তাদেরকে মানুষ কীভাবে বলতে পারি!

کیا یہی اسلام کا ہے دوسرے دینوں پہ فخر　　کردیا قصّوں پہ سارا ختم دیں کا کاروبار

অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে এটিই কি ইসলামের গর্বের বিষয়?
ধর্ম কেবল গল্পসর্বস্বই থেকে গেল!

مغزِ فرقانِ مطہرؐ کیا یہی ہے زُہد خشک　　کیا یہی چوہا ہے نکلا کھود کر یہ کوہسار

পবিত্র কুরআনের সব পবিত্র শিক্ষার সার কি এ প্রাণহীন তাকওয়া?
এত বড়ো পাহাড় খোদাইয়ের পর কি এ ইঁদুরটিই বের হলো?

گر یہی اسلام ہے بس ہو گئی اُمّت ہلاک　　کس طرح رہ مل سکے جب دیں ہی ہو تاریک و تار

এটিই যদি ইসলাম হয় তাহলে উম্মত যে ধ্বংস হয়ে গেল,
ধর্মই যদি তমসাচ্ছন্ন হয় তাহলে সঠিক পথ পাওয়া
কীভাবে সম্ভব?

منہ کو اپنے کیوں بگاڑا نااُمیدوں کی طرح　　فیض کے در کھل رہے ہیں اپنے دامن کو پسار

নৈরাশ্যের শিকার লোকদের ন্যায় নিজের চেহারা কেন বিকৃত করলে?
তোমার আঁচল বিছিয়ে দাও, কেননা কল্যাণের দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে।

کس طرح کے تم بشر ہو دیکھتے ہو صد نشاں　　پھر وہی ضدّ و تعصّب اور وہی کین و نقار

তোমরা কেমন মানুষ! শত শত নিদর্শন দেখেও–
একই হঠকারিতা ও বিদ্বেষ এবং একই হিংসা ও ঘৃণা লালন করো!

بات سب پوری ہوئی پر تم وہی ناقص رہے　　باغ میں ہو کر بھی قسمت میں نہیں دیں کے ثمار

সব কথা পূর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমরা পূর্বের মতো অপূর্ণ রয়ে গেলে,
বাগানে বসবাস করেও তোমাদের ভাগ্যে বাগানের ফল নেই।

دیکھ لو وہ ساری باتیں کیسی پوری ہوگئیں جن کا ہونا تھا بعید از عقل و فہم و افتکار

দেখো, সেসব কথা কীভাবে পূর্ণ হয়ে গেল–
যা বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তাচেতনার নিরিখে হওয়া অসম্ভব ছিল!

اُس زمانہ میں ذرہ سوچو کہ میں کیاچیز تھا جس زمانہ میں براہیں کا دیا تھا اشتہار

একটু ভাবো, সে যুগে আমি কী ছিলাম–
যে যুগে বারাহীনের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম!

پھر ذرہ سوچو کہ اب چرچا مرا کیسا ہوا کس طرح سرعت سے شہرت ہوگئی در ہر دیار

একটু চিন্তা করো, এখন আমার খ্যাতি কত অসাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়েছে!
কত দ্রুত সকল দেশে আমার খ্যাতি বিস্তার লাভ করেছে।

جانتا تھا کون کیا عزت تھی پبلک میں مجھے کس جماعت کی تھی مجھ سے کچھ ارادت یا پیار

আমাকে কে জানত আর জনমানবে আমার কিবা সম্মান ছিল!
কোন জামা'ত আমাকে সম্মান করত বা ভালোবাসত?

تھے رجوعِ خلق کے اسباب مال و علم و حکم خاندانِ فقر بھی تھا باعثِ عزّ و وقار

যা মানুষকে আকৃষ্ট করে তা হলো সম্পদ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা–
সূফী-সাধকদের বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়াও একটি সম্মানের কারণ হয়ে থাকে।

لیک ان چاروں سے میں محروم تھا اور بے نصیب ایک انساں تھا کہ خارج از حساب و از شمار

কিন্তু এই চারটির সবক'টি থেকেই আমি বঞ্চিত ছিলাম,
এমন এক মানুষ ছিলাম– যে হিসাব ও গণনার বাইরে ছিল।

پھر رکھایا نام کافر ہوگیا مطعونِ خلق کُفر کے فتووں نے مجھ کو کر دیا بے اعتبار

এরপর আমরা নাম রাখিয়েছি কাফির আর সৃষ্টির তিরস্কারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছি,
সব কুফরী ফতোয়া আমাকে অবিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

اس پہ بھی میرے خدا نے یاد کر کے اپنا قول مرجع عالم بنایا مجھ کو اور دین کا مدار

এতেও আমার খোদা নিজের কথা স্মরণ করে,
আমার প্রতি পৃথিবীর লোকদের আকৃষ্ট করেছেন আর আমাকে ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন।

سارے منصوبے جو تھے میری تباہی کے لئے کر دیئے اُس نے تبہ جیسے کہ ہو گرد و غبار

আমাকে ধ্বংস করার জন্য যত ষড়যন্ত্র ছিল,
সেগুলোকে ধ্বংস করে ধুলাবালিতুল্য করে দিয়েছেন।

سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ آدمی کا کام ہے کوئی بتلائے نظیر اس کی اگر کرنا ہے وار

একটু চিন্তা করে দেখো, এটি কি মানুষের কাজ হতে পারে?
যদি কেউ হামলা করতে চায় তাহলে তার উচিত এর কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা।

مکر انساں کو مٹا دیتا ہے انسانِ دِگر پر خدا کا کام کب بگڑے کسی سے زینہار

মানুষের ষড়যন্ত্র অন্য মানুষ নিশ্চিহ্ন করে দেয়,
কিন্তু খোদার কাজ কেউ কখনো ব্যর্থ করতে পারে কি?

مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں رُوسیہ جلد تر ہوتا ہے برہم افترا کا کاروبار

প্রতারক ও মিথ্যাবাদী এ পৃথিবীতেই লাঞ্ছিত হয়ে যায়,
প্রতারণাভিত্তিক কার্যক্রম খুব দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায়।

افترا کی ایسی دُم لمبی نہیں ہوتی کبھی جو ہو مثلِ مدتِ فخر الرسل فخر الخیار

মিথ্যা রচনার লেজ কখনো এত লম্বা হয় না,
যা নবীদের ও পুণ্যবানদের যুগের ন্যায় দীর্ঘ হবে।

حسرتوں سے میرا دل پُر ہے کہ کیوں منکر ہو تم یہ گھٹا اب جھوم جھوم آتی ہے دل پر بار بار

তোমাদের অস্বীকার আমাকে ভীষণভাবে ব্যথিত করে,
এই মেঘমালা বার বার আমার হৃদয়ে ছেয়ে যায়।

یہ عجب آنکھیں ہیں سورج بھی نظر آتا نہیں کچھ نہیں چھوڑا حسد نے عقل اور سوچ اور بچار

এগুলো অদ্ভুত চোখ– যা সূর্যকেও দেখে না,
হিংসা তাদের বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তাচেতনার কিছুই অবশিষ্ট রাখে নি।

قوم کی بدقسمتی اِس سرکشی سے کھل گئی پر وہی ہوتا ہے جو تقدیر سے پایا قرار

এই দুষ্কৃতির কারণে জাতির দুর্ভাগ্য স্পষ্টভাবে সামনে এসে গেছে,
কিন্তু হয় তা-ই যা নিয়তিতে নির্ধারিত থাকে।

قوم میں ایسے بھی پاتا ہوں جو ہیں دُنیا کے کرم مقصد اُن کی زیست کا ہے شہوت و خمر و قمار

জাতির মাঝে এমন লোকও দেখি– যারা দুনিয়ার কীট,
তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো কামনা বাসনার পূজা আর মদ ও জুয়ায় লিপ্ত থাকা।

مکر کے بل چل رہی ہے اُن کی گاڑی روز و شب نفس و شیطاں نے اُٹھایا ہے انہیں جیسے کہار

সকাল-সন্ধ্যা তাদের কাজ হলো প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র,
দুইজন পালকি বহনকারীর ন্যায় তাদেরকে শয়তান-ও তাদের আমিত্ব বহন করে চলেছে।

دیں کے کاموں میں تو اُن کے لڑکھڑاتے ہیں قدم لیک دُنیا کے لئے ہیں نوجوان و ہوشیار

ধর্মের কাজের ক্ষেত্রে তাদের চরণ দোদুল্যমান,
কিন্তু দুনিয়ার বিষয়ে তারা সক্ষম ও চৌকশ।

حلّت و حُرمت کی کچھ پروا نہیں باقی رہی ٹھونس کر مُردار پیٹوں میں نہیں لیتے ڈکار

তাদের মাঝে হালাল ও হারামের চেতনা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই,
তারা নীরবে লাশ ভক্ষণ করে ফেলে, ঢেকুর পর্যন্ত তোলে না।

لافِ زہد و راستی اور پاپ دل میں ہے بھرا ہے زباں میں سب شرف اور نیچ دل جیسے چمار

তারা তাকওয়া ও পুণ্যের কথা বলে কিন্তু তাদের হৃদয় পাপে পরিপূর্ণ,
তারা ভদ্রতা ও শালীনতার বুলি আওড়ায়, অথচ হৃদয় চামারের ন্যায় নীচ ও হীন।

اے عزیزو کب تلک چل سکتی ہے کاغذ کی ناؤ ایک دن ہے غرق ہونا باد و چشم اشکبار

হে প্রিয়গণ! কাগজের নৌকা কতদিন চলতে পারে?
একদিন ডুবতে হবে যখন দুচোখ থেকে অশ্রু উপচে পড়বে।

جاودانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں گلشنِ دلبر کی راہ ہے وادیٔ غربت کے خار

মৃত্যুতেই চিরস্থায়ী জীবন নিহিত,
প্রেমাস্পদের বাগানের পথ হলো নির্জন উপত্যকার কাঁটা।

اے خدا کمزور ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے اُٹھا ناتواں ہم ہیں ہمارا خود اُٹھالے سارا بار

হে খোদা! আমরা দুর্বল, তুমি আমাদের অবলম্বন হয়ে যাও,
আমরা দুর্বল, তুমি আমাদের পুরো বোঝা বহন করো।

تیری عظمت کے کرشمے دیکھتا ہوں ہر گھڑی تیری قدرت دیکھ کر دیکھا جہاں کو مُردہ وار

প্রতিটি মুহূর্ত তোমার মাহাত্ম্যের কারিশমা দেখি,
তোমার ক্ষমতা দেখার পর পৃথিবীকে আমার মৃত লাশের মতো মনে হয়।

کام دکھلائے جو تو نے میری نصرت کے لئے پھرتے ہیں آنکھوں کے آگے ہر زماں وہ کاروبار

আমার সাহায্যার্থে তুমি যেই ক্ষমতা দেখিয়েছ,
সকল যুগে সেই কাজ আমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়।

کس طرح تو نے سچائی کو مری ثابت کیا میں ترے قرباں مری جاں تیرے کاموں پر نثار

তুমি আশ্চর্যজনকভাবে আমার সত্যতা প্রমাণ করেছ,
আমি তোমার জন্য নিবেদিত আর আমার প্রাণ তোমার কাজে উৎসর্গীত।

ہے عجب اک خاصیت تیرے جمال و حسن میں جس نے اک چمکار سے مجھ کو کیا دیوانہ وار

তোমার সৌন্দর্য-সুষমায় এক আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান,
যা নিজের একটিমাত্র বিকাশ আমাকে উন্মাদপ্রায় করে তুলেছে।

اے مرے پیارے ضلالت میں پڑی ہے میری قوم تیری قدرت سے نہیں کچھ دُور گر پائیں سُدھار

হে আমার প্রিয়! আমার জাতি ভ্রষ্টতায় নিপতিত,
তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসা তোমার ক্ষমতার বাইরে নয়।

مجھ کو کافر کہتے ہیں میں بھی انہیں مومن کہوں گر نہ ہو پرہیز کرنا جھوٹ سے دیں کا شعار

তারা আমাকে কাফির বলে; আমি তাদের মুমিন বলতাম–
যদি না মিথ্যাকে এড়িয়ে চলা ধর্মের শিক্ষা হতো!

مجھ پہ اے واعظ نظر کی یار نے تجھ پر نہ کی حیف اُس ایماں پہ جس سے کفر بہتر لاکھ بار

বন্ধু আমার প্রতি স্নেহদৃষ্টি দিয়েছেন, কিন্তু হে নসীহতকারী তোর প্রতি করেন নি;
ধিক সেই ঈমানের জন্য যা হতে অবিশ্বাস লক্ষগুণ ভালো!

روضۂ آدم کہ تھا وہ نامکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ و بار

আজ পর্যন্ত আদমের বাগান অসম্পূর্ণ ছিল,
আমার আগমনের মাধ্যমে তা সকল প্রকার ফলমূলে ভরে গিয়েছে।

وہ خدا جس نے نبی کو تھا زرِ خالص دیا زیورِ دیں کو بناتا ہے وہ اب مثل سُنار

সেই খোদা যিনি নবীকে খাঁটি সোনা দিয়েছেন,
এখন তিনি স্বর্ণকারের ন্যায় ধর্মের গহনা বানিয়েছেন।

وہ دکھاتا ہے کہ دیں میں کچھ نہیں اکراہ و جبر دیں تو خود کھینچے ہے دل مثلِ بُتِ سیمیں عذار

তিনি প্রমাণ করেন যে, ধর্মে কোনো জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগের স্থান নেই,
কেননা ধর্ম স্বয়ং মানুষকে আকর্ষণীয় প্রেমাস্পদের ন্যায় আকৃষ্ট করে।

پس یہی ہے رمز جو اُس نے کیا منع از جہاد تا اٹھاوے دیں کی راہ سے جو اُٹھا تھا اِک غبار

তিনি যে জিহাদ করতে নিষেধ করেছেন, এর এটিই রহস্য–
যেন ধর্মের চেহারায় যে ধুলা ছেয়ে গিয়েছিল– তা দূরীভূত করতে পারেন।

تا دکھاوے منکروں کو دیں کی ذاتی خوبیاں جن سے ہوں شرمندہ جو اسلام پر کرتے ہیں وار

যেন অস্বীকারকারীদের ধর্মের সৌন্দর্য দেখাতে পারেন–
যার মাধ্যমে ইসলামের ওপর হামলাকারীরা লজ্জিত হবে।

کہتے ہیں یورپ کے ناداں یہ نبی کامل نہیں وحشیوں میں دیں کو پھیلانا یہ کیا مشکل تھا کار

ইউরোপের নির্বোধেরা বলে, এই নবী কামিল নন,
বর্বরদের মাঝে ধর্মের প্রচার কোনো বড়ো কাজ ছিল না!

پر بنانا آدمی وحشی کو ہے اِک معجزہ معنیٔ رازِ نبوت ہے اسی سے آشکار

কিন্তু বর্বর লোকদের মানুষ বানানো একটি নিদর্শন ছিল,
এতেই নবুওয়তের রহস্য নিহিত।

نور لائے آسماں سے خود بھی وہ اِک نور تھے قوم وحشی میں اگر پیدا ہوئے کیا جائے عار

তিনি আকাশ থেকে আলো এনেছেন আর তিনি নিজেও একটি আলো ছিলেন,
বুনোদের মাঝে জন্ম নিলে লজ্জার কী আছে?

روشنی میں مہرِ تاباں کی بھلا کیا فرق ہو گرچہ نکلے روم کی سرحد سے یا از زنگبار

উজ্জ্বল সূর্যের আলোতে সেটি কিবা প্রভাব ফেলতে পারে!
তা রোমের সীমান্ত হতে উদিত হোক বা জাঞ্জিবারের
সীমান্ত হতে।

اے مرے پیارو شکیب و صبر کی عادت کرو وہ اگر پھیلائیں بدبو تم بنو مشکِ تتار

হে আমার প্রিয়! ধৈর্য ও স্থৈর্যের অভ্যাস রপ্ত করো,
তা যদি দুর্গন্ধও ছড়ায়, তোমরা তাতারিস্তানের কস্তুরি হয়ে যাও।

نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں چپکے چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامانِ دمار

নিজের অবাধ্য প্রবৃত্তিকে হত্যা করো কেননা এর ন্যায় কোনো শত্রু নেই,
এটি গোপনে ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি করে।

جس نے نفسِ دُوں کو ہمت کرکے زیر پا کیا چیز کیا ہیں اُس کے آگے رستم و اسفندیار

যে সাহসিকতার সাথে হীন প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে,
তার সামনে রুস্তম ও এসফানদিয়ার কিবা গুরুত্ব রাখে?

گالیاں سن کر دُعا دو پا کے دکھ آرام دو کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار

গালির প্রত্যুত্তরে দোয়া দাও আর কষ্ট পেয়ে অন্যদের আরাম দাও,
অহংকারের অভ্যাস দেখলে এর বিপরীতে তুমি বিনয় প্রদর্শন করো।

تم نہ گھبراؤ اگر وہ گالیاں دیں ہر گھڑی چھوڑ دو اُن کو کہ چھپوائیں وہ ایسے اشتہار

তারা সর্বক্ষণ গালি দিলেও তোমরা ভয় পেয়ো না,
তাদের ছেড়ে দাও– তারা এমন বিজ্ঞাপন প্রচার করুক।

چپ رہو تم دیکھ کر اُن کے رسالوں میں ستم دم نہ مارو گر وہ ماریں اور کردیں حالِ زار

তাদের পুস্তক-পুস্তিকায় নির্যাতনমূলক বিষয় দেখে নীরব থাকো,
তারা যদি প্রতিশোধ নেয় আর অবস্থা শোচনীয়ও করে দেয়,
তবুও তোমরা প্রতিশোধ নেবে না।

دیکھ کر لوگوں کا جوش و غیظ مت کچھ غم کرو شدتِ گرمی کا ہے محتاج بارانِ بہار

মানুষের রাগ ও ক্রোধ দেখে তোমরা দুঃখ কোরো না,
বসন্তবারি প্রবল গরমের মুখাপেক্ষী।

افترا اُن کی نگاہوں میں ہمارا کام ہے یہ خیال اللہ اکبر کس قدر ہے نابکار

তাদের দৃষ্টিতে আমাদের কাজ হলো মিথ্যা বলা,
আল্লাহু আকবর! (আমাদের সম্পর্কে তাদের) এ ধারণাটি কত-না অর্থহীন!

خیر خواہی میں جہاں کی خوں کیا ہم نے جگر جنگ بھی تھی صلح کی نیت سے اور کیں سے فرار

পৃথিবীর কল্যাণের জন্য আমি নিজের রক্ত পানি করেছি,
এমনকি আমার যুদ্ধও ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা আর বিদ্বেষ দূরীভূত করার নিমিত্তে।

پاک دل پر بدگمانی۔ ہے یہ شقوت کا نشاں اب تو آنکھیں بند ہیں دیکھیں گے پھر انجام کار

পবিত্র হৃদয়কে সন্দেহ করা দুর্ভাগা হবার চিহ্ন,
এখন এদের চোখ বন্ধ, কিন্তু পরিশেষে একদিন তারা দেখবে।

جب کہ کہتے ہیں کہ کاذب پھولتے پھلتے نہیں پھر مجھے کہتے ہیں کاذب دیکھ کر میرے ثمار

যদিও তারা বলে যে, মিথ্যাবাদী কখনো উন্নতি করে না–
কিন্তু আমার উন্নতি দেখেও তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।

کیا تمہاری آنکھ سب کچھ دیکھ کر اندھی ہوئی کچھ تو اُس دن سے ڈرو یارو کہ ہے روزِ شمار

সবকিছু দেখেও কি তোমাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেল?
বন্ধুগণ! সেই দিনকে ভয় করো, যে-দিন তোমাদের হিসাব নেওয়া হবে।

آنکھ رکھتے ہو ذرہ سوچو کہ یہ کیا راز ہے کس طرح ممکن کہ وہ قدّوس ہو کاذب کا یار

তোমাদের চোখ আছে, তাই একটু চিন্তা করো– রহস্যটা কী!
সেই পবিত্র সত্তা মিথ্যাবাদীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হবেন– এটি কীভাবে সম্ভব?

یہ کرم مجھ پر ہے کیوں کوئی تو اس میں بات ہے بے سبب ہرگز نہیں یہ کاروبارِ کردگار

আমার প্রতি এত কৃপা কেন? নিশ্চয় এতে কোনো রহস্য আছে,
খোদার এই ব্যবহার কখনো বিনা কারণে নয়।

مجھ کو خود اُس نے دیا ہے چشمہءِ توحید پاک تا لگاوے از سرِ نو باغِ دیں میں لالہ زار

তিনি স্বয়ং আমাকে পবিত্র তওহীদের প্রস্রবণ দান করেছেন,
যেন ধর্মের বাগানে তিনি পুনরায় টিউলিপ ফুল ফোটাতে পারেন।

دوش پر میرے وہ چادر ہے کہ دی اُس یار نے پھر اگر قدرت ہے اے منکر تو یہ چادر اُتار

আমার কাঁধে সেই চাদর আছে যা সেই বন্ধু দান করেছেন,
যদি ক্ষমতা থাকে হে অস্বীকারকারী! এই চাদর খুলে ফেলো।

خیرگی سے بدگمانی اس قدر اچھی نہیں اِن دنوں میں جب کہ ہے شورِ قیامت آشکار

দুরভিসন্ধি নিয়ে কুধারণা করা ভালো নয়,
এই দিনগুলোতে যখন কিয়ামতরূপী হই-হট্টগোল সর্বত্র বিরাজমান।

ایک طوفاں ہے خدا کے قہر کا اب جوش پر نوح کی کشتی میں جو بیٹھے وہی ہو رستگار

খোদার আযাবের একটি তুফান ফুঁসে উঠেছে,
যারা নূহের নৌকায় বসে আছে, তারাই রক্ষা পাবে।

صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہیں درندے ہر طرف مَیں عافیت کا ہوں حصار

নিষ্ঠার সাথে আমার কাছে আসো, এতেই কল্যাণ নিহিত;
সর্বত্র হিংস্র প্রাণী বিরাজমান– আমি নিরাপত্তার দুর্গ।

پشتیء دیوارِ دیں اور مامنِ اسلام ہوں نارسا ہے دستِ دشمن تا بفرقِ ایں جدار

আমি ইসলামের দেয়ালের অবলম্বন আর ইসলামের আশ্রয়স্থল;
শত্রুর হাত এই দেয়াল ভাঙতে পারবে না।

جاہلوں میں اس قدر کیوں بدگمانی بڑھ گئی کچھ بُرے آئے ہیں دن یا پڑ گئی لعنت کی مار

অজ্ঞদের ভেতর কুধারণা কেন এত বেড়ে গেল?
মন্দসময় কি এসে গেল, নাকি তারা খোদার অভিশাপের শিকার হয়েছে?

کچھ تو سمجھیں بات کو یہ دل میں ارماں ہی رہا واہ رے شیطاں عجب اُن کو کیا اپنا شکار

তারা আমার কথা কিছুটা বুঝবে– আমার এ স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেল,
হে শয়তান! তুই আশ্চর্যজনকভাবে তাদের নিজের শিকারে পরিণত করেছিস।

اے کہ ہر دم بدگمانی تیرا کاروبار ہے دوسری قوت کہاں گم ہوگئی اے ہوشیار

হে সেই ব্যক্তি! যার অভ্যাস হলো সদা কুধারণা করা,
হে তথাকথিত বুদ্ধিমান! তোমার অন্য শক্তি কোথায় গেল?

میں اگر کاذب ہوں کذّابوں کی دیکھوں گا سزا پر اگر صادق ہوں پھر کیا عذر ہے روزِ شمار

আমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি তাহলে মিথ্যাবাদীদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি পাবো,
কিন্তু যদি সত্যবাদী হয়ে থাকি তাহলে কিয়ামত দিবসে তোমাদের অজুহাত কী হবে?

اس تعصب پر نظر کرنا کہ مَیں اسلام پر ہوں فدا۔ پھر بھی مجھے کہتے ہیں کافر بار بار

নিজেদের বিদ্বেষ সম্পর্কে একটু চিন্তা করো, কেননা আমার জীবন যে ইসলামের জন্য নিবেদিত–
তা সত্ত্বেও আমাকে বার বার কাফির আখ্যায়িত করে থাকো।

مَیں وہ پانی ہوں کہ آیا آسماں سے وقت پر میں وہ ہوں نورِ خدا جس سے ہوا دن آشکار

আমি সেই পানি– যা যথাসময়ে আকাশ থেকে বর্ষিত হয়েছে,
আমি খোদার সেই জ্যোতি– যার মাধ্যমে ধর্মের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে।

ہائے وہ تقویٰ جو کہتے تھے کہاں مخفی ہوئی سارباںِ نفس دوں نے کس طرف پھیری مہار

পরিতাপ সেই তাকওয়া! যা নিয়ে অনেক কথা হতো– তা কোথায় হারিয়ে গেল!
পাপিষ্ঠ প্রবৃত্তি তোমায় কোথায় নিয়ে গেল?

کام جو دکھلائے اُس خلّاق نے میرے لئے کیا وہ کر سکتا ہے جو ہو مفتری شیطاں کا یار

সেই মহাস্রষ্টা আমার জন্য যা কিছু করে দেখিয়েছেন,
সেই প্রতারক– যে শয়তানের বন্ধু, সে কি এমন কাজ করতে পারে?

میں نے روتے روتے دامن کر دیا تر درد سے اب تلک تم میں وہی خشکی رہی باحالِ زار

আমি বেদনার ঘোরে কাঁদতে কাঁদতে আমার আঁচল সিক্ত করেছি,
তা সত্ত্বেও তোমরা এখনও সেই দুর্ভাগ্যের মাঝে শোচনীয় অবস্থায় পড়ে রয়েছ।

ہائے یہ کیا ہوگیا عقلوں پہ کیا پتھر پڑے ہوگیا آنکھوں کے آگے اُن کے دن تاریک و تار

পরিতাপ! এ কী হয়ে গেল, মানুষের বিবেকবুদ্ধির কী হয়েছে?
তাদের চোখের সামনে তাদের দিন তমসাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে।

یا کسی مخفی گناہ سے شامتِ اعمال ہے جس سے عقلیں ہو گئیں بیکار اور اک مُردہ وار

নাকি কোনো প্রচ্ছন্ন পাপের কারণে তাদের এই পরিণতি হলো!
যার ফলে বিবেকবুদ্ধি প্রাণহীন লাশের ন্যায় অকেজো হয়ে গেল।

گر دنوں پر اُن کی ہے سب عام لوگوں کا گناہ جن کے وعظوں سے جہاں کے آگیا دل میں غبار

সর্বসাধারণের দৃষ্টি তাদের পানে নিবদ্ধ,
যাদের বক্তৃতার কারণে মানুষের হৃদয় কলুষিত হয়ে উঠেছে।

ایسے کچھ سوئے کہ پھر جاگے نہیں ہیں اب تلک ایسے کچھ بھولے کہ پھر نسیاں ہوا گر دن کا ہار

তারা এমন নিদ্রায় আচ্ছন্ন যে, আজও জাগ্রত হয় নি;
এমনভাবে ভুলে বসেছে যে, ভোলার রোগ তাদের গলার হার হয়ে গিয়েছে।

نوعِ انساں میں بدی کا تخم بونا ظلم ہے وہ بدی آتی ہے اُس پر جو ہو اُس کا کاشتکار

মানবজাতির মাঝে পাপের বীজ বপন করা মহা অন্যায়,
যে পাপের বীজ বপন করবে সে পাপের ফলও বহন করবে।

چھوڑ کر فرقاں کو آثارِ مخالف پر جمے سر پہ مسلم اور بخاری کے دیا ناحق کا بار

তারা কুরআনকে ছেড়ে দিয়ে স্ববিরোধী বিভিন্ন রেওয়ায়েত নিয়ে ব্যস্ত,
বুখারী ও মুসলিমের প্রতি অন্যায় কথা আরোপ করেছে।

جبکہ ہے امکان کذب و کجروی اخبار میں پھر حماقت ہے کہ رکھیں سب انہی پر انحصار

যেখানে হাদীসে ভুল ও বক্রতার আশঙ্কা রয়েছে,
সেখানে সম্পূর্ণভাবে সেসবের ওপর নির্ভর করা চরম বোকামি।

جبکہ ہم نے نور حق دیکھا ہے اپنی آنکھ سے جب کہ خود وحی خدا نے دی خبر یہ بار بار

যেখানে আমরা স্বচক্ষে সত্যের জ্যোতি দেখেছি,
যেখানে খোদার ওহী বার বার এ সংবাদ প্রদান করেছে।

پھر یقیں کو چھوڑ کر ہم کیوں گمانوں پر چلیں خود کہو رویت ہے بہتر یا نقولِ پُر غبار

সেখানে আমরা নিশ্চিত কথা পরিত্যাগ করে কেন ধারণার পেছনে ছুটব?
তোমরা আমাকে বলো, নিজের চোখে দেখা ভালো নাকি সন্দেহযুক্ত
রেওয়ায়েতের পেছনে ছোটা ভালো?

تفرقہ اسلام میں نقلوں کی کثرت سے ہوا جس سے ظاہر ہے کہ راہ نقل ہے بے اعتبار

ইসলামে রেওয়ায়েত বা হাদীসের আধিক্যের কারণেই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে,
এটি থেকে বুঝা যায়, রেওয়ায়েত বা হাদীস যেভাবে বর্ণিত হয়েছে–
তা নির্ভরযোগ্য নয়।

نقل کی تھی اک خطا کاری مسیحا کی حیات جس سے دیں نصرانیت کا ہوگیا خدمت گذار

ঈসা জীবিত থাকার বিশ্বাস এমনই রেওয়ায়েত থেকেই মাথাচাড়া দিয়েছে,
যার মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম খ্রিষ্টধর্মকে সাহায্য করেছে।

صد ہزاراں آفتیں نازل ہوئیں اسلام پر ہوگئے شیطاں کے چیلے گردنِ دیں پر سوار

ইসলামের ওপর হাজার হাজার বিপদাপদ নেমে এসেছে,
ধর্মের ঘাড়ে শয়তানের চেলারা ভর করেছে।

موتِ عیسیٰ کی شہادت دی خدا نے صاف صاف پھر احادیثِ مخالف رکھتی ہیں کیا اعتبار

খোদা তা'লা ঈসার মৃত্যুর পরিষ্কার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন,
তাই এর বিরোধী হাদীসের ওপর কীভাবে নির্ভর করা যেতে পারে?

گر گُماں صحت کا ہو پھر قابلِ تاویل ہیں کیاحدیثوں کے لئے فرقاں پہ کرسکتے ہو وار

নির্ভরযোগ্য মনে হলেও সেগুলোর ব্যখ্যা করা আবশ্যক,
হাদীসের খাতিরে কুরআনের ওপর হামলা করা যায় কি?

وہ خدا جس نے نشانوں سے مجھے تمغہ دیا اب بھی وہ تائید فرقاں کر رہا ہے بار بار

সে খোদা– যিনি আমাকে নিদর্শনাবলির পদক প্রদান করেছেন,
আজও তিনি বার বার কুরআনকে সমর্থন করছেন।

سر کو پیٹو! آسماں سے اب کوئی آتا نہیں عمرِ دنیا سے بھی اب ہے آگیا ہفتم * ہزار

মাথা ঠোকো! কেননা এখন আর আকাশ থেকে কেউ আসবে না;
পৃথিবীর বয়সের এটি সপ্তম হাজার বছর।*

---

* **টীকা:** পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থাবলি এবং সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে (এখন পর্যন্ত) দুনিয়ার বয়স সাত হাজার বছর। এর দিকেই কুরআন শরীফ এ আয়াতে ইঙ্গিত করে বলছে যে,

اُس کے آتے آتے دیں کا ہوگیا قصّہ تمام کیاوہ تب آئے گاجب دیکھے گااِس دیں کامزار

তার আসার অপেক্ষায় ধর্মের অবস্থা শোচনীয় হয়ে গেছে,
সে কি এ ধর্মের কবর জিয়ারতের জন্য আসবে?

کشتیء اسلام بے لطفِ خدا اب غرق ہے اے جنوں کچھ کام کر بیکار ہیں عقلوں کے وار

খোদার সাহায্য যদি না আসে তাহলে ইসলামের নৌকা নিমিজ্জত হতে চলেছে,
হে আন্তরিক আবেগ ও উচ্ছ্বাস! কিছু করে দেখাও, কেননা যুক্তির এখানে কোনো কাজ নেই।

مجھ کو دے اک فوق عادت اے خدا جوش و تپش جس سے ہو جاؤں میں غم میں دیں کے اِک دیوانہ وار

হে খোদা! আমাকে একটি অসাধারণ উচ্ছ্বাস ও আবেগ দান করো,
যার কল্যাণে আমি ধর্মের জন্য বেদনায় উন্মাদপ্রায় হয়ে যাব।

وہ لگادے آگ میرے دل میں ملّت کے لئے شعلے پہنچیں جس کے ہر دم آسماں تک بیشمار

আমার হৃদয়ে ধর্মের জন্য এমন এক আগুন জ্বালিয়ে দাও,
যার অগণিত স্ফুলিঙ্গ সদা আকাশে পৌঁছাবে।

*** চলমান টীকা:**

اِنَّ یَوۡمًا عِنۡدَ رَبِّکَ کَاَلۡفِ سَنَۃٍ مِّمَّا تَعُدُّوۡنَ

(সূরা আল-হাজ্জ: ৪৮)

অর্থাৎ আল্লাহর একটি দিন তোমাদের হাজার বছরের সমান। আল্লাহ তা'লা আমার অন্তরে এই এলহাম করেছেন যে, হযরত আদম (আ.) থেকে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ পর্যন্ত চন্দ্রবর্ষ (বা কামরী হিসাব) অনুযায়ী ততটাই সময়কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, যতটা সূরা ওয়াল আসর-এর গাণিতিক মান অনুযায়ী হিসাব করলে বোঝা যায়। এই হিসাব অনুসারে, হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে এখন সপ্তম হাজার চন্দ্রবর্ষ চলছে, যা পৃথিবীর সমাপ্তির ইঙ্গিত বহন করে। এই হিসাব যা সূরা ওয়াল আসরের অক্ষরের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়েছে, তা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের হিসাবের সাথেও পুরোপুরি মিল রাখে শুধু চান্দ্র ও সৌর হিসাবের পার্থক্য বিবেচনায় রাখা দরকার। তাদের (ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের) গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মসীহ মওউদ-এর আগমন ষষ্ঠ হাজারে হওয়া জরুরি এবং এখন ষষ্ঠ হাজার পার হবার পর বহু বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। –লেখক

اے خدا تیرے لئے ہر ذرّہ ہو میرا فدا مجھ کو دکھلادے بہارِ دیں کہ مَیں ہوں اشکبار

হে খোদা! তোমার জন্য যেন আমার প্রতিটি দেহকণা নিবেদিত হয়,
আমাকে ধর্মের বসন্ত দেখাও, কেননা আমি অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছি।

خاکساری کو ہماری دیکھ اے دانائے راز کام تیرا کام ہے ہم ہوگئے اب بیقرار

হে অদৃশ্যের দ্রষ্টা! আমার দৈন্যদশা দেখো,
এটি তোমার কাজ কিন্তু আমরা এখন ব্যাকুল।

اِک کرم کر پھیر دے لوگوں کو فرقاں کی طرف نیز دے توفیق تا وہ کچھ کریں سوچ اور بچار

একটিবার কৃপা করো আর মানুষকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করো,
আর তাদের সামর্থ্যও দান করো যেন তারা চিন্তাভাবনা করে।

ایک فرقاں ہے جو شک اور ریب سے وہ پاک ہے بعد اس کے ظنِّ غالب کو ہیں کرتے اختیار

একমাত্র কুরআনই সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্ত,
এটিকে বাদ দিয়ে তারা সন্দেহকে অবলম্বন করে।

پھر یہ نقلیں بھی اگر میری طرف سے پیش ہوں تنگ ہو جائے مخالف پر مجالِ کار زار

আমি যদি আমার পক্ষ থেকে এমন রেওয়ায়েত উপস্থাপন করি,
তাহলে বিরোধীদের জন্য আর পলায়নের কোনো রাস্তা থাকবে না।

باغ مرجھایا ہوا تھا گر گئے تھے سب ثمر میں خدا کا فضل لایا پھر ہوئے پیدا ثمار

ঈমানের বাগান শুকিয়ে গিয়েছিল আর সব ফল ঝরে গিয়েছিল,
আমি খোদার কৃপা নিয়ে এসেছি কেবল এরপরই ফল ধরেছে।

مرہمِ عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا میری مرہم سے شفا پائے گا ہر ملک و دیار

মরহমে ঈসা কেবল ঈসাকে আরোগ্য দান করেছে,
আমার মলমের মাধ্যমে সব দেশ ও ভূমি আরোগ্য লাভ করবে।

جھانکتے تھے نور کو وہ روزنِ دیوار سے لیک جب در کھل گئے پھر ہوگئے شپّر شعار

তারা দেয়ালের ছিদ্রপথে উঁকি মেরে আলো দেখত,
কিন্তু দরজা যখন পুরোপুরি খুলে গেল, তখন তারা নিছক বাদুড় হয়ে গেল।

وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے　　اب مَیں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار

যে ধনভাণ্ডার সহস্র বছর থেকে চাপা পড়েছিল,
নেবার কেউ থাকলে নিতে পারে আমি এখন তা পুনরায় বণ্টন করছি।

پر ہوئے دیں کے لئے یہ لوگ مارِ آستیں　　دشمنوں کو خوش کیا اور ہوگیا آزردہ یار

কিন্তু ধর্মের জন্য এরা আস্তিনের সাঁপ সদৃশ হয়ে গেল,
তারা শত্রুকে সন্তুষ্ট করে আর বন্ধুদের অসন্তুষ্ট করে।

غل مچاتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور دجّال ہے　　پاک کو ناپاک سمجھے ہوگئے مردار خوار

তারা বাড়াবাড়ি করে বলে যে, এ ব্যক্তি কাফির ও দাজ্জাল;
তারা পবিত্রকে অপবিত্র জ্ঞান করে বসে আর লাশের মাংস ভক্ষণ করে।

گو وہ کافر کہہ کے ہم سے دُور تر ہیں جا پڑے　　اُن کے غم میں ہم تو پھر بھی ہیں حزیں و دلفگار

যদিও তারা কাফির আখ্যা দিয়ে আমাদের চেয়ে দূরে ছিটকে পড়েছে,
তবুও আমরা তাদের দুঃখে ভারাক্রান্ত ও বেদনার্ত।

ہم نے یہ مانا کہ اُن کے دل ہیں پتھر ہوگئے　　پھر بھی پتھر سے نکل سکتی ہے دینداری کی نار

আমরা বুঝলাম যে, তাদের হৃদয় পাষাণ হয়ে গিয়েছে;
তা সত্ত্বেও পাথর থেকে ধার্মিকতার স্ফুলিঙ্গ বের হতে পারে।

کیسے ہی وہ سخت دل ہوں ہم نہیں ہیں ناامید　　آیتِ لَا تَیْئَسُوْا رکھتی ہے دل کو استوار

তাদের হৃদয় যতই কঠোর হোক না কেন আমরা নিরাশ নই,
আয়াত 'লা তাইআসূ' (তথা তোমরা নিরাশ হয়ো না)
হৃদয়কে শক্তি জুগিয়ে থাকে।

پیشہ ہے رونا ہمارا پیش ربِّ ذُوالمِنَن　　یہ شجر آخر کبھی اس نہر سے لائیں گے بار

অনুগ্রহশীল খোদার কাছে আমাদের পেশা হলো অশ্রু বিসর্জন দেওয়া,
এই অশ্রুধারা অবশেষে একদিন এ বৃক্ষের ফল ধরার কারণ হবে।

جن میں آیا ہے مسیح وقت وہ منکر ہوئے　　مرگئے تھے اس تمنا میں خواصِ ہر دیار

যাদের ভেতর যুগ মসীহ এসেছেন– তারা তাকে অস্বীকার করে বসেছে,
অথচ সকল দেশের বিশেষ শ্রেণির লোকেরা তার অপেক্ষা করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

مَیں نہیں کہتا کہ میری جاں ہے سب سے پاک تر میں نہیں کہتا کہ یہ میرے عمل کے ہیں ثمار

আমি বলি না যে, আমার জীবন সবচেয়ে পবিত্র;
আমি বলি না যে, এটি আমার কর্মফল।

میں نہیں رکھتا تھا اس دعوے سے اِک ذرّہ خبر کھول کر دیکھو براہیں کو کہ تا ہو اعتبار

এই দাবি সম্পর্কে আমি বিন্দুমাত্র ধারণা রাখতাম না,
বারাহীনে আমহদীয়া খুলে দেখো, যেন তোমাদের বিশ্বাস হয়।

گر کہے کوئی کہ یہ منصب تھا شایانِ قریش وہ خدا سے پوچھ لے میرا نہیں یہ کاروبار

যদি কেউ বলে যে, একমাত্র কুরাইশ এই পদের যোগ্য–
তার উচিত খোদাকে জিজ্ঞেস করা, আমি নিজ চেষ্টায় এ পদ লাভ করি নি।

مجھ کو بس ہے وہ خدا عہدوں کی کچھ پروا نہیں ہو سکے تو خود بنو مہدی بحکمِ کردگار

আমার জন্য সেই খোদাই যথেষ্ট, আমি পদের কোনো চিন্তা করি না–
যদি সম্ভব হয় তাহলে খোদার নির্দেশ অনুসারে নিজেই মাহদী হয়ে যাও।

افترا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے پھر لعیں وہ بھی ہے جو صادق سے رکھتا ہے نقار

মিথ্যা দাবি করা একটি অভিশাপ, প্রত্যেক মিথ্যা দাবিদার হলো অভিশপ্ত,
এছাড়া সে-ও শয়তান যে সত্যবাদীর প্রতি বিদ্বেষ রাখে।

تشنہ بیٹھے ہو کنارِ جوئے شیریں حیف ہے سر زمینِ ہند میں چلتی ہے نہرِ خوشگوار

কত দুঃখজনক কথা যে তুমি সুমিষ্ট-সুপেয় জলধারার পাশে পিপাসার্ত বসে আছো!
ভারতের ভূমিতে একটি সতেজ ঝরনাধারা বহমান রয়েছে।

ان نشانوں * کو ذرہ سوچو کہ کس کے کام ہیں کیا ضرورت ہے کہ دکھلاؤ غضب دیوانہ وار

এসব নিদর্শন* দেখো, এগুলো কার হাতের সৃষ্ট!
উন্মাদের ন্যায় তোমাদের ক্রোধ প্রকাশের প্রয়োজন কী?

---

* **টীকা:** এখন পর্যন্ত আল্লাহ তা'লার শত-সহস্র নিদর্শন আমার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ছে। স্বর্গও আমার জন্য নিদর্শন দেখিয়েছে আর মর্ত্যও আর বন্ধুদের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে এবং শত্রুদের মধ্যেও, যার কয়েক লক্ষ মানুষ সাক্ষী। এসব নিদর্শন যদি

مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو یہ خدا کا ہے نہ ہے یہ مفتری کا کاروبار

হে অস্বীকারকারীরা! খোদার দৃষ্টিতে বিনা কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ো না,
এটি খোদার কাজ– কোনো মিথ্যা দাবিকারকের কাজ নয়।

یہ فتوحاتِ نمایاں یہ تواتر سے نشاں کیا یہ ممکن ہیں بشر سے کیا یہ مکاروں کا کار

এই স্পষ্ট বিজয় এবং অব্যাহত এসব নিদর্শন,
এটি কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? এটি কি ষড়যন্ত্রকারীদের কাজ?

ایسی سرعت سے یہ شہرت ناگہاں سالوں کے بعد کیا نہیں ثابت یہ کرتی صدقِ قولِ کردگار

এত বছর পর আকস্মিকভাবে এ খ্যাতি লাভ করা–
এটি কি খোদা তা'লার কথার সত্যতা প্রমাণ করে না?

کچھ تو سوچو ہوش کر کے کیا یہ معمولی ہے بات جس کا چرچا کر رہا ہے ہر بشر اور ہر دیار

একটু বিবেক খাটিয়ে চিন্তা করো, এটি কি সামান্য বিষয়?
যার কথা সব মানুষ ও প্রতিটি দেশ বলছে।

مٹ گئے حیلے تمہارے ہوگئی حجت تمام اب کہو کس پر ہوئی اے منکرو لعنت کی مار

তোমাদের সকল চক্রান্ত ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে আর সকল যুক্তিপ্রমাণও স্পষ্ট হয়ে গেছে।
এখন হে অস্বীকারকারীরা! বলো, কার ওপর অভিশাপ বর্ষিত হলো।

بندۂ درگاہ ہوں اور بندگی سے کام ہے کچھ نہیں ہے فتح سے مطلب نہ دل میں خوفِ ہار

আমি খোদার দরবারের ফকির আর দাসত্ব করা আমার কাজ,
বিজয় নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই আর পরাজয়ের ভয়ও নেই।

---

* **চলমান টীকা:** পৃথক পৃথকভাবে বিস্তারিত গণনা করা হয়, তবে তা প্রায় দশ লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। فالحمد لله على ذلك (অতএব এর সব প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য) –লেখক

مت کرو بک بک بہت۔ اُس کی دلوں پر ہے نظر دیکھتا ہے پاکیٔ دل کو نہ باتوں کی سنوار

বেশি বকবক কোরো না, মানুষের হৃদয়ের ওপর তাঁর দৃষ্টি রয়েছে;
তিনি হৃদয়ের পবিত্রতা দেখেন– কথা কতটা সাজিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে
সেটি দেখেন না।

کیسے پتھر پڑ گئے ہے ہے تمہاری عقل پر دیں ہے مُنہ میں گرگ کے تم گرگ کے خود پاسدار

তোমাদের বিবেকবুদ্ধি কীভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে গেল,
ধর্ম এখন নেকড়ের মুখে অথচ তোমরা নেকড়ের রক্ষণাবেক্ষণ করছ।

ہر طرف سے پڑ رہے ہیں دینِ احمد پر تبر کیا نہیں تم دیکھتے قوموں کو اور اُن کے وہ وار

সকল দিক থেকে আহমদের ধর্মের ওপর কুঠারাঘাত আসছে,
তোমরা কি তাদেরকে ও তাদের হামলাকে দেখো না?

کون سی آنکھیں جو اس کو دیکھ کر روتی نہیں کون سے دل ہیں جو اس غم سے نہیں ہیں بیقرار

এমন কোনো চোখ আছে যা তা দেখে অশ্রু বিসর্জন দেয় না?
সেগুলো কেমন হৃদয় যা এসব দুঃখে ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত নয়?

کھا رہا ہے دیں طمانچے ہاتھ سے قوموں کے آج اِک تزلزل میں پڑا اسلام کا عالی منار

আজ বিভিন্ন জাতির হাতে ধর্ম চপেটাঘাত খাচ্ছে,
ইসলামের সুমহান মিনার ভূমিকম্প কবলিত।

یہ مصیبت کیا نہیں پہنچی خدا کے عرش تک کیا یہ شمس الدّیں نہاں ہو جائے گا اب زیر غار

এই বিপদ কি খোদার আরশ পর্যন্ত পৌঁছে নি,
ধর্মের এই সূর্য কি এখন গুহায় হারিয়ে যাবে?

جنگ روحانی ہے اب اِس خادم و شیطان کا دل گھٹا جاتا ہے یارب سخت ہے یہ کارزار

এখন শয়তান ও এ অধমের মাঝে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ চলমান,
হে আমার প্রভু! তুমুল যুদ্ধে আমার হৃদয় ম্রিয়মাণ।

ہر نبیٔ وقت نے اس جنگ کی دی تھی خبر کر گئے وہ سب دعائیں بادو چشمِ اشکبار

সকল যুগের নবী যুদ্ধের সংবাদ দিয়েছিলেন,
তারা বেদনার্ত হৃদয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে সিজদাবনত হয়েছেন।

اے خدا شیطاں پہ مجھ کو فتح دے رحمت کے ساتھ وہ اکٹھی کر رہا ہے اپنی فوجیں بے شمار

হে খোদা! তুমি কৃপা করো আর আমাকে শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয় দান করো,
সে নিজের অগণিত বাহিনী সমবেত করছে।

جنگ یہ بڑھ کر ہے جنگِ روس اور جاپان سے میں غریب اور ہے مقابل پر حریفِ نامدار

রাশিয়া ও জাপানের যুদ্ধ থেকে এটি ভয়াবহ যুদ্ধ,
আমি অসহায় আর আমার বিপরীতে রয়েছে ভয়াবহ শত্রু।

دل نکل جاتا ہے قابو سے یہ مشکل سوچ کر اے مری جاں کی پنہ فوجِ ملائک کو اُتار

এ সমস্যার কথা চিন্তা করে হৃদয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়,
হে নিরাপত্তাদাতা! তুমি ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করে আমাকে সাহায্য করো।

بستر راحت کہاں ان فکر کے ایّام میں غم سے ہر دن ہو رہا ہے بدتر از شب ہائے تار

এই দুঃশ্চিন্তার মাঝে আরাম কাকে বলে আমি ভুলে গিয়েছি,
অন্ধকার রজনী থেকে আমার প্রতিটি দিন বেশি ভয়াবহ কাটছে।

لشکر شیطاں کے نرغے میں جہاں ہے گھِر گیا بات مشکل ہو گئی قدرت دکھا اے میرے یار

শয়তানের বাহিনী দ্বারা সমগ্র পৃথিবী পরিবেষ্টিত রয়েছে,
হে আমার বন্ধু! তুমি শক্তি প্রদর্শন করো, কেননা বিষয়টি অনেক কঠিন হয়ে গিয়েছে।

نسلِ انساں سے مدد اب مانگنا بے کار ہے اب ہماری ہے تری درگاہ میں یاربّ پکار

এখন মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া অর্থহীন,
এখন হে প্রভু! তোমার দরবারেই আমাদের কাকুতি।

کیوں کریں گے وہ مدد اُن کو مدد سے کیا غرض ہم تو کافر ہو چکے اُن کی نظر میں بار بار

তারা কেন সাহায্য করবে– সাহায্য নিয়ে তাদের কিবা মাথা ব্যথা,
আমি তো তাদের দৃষ্টিতে বার বার কাফির হয়ে গেছি।

پر مجھے رہ رہ کے آتا ہے تعجب قوم سے کیوں نہیں وہ دیکھتے جو ہو رہا ہے آشکار

কিন্তু জাতির অবস্থা দেখে আমার ক্ষণে ক্ষণে আক্ষেপ হয়,
যা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে তা তারা দেখে না কেন?

شکر لِلہ میری بھی آہیں نہیں خالی گئیں کچھ بنیں طاعوں کی صورت کچھ زلازل کے بخار

খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আমার আহাজারি বৃথা যায় নি;
কখনো প্লেগের আকারে আবার কখনো ভূমিকম্পরূপে গৃহীত হয়েছে।

اِک[১] طرف طاعون خونی کھا رہا ہے ملک کو ہو رہے ہیں صدہزاراں آدمی اس کا شکار

একদিকে রক্তপিপাসু প্লেগ দেশকে গ্রাস করছে,
লক্ষ লক্ষ মানুষ এর শিকারে পরিণত হচ্ছে।

دوسرے[২] منگل کے دن آیا تھا ایسا زلزلہ جس سے اِک محشر کا عالم تھا بصد شوروپکار

দ্বিতীয়ত মঙ্গলবারে এমন ভূমিকম্প এসেছে,
যার কারণে কিয়ামতের দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে।

ایک ہی دم میں ہزاروں اس جہاں سے چل دیئے جس قدر گھر گر گئے اُن کا کروں کیونکر شمار

নিমিষে এ পৃথিবী থেকে হাজার হাজার মানুষ বিদায় নিয়েছে,
কত ঘর যে মাটিতে মিশে গেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই!

یا تو وہ عالی مکاں تھے زینت و زیبِ جلوس یا ہوئے اِک ڈھیر اینٹوں کے پُر از گرد و غبار

মুহূর্ত পূর্বে যা ছিল সুরম্য অট্টালিকা,
পরবর্তী মুহূর্তে হয়ে গেল ইট এবং ধুলাবালির স্তূপ।

حشر جس کو کہتے ہیں اِک دم میں برپا ہوگیا ہر طرف میں مرگ کی آواز تھی اور اضطرار

যাকে হাশর বলা হয় তা নিমিষে দৃশ্যমান হলো,
সর্বত্র ছিল মৃত্যুধ্বনি আর ছিল অসহায়ত্ব।

دب گئے نیچے پہاڑوں کے کئی دیہات و شہر مرگئے لاکھوں بشر اور ہوگئے دُنیا سے پار

বহু শহর ও গ্রাম পাহাড়ের তলায় চাপা পড়েছে,
লক্ষ লক্ষ লোক মারা গিয়েছে এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে।

اِس نشاں کو دیکھ کر پھر بھی نہیں ہیں نرم دل پس خدا جانے کہ اب کس حشر کا ہے انتظار

একটি নিদর্শন দেখেও মানুষের হৃদয় গলে নি,
এখন জানি না কোন হাশরের অপেক্ষা এরা করছে!

وہ جو کہلاتے تھے صوفی کیں میں سب سے بڑھ گئے کیا یہی عادت تھی شیخ غزنوی کی یادگار

যারা সূফী আখ্যায়িত হতো তারা শত্রুতায় সবচেয়ে এগিয়ে গিয়েছে,
শায়খে গজনবী কি এ দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছিল!

کہتے ہیں لوگوں کو ہم بھی زُبدۃُ الابرار ہیں پڑتی ہے ہم پر بھی کچھ کچھ وحی رحماں کی پھوار

মানুষকে বলে যে, আমরা পুণ্যবানদের শিরোমণি;
আমাদের প্রতি রহমান খোদার ওহীর ছিটেফোঁটা অবতীর্ণ হয়।

پر وہی نا فہم ملہم اَوّلُ الاعداء ہوئے آگیا چرخِ بریں سے اُن کو تکفیروں کا تار

কিন্তু সেই নির্বোধ এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি সবচেয়ে বড়ো শত্রুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো,
যেন তারা ঊর্ধ্বলোক থেকে এমন কোনো টেলিগ্রাম পেয়েছে যাতে আমাকে কাফির আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

سب نشاں بیکار اُن کے بغض کے آگے ہوئے ہو گیا تیرِ تعصّب ان کے دل میں وار پار

তাদের বিদ্বেষের সামনে সব নিদর্শন অর্থহীন সাব্যস্ত হলো,
বিদ্বেষের তির তাদের হৃদয় বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গেছে।

دیکھتے ہرگز نہیں قُدرت کو اُس ستّار کی گو سناویں اُن کو وہ اپنی بجاتے ہیں ستار

তারা সেই দুর্বলতা গোপনকারী খোদার শক্তিমত্তাকে আদৌ দেখে না,
আমরা যাই বলি না কেন তারা নিজেদের কথাই বলতে থাকে।

صوفیا اب ہیچ ہے تیری طرح تیری تراہ آسماں سے آگئی میری شہادت بار بار

হে সূফীরা! তোমাদের রীতিনীতি তোমাদের নিজেদের মতোই এখন অর্থহীন,
আকাশ থেকে বার বার আমার সত্যতার সাক্ষ্য এসেছে।

قدرتِ حق ہے کہ تم بھی میرے دشمن ہوگئے یا محبت کے وہ دن تھے یا ہوا ایسا نقار

খোদার কুদরত– তোমরাও আমার শত্রু হয়ে গেলে!
একসময় যে গভীর ভালোবাসা ছিল তা আজ ঘৃণায় রূপ নিয়েছে।

دھو دیئے دل سے وہ سارے صحبتِ دیریں کے رنگ پھول بَن کر ایک مدت تک ہوئے آخر کو خار

হৃদয় থেকে দীর্ঘকালের সাহচর্যের স্মৃতি তোমরা মুছে ফেলেছ,
দীর্ঘদিন ফুল হয়ে বিরাজমান থাকার পর এখন কাঁটা হয়ে গেলে।

جس قدر نقدِ تعارف تھا وہ کھو بیٹھے تمام آہ کیا یہ دل میں گذرا۔ ہوں میں اس سے دلفگار

পরিচিতির সকল মূল্যবান স্মৃতি হারিয়ে বসেছ,
হায়! আমার হৃদয়ে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা আমার মন ভেঙে দিয়েছে।

آسماں پر شور ہے پر کچھ نہیں تم کو خبر دن تو روشن تھا مگر ہے بڑھ گئی گرد و غبار

ঊর্ধ্বলোকে একটি হইচই চলছে, কিন্তু তোমরা সে সম্পর্কে অজ্ঞ;
দিন উজ্জ্বল ছিল কিন্তু এখন তা ধুলাবালি ও নৈরাশ্যের কারণে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে।

اِک نشاں ہے آنے والا آج سے کچھ دن کے بعد جس سے گردش کھائیں گے دیہات و شہر اور مرغزار

আজ থেকে কিছু দিনের মাথায় একটি নিদর্শন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে,
যা গ্রাম, শহর এবং তৃণভূমিকে প্রকম্পিত করবে।

آئے گا قہر خدا سے خلق پر اِک انقلاب اِک برہنہ سے نہ یہ ہو گا کہ تا باندھے ازار

খোদার ক্রোধের ফলে তাঁর সৃষ্টির ওপর একটি বড়ো শাস্তি নেমে আসবে,
এটি এত আকস্মিকভাবে আসবে যে, একজন উলঙ্গ ব্যক্তি লুঙ্গি পরারও সুযোগ পাবে না।

یک بیک اِک زلزلہ سے سخت جنبش کھائیں گے * کیا بشر اور کیا شجر اور کیا حجر اور کیا بحار

আকস্মিক ভূমিকম্পের ফলে (ভূমি) মারাত্মকভাবে প্রকম্পিত হবে,*
তা মানুষ, বৃক্ষ, পাহাড়-পর্বত বা সমুদ্রই হোক।

*** টীকা:** আল্লাহ তা'লার ওহীতে বার বার 'ভূমিকম্প' শব্দটি এসেছে। তিনি বলেছেন যে, এমন এক ভূমিকম্প ঘটবে, যা কিয়ামতুল্য হবে– বরং সেটিকেই প্রকৃতপক্ষে কিয়ামত দিবসের ভূমিকম্প বলা উচিত যার প্রতি সূরা اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا (আয-যিলযাল: ০২) ইঙ্গিত করে। তবে আমি এখনও এই 'ভূমিকম্প' শব্দটিকে সুনিশ্চিত ও চূড়ান্তভাবে আক্ষরিক ভূমিকম্পের অর্থে নিতে পারি না। এটি হয়ত কোনো সাধারণ ভূমিকম্প নয়– বরং অন্য কোনো ভয়ানক দুর্যোগ হবে, যা কিয়ামতের দৃশ্যের অবতারণা করবে। যার দৃষ্টান্ত এ যুগ কখনো দেখে নি, এবং যার ফলে প্রাণ ও বাড়িঘর মারাত্মক ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। তবে এমন অসাধারণ নিদর্শন যদি প্রকাশ না পায় এবং মানুষ স্পষ্টভাবে নিজেদের সংশোধনও না করে, তাহলে এমতাবস্থায় আমি মিথ্যাবাদী গণ্য হব। কিন্তু আমি বার বার লিখেছি, এই ভয়ানক দুর্যোগ– যাকে আল্লাহ তা'লা 'ভূমিকম্প' বলে

اِک جھپک میں یہ زمیں ہو جائے گی زیروزبر نالیاں خوں کی چلیں گی جیسے آبِ رودبار

চোখের পলকে এই দেশ ওলটপালট হয়ে যাবে,
নদীর ন্যায় রক্তধারা প্রবাহিত হবে।

رات جو رکھتے تھے پوشاکیں برنگِ یاسمن صبح کردے گی انہیں مثلِ درختانِ چنار

যাদের রাতের পোশাক জেসমিনের ন্যায় সাদা ছিল,
তারা প্রভাতে জাগ্রত হয়ে দেখবে যে, তারা পপলার গাছের (পাতার) ন্যায়
লাল রঙের পোশাক পরিহিত।

ہوش اُڑ جائیں گے انساں کے پرندوں کے حواس بھولیں گے نغموں کو اپنے سب کبوتر اور ہزار بلبل

মানুষ ও পাখিদের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাবে,
কবুতর ও দোয়েল তাদের গান ভুলে যাবে।

ہر مسافر پر وہ ساعت سخت ہے اور وہ گھڑی راہ کو بھولیں گے ہو کر مست و بیخود راہوار

সেই মুহূর্ত মুসাফিরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে,
যারা পথিমধ্যে থাকবে তারা ভ্রমের শিকার হয়ে পথ ভুলে যাবে।

خون سے مردوں کے کوہستان کے آبِ رواں سرخ ہو جائیں گے جیسے ہو شرابِ انجبار

মৃত লোকদের রক্তের কারণে পাহাড়ি নদীর বহমান পানি,
আঞ্জাবর (তথা লাল সুরা)-এর ন্যায় লাল হয়ে যাবে।

*** চলমান টীকা:** অভিহিত করেছেন– তা কেবল ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে কারো ওপর প্রভাব বিস্তার করবে না। হিন্দু বা খ্রিষ্টান হওয়াও আযাব আসার কারণ হতে পারে না, আর কেউ আমার হাতে বয়আত না করার কারণেও শাস্তি পাবে তা আবশ্যক নয়; এসব লোক এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত। তবে কোনো ব্যক্তি– সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক– অপরাধ প্রবণতা যদি তার অভ্যাস হয়ে থাকে; যেমন অনাচার ও কদাচারে লিপ্ত থাকে, ব্যভিচার, হত্যা, চুরি ও জুলুম করে, কিংবা অন্যায়ভাবে কারো ক্ষতি করে ও নোংরাভাষী হয় আর দুরাচারে নিমজ্জিত থাকে, তাহলে তার জন্য ভয় করার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে সে যদি তওবা করে তার কোনো আশঙ্কা নেই। মানুষ যদি উত্তম স্বভাবচরিত্রের অধিকারী ও সদাচারী হয়ে ওঠে, তাহলে এই শাস্তি এড়ানো যেতে পারে। এটি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। –লেখক

مضمحل ہو جائیں گے اس خوف سے سب جنّ وانس زار بھی ہو گا تو ہو گا اُس گھڑی باحالِ زار

বড়ো-ছোটো সব মানুষ এ ভয়ে হতবিহ্বল হয়ে যাবে,
সেসময় স্বয়ং জারও (অর্থাৎ রাশিয়ার সম্রাট) শোচনীয় অবস্থায় থাকবে।

اِک نمونہ قہر کا ہو گا وہ ربّانی نشاں آسماں حملے کرے گا کھینچ کر اپنی کٹار

সেই ঐশী নিদর্শন ভয়ভীতির চিহ্ন হয়ে থাকবে,
ঊর্ধ্বলোক নগ্ন তরবারি বের করে হামলা করবে।

ہاں نہ کر جلدی سے انکار اے سفیہ ناشناس اِس پہ ہے میری سچائی کا سبھی دارومدار

তড়িঘড়ি অস্বীকার কোরো না হে অদূরদর্শী অজ্ঞ!
আমার সত্যতা এই নিদর্শন পূর্ণ হবার মাঝেই নিহিত।

وحی حق کی بات ہے ہو کر رہے گی بے خطا کچھ دنوں کر صبر ہو کر متقی اور بُردبار

একথার ভিত্তি খোদার ওহীর ওপর তা অবশ্যই পূর্ণ হবে,
কিছুকাল তাকওয়া ও নমনীয়তার সাথে ধৈর্যধারণ করো।

یہ گماں مت کر کہ یہ سب بدگمانی ہے معاف
قرض ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا اُدھار

এটি মনে কোরো না যে, এসব কুধারণা ক্ষমা করে দেওয়া হবে;
এটি একটি ঋণ যা তোমাকে পুরোপুরি ফেরত দেওয়া হবে (অর্থাৎ এর শাস্তি অবশ্যই পাবে)।

বারাহীনে আহমদীয়া পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্ট

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

اے یار ازل بس است روئے تو مرا بہتر زِ ہزار خلد کوئے تو مرا

হে চিরস্থায়ী বন্ধু! তোমার চেহারা আমার জন্য যথেষ্ট,
তোমার গলি হাজার জান্নাত হতে আমার জন্য শ্রেয়।

از مصلحتے دگر طرف بینم لیک ہر لحظہ نگاہِ ہست سوئے تو مرا

প্রয়োজনে যৌক্তিক কারণে আমি অন্য দিকে তাকাই,
কিন্তু সত্যিকার অর্থে সর্বদা দৃষ্টি তোমাতেই নিবদ্ধ।

بر عزتِ من اگر کسے حملہ کند صبر است طریق ہمچو خوئے تو مرا

আমার সম্মানে যদি কেউ হামলা করে,
তোমার অভ্যাসের ন্যায় আমার রীতি হলো ধৈর্যধারণ করা।

من چیستم و چہ عزتم ہست مگر جنگ است زِ بہرِ آبروئے تو مرا

আমি কী আর আমার সম্মানইবা কী!
তোমার সম্মানের জন্য এই যুদ্ধ হচ্ছে।

একরামুল্লাহ নামের এক ব্যক্তি দৈনিক পয়সা পত্রিকার ১৯০৫ সনের ২২ মে-এর সংখ্যায় আমার সেসব বিজ্ঞাপন সম্পর্কে যাতে প্রথম ও দ্বিতীয় বারের ভূমিকম্প সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে, কিছু আপত্তি ছেপেছে। আমার মতে সেসব আপত্তি কেবল বিদ্বেষের কারণে করা হয় নি, বরং বুঝার ভুল ছিল। জ্ঞানের একান্ত স্বল্পতার কারণে আপত্তি করা হয়েছে। জাতির অবস্থা দেখে আমার এ কারণেই কান্না পায় যে, আপত্তি করার সময় আদৌ চিন্তা করে না। তারা অযৌক্তিক ধ্যানধারণা ও অজ্ঞতার কারণে এমন কথাবার্তা বলে। অথবা লোক-দেখানোর জন্য এ অভিলাষ হৃদয়ে জাগ্রত হয় যে, কোনোভাবে আপত্তিকারী সেজে আমরাও যেন প্রথম সারির বিরোধীদের মাঝে স্থান করে নিতে পারি বা নিদেনপক্ষে যোগ্য ও জ্ঞানী পরিগণিত হতে পারি। কিন্তু

(বাস্তবে) জ্ঞানী আখ্যা পাবার পরিবর্তে নিজেদেরকে নিজেরাই নগ্ন করে। এখন ন্যায়পরায়ণ লোকের উচিত তাদের আপত্তি শোনা এবং আপত্তি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা। কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, যার সামান্য বিবেকবুদ্ধিও রয়েছে এবং ধর্মের কিছুটা জ্ঞান আছে সে এমন আপত্তি করতে পারে কি? পরিতাপ, এরা প্রথমে নিজেরা প্রতারিত হয় আর এরপর লোকদের প্রতারিত করতে চায়। এ অজ্ঞতার পুরো কারণ সেই বিদ্বেষ যা নিজের মাঝে জাহান্নামের আগুন রাখে।

প্রথম আপত্তির সারমর্মঃ তার উক্তি– এখন আমরা মির্যা সাহেবের কথা থেকে প্রমাণ করছি যে, ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণী গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, কেননা তিনি নিজের বই ইযালায়ে আওহাম-এ নিজেই লিখেছেন যে, ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণী গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, বরং অর্থহীন আর মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য নয়!

উত্তরঃ স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আপত্তিকারী এখানে আমার সেই বাক্য উপস্থাপন করেছেন যা হযরত মসীহ্‌র প্রতি আরোপিত 'মথি'-র ইনজীলের একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে ইযালায়ে আওহামে আমি লিখেছি। এখানে ভূমিকম্প সম্পর্কে 'মথি'-র ইনজীলের সেই পদ জনসমক্ষে উপস্থাপন করা যথেষ্ট হবে যা 'মথি'-র ইনজীলে হযরত ঈসার নামে লেখা আছে আর যা আমি ইযালায়ে আওহামে উদ্ধৃত করেছি। এছাড়া আমার ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোতে উভয় ভূমিকম্প সম্পর্কে বিজ্ঞাপন যোগে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা এখানে পাশাপাশি লিখে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে যেন দর্শকরা নিজেরাই বুঝতে পারেন যে, এ উভয় ভবিষ্যদ্‌বাণী কি একই ধরনের নাকি দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য আছে। প্রশ্ন হলো, মসীহ্‌র ইনজীলের বাক্যাবলির ন্যায় আমার ভবিষ্যদ্‌বাণীতে কি ভূমিকম্প সম্পর্কে সাধারণ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা সকল প্রকার ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে প্রজোয্য হতে পারে, নাকি আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ভূমিকম্পের সংবাদ প্রদান করে? এখানে একথার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে-স্থানে হযরত মসীহ ছিলেন অর্থাৎ সিরিয়ার পরিস্থিতি আদি থেকে কাশ্মীরের ন্যায়। সেখানে সবসময় ভূমিকম্প এসে থাকে। এছাড়া সেদেশে প্লেগও দেখা দিয়ে থাকে। সুতরাং সে দেশে ভূমিকম্প আসা বা প্লেগ দেখা দেওয়া আশ্চর্যজনক কিছু নয়, বরং কোনো বড়ো ভূমিকম্প আসাও আশ্চর্যজনক কিছু নয়। হযরত মসীহ্‌র জন্মের পূর্বেও

সেখানে ভূমিকম্প এসেছে আর তাঁর জীবদ্দশায়ও সেখানে সবসময় ছোটো-বড়ো ভূমিকম্প অব্যহত হতে থাকে। সুতরাং সচরাচর যা ঘটে তাকে ভবিষ্যদ্‌বাণী কীভাবে বলা যেতে পারে? আমি পরবর্তীতে বর্ণনা করব, যেই ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণী আমি করেছি তা এদেশের জন্য কোনো সামান্য বিষয় ছিল না, বরং একটি অসম্ভব ও অসাধারণ কথা ছিল যাকে সারা দেশে বসবাসকারীরা অসাধারণ আখ্যায়িত করেছে। বরং এটিকে কিয়ামতের নিদর্শন মনে করেছে। ইংরেজ গবেষকরাও এ সাক্ষ্যই দিয়েছে। এছাড়া পাঞ্জাবের ইতিহাসও একই সাক্ষ্য দেয়। অধিকন্তু পুরোনো সব অট্টালিকা, যা ১৬০০ বছর থেকে অক্ষত-সুরক্ষিত চলে আসছে তা-ও বাস্তব অবস্থার নিরিখে একই সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু সবাই জানে সিরিয়ায় এত বেশি ভূমিকম্প আসে যে, সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী যখন লেখা হয়েছে তখনও হয়ত কোনো ভূমিকম্প সংঘটিত হচ্ছিল।

এখন আমরা সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী লিপিবদ্ধ করছি যা ভূমিকম্পের আগমন সম্পর্কে 'মথি'-র ইনজীলে লেখা হয়েছে এবং যা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি আরোপ করা হয়েছে আর তা হলো, 'জাতি জাতির ওপর আর রাজত্ব রাজত্বের ওপর চড়াও হবে আর দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেবে এবং বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প আসবে'।

এটিই সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী যা সম্পর্কে আমি ইযালায়ে আওহামে সেই বাক্য লিখেছি যা আপত্তিকারী উল্লিখিত পত্রিকার পৃষ্ঠা নম্বর ৫-এর প্রথম কলামের ২৬ নম্বর লাইনে উদ্ধৃত করেছে। তা হলো, 'এটিও কি কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী হলো যে, ভূমিকম্প আসবে, মহামারি দেখা দেবে, যুদ্ধ হবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। আপত্তিকারী আমার এই বাক্যগুলো লিখে এর এই উপসংহার টানছে যে, তার মতে আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ভূমিকম্প সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা কোনো বড়ো বিষয় নয়। প্রত্যেক বিবেকবান বুঝতে পারবে যে, এ বাক্যগুলো লেখার পেছনে আমার উদ্দেশ্য তা নয় যা আপত্তিকারী মনে করেছে। বরং উদ্দেশ্য হলো এটি বলা যে, এমন একটি বিষয় উপস্থাপন করা যাতে কোনো বিস্ময়কর দিক নেই এবং যাতে কোনো অসাধারণ বিষয়ও নেই– ভবিষ্যদ্‌বাণীর গণ্য হতে পারে না। যেমন- যদি কেউ ভবিষ্যদ্‌বাণী করে যে, বর্ষার সময় কিছু বৃষ্টি হবে তাহলে এটি ভবিষ্যদ্‌বাণী আখ্যায়িত হতে পারে না, কেননা বর্ষার মাসগুলোতে কিছু না কিছু বৃষ্টি হয়েই থাকে, খোদার রীতি

এভাবেই চলমান রয়েছে। অবশ্য কেউ যদি এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করে যে, এবার বর্ষার সময় এত পরিমাণ বৃষ্টি হবে যে, ভূমি হতে ঝরনা উৎসারিত হবে, কূপগুলো ভরে গিয়ে নদীর ন্যায় প্রবাহিত হবে, অধিকন্তু বিগত শত বছরেও এ ধরনের বৃষ্টির কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না, তাহলে এর নাম অলৌকিক বিষয় ও ভবিষ্যদ্‌বাণী রাখা হবে। এ নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে মথি-র ২৪শ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে আমি আপত্তি করেছি, যে দেশে সবসময় ভূমিকম্প এসে থাকে, বরং ভয়াবহ ভূমিকম্পও আসে, সে দেশ সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলে দেওয়া যে, সেখানে ভূমিকম্প আসবে– এটি এমন কোনো খবর নয় যার নাম ভবিষ্যদ্‌বাণী রাখা যেতে পারে বা অলৌকিক বিষয় আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এখন দেখা উচিত যে, এ তিনটি বিজ্ঞাপনেও, যা আমি ভূমিকম্প সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী হিসেবে দেশে প্রচার করেছি, সেখানেও কি এমনই সাধারণ সংবাদ দেওয়া হয়েছে যাতে অলৌকিক কিছু নেই? যদি সত্যিকার অর্থে এমনই হয়ে থাকে তাহলে ভূমিকম্প সম্পর্কে আমার ভবিষ্যদ্‌বাণীও সাধারণ বিষয় হবে।

ভূমিকম্প সম্পর্কে আমার বিজ্ঞাপনের শব্দ হলো– عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا- যা ১৯০৪ সনের পহেলা মে খোদার পক্ষ থেকে আমার প্রতি ওহী হয়েছে, আর যা আমি বদর ও আল-হাকাম পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছিলাম, অর্থাৎ এ দেশের একটি অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এর স্থায়ী ও অস্থায়ী নিবাস উভয়টি ধ্বংস হয়ে যাবে, এগুলোর নামচিহ্নও থাকবে না। আদ-দিয়ারে যে আলিফ-লাম রয়েছে তা প্রমাণ করে যে, খোদার দৃষ্টিতে এ দেশের কিছু বিশেষ বিশেষ স্থান রয়েছে যেখানে এই ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসবে। দেশের সেই বিশেষ অংশের বাড়িঘর মাটিতে মিশে যাবে। এটি কত-না অসাধারণ এক ভবিষ্যদ্‌বাণী আর এতে কত পরিষ্কারভাবে ভবিষ্যৎ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, এদেশের ১৬০০ বছরের ইতিহাসে যার কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেমন ইংরেজি পত্রিকা পাঠে জানা যাবে যে, বড়ো বড়ো ভূতত্ত্ববিদ এদেশের ক্ষেত্রে এটিকে অসাধারণ ঘটনা আখ্যা দিয়েছে। এমনকি ইউরোপের বড়ো বড়ো গবেষকদের সাক্ষ্যের সাথে ছাপা হয়েছে যে, পাঞ্জাবে ১৬০০ বছর পর্যন্ত এ ভূমিকম্পের কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। সব পত্রিকা এ সংবাদে পরিপূর্ণ যে, এ ভূমিকম্প কিয়ামত সদৃশ ছিল। অতএব আমার প্রতি অবতীর্ণ খোদার এ ওহীতে এ অসাধারণ বিষয় অন্তর্নিহিত আছে যে, এই দুর্ঘটনার কারণে ভবন ও

অট্টালিকাসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর এ দেশের একটি অংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই একান্ত আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, এমন অসাধারণ ভবিষ্যদ্‌বাণী, যা একটি দেশের ধ্বংসের সংবাদ দেয়, সেটিকে ইনজীলের এক সাধারণ সংবাদের সমান আখ্যা দেওয়া হচ্ছে! সে সংবাদ হলো, ভূমিকম্প আসবে আর তা-ও সে দেশে আসবে যা ভূমিকম্পের আবাসভূমি। প্রশ্ন হলো, কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণীর শব্দ এর চেয়ে ভীতিপ্রদ হতে পারে কি? প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি নিজেই চিন্তা করে দেখুক, এ দেশ অর্থাৎ পাঞ্জাবের জন্য ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণীর শব্দ এর চেয়ে বেশি অলৌকিক হতে পারে কি যা খোদার ওহী عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا- -তে বিদ্যমান? এর অর্থ হলো দেশের একটি অংশ এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যে, এর বাড়িঘরগুলোর চিহ্ন মিটে যাবে। অস্থায়ী নিবাস বা সরাইখানাও অবশিষ্ট থাকবে না আর স্থায়ী বসতিস্থলও না। এখানে আরবীর সামান্য জ্ঞানও যার রয়েছে সে-ও আদ-দিয়ার শব্দের (উপসর্গ) আলিফ-লামকে মাথায় রেখে বুঝতে পারে যে, আদ-দিয়ার বলতে এ দেশের একাংশকে বুঝায় আর আফাত-এর অর্থ হলো দেশের এ অংশের সব ঘরবাড়ি ধ্বসে পড়বে আর বিলুপ্ত ও অদৃশ্য হয়ে যাবে।* সুতরাং কেউ আমাকে বলুক যে, এ দেশে এমন ঘটনা এর পূর্বে কবে ঘটেছে? নতুবা নির্লজ্জের ন্যায় মানুষের মিথ্যা বলা আর সেই খোদাকে ভয় না করা যার হাত সদা শাস্তি প্রদানে ক্ষমতাবান একটি ঈমান বিবর্জিত বিষয়। এছাড়া আল-ওসিয়ত পুস্তিকায়, যা ১৯০৫ সনে ভূমিকম্পের পূর্বে প্রকাশ করা হয়েছিল– এ উক্তিটি উল্লিখিত রয়েছে। সময়টি ছিল মাঝ রাতের পর চারটা। দিব্যদর্শনে আমি দেখেছি যে, হৃদয় বিদারক মৃত্যুর কারণে আশ্চর্যজনক হইচই বিরাজমান। একইসাথে এ এলহামও হয় যে, সর্বত্র মৃত্যুর মিছিল চলছে। এখন চিন্তা করো! একটি ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে এভাবে বলা যে, তা

*** টীকাঃ** যদি কেউ এই অর্থে সন্দেহ পোষণ করে, তবে তার আল্লাহ তা'লার নামে শপথ করে কোনো আরবি ভাষায় পারদর্শী বিরোধীকে শপথমূলে জিজ্ঞেস করা উচিত– এই ওহী عَفَتِ الدِّيَار দ্বারা কি ভবন ভূপাতিত ও নিশ্চিহ্ন হওয়া এবং সেসব ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়া যা আসা-যাওয়ার পথে সাময়িকভাবে থাকার জন্য নির্মিত হয়, যেমন ধর্মশালা, কিংবা কাঙড়া পাহাড়ে লাটাওয়ালী মন্দির অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নির্মিত ঘরবাড়ির ধ্বসে পড়া বুঝায় না? এটি এতটাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, এর জন্য অতিরিক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। –লেখক

কিয়ামততুল্য হবে আর এর ফলে কিয়ামতের দৃশ্যের অবতারণা হবে– সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী কি এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর সমান হতে পারে যাতে সাধারণ শব্দে কেবল বলা হয় হয় যে, ভূমিকম্প আসবে? বিশেষ করে সিরিয়ার মতো দেশে, যে দেশটি ভূমিকম্প ও প্লেগের জায়গা! খোদাভীতি যদি থাকে তাহলে খোদার ভবিষ্যদ্‌বাণীকে অস্বীকারের এতটা ধৃষ্টতা কীভাবে হতে পারে? এ হামলা আমার ওপর নয় বরং খোদার ওপর– যিনি এই উক্তি করেছেন। আর একথা বলা যে, عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا- এটি লাবিদ বিন রাবিয়া-র একটি পঙ্‌ক্তির প্রথম লাইন; এটিও খোদা তা'লার ওপর অবমাননাকর হামলা ছাড়া কিছু নয়। তিনি সবার কথার বা উক্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী, লাবীদ হোক বা অন্য কেউ হোক। কবিতাও তাঁরই প্রদত্ত সামর্থ্যের ফলেই রচিত হয়। সুতরাং তিনি যদি কোনো ব্যক্তির কবিতা নিয়ে ওহী হিসেবে কারো প্রতি এলকা করেন বা কারো হৃদয়ে সঞ্চার করেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি বর্তাতে পারে না। যদি এটি আপত্তিকর বিষয় হয়ে থাকে তাহলে পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান আয়াত فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ এর কী উত্তর হবে যে, এটিও প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষের অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন আবি সারাহ-এর উক্তি ছিল, যে প্রথম দিকে কুরআন শরীফের কিছু আয়াতের কাতেব বা লিপিকারও ছিল, পরবর্তীতে সে মুরতাদ হয়ে যায়। তার উক্তি কোনো সংযোজন ও বিয়োজন ছাড়াই কুরআন শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহর ওহী, عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا -এর অক্ষর-সংখ্যা কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ (আল-মুমিনূন: ১৫)-এর অক্ষর-সংখ্যা থেকেও বেশি নয়। বরং এর অক্ষর সংখ্যা ২১ কিন্তু কুরআনের আয়াতের অক্ষর সংখ্যা ২২। অধিকন্তু আপত্তিকারীর খোদার এই ওহী সম্পর্কে এই প্রবচন শোনানো যে, 'এক জায়গার ইট আর অন্য জায়গার কঙ্কর, ভানুমতি গড়েছে শংকর' (অর্থাৎ বিভিন্ন অসংলগ্ন কথা একত্র করে এলহাম বানিয়েছেন বলার পূর্বে –অনুবাদক)* তার ভাবা উচিত ছিল,

---

* **টীকা:** যদিও পাপের হাজারো ধরন রয়েছে, তবে সবচেয়ে অভিশপ্ত সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'লার পবিত্র বাণীর (অর্থাৎ কুরআনের) বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে। অজ্ঞ ব্যক্তি তড়িঘড়ি, ঔদ্ধত্যভরে ও উল্লাসের সাথে আল্লাহর বাণীর প্রতি আপত্তি প্রকাশ করে এবং সেই পবিত্র সত্তার সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়– অথচ তার মারা যাওয়া শ্রেয় ছিল। –লেখক

সত্যিকার অর্থে কুরআন শরীফের ওপর আক্রমণ করে নিজের পরিণামকে হুমকির মুখে ফেলেছে। কুরআন শরীফে একমাত্র এই ওহীই একথার প্রমাণ বহন করে না যে, তা প্রথমে মানুষের উক্তি ছিল আর পরে তা খোদার ওহী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। সত্য কথা হলো, এমন বহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হতে পারে যাতে মানুষের কথা খোদার কথা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- কুরআন শরীফ অনেক স্থানে হযরত উমরের কথার সাথে মিলে গেছে যা সম্পর্কে আলেমগণ অনবহিত নন আর যার একটি দীর্ঘ তালিকা উপস্থাপন করা যেতে পারে। এটি থেকে বুঝা যায় যে, আপত্তিকারী সত্যিকার অর্থে কুরআন শরীফকে মানে না নতুবা এমন অবমাননাকর ও অশিষ্ট বাক্য কোনোভাবে তার মুখ থেকে বের হতো না। কোনো মুমিন কারো সম্পর্কে এমন আপত্তি করতে পারে কি যা হুবহু কুরআন শরীফের বিরুদ্ধে বর্তায়? নাঊযুবিল্লাহ, কখনো নয়।

এছাড়া আপত্তিকারীর عَفَتِ الدِّيَارُ ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে একটি আপত্তি এটিও রয়েছে যে, আফাত শব্দটি অতীত কাল, কিন্তু এর অনুবাদ করা হয়েছে বর্তমান কালে, অথচ এর অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল অতীতের অর্থে। এ আপত্তি করতে গিয়ে আপত্তিকারী অনেক দম্ভ করেছে, যেন বিরোধিতাপূর্ণ হামলায় সে অনেক সাফল্য পেয়েছে। এখন আমরা তার কোনো কোনো প্রতারণা ফাঁস করব? যে ব্যক্তি কাফিয়া বা হিদায়াতুন নহভ পড়ে থাকবে সে ভালোভাবে জানে যে, অতীতের ক্রিয়া বর্তমানকালের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, বরং এমনসব স্থানে যখনকিনা পরবর্তী ঘটনা বক্তার দৃষ্টিতে সুনিশ্চিতভাবে ঘটিতব্য* হয়, বর্তমান কালের ক্রিয়া অতীতের অর্থেও ব্যবহার করা হয় যেন

---

* **টীকা:** উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তিকে বহু প্রাণহারী বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে সে বলে: 'আমি তো মরেই গেছি।' অথচ এটা পরিষ্কার যে, 'মরেই গেছি'– ক্রিয়ার অতীত কালের রূপ; বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের নয়। আসলে তার কথার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এটি বলা যে, 'আমি নিশ্চিতভাবে মারা যাব'। আরেকটি উদাহরণ হলো, ধরুন! একজন আইনজীবী, যিনি তার মক্কেলের পক্ষে চিফ কোর্টের পক্ষ থেকে রায়ের একটি শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হাতে পান আর আনন্দে বলে ওঠেন: 'ব্যস, আমরা তো এখন মামলায় জিতে গিয়েছি!' যদিও প্রকৃতপক্ষে মামলাটি তখনো বিচারাধীন এবং তখনো কোনো চূড়ান্ত রায় লেখা হয় নি। তার এই কথার প্রকৃত অর্থ হলো: 'আমরা অবশ্যই জয়লাভ করব।' এ কারণেই, ভবিষ্যৎ বোঝাতে সে অতীত কালের শব্দ ব্যবহার করে। –লেখক

প্রকাশ পেয়ে যায় যে, এ বিষয়টি নিশ্চিতভাবে ঘটতে যাচ্ছে। কুরআন শরীফে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন–

وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ

(ইয়াসীন: ৫২)

আবার আরেক স্থানে বলেন,

وَ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَ اُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

(আল-মায়েদা: ১১৭)

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ

(আল-মায়েদা: ১২০)

আরেক স্থানে বলেন,

وَ نَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ

(আল-হিজর: ৪৮)

আরেক স্থানে বলেন,

وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ قَالُوْا نَعَمْ

(আল-আরাফ: ৪৫)

আরেক স্থানে বলেন,

تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ

(আল-লাহাব: ২-৩)

আরেক স্থানে বলেন,

وَ لَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ

(আল-আনআম: ২৮)

আরেক স্থানে বলেন,

وَ لَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ رَبِّنَا

(আল-আনআম: ৩১)

এখন আপত্তিকারী সাহেব বলুন যে, কুরআনের এ আয়াতগুলো কি অতীত কালের অর্থ প্রকাশ করে নাকি ভবিষ্যতের? আর সেগুলো যদি ক্রিয়ার অতীত কালের রূপ হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলোর অর্থ এখানে বর্তমান কালে হবে নাকি অতীত কালে? মিথ্যা বলার এতটা শাস্তিই যথেষ্ট যে, আপনার হামলা শুধু আমার ওপর নয় বরং কুরআনের ওপরও বর্তেছে। আপনার কথার অর্থ হলো আপনি যে আরবী ব্যাকরণ জানেন, খোদা তা জানেন না। এ কারণে খোদা বিভিন্ন স্থানে ভুল করেছেন আর বর্তমান কালের ক্রিয়ার পরিবর্তে অতীতের রূপ লিখে দিয়েছেন।

এর পাশাপাশি আপনার আরো একটি আপত্তি আছে আর তা হলো– এই ভবিষ্যদ্‌বাণী عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا- -তে ভূমিকম্প শব্দ কোথায়? পরিতাপের বিষয় হলো এ আপত্তিকারীর এটিও জানা নেই যে, ভবিষ্যদ্‌বাণীর উদ্দেশ্য কেবল সেই ভাব প্রকাশ করা যা (বাক্যের) শব্দ থেকে প্রতিভাত হয়। মূল কথা হলো, দেশের একটি অংশে বড়ো ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসবে। বুদ্ধিমান এখানে নিজেই বুঝতে পারে যে, বাড়িঘর ভূমিকম্পের মাধ্যমেই ধ্বংস হয়ে থাকে। অবশ্য অন্য কোনোভাবেও এ অসাধারণ ধ্বংসযজ্ঞ আর শহর ও বাড়িঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার বিষয়টি প্রকাশ পেতে পারে; কিন্তু এমনটি হলেও এ ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য প্রমাণিত হবে। যেহেতু ঐশীরীতি অনুসারে এমন ধ্বংসযজ্ঞে সহজাতভাবে ভূমিকম্প বুঝানো হয়ে থাকে, তাই এর উল্লেখ করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু যেহেতু খোদা তা'লা জানেন যে, কিছু স্বল্পবুদ্ধির মানুষ, যাদের প্রকৃতি অজ্ঞতা ও বিদ্বেষের সমাহার থেকে থাকে, তারা হয়ত এমন আপত্তিও করবে, তাই ভূমিকম্প শব্দটিও পরিষ্কারভাবে লিখে দিয়েছেন। যেমন ১৯০৩ সনের ২৪ ডিসেম্বরের আল-হাকাম দ্রষ্টব্য। এই ভবিষ্যদ্‌বাণীটিকে যদি ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণী হতে পৃথকভাবেও দেখা হয়, যা পূর্বে ছেপে গেছে, তাহলে তা কেবল একথা প্রকাশ করে যে, এ দেশের কোনো কোনো অংশ ধ্বংস হয়ে যাবে আর কঠিন ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসবে এবং ভবন ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর বিভিন্ন জনপদ বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যাবে। সেটি একথা বলে না যে, কোনো বিশেষ মাধ্যমে ধ্বংসযজ্ঞ প্রকাশ পাবে। কিন্তু শহর ও জনপদ কীভাবে ভূমিতে তলিয়ে যায় আর অট্টালিকা ইত্যাদি কীভাবে মাটিতে মিশে যায়, সে সম্পর্কে যে ব্যক্তি চিন্তা করবে আর এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর সাথে সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীও পড়বে যা এ পত্রিকায় পাঁচ মাস পূর্বে ছেপে গেছে, যার

শব্দ হলো ভূমিকম্পের ধাক্কা; সে এমন আপত্তি করতে গিয়ে লজ্জাবোধ করবে যে, এ ভবিষ্যদ্‌বাণীতে ভূমিকম্পের উল্লেখ নেই। অবশ্য আমরা এখনও বলি যে, খোদার বাণীতে রূপকের ব্যবহারও থেকে থাকে, যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى *

(বনী ইসরাঈল: ৭৩)

তাই হয়ত ভূমিকম্প বলতে অন্য কোনো ভয়াবহ বিপদও হতে পারত যা পুরোপুরি ভূমিকম্পের প্রকৃতি নিজের মাঝে রাখত। কিন্তু বাক্যের অক্ষরকে ব্যাখ্যার ওপর প্রাধান্য দিতে হয়। অতএব সত্যিকার অর্থে এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর গণ্ডি বিস্তৃত ছিল। কিন্তু খোদা তা'লা শত্রুর চেহারা কালিমালিপ্ত করার জন্য আক্ষরিক অর্থেও তা পূর্ণ করেছেন। এছাড়া এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর কোনো কোনো অংশ অন্য কোনোভাবেও প্রকাশিত হতে পারে। কিন্তু সে বিষয়টি অবশ্যই অসাধারণ হবে যা সম্পর্কে এ ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে। যেমন- এ ভূমিকম্প পাঞ্জাবে মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেছে যা সম্পর্কে সিভিল ও মিলিটারী গেজেট ইত্যাদি পত্রিকায় সংবাদ ছেপেছে আর প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৬০০ বছর পর্যন্ত পাঞ্জাবে এমন কোনো ভূমিকম্প আসে নি। অতএব ভবিষ্যদ্‌বাণী নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণির অলৌকিক বিষয়ের সংবাদ দেয়। এরপরও হয়ত কিছু এমন অলৌকিক ঘটনা বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে প্রকাশ পাবে যা এমন ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হবে। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর কোনো অংশে ভূমিকম্পের উল্লেখ না থাকলেও এটি এক মহান নিদর্শন ছিল। কেননা এখানে এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রতিপাদ্য হলো, এর ফলে ঘরবাড়ি ও শহরবন্দরে একটি অসাধারণ ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হবে যা হবে অনন্য, তা ভূমিকম্পের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনো ভাবে হোক না কেন। অতএব যেখানে এ সাক্ষ্য হস্তগত হলো যে, ১৬০০

---

* **টীকা:** এই আয়াতের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অন্ধ, সে পরকালেও অন্ধই থাকবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ জীবনে আল্লাহর দর্শন থেকে বঞ্চিত, সে পরকালেও তা লাভ করতে সক্ষম হবে না। এই আয়াতের অর্থ মোটেও এটা নয়, যে-সব হতভাগা এ পৃথিবীতে শারীরিকভাবে অন্ধ, পরকালেও তারা অন্ধ থাকবে। শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে– জ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞকে অন্ধ বলা হয়েছে। –লেখক

বছর পর্যন্ত পাঞ্জাবে এর কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না, এমতাবস্থায় এই ভবিষ্যদ্‌বাণী কোনো সামান্য বিষয় থাকল না যা কেবল মানবীয় ধারণারভিত্তিক হতে পারে। এছাড়া যেখানে এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রথম অংশে পরিষ্কার ভাষায় ভূমিকম্পের কথা প্রকাশ করা হয়েছে, যা এই আল-হাকাম পত্রিকার ১৯০৩ সনের ২৪শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় ছাপানো রয়েছে, সেখানে আমি বুঝি না এমন আপত্তিকারীর কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে হাসব, নাকি কাঁদব, যে বলে 'ভূমিকম্পের কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী করে নি'।

এখন স্মরণ রাখা উচিত عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا۔ এটি সেই উক্তি যা আজ হতে ১৩০০ বছর পূর্বে লাবীদ বিন রাবিয়া আমেরি-র হৃদয়ে খোদা তা'লা সঞ্চার করেন, যা তার সেই কবিতার প্রথম ছত্র যা সাবা মুআল্লাকাভুক্ত চতুর্থ কবিতা। লাবীদ ইসলামের যুগ পেয়েছিলেন আর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। সে কারণে খোদা তার উক্তিকে সম্মান দান করেছেন, যা শেষ যুগ সম্পর্কে এক মহান ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল। অর্থাৎ এমনসব ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসবে যার ফলে একটি দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। তার কবিতার শব্দ যা তার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল– ওহী হিসেবে অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং একথা চরম অজ্ঞতা যে, একজন মুসলমানের মুখনিঃসৃত কথা কীভাবে খোদার ওহীর অন্তর্ভুক্ত হলো? যেমন কিনা আমরা এখনই উল্লেখ করেছি যে, আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ-এর মুখ থেকে যে বাক্যাংশ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ তা-ই পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে, যার কারণে আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ মুরতাদ হয়ে মক্কায় পালিয়ে যায়।* সুতরাং যেখানে এক মুরতাদের কথার খোদার বাণীর সাথে মিল স্থাপিত হলো সেখানে লাবীদের মতো সম্মানিত সাহাবীর কথার সাথে খোদার কথার মিল বা সামঞ্জস্য সৃষ্টি হলে আশ্চর্য হবার কী আছে? প্রত্যেক জিনিসের প্রকৃত মালিক হবার ন্যায় খোদা তা'লা সকল পবিত্র বাণীরও মালিক। তাঁরই প্রদত্ত সামর্থ্যে সকল পবিত্র বাণী মুখ থেকে নিঃসৃত হয়। সুতরাং এমন বাণী ওহীস্বরূপ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কেবল সে-ই সন্দেহ করবে যার ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ থাকে। লাবীদের একটি শ্রেষ্ঠত্ব হলো, তিনি কেবল মহানবীর যুগ পান

---

* **টীকা:** দ্রষ্টব্য: তফসীর আল্লামা আবী আস-সউদ যা তফসীরে কবীরের টীকা সম্পর্কে লেখা পৃ. ২৭৬-২৭৭ ষষ্ঠ খণ্ড।

নি, বরং ইসলামের উন্নতির যুগও খুব ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন আর ৪১ হিজরী সনে ১৫৭ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। একইভাবে হযরত উমরের কথার সাথেও বেশ কয়েকবার কুরআন শরীফের তওয়ারুদ বা মিল স্থাপিত হতে দেখা গেছে যেমনটি হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, قال قال عمر وَافَقْت رَبِّيْ فِيْ اَرْبَعٍ অর্থাৎ আমার মুখ থেকে যে চারটি কথা বেরিয়েছে আল্লাহ তা'লাও তা-ই বলেছেন। উম্মতের ওলী যাদের হৃদয়ে অন্যদের কথা এলহাম হিসেবে সঞ্চারিত হয়েছে আর যত লোকের হৃদয়ে রূমীর মসনভীর পঙ্‌ক্তি এলহাম করা হয়েছে তা যদি আমরা উল্লেখ করি তাহলে এ বর্ণনার জন্য একটি পৃথক কিতাবের প্রয়োজন হবে। আমি জানি, যে ব্যক্তি এ জগতের সামান্য জ্ঞানও রাখে সে কখনো একথা মুখেও আনবে না যে, খোদার কথার মানুষের কথার সাথে মিল থাকতে পারে না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি, যে কিছুটা শরীয়তের জ্ঞান রাখে, সে এমন কথাকে কুফরীর কারণ মনে করবে। কেননা এ বিশ্বাস পোষণ করলে কুরআনকে অস্বীকার করা আবশ্যক হয়ে যায়। এখানে একটি সমস্যাও আছে যার আমরা সমাধান উপস্থাপন করা আবশ্যক মনে করি। তা হলো, এটি মনে করা বৈধ নয় যে, কোনো মানুষের কথার সাথে খোদার কথার সাদৃশ্য ঘটলে তা কুরআনের অলৌকিকত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে– কেননা তফসীরে কবীরের লেখক ও অন্যান্য মুফাসসেররা লিখেছেন, এতে জটিলতার কিছু নেই, কেননা কুরআনের নিদর্শন হবার বিষয়টি শুধু এ পরিমাণ একথার ওপর নির্ভর করে না। কারণ কুরআনের শব্দাবলিও তা-ই যা অন্যান্য আরবদের মুখ থেকে নিঃসৃত হতো। নিদর্শনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য আবশ্যক হলো খোদার বাণী* সেই সূরার সমান হওয়া যা কুরআন শরীফের সবচেয়ে ছোটো সূরার সমান বা অন্ততঃপক্ষে ১০ আয়াত হওয়া বাঞ্ছনীয় কেননা এ পরিমাণ আয়াতকে কুরআন শরীফ নিদর্শন আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু আমি বলব, কারো উক্তি যদি খোদার বাণীতে ওহী হিসেবে স্থান পায় তা অবশ্যই নিদর্শনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খোদার ওহী عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا- যখন লাবীদ (রা.)-এর মুখ থেকে পঙ্‌ক্তি হিসেবে নিঃসৃত হয়েছে তখন এটি নিদর্শন ছিল না, কিন্তু যখন

---

* **টীকাঃ** লিপিকার ভুলে 'খোদার বাণী' লিখেছেন। প্রকৃত শব্দটি হলো 'মানুষের উক্তি'। –প্রকাশক

ওহী হিসেবে প্রকাশিত হলো এটি এখন নিদর্শন হয়ে গেল, কেননা লাবীদ একটি অতীত ঘটনার অবস্থা উপস্থাপন করেন যা বর্ণনা করা মানবীয় শক্তির অন্তর্গত বিষয়, কিন্তু এখন খোদা তা'লা লাবীদের উক্তির সাথে স্বীয় ওহীর মিল সৃষ্টি করে এক মহান ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন যা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। অতএব সেই উক্তি যখন লাবীদের প্রতি আরোপ করা হয় তা নিদর্শন নয়, কিন্তু যখন খোদা তা'লার প্রতি আরোপ করা হয় তখন নিঃসন্দেহে তা নিদর্শন। আজ থেকে এক বছর পূর্বে একথা কে জানত যে, এ দেশের একটি অংশ ভূমিকম্পের কারণে ধ্বংস ও বিরাণ হয়ে যাবে? কে জানত যে, এতগুলো শহর ও গ্রাম হঠাৎ করে ভূগর্ভে তলিয়ে গিয়ে সব বাড়িঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর এ দেশের অবস্থা এমন হয়ে যাবে যেন এখানে কখনো কোনো বাড়িঘরই ছিল না? অতএব এরই নাম হলো মুজিযা বা নিদর্শন। অর্থাৎ এমন কোনো কথা প্রকাশ পাওয়া যা ইতিপূর্বে কেউ ভাবেও নি আর কেউ চিন্তাও করে নি যে, এমনটি হতে পারে। এটি কি সত্য নয় যে, এ দেশের অধিবাসীরা এ ভয়াবহ ভূমিকম্পকে গভীর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখেছে আর এটিকে অসাধারণ, অসম্ভব ও কিয়ামততুল্য আখ্যায়িত করেছে? এটি কি সত্য নয় যে, ইউরোপের গবেষকরা এ সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, এদেশের ১৬০০ বছরের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাতে প্রমাণিত যে, এর পূর্বে এমন ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প এদেশে কখনো সংঘটিত হয় নি? অতএব যে ওহী দীর্ঘকাল পূর্বে এমন আসাধারণ ঘটনার সংবাদ দিয়েছে সে সংবাদ কি নিদর্শন নয়? তা কি মানবীয় শক্তির অন্তর্গত বিষয়?* যে দেশের মানুষ বরং তাদের পিতাপিতামহও প্রায়

---

* **টীকাঃ** যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, আপত্তিকারী 'পয়সা' পত্রিকায় এই আপত্তি ছেপে দিয়েছেন যে, عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا۔ এই ভবিষ্যদ্‌বাণীতে কোথাও ভূমিকম্পের কোনো উল্লেখ নেই। অথচ বাস্তব বিষয় হলো, এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর পাঁচ মাস আগেই পয়সা পত্রিকাতে ভূমিকম্প সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকাশিত হয়েছিল আর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্যিকার অর্থে সেই ভূমিকম্পের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিরই বিবরণ তুলে ধরছে। এই হলো আমাদের বিরোধীদের সততা, বিশ্বস্ততা ও বিবেক বুদ্ধির স্বরূপ। এদের মধ্যে কি কেউই এমন নেই যে একান্তে এই ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করবে এবং কান মলবে যে, "তুমি কেন জনসাধারণকে এভাবে প্রতারিত করলে? অথচ সে ভালোভাবেই জানে, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯০৩ সালের 'আল-হাকাম' পত্রিকায় ভূমিকম্প-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণীটি পরিষ্কারভাবে বিধৃত রয়েছে যার ভয়ানক ফলাফলের কথা 'عَفَتِ الدِّيَارُ ' ওহীতে উল্লেখ

২০০০* বছর পর্যন্ত এমন একটি ঘটনা দেখে নি, শোনে নি আর তাদের অনুমান ও ধারণার জগতেও তা স্থান পায় নি যে, এমন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বা ঘটতে পারে। সুতরাং কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী যদি এমন ঘটনার সংবাদ দেয় এবং সেই ঘটনা সেভাবেই ঘটে যায় তাহলে সে খবর শুধু নিদর্শনই আখ্যায়িত হবে না, বরং প্রথম সারির নিদর্শন আখ্যায়িত হবে।

আমরা পুনরায় প্রকৃত কথার দিকে ফিরে এসে লিখছি যে, আপত্তিকারী এক মহান ভবিষ্যদ্‌বাণীর মাহাত্ম্যকে খাটো করে দেখানোর জন্য এবং তা মানুষের দৃষ্টিতে খর্ব প্রমাণের জন্য ইনজীলের এই অর্থহীন ভবিষ্যদ্‌বাণীর সাথে এর তুলনা করেছে যাতে কেবল সাধারণ ভাষায় লেখা হয়েছে যে, ভূমিকম্প আসবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে আমার বিজ্ঞাপন পড়বে তাকে আক্ষেপের সাথে বলতে হবে যে, আপত্তিকারী অন্যায়ভাবে উজ্জ্বল দিনকে মেঘাচ্ছন্ন করতে চেয়েছে এবং মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকার আশ্রয় নিয়েছে। সে আমার বিজ্ঞাপন পড়েছে আর সে ভালোভাবে জানত যে, আমার ভবিষ্যদ্‌বাণীর শব্দ ইনজীলের শব্দাবলির ন্যায় সামান্য ও সাধারণ মানের নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে জেনেশুনে হঠকারিতার আশ্রয় নিয়েছে। কে না জানে, আরবী এলহাম عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا- এমন এক বিস্ময়কর সংবাদ ভবিষ্যদ্‌বাণী হিসেবে বর্ণনা করছে যার কারণে শরীর কেঁপে উঠে। প্রশ্ন হলো এটি কি একটি সামান্য ঘটনা যে, শহর ও গ্রাম মাটির তলায় তলিয়ে যাবে আর উর্দূতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ভূমিকম্পের ধাক্কা লাগবে। দ্রষ্টব্য আল-হাকাম পত্রিকা, পৃ. ১৫, কলাম: ২, ২৪ ডিসেম্বর ১৯০৩। আর এরপর ১৯০১ সনে

*** চলমান টীকা:** করা হয়েছে?"এই দুটি ভবিষ্যদ্‌বাণী সেই ভূমিকম্প ঘটার এক বছর আগেই প্রচারিত হয়েছিল। বরং ভূমিকম্প-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী স্পষ্ট ভাষায় মাওয়াহেবুর রহমান পুস্তকের ৮৬ নম্বর পৃষ্ঠায়ও বিদ্যমান, যা প্রায় আড়াই বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। –লেখক

*** টীকা:** সিভিল এণ্ড মিলিটারি গেজেটে একটি গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে যে কাংড়ায় ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু মন্দিরটি প্রায় দুই হাজার বছর থেকে বিদ্যমান ছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয়, যদি এই অঞ্চলে এর আগে অনুরূপ তীব্রতার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে থাকত, তাহলে এই স্থাপনাগুলি আরো আগেই বিলীন হয়ে যেত। –লেখক

যে আমীন পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে লেখা হয়েছে যে, তা এমন ঘটনা হবে যার কারণে কিয়ামতের প্রতি মানুষের মনোযোগ নিবদ্ধ হবে আর* ১৯০৪ সনের ২৪ মার্চ তারিখের আল-হাকাম পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের একটি নিদর্শন দেখানো হবে। এছাড়া আল-ইনযার পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ ভূমিকম্প কিয়ামততুল্য দৃশ্যের অবতারণা করবে। এছাড়া আন-নিদায় লেখা আছে যে, আসন্ন ভূমিকম্পের কারণে ভূমি ওলট-পালট হয়ে যাবে। এরপর এতে লেখা হয়েছে যে, এই অসাধারণ দুর্বিপাক হাশরের ঘটনা স্মরণ করাবে। পুনরায় এতে খোদা তা'লা বলেন, আমি স্বীয় নিদর্শন দেখানোর জন্য তোমার খাতিরে ভূমিতে অবতরণ করব। আমি তোমার জন্য ভূমিকম্পের নিদর্শন দেখাবো। উদাসীন মানুষ যে-সব অট্টালিকা নির্মাণ করে বা ভবিষ্যতে নির্মাণ করবে আমি তা ধূলিসাৎ করব আর আমি সেই নিদর্শন প্রকাশ করব যার ফলে ভূমি কেঁপে উঠবে, সে দিনটি পৃথিবীর জন্য বিলাপের দিন হবে। এছাড়া এ বিজ্ঞাপনে, যার শিরোনাম হলো 'ভূমিকম্পের সংবাদ তৃতীয় বার' ভবিষ্যৎ ভূমিকম্প সম্পর্কে এ বাক্যও লেখা রয়েছে যে, সত্যিকার অর্থে এটি সত্য এবং অবশ্যই সত্য যে, সেই ভূমিকম্প এদেশে আসতে যাচ্ছে যা পূর্বে কোনো চোখ দেখে নি, কোনো কান শোনে নি, কারো হৃদয়ে এর ধারণাও জাগ্রত হয় নি। এখন সততার সাথে বলো যে, ইনজীলে ভূমিকম্প সম্পর্কে এমন বাক্যাবলি কোথায়? যদি থাকে উপস্থাপন করা উচিত নতুবা খোদা তা'লাকে ভয় করে সত্য গোপন করা হতে বিরত হওয়া উচিত।

তার আপত্তিঃ

অনুবাদে ভূমিকম্প শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে যেন অজ্ঞরা বিশ্বাস করে নেয় যে, এলহামে ভূমিকম্প শব্দও রয়েছে।

---

* **টীকাঃ** একইভাবে, আমার রচিত ১৯০২ সালে প্রকাশিত 'মাওয়াহিবুর রহমান' নামক গ্রন্থে একটি এমন প্রবল ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে, যার ফলে বহু স্থাপনা ধ্বসে পড়বে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই পুস্তকে শুধুমাত্র ভবন বা বাড়িঘর ধ্বংসের কথাই বলা হয় নি, বরং সুস্পষ্টভাবে 'ভূমিকম্প' শব্দটিরও উল্লেখ রয়েছে। মাওয়াহিবুর রহমান পৃ. ৮৬ দ্রষ্টব্য। –লেখক

আমার উত্তরঃ

হে অন্ধ মানুষ! ভবিষ্যদ্‌বাণীর পুরো বাক্য হলো, ভূমিকম্পের ধাক্কা عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا। দ্রষ্টব্য আল-হাকাম ১৯০৩ ও ১৯০৪। উভয়টির অর্থ হলো ভূমিকম্পের একটি ধাক্কা আসবে যার ফলে এ দেশের একটি অংশ ধ্বংস হয়ে যাবে, বাড়িঘর ধ্বসে পড়বে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এখন বলো, আমরা কি অজ্ঞদের প্রতারিত করেছি?*

নাকি আপনি অজ্ঞদের প্রতারিত করেন। আমরা মিথ্যা বলেছি নাকি আপনি মিথ্যা বলেন? لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ। আল-হাকাম পত্রিকা (এখনও) আছে। এর উভয় সংখ্যা দেখুন। এ পত্রিকা প্রতিশ্রুত ভূমিকম্পের এক বছর পূর্বে দেশে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে, সরকারের কাছেও পৌঁছে গেছে। এখন বলুন, কোন বিদ্বেষ আপনাকে এ মিথ্যায় প্ররোচিত করেছে যে, আপনি দাবি করে বসেছেন ভবিষ্যদ্‌বাণীতে ভূমিকম্প শব্দই নেই।

তার আপত্তিঃ

এ এলহাম ১৯০২** সনের ৩১মে তারিখের আল-হাকাম পত্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠার ৪র্থ কলামে রয়েছে আর তাতে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে, প্লেগ-সংক্রান্ত।

আমার উত্তরঃ

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ভূমিকম্পও প্লেগের একটি পরিশিষ্ট আর

*** টীকাঃ** যেমনটি আমরা ইতোমধ্যেই লিখে এসেছি, আমার রচিত 'মাওয়াহিবুর রহমান' পুস্তকে, যা ১৯০২ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় এই ভবিষ্যদ্‌বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং সরাসরি 'ভূমিকম্প' শব্দটি উল্লেখপূর্বক বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, অজ্ঞ কেবল তারাই– যারা এতটা স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও স্পষ্ট বিবরণ সত্ত্বেও প্রশ্ন করে যে, ভূমিকম্পের উল্লেখ কোথায় আছে? তাদের উচিত জাগ্রত মনমানসিকতা নিয়ে 'আল-হাকাম' পত্রিকার ২৪ ডিসেম্বর ১৯০৩ সনের সংখ্যাটি পাঠ করা। এছাড়া 'আমীন' পুস্তিকাটিও পাঠ করা উচিত যা ১৯০১ সনে ছাপা হয়েছে, একইসাথে ১৯০২ সনে প্রকাশিত 'মওয়াহিবুর রহমান' পুস্তকের ৮৬ নম্বর পৃষ্ঠাও পাঠ করা উচিত এবং নিজেদের বিশ্বাসের শোচনীয় অবস্থার জন্য অশ্রুপাত করা উচিত। –লেখক

**** টীকাঃ** মুদ্রণজনিত ভুল হয়েছে। এটি হবে ১৯০৪ সনের ৩১মে তারিখের আল-হাকাম পত্রিকার ৯ম পৃষ্ঠার ৪র্থ কলাম। –প্রকাশক

সেটির সাথেই সম্পর্ক রাখে। কেননা খোদা তা'লা আমাকে বার বার বলেছেন যে, ভূমিকম্প ও প্লেগ উভয়টি তোমার সমর্থনের জন্য। সুতরাং ভূমিকম্প সত্যিকার অর্থে প্লেগের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক রাখে। প্লেগও আমার জন্য খোদা তা'লার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন, একইভাবে ভূমিকম্পও। এ কারণেই উভয়টির মাঝে সম্পর্ক আছে আর উভয়টি একই বিষয়ের সমর্থনকারী। হৃদয়ে যদি সন্দেহ দানা বেঁধে থাকে যে, এ বাক্যের অর্থ সত্যিই প্লেগ, তাহলে এ সন্দেহ নিতান্তই অলীক, কেননা যে জিনিস কোনোকিছুর সাথে সম্পর্ক রাখে তা হুবহু সেই বস্তু হতে পারে না। তাছাড়া এখানে এর শক্তিশালী পার্থক্যসূচক লক্ষণও রয়েছে আর তা হলো, এ বাক্যের অর্থ সত্যিকার অর্থে প্লেগ নয়, কেননা এর পূর্বে যেখানে এলহাম 'ভূমিকম্পের ধাক্কা' বিদ্যমান সেখানে একটি ইনসাফ ও বিবেক খাটিয়ে নিজেরই চিন্তা করা উচিত যে, বাড়িঘর ভূপাতিত হওয়া আর জনপদ নিশ্চিহ্ন হওয়া কি প্লেগের বৈশিষ্ট্য হতে পারে? এগুলো যে ভূমিকম্পের বিশেষত্ব! একজন পরহেযগার মানুষের পক্ষে এত বাজে কথা বলা সম্ভব না। অর্থাৎ একটি বাক্যের শব্দের যে অর্থ প্রতিভাত হয়, যা বাক্যের প্রসঙ্গ হতে বুঝা যায়, যে অর্থ ঘটনা ঘটার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে গেছে আর মানব বিবেক মেনে নিয়েছে যে, যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে তা হুবহু তা-ই যা এলহাম عَفَتِ الدِّيَارُ থেকে বোধগম্য; তা সত্ত্বেও সেটিকে অস্বীকারে অনড় থাকবে। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজের ব্যাখ্যাগত ভ্রান্তির কারণে সেই দৈব ঘটনা যা এলহাম عَفَتِ الدِّيَارُ থেকে প্রকাশ পায় প্লেগ মনে করেছেন তাহলেও ঘটনা ঘটার পূর্বেকার এই ভ্রান্তি বিরোধীদের স্বার্থের অনুকূলে কোনো প্রমাণ নয়। পৃথিবীতে এমন কোনো নবী বা রসূল অতিবাহিত হন নি যিনি স্বীয় ভবিষ্যদ্‌বাণীর ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাগত ভুল করেন নি। প্রশ্ন হলো, সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী কি আপনার মতে খোদার নিদর্শন হবে না? হৃদয়ে যদি এমনই অবিশ্বাস বিরাজমান থাকে তাহলে চাপাভাষায় কেন কথা বলো? প্রকাশ্যে কেন ইসলামের ওপর হামলা করো না? কোনো একজন নবীর নাম কি বলতে পারো যিনি নিজের কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণীর ব্যাখ্যায় ভুল করেন নি? প্রশ্ন হলো, যদি ধরেও নেই– সংশ্লিষ্ট শব্দের অর্থ প্লেগ, (তাহলে) প্রশ্ন হলো, এটি কি সমগ্র নবীকুলের ওপর হামলা নয়? এলহামী বাক্য عَفَتِ الدِّيَارُ -এ দৃষ্টিপাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ বাক্যে যা বলা হয়েছে তা হলো, এমন দুর্ঘটনা ঘটবে যে, দেশের একটি অংশের বাড়িঘর ধ্বসে পড়বে আর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এটি

জানা কথা যে, প্লেগের বাড়িঘরের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। তাই আল-হাকাম পত্রিকার সম্পাদক এমনটি যদি লিখে দিয়েও থাকেন যে, এ বাক্যটি প্লেগ-সংক্রান্ত আর এর সেই অর্থ নেওয়া হয় যা আপত্তিকারী নিয়েছেন তাহলে এ সম্পর্কে সর্বোচ্চ যা বলা হবে তা হলো আল-হাকামের সম্পাদক এমনটি লিখতে গিয়ে ভুল করেছেন। ভবিষ্যদ্‌বাণী বুঝার ক্ষেত্রে কখনো কখনো নবীদের এমন ভ্রান্তি হয়েছে। যেমনটি কিনা বুখারীতে ذهب وهلى হাদীসটি বিদ্যমান রয়েছে আর এর শব্দাবলি হলো,

قال ابو موسٰى عن النبى صلى الله عليه وسلم رئيت فى المنام انّى اهاجر من مكة الى ارض بها نخل فذهب وهلى الى انها اليمامة او هجر فإذا هى المدينة يثرب

(বুখারী, খণ্ড: ২, মহানবী ও তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিজরত অধ্যায়)

অর্থাৎ আবু মূসা মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি মক্কা হতে এমন এক অঞ্চলের দিকে হিজরত করেছি যাতে খেজুর বৃক্ষ রয়েছে। তখন আমার মনে হলো, সে অঞ্চল হয়ত ইয়ামামাহ বা হিজর হবে, কিন্তু তা মদীনা অর্থাৎ ইয়াসরিব প্রমাণিত হলো। এখন দেখো! মহানবী (সা.), যার স্বপ্ন ওহী এবং যার তাবীর সব তাবীর হতে বেশি সঠিক ও অধিক দৃঢ় ও সবচেয়ে বেশি সঠিক, তিনি স্বপ্নের এ অর্থ করেছিলেন যে, ইয়ামামাহ বা হিজরের দিকে হিজরত হবে। কিন্তু সে অর্থ সঠিক প্রমাণিত হয় নি। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্‌বাণী কি আপনার দৃষ্টিতে ভবিষ্যদ্‌বাণী নয়? আপনি কি মহানবী (সা.)-এর ওপরও হামলা করতে প্রস্তুত? অতএব যেখানে ব্যাখ্যাগত ভ্রান্তি মহানবী (সা.)-ও করেছেন সেখানে আপনার এটি কেমন ঈমান যে, বিদ্বেষের আতিশয্যে মহানবী (সা.)-এর সম্মানেরও পরোয়া করেন না আর খোদার সামনেও লজ্জা করেন না। এ ছাড়া সত্যিকার ন্যায়পরায়ণ হিসেবে খোদাভীতির নিরিখে عَفَتِ الدِّيَارُ শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ করা উচিত যে, এর শব্দগুলো প্লেগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় কিনা? এটি কি ঈমানের পরিচয় যে, যেখানে ঘটনার প্রকাশ عَفَتِ الدِّيَارُ এর অর্থ নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছে তা সত্ত্বেও এর অর্থ প্লেগ করবেন? এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর শব্দ পরিষ্কার ভাষায় বলছে যে, তা এমন একটি দুর্বিপাক যার ফলে বাড়িঘর ধ্বসে পড়বে আর দেশের জনবসতিগুলোর একটি অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আপনি যদি আরবী না জানেন তাহলে কোনো আরবী বিশারদের কাছে জিজ্ঞেস করে নিন

যে, عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا- এর অর্থ কী? আর কাউকে যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে ভাষ্যকার যে অর্থ করেছেন তা দেখুন আর সেই অর্থ হলো,

اِنْدَرَسَتْ دِيَارُ الْاَحْبَابِ وَانْمَحٰى مَا كَانَ مِنْهَا لِلْحَوْلِ* وَمَا كَانَ لِلْإِقَامَةِ

(সাবা মুআল্লাকা, চতুর্থ শরাহ, প্রথম ছত্র)

অর্থাৎ বন্ধুদের জনপদ ও বাড়িঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আর সেসব অট্টালিকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যা সাময়িক অবস্থানের জন্য বানানো হয়েছিল, যেমন- সরাইখানা ইত্যাদি বা পর্যটনের স্থান এবং স্থায়ী বসবাসের নিমিত্তে নির্মিত বাড়িঘরও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এখন বলো, এ অর্থগুলো প্লেগের ক্ষেত্রে কী করে সঠিক প্রমাণিত হতে পারে আর ভবন ভূপাতিত হবার সাথে প্লেগের কিবা সম্পর্ক? এসব অর্থে ও খোদা তা'লার ওহীর অর্থে শুধু অতীত ও বর্তমান কালের পার্থক্য। অর্থাৎ লাবীদ এখানে অতীতের অর্থ দৃষ্টিতে রেখেছেন আর খোদা তা'লার বাণীতে এখানে ভবিষ্যতের অর্থ রয়েছে। যার অর্থ হলো ভবিষ্যতে দেশের একটি অংশের ভবনগুলো ও জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, অস্থায়ী বা স্থায়ী কোনো আবাসস্থল অবশিষ্ট থাকবে না। এখন বলো, এ অর্থ প্লেগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কি? হঠকারিতা করে লাভ কী? দু ধরনের মানুষ অনর্থক হঠকারিতা প্রদর্শন করে, হয় চরম আহাম্মক বা চরম বেইমান বিদ্বেষী। আপনি যদি পুনরায় একই আপত্তি করেন যার পূর্বেও উত্তর দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এটি ক্রিয়ার অতীত রূপ আর লাবীদ (রা.) অতীত কালের ক্রিয়ায় ব্যবহার করেছেন, তাহলে এর উত্তর পূর্বেও দেওয়া হয়েছে যে, এটি লাবীদের উক্তি নয় বরং খোদার উক্তি। খোদা কুরআন শরীফে বিভিন্ন স্থানে সুমহান ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে অতীত কালের ক্রিয়ায় বর্ণনা করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা'লা বলেন,

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ **

(আল-লাহাব: ২-৩)

এখন কিছুটা ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখে উত্তর দাও যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দ

---

* **টীকা:** মুদ্রণজনিত ভুল হয়েছে। 'লিলহাওলি' হবে না, বরং এটি হবে 'লিলহালূলি'। –প্রকাশক

** **টীকা:** বাইবেলেও অনেক জায়গায় ভবিষ্যতের ঘটনাবলিকে ক্রিয়ার

কি ক্রিয়ার অতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে নাকি বর্তমানকালে। বিবেকবানের জন্য এটি চরম লজ্জার কারণ, বরং এক ব্যক্তির জ্ঞানী হবার দাবি থাকা সত্ত্বেও একটি স্পষ্ট বিষয় অস্বীকার করার মতো ভুল করা হতে মরে যাওয়া ভালো। কিন্তু আমি জানি না এসব উত্তর যাচাইয়ের পর আপনার কী অবস্থা হবে? এমন পন্থা অবলম্বনে মানুষের কী লাভ যার কারণে একদিকে সত্য পরিত্যাগ করে খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করতে হয় আর অপরদিকে অন্যায় বিষয়ে হঠকারিতা করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয়? খোদার বাণীতে অধিকাংশ ভবিষ্যদ্‌বাণীকে অতীত কালের ক্রিয়ায় বর্ণনা করার প্রকৃত দর্শন হলো সকল ঘটনা যা ভূপৃষ্ঠে ঘটতে যাচ্ছে তা পূর্বেই ঊর্ধ্বলোকে ঘটে গিয়ে থাকে। সুতরাং ঊর্ধ্বলোকের দৃষ্টিকোণ থেকে সে ঘটনা যেন অতীতের সাথে সম্পর্ক রাখে। এ বিষয়ের ভিত্তিও এটিই, অর্থাৎ সাধারণ মানুষও যে, শত শত সত্য স্বপ্ন দেখে থাকে সেসব স্বপ্নেও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য কথাকেও অতীত কালের ক্রিয়ায় প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যেমন কারো ঘরে যে ছেলে সন্তানের জন্ম হয় তার সংবাদ দেবার উদ্দেশ্যে দেখানো হয় যে, ছেলে হয়েছে বা মেয়ে জন্ম নিয়েছে বা এমন জিনিস সে পেয়ে গেছে যার ব্যাখ্যা হলো ছেলে। ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোকে অতীতের ক্রিয়ায় উল্লেখ করা এরপর বর্তমান কালের অর্থে ব্যবহার করা কেবল কুরআনে নয় বরং পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থাবলিতেও এ রীতি জানা ও সুবিদিত বিষয় যা এক শিশুও অস্বীকার করতে পারবে না। হাদীসে এই বাগ্‌ধারার অজস্র ব্যবহার দেখা যায়;

عن انس رضى الله عنه قال، قال النبى صلّى الله عليه وسلم خربت خيبر۔ انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين۔

খায়বার বিজয়ের পূর্বে মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, খায়বার বিজিত হয়েছে, আমরা যখন কোনো জাতির আঙিনায় অবতরণ করি তখন তাদের

**** চলমান টীকাঃ** অতীত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে যেমন- 'বাবিল মুখ থুবড়ে পড়েছে, বাবিল মুখ থুবড়ে পড়েছে।' (যিশাইয় ২১:৫*) অনুরূপভাবে এই উক্তি, 'হায় নবো (পর্বত)! ওটা তো ধ্বংস হয়ে গেছে। কিরিয়াথয়িমকে অপদস্থ করা হয়েছে।' (যিরমিয় ৪৮:১)

* মুদ্রণজনিত ভুল হয়েছে। এটি হবে যিশাইয় ২১:৯। –প্রকাশক

প্রভাত অশুভ হয়ে থাকে, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। দেখুন! তিনি এখানে অতীতের ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন আর এর অর্থ হলো পরবর্তীতে তাদের অশুভ পরিণতি ঘটতে যাচ্ছে।

বস্তুত এটি একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল যা অতীত কালের ক্রিয়ায় করা হয়েছিল আর সত্যিকার অর্থে বর্তমান কালের অর্থ রাখত অর্থাৎ ভবিষ্যতের। সুতরাং عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا- ও এমনই একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী যা অতীত কালের ক্রিয়ায় বর্ণনা করা হয়েছে আর ভবিষ্যতের অর্থ রাখে। আমরা লিখে এসেছি যে, আদ-দিয়ার বলতে দেশের একটি অংশ বুঝায় আর আলিফ লাম সে প্রমাণই বহন করে, এ কারণে লাবীদ (রা.) আদ-দিয়ার বলতে সব দেশ বুঝান নি, বরং বন্ধুদের দেশ বা শহর অর্থ করেছেন। এখানে অর্থাৎ খোদার বাণীতে عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا- মহল বলতে হিন্দুদের প্রাচীন দর্শনীয় স্থান বুঝায়। অর্থাৎ সেই মন্দির যা প্রাচীন যুগ থেকে ধরমশালা ও কাংড়ায় বিদ্যমান ছিল, যা অন্ততপক্ষে ১৬০০ বছর পূর্বে নির্মাণ করা হয়েছিল বলে প্রমাণিত আর মকাম বলতে সেসব ঘরবাড়ি বুঝায় যা স্থায়ী আবাসস্থল হিসেবে সেসব এলাকায় নির্মাণ করা হয়েছিল। খোদা তা'লা সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীতে এ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, সেই মন্দির অর্থাৎ প্রতিমাঘরও ধ্বসে পড়বে, যা ভূপাতিত হওয়া একত্ববাদের প্রচার প্রসারের জন্য পূর্ব-সংবাদবাহকস্বরূপ আর অন্যান্য বাড়িঘরও ভূপাতিত হবে। অতএব এমনই ঘটেছে। যেহেতু আক্ষরিকভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে তাই এখন সেটি অস্বীকার করা অপলাপ ছাড়া কিছুই নয়। বাহ্যিকভাবে শব্দ যেভাবে রয়েছে অর্থ করার সময় তা দৃষ্টিতে রাখা বাঞ্ছনীয়। যদি আক্ষরিকভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণতা লাভ করে তাহলে আক্ষরিক অর্থকে এড়িয়ে যাওয়া নিছক আহাম্মকের কাজ। যদি বাক্য عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا- মানুষের বানানো হতো আর এর অর্থ হতো প্লেগ, তাহলে এমন প্রতারক কখনো এ বাক্য ব্যবহার করতে পারত না, কেননা বিবেক তাকে প্লেগ সম্পর্কে সে শব্দ ব্যবহার করতে বারণ করত যা প্লেগের জন্য সঠিক হতে পারে না; কারণ প্লেগের মাধ্যমে ভবন ভূপাতিত হয় না। যদি অর্থ করতে গিয়ে যথা সময়ে সঠিক অর্থ না করা হয়ে থাকে তাহলে এর নাম ব্যাখ্যাগত ভুল আর পরবর্তীতে যখন বাস্তব বিষয় প্রকাশ পেয়ে গেছে তখন সঠিক অর্থ স্বীকার না করার নাম হলো দুষ্কৃতি ও ঈমানহীনতা এবং হঠকারিতা।

তার আপত্তিঃ

আমরা আপনার কাছে সে এলহামের কথা জানতে চাই যাতে আপনি এ খবর দিয়ে থাকবেন যে, ভূমিকম্প আসবে; কিন্তু এমন এলহাম আপনি কিয়ামত পর্যন্ত দেখাতে পারবেন না।

আমার খণ্ডনঃ

আমার উত্তর হলো, যে কিয়ামতকে আপনি দূরে বলে মনে করতেন সেই কিয়ামত আপনার ওপর নিপতিত হয়েছে। ১৯০৩ সনের ২৪ ডিসেম্বরের আল-হাকামের ১৫ পৃষ্ঠার ২নং কলাম দেখুন যাতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ভূমিকম্পের ধাক্কা আসবে আর ৫ মাস পর ১৯০৪ সনের ৩১ মে-র সংখ্যায় এই ধাক্কার ভয়াবহতা ও শক্তি খোদার সেই ওহীতে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا যার অর্থ হলো সেই ধাক্কা এমন হবে যার কারণে এদেশ পাঞ্জাবের একটি অংশের জনপদ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ভবনসমূহের নামচিহ্নও থাকবে না। তা ধর্মশালা ও কাংড়ায় হিন্দুদের মন্দিরের ন্যায় সাময়িক বসবাসস্থল হোক বা ধর্মশালা ও কাংড়ায় হিন্দুদের স্থায়ী আবাসস্থলই হোক। এখন বলুন তো দেখি, সেই কিয়ামত যাকে আপনি অনেক দূরে বলে মনে করতেন আর বলতেন যে, এমন এলহাম তুমি কিয়ামত পর্যন্ত উপস্থাপন করতে পারবে না সেই কিয়ামত আপনার জীবনে এসে গেছে নাকি আসে নি। এটি সবার বোধগম্য যে, সেই কিয়ামত আপনাকে পেয়ে বসেছে। কেননা যে ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা আপনি অস্বীকার করছেন তার স্পষ্ট উল্লেখ ২৪ ডিসেম্বর ১৯০৩ সনের আল-হাকাম পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠার ২ নং কলামে বিদ্যমান রয়েছে। একটু চোখ খোলো আর পড়ো এবং লজ্জায় মরো। উল্লিখিত এই ভূমিকম্পের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্য ওহী عَفَتِ الدِّيَارُ প্রথম ওহীর পর অবতীর্ণ হয়েছে। প্রশ্ন হলো এখন পর্যন্ত কি আপনার ওপর কিয়ামত নেমে আসে নি? যদি বলো যে, কিয়ামতে তো লোক মরে যাবে কিন্তু আমি যে এখনও জীবিত! তাহলে এর উত্তর হলো সত্যিকার অর্থে লাঞ্ছনার মৃত্যু ইতোমধ্যে আপনার ওপর আঘাত হেনেছে। আধ্যাত্মিক মৃত্যুর পর এই দৈহিক জীবন কোনো অর্থ রাখে না। সেই ব্যক্তি কি জীবিত আখ্যায়িত হতে পারে যে জোরালো দাবি করেছে যে, ভবিষ্যদ্‌বাণীতে আদৌ ভূমিকম্পের উল্লেখ নেই আর বড়ো অহংকারভরে একথার ওপর জোর দিয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত তুমি

এমন ভবিষ্যদ্‌বাণী দেখাতে পারবে না যাতে ভূমিকম্পের উল্লেখ থাকবে? কিন্তু তাকে দেখানো হয়েছে যে, সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী বিদ্যমান রয়েছে যাতে স্পষ্ট ভাষায় ভূমিকম্পের উল্লেখ রয়েছে যা عَفَتِ الدِّيَارُ এলহাম হবার পাঁচ মাস পূর্বে আল-হাকামে ছাপা হয়েছে। আর এলহাম عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا। সেই উল্লিখিত ভূমিকম্পের ভয়াবহতা তুলে ধরে যে, তা এমন হবে; এ কারণেই এতে পুনরায় ভূমিকম্প শব্দ আনার প্রয়োজন ছিল না।

এখন বলো, এটি কি কোনো জীবন হলো, একটি কথা কিয়ামত পর্যন্ত হতে পারে না বলে দাবি করেছ আর তা বগল হতেই বেরিয়ে এলো–

بمردی کہ تا زیستن مرد را بہ از زندگانی بترکِ حیا

অশালীন-নির্লজ্জ জীবনযাপন করার চেয়ে
একজন পুরুষের জন্য বীরত্বের সাথে মরে যাওয়া শ্রেয়।

جہنم کزو داد فرقان خبر بسوزد درو کاذبِ بد گہر

কুরআন যে জাহান্নামের সংবাদ দিয়েছে
দুশ্চরিত্র মিথ্যাবাদী তাতে জ্বলতে থাকবে।

যে ব্যক্তি অন্ধ ও মৃত নয় সে বুঝতে পারবে যে, এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর জন্য যত স্পষ্টতা ও বর্ণনার গভীরতা বা দৃঢ়তা প্রয়োজন, তার সবকিছু সবচেয়ে জোরালোভাবে সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীতে বিদ্যমান, বরং তার চেয়েও বেশি। এটিকে অস্বীকার করা এমন হঠকারিতা যার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এমন ব্যক্তির খোদার সত্তায় ঈমানই নেই। আর এটি কোনো নতুন রীতি নয়। বরং অতীত কালেও যারা কোনোভাবে সত্য গ্রহণে বিমুখ ছিল তারা এ রীতিই অনুসরণ করে আসছে।

আপনি হয়ত বিদ্বেষের আতিশয্যে এ আপত্তিও করে বসবেন যে, খোদা তা'লা ভূমিকম্প আসার ৫ মাস পূর্বে সংবাদ দিয়েছেন যা ১৯০৩ সনের ২৪ ডিসেম্বরের আল-হাকামে ছেপেছে আর ভূমিকম্পের তীব্রতার চিহ্নাবলি ও এর ভয়াবহতার ফলাফল ৫ মাস পর নিজের ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন– একসাথে কেন বর্ণনা করলেন না? কিন্তু যদি আপনি এমন আপত্তি করেন তাহলে এ আপত্তিও নতুন নয়, বরং এটিও সেই আপত্তি যা আজ হতে ১৩০০

বছর পূর্বে অভিশপ্ত আবু জাহল ও অভিশপ্ত আবু লাহাব কুরআন শরীফ সম্পর্কে করেছিল যে,

لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً *

সুতরাং এমন আপত্তি মূলত تَشَابَهَتِ الْقُلُوب (তথা ভ্রান্ত চিন্তাধারা)-র অন্তর্গত গণ্য হবে যা একজন মুসলমানের এড়িয়ে চলা উচিত।

তার আপত্তিঃ

আপনি এ এলহামে এটি বলেন নি যে, ভূমিকম্প বলতে কী বুঝায়?

আমার খণ্ডনঃ

ওহীর আক্ষরিক বাক্যে ভূমিকম্প শব্দ রয়েছে, কিন্তু এমন ভূমিকম্প যা কিয়ামততুল্য হবে, বরং কিয়ামত আনয়নকারী ভূমিকম্প হবে আর এতে সহস্র সহস্র গৃহ ধ্বসে পড়বে, অনেক জনপদ হারিয়ে যাবে আর এর দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী যুগে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আকস্মিকভাবে সহস্র সহস্র লোক মারা যাবে আর এমন ঘটনা ঘটবে যা পূর্বে কোনো চোখ দেখে নি। সুতরাং এভাবে গৃহ ধ্বসে পড়া আর সহস্র সহস্র লোকের আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করা আর এক অসাধারণ বিষয় প্রকাশ পাওয়া, ভবিষ্যদ্বাণীর মূল উদ্দেশ্য। যদিও ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত শব্দ 'ভূমিকম্প' বলতে ভূমিকম্পই মনে করা হয়, কিন্তু খোদার বাণীর প্রতি শিষ্টাচারের দাবি হলো আসল উদ্দেশ্যকে সামনে রাখা যা-কিনা এক অসাধারণ বিষয় এবং নিদর্শন। এসব বিষয়ে নাক গলানো উচিত নয় যে, ভূমিকম্পের প্রকৃতি কেমন হবে আর তা কোন ধরনের হবে। যদিও শব্দ বাহ্যত এটিই প্রকাশ করে যে, তা ভূমিকম্প, কিন্তু তা অন্য কোনো ভয়াবহ দুর্বিপাকও হতে পারে যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পূর্বে দেখা যায় নি আর তা ভূমিকম্পের রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে রাখবে। অর্থাৎ হতে পারে তা ভূমিধ্বসের মতো হবে, অর্থাৎ মাটির তলায় তলিয়ে যাবে আর কোনো ভূমিকম্প অনুভূত হবে না, ভূমি ওলট-পালট হয়ে যাবে বা অন্য কোনো নিদর্শনমূলক বিপদ প্রকাশ পাবে যা মানুষ কখনো দেখেও নি। যাহোক, সেটি নিদর্শন। অবশ্য পৃথিবীতে যদি ভূমিকম্প সৃষ্টিকারী সেই ভয়াবহ বিপদ প্রকাশ

---

* **টীকাঃ** অর্থাৎ তার প্রতি পুরো কুরআন একবারে অবতীর্ণ হলো না কেন? –অনুবাদক (আল-ফুরকানঃ ৩৩)

না পায়, যা খোদার ওহীর বাহ্যিক শব্দ অনুসারে ভূমিকম্পের আদলে হবার কথা বা যদি কোনো সামান্য বিষয় প্রকাশ পেয়ে থাকে যা পৃথিবীর দৃষ্টিতে অসাধারণও নয় আর অস্বাভাবিকও নয় এবং যা কিয়ামততুল্যও নয় বা আমার জীবদ্দশায় প্রকাশ না পায় তাহলে ঢোল পিটিয়ে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করো বা মিথ্যাবাদী মনে করো। এই মহা দুর্বিপাক কিয়ামততুল্য হবে আর অঞ্চল পুরো নিমিষে ধ্বংস করে দেবে আর সহস্র সহস্র মানুষকে আমাদের জামা'তে প্রবেশ করাবে।

তার আপত্তিঃ

আপনি সুযোগ বুঝে বারাহীনে আহমদীয়ার বাক্যগুলোর অর্থ ভূমিকম্প নিয়েছেন, অথচ এসব বাক্যে ভূমিকম্পের উল্লেখ নেই।

আমার খণ্ডনঃ

এ ধরনের আপত্তিই এ যুগের বিদ্বেষী খ্রিষ্টানরা কুরআন শরীফের ভবিষ্যদ্‌বাণী এই

الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ

(আর-রূম: ২-৪) সম্পর্কে করে আর বলে মহানবী সুযোগ বুঝে নিজের পক্ষ থেকে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী বানিয়েছেন। রোমান সাম্রাজ্যের বিজয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে এ ভেবে যে, তারা শক্তিশালী, যুদ্ধের সাজসরঞ্জামও ছিল পর্যাপ্ত। সেনাবাহিনী অভিজ্ঞ ও সাহসী ছিল। অপরদিকে পারস্য সাম্রাজ্যের অবস্থা ছিল এর বিপরীত। তাই বিরাজমান অবস্থা দেখে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে দিয়েছেন। আমি আশ্চর্য হই, পাদরিদের অভ্যাস আপনার মাঝে কোত্থেকে এলো। অন্যায়ে অভ্যস্ত পাদরিরা কুরআনের সকল ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে এই আপত্তিই করে যা আপনি করেছেন। তওবা করুন, কোথাও এমনটি যেন না হয় যে, এই সাদৃশ্য আবার বড়ো কোনো অধঃপতনে না পর্যবসিত হয়। চোখ খুলে নিজের আপত্তিটি বিশ্লেষণ করুন। বারাহীনে আহমদীয়ার ৫৫৭ পৃষ্ঠায় এই ভবিষ্যদ্‌বাণী বিদ্যমান। খোদা তা'লা বলেন, আমি আমার চমক বা ঔজ্জ্বল্য দেখাবো আর আমার শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমাকে উত্থিত করব। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে, পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি, কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন আর জোরালো আক্রমণের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করবেন।

فلما تجلّٰى ربه للجبل جعله دكا۔ قوة الرحمٰن لعبيد الله الصمد۔

আরবী এলহামের অনুবাদ হলো যখন খোদা পাহাড়ে স্বীয় বিকাশ ঘটাবেন তখন একে টুকরো টুকরো করে দেবেন। খোদা এমন করবেন স্বীয় বান্দার সত্যতা প্রকাশের জন্য।

এখন চিন্তা করে দেখো আমি এতে নিজের পক্ষ থেকে কী বানালাম। এখানে খোদা তা'লা স্বয়ং একটি চমক বা বিকাশ ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, যেভাবে তূর পর্বতে মূসার জন্য চমক প্রদর্শিত হয়েছে। তিনি এমন এক শক্তিমত্তা প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দেন যা অলৌকিক এবং যা আমার উন্নীত হবার কারণ হবে। এরপর তৃতীয়বার এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, খোদা জোরালো সব আক্রমণের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করবেন। আর শেষের দিকে এই জোরালো হামলা ও চমক এবং স্বীয় শক্তিমত্তা প্রদর্শনের ব্যাখ্যা করেন যার কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, খোদা একটি বিশেষ পাহাড়ে স্বীয় বিকাশ ঘটাবেন আর পাহাড়কে টুকরো টুকরো করে দেবেন। আপনার চোখ যদি বিদ্বেষের কারণে কিছু দেখতে সক্ষম না হয় তাহলে কোনো ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের মানুষকে জিজ্ঞেস করে নিন যে, এই এলহামী বাক্যে কোনো মহান নিদর্শনের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, নাকি এটি আমাদের বানানো? আর যদি প্রতিশ্রুতি থাকে তাহলে কি ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দ হতে এটিই বের হয় যে, নিদর্শনস্বরূপ পাহাড় টুকরো টুকরো করে দেওয়া হবে, নাকি অন্য কিছু বের হয়? বাকি থাকল এ আপত্তি যে, তখন আমাদের মন সেদিকে যায় নি যে, সত্যিই পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এটি আসলে যেভাবে মহানবী (সা.)-কে হিজরতের স্থান হিসেবে দিব্যদর্শনে যে স্থান দেখানো হয়েছে তা মদীনা ছিল, ইয়ামামা বা হিজর নয়, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হয় নি যা দেখানো হয়েছে। এছাড়া হুদায়বিয়ার সফরে মক্কায় যেতে পারবেন না আর কাবা শরীফের তাওয়াফও করতে পারবেন না (কিন্তু তিনি তা বুঝতে পারেন নি)। অতএব আপনার আপত্তি যদি তেমনই হয়ে থাকে যেমনটি এ যুগের অথর্ব কাফিররা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে করে থাকে, তাহলে আমার এ চিন্তা হচ্ছে যে, কোন দিন আপনি ইসলাম থেকে না আবার মুখ ফিরিয়ে নেন!

এখন স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা তা'লা উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীতে, যা

বারাহীনে আহমদীয়ার ৫৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে পরিষ্কারভাবে ভূমিকম্পের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, কেননা আয়াত فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ (আল-আরাফ: ১৪৪) সে সময়কার আয়াত যখন খোদা তা'লা তূর পর্বতে একটি ভূমিকম্প সৃষ্টি করে সেটিকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলেন। এ বিষয়টি তওরাতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে যা আমরা জানি। সুতরাং এমতাবস্থায় আপনি যে বলেন, এ বাক্যগুলোতে ভূমিকম্পের নামগন্ধও নেই! আপনার এমন আচরণের নাম বিদ্বেষ রাখব নাকি অজ্ঞতা? হে খোদার বান্দা! যদি ভূমিকম্পের উল্লেখ না থাকে তাহলে তূর পর্বতও যে ভূমিকম্পে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল তা তোমার অস্বীকার করা উচিত।

তার আপত্তিঃ

عَفَتِ الدِّيَارُ পঙ্‌ক্তির অর্থ হলো অতীতে ঘর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আমার খণ্ডনঃ

সকল প্রশংসা আল্লাহর যে, আপনি কমপক্ষে একথা মেনে নিয়েছেন যে, عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا- এর অর্থ হলো ঘরবাড়ি ভেঙে যাওয়া এবং ধ্বংস হওয়া। বাকি থাকল, আপনি عَفَتِ শব্দকে অতীতের অর্থে সীমাবদ্ধ রাখছেন। এ ধারণার খণ্ডনে আমরা কুরআন শরীফের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি, বরং এক্ষেত্রে পুরো আরববাসী আমাদের সাক্ষী। এখন বলো, এ ভবিষ্যদ্‌বাণী অসাধারণ নয় কি? যদি বলো যে, এতে কোনো সময় উল্লেখ করা হয় নি, তাহলে এর উত্তর হলো, যে-সব ভবিষ্যদ্‌বাণীতে খোদা সময় অপ্রকাশিত রাখতে চান সেগুলোতে তিনি আদৌ বলেন না যে, অমুক সময় এ ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হবে। অতএব খোদা তা'লা যখন পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণী এমন সময় প্রকাশিত হবে যখন কেউ জানবে না আর আকস্মিকভাবে সে ঘটনা ঘটবে, তাই এর সময় বলে দেওয়া স্ববিরোধ ছাড়া কিছু নয়। দ্রষ্টব্য আন-নিদা পৃ. ১৪। যদি বলো, নির্দিষ্ট করা ছাড়া ভবিষ্যদ্‌বাণীর আর কী বিশেষত্বইবা থাকল? পৃথিবীতে এমনিতেই কখনো কখনো এমন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এর উত্তর হলো, এ নির্দিষ্টকরণ যথেষ্ট যে, খোদা বলেন, আমার জীবদ্দশায় আমার সত্যায়নে এ দুর্ঘটনা ঘটবে আর সমসাময়িক কোটি কোটি লোক জীবিত থাকবে যারা এ দুর্ঘটনা দেখবে। এ দুর্ঘটনার প্রকৃতি এমন যে, এ দেশে ইতিপূর্বে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং এতটুকু নির্দিষ্ট করা যথেষ্ট যে, সেই

কিয়ামততুল্য ভূমিকম্প আমার জীবদ্দশায় আমার এবং অধিকাংশ বিরোধীর জীবদ্দশায় সংঘটিত হবে। স্মরণ রেখো তোমাদের ন্যায় মক্কার বিরোধীরাও مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ বলে সময় নির্দিষ্ট করার দাবি উত্থাপন করেছিল, কিন্তু তাদেরকে সময় অবহিত করা হয় নি।

তার আপত্তিঃ

যে-সব পত্রিকা ইসলামী বিষয়াদিতে সমবেদনা রাখে তাদের উচিত এ বিষয়কে নিজেদের পত্রিকায় উল্লেখ করে মানুষকে অবহিত করা যে, এ বিজ্ঞাপন মিথ্যা আর মির্যা কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী করে নি।

আমার খণ্ডনঃ

এখন এর এছাড়া আর কী উত্তর দেওয়া যায় যে, لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ। বাকি থাকল একথা যে, পত্রপত্রিকায় মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রবন্ধ ছেপে দিক– এর উত্তর হলো যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন সেই সর্বশক্তিমান সত্তা এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। এ জগতের কীট ঊর্ধ্বলোকের বিষয়াদির পথে কিবা বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে? এর পূর্বে অভিশপ্ত আবু জাহল আরবের সকল জাতিকে এই বলে উত্তেজিত করেছিল যে, এ ব্যক্তি [(অর্থাৎ মহানবী (সা.)] মিথ্যা দাবি করেছিলেন আর সে অজ্ঞদের নিজের সাথে সমবেত করে নিয়েছিল। চিন্তা করে দেখো এর পরিণাম কী হয়েছিল! আল্লাহ যা করতে চাইতেন তা কি তাদের দুষ্কৃতির কারণে থেমে গিয়েছিল? বরং সেই দুর্ভাগার অদৃষ্টের সিদ্ধান্ত খোদা তা'লা বদরের যুদ্ধে দিয়ে দিয়েছিলেন, অপরদিকে খোদার সত্য নবীর ধর্ম সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। একইভাবে আমি সত্যই বলছি যে, ঊর্ধ্বলোকে যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে কোনো পত্রিকা সেটিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। মানুষের ক্রোধ খোদার ক্রোধ হতে বড়ো নয়। এটি আমার ওপর নয় বরং সেই খোদার ওপর হামলা, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি ভূমিকে পাপমুক্ত করতে চেয়েছেন এবং সে দিনগুলো পুনরায় আনতে চেয়েছেন যা নিষ্ঠা, সততা ও একত্ববাদের দিন। কিন্তু যে-সব হৃদয় জগৎকে ভালোবাসে তারা চায় না যে, এমন দিন আসুক। হে নির্বোধ! তুই কি খোদার বিরোধিতা করবি? তুই কি তাঁর সাথে লড়াইয়ের শক্তি রাখিস? যদি এ কাজ মানুষের হতো তাহলে তোর বিরোধিতা করার কিবা প্রয়োজন ছিল? এটিকে ধ্বংস করার জন্য খোদা-ই যথেষ্ট ছিলেন। কিন্তু প্রায় পঁচিশ

বছর হলো এ জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে। খোদা নিজের পবিত্র প্রতিশ্রুতি অনুসারে এটিকে নিদর্শনমূলক উন্নতি দিয়েছেন। এ পৃথিবী ধ্বংস হবার পূর্বে খোদার জন্য এ জামা'তকে পুরো উন্নতি দেওয়া আর আমার সত্যায়নে সহস্র সহস্র নিদর্শন দেখানো অবধারিত, যার লক্ষ লক্ষ মানুষ সাক্ষী থাকবে। ভূমি থেকেও নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছে আর আকাশ হতেও। শত্রুদের মধ্য হতেও আর মিত্রদের মধ্য হতেও। আর কোনো মাস এমন অতিবাহিত হয় না যা নিদর্শনশূন্য হবে। এখনও অসাধারণ ও অলৌকিক নিদর্শনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যার নাম কিয়ামত আনয়নকারী ভূমিকম্প রাখা হয়েছে, যা পৃথিবীকে সেই ধ্বংসযজ্ঞে পিষ্ট করবে যা পৃথিবী কখনো দেখে নি। সুতরাং যদি খোদাভীতি থাকে তাহলে কেন কিছুকাল ধৈর্যধারণ করা হয় না। এ ভূমিকম্প হবে, যেন খোদা সত্যবাদীর সত্য ও নিষ্ঠা প্রকাশ করে দেন আর মানুষ যেন বক্রতামুক্ত সত্যকে একটি উজ্জ্বল নিদর্শনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে। যদিও এরপর ঈমান আনা খুব একটা সম্মানজনক বিষয় হবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা গ্রহণ করবে তারা এই রহমত হতে অংশ পাবে, যা বিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

তার আপত্তিঃ

আহমদ বেগের মেয়ের কাহিনি কি মির্যায়ী এলহামকে নিষ্প্রভ করে না?

আমার উক্তিঃ

হে আপত্তিকারী! পূর্বের বেহুদা আপত্তি করে যে লাঞ্ছনা দেখেছেন তা কি যথেষ্ট ছিল না যে, এখন আবার এ বাজে আপত্তি করে বসলেন? এখন কান খুলে শুনুন, এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর দুটো অংশ ছিল; উভয়টি ছিল শর্তসাপেক্ষ। একটি অংশ আহমদ বেগের মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত ছিল, অর্থাৎ তাতে এ ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল যে, সে যদি খোদার নির্ধারিত শর্তগুলো অনুসরণ না করে তাহলে সে তিন বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই মারা যাবে। আর কেবল সে নয়, বরং এর সাথে তার আরো বেশ ক'জন নিকটাত্মীয় মারা যাবে। কিন্তু সে যেহেতু ঔদ্ধত্য বশত কোনো শর্ত মেনে চলে নি তাই খোদা তা'লা তাকে মেয়াদকাল পূর্ণ হবার পূর্বেই এ পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন আর এর সাথে আরো কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু ভবিষ্যদ্‌বাণীর দ্বিতীয় অংশ যা আহমদ বেগের জামাতা সংক্রান্ত ছিল তা বিলম্বিত করার কারণ হলো বেঁচে যাওয়া

লোকেরা শর্তকে কাজে লাগিয়েছে আর হৃদয়ে ভয় সৃষ্টি করেছে এবং ভয় পেয়েছে। একথা সবার বোধগম্য যে, যদি দুব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয় আর তাদের একজন মেয়াদের ভেতর মারা যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় ব্যক্তির হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার হয়ে থাকে।

সুতরাং আহমদ বেগের মৃত্যু দেখে তার জামাতার আত্মীয়স্বজনের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক বিষয় ছিল। সুতরাং খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাদের ভয় দেখে তার জামাতার মৃত্যু সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল তা বিলম্বিত করেন। এর উদাহরণ তেমনই যেমনটি কিনা ডেপুটি আবদুল্লাহ আথম ও পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্‌বাণীর ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। কেননা ডেপুটি আবদুল্লাহ আথম মৃত্যুর ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনে অনেক ভীতি প্রকাশ করে। সে কারণে তার মৃত্যু বিলম্বিত করা হয় আর সে নির্ধারিত সময় হতে কয়েক মাস বেশি জীবিত ছিল। কিন্তু লেখরাম ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনে অনেক ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে আর অপলাপে সীমালঙ্ঘন করে, তাই তাকে নির্ধারিত সময়েরও পূর্বে এ পৃথিবী থেকে তুলে নেওয়া হয়। সত্য কথা হলো, খোদার রসূল যে-সব ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, যাতে কারো মৃত্যু বা শাস্তির সংবাদ থাকে, তা শাস্তির ভবিষ্যদ্‌বাণী আখ্যায়িত হয়ে থাকে। আল্লাহর রীতি হলো তাতে কোনো শর্ত নির্ধারিত থাকুক বা না থাকুক, তা তওবা ও এস্তেগফারের মাধ্যমে টলতে পারে বা সেগুলো বিলম্বিত করা হয়, যেমনটি কিনা ইউনুস নবীর ভবিষ্যদ্‌বাণীর ক্ষেত্রে ঘটেছে। ইউনুস নবী ৪০ দিনের ভেতর তার জাতির ওপর শাস্তি নেমে আসার যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন তা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি ছিল। তাতে ঈমান আনার বা ভয় পাবার কোনো শর্ত ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতি যখন কাকুতিমিনতি করল তখন খোদা তা'লা সেই শাস্তি টলিয়ে দিয়েছেন। নবীকুলের এটি সর্বসম্মত বিশ্বাস যে, খোদা তা'লা যখন কোনো বান্দার ওপর শাস্তি অবতীর্ণ করার ইচ্ছা করেন তা সদকা-খয়রাত, তওবা ও এস্তেগফার এবং দোয়ার মাধ্যমে টলতে পারে। সুতরাং সেই বিপদাপদ, যা নাযিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে যদি কোনো নবী রসূলকে সংবাদ দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তা শাস্তিমূলক ভবিষ্যদ্‌বাণী আখ্যায়িত হয়। বিপদ হবার কারণে তা খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে তওবা, এস্তেগফার আর সদকা-খয়রাত ও দোয়া এবং কাকুতিমিনতির মাধ্যমে অপসারিত হতে পারে বা বিলম্বিত হতে পারে। সেই শাস্তি যা ভবিষ্যদ্‌বাণীরূপে প্রকাশ করা হয়েছে,

তা যদি সদকা-খয়রাত ও কাকুতিমিনতির মাধ্যমে অপসারিত হতে না পারে তাহলে খোদা তা'লার সকল কিতাব এতে মিথ্যা প্রমাণিত হবে আর ধর্মের সকল ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। আপত্তিকারী এভাবে ইসলামের ওপর কঠিন হামলা করেছে। শুধু ইসলামের ওপর নয়, বরং সকল নবীর ওপর হামলা করেছে। যদি পরিকল্পিতভাবে হামলা না করে থাকে তাহলে ইসলাম ও শরীয়ত সম্পর্কে তার অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়। বিশ্বাসীদের এমন লোকদের বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। আমার ওপর হামলার পেছনে তার লক্ষ্য শুধু আমি নই, বরং ইসলাম ধর্মের বিষয়ে সে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করে না বরং সে ইসলামের গুপ্ত শত্রু। খোদা তা'লা নিজের ধর্মকে তার দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করুন।

এই অবোধ এ বিষয়ে অজ্ঞ যে, খোদা যেখানে এ বিষয়টি নিজের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত রেখেছেন যে, তিনি শাস্তিমূলক ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোকে দোয়া, সদকা ও তওবা এবং এস্তেগফারের মাধ্যমে টলিয়ে দেন, একইভাবে মানুষকেও তিনি একই নৈতিক আদর্শ শিখিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ কুরআন ও হাদীস থেকে এটি প্রমাণিত যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে নিছক নোংরামিবশত যে ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল সেই ষড়যন্ত্রে কতক সরল সাহাবীও জড়িয়ে পড়েছিলেন। একজন সাহাবী ছিলেন যার সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) শাস্তিমূলক পদক্ষেপস্বরূপ কসম খেয়েছেন যে, আমি এই অসংগত কাজের শাস্তিস্বরূপ তাকে কখনো খাবার সরবরাহ করব না; তখন আয়াত–

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(আন-নূর: ২৩) অবতীর্ণ হয়। এ কারণে হযরত আবু বকর নিজের শপথ প্রত্যাহার করে নেন এবং খাবার সরবরাহ বহাল করেন। এ ভিত্তিতে ইসলামি নৈতিক শিক্ষার অন্তর্গত বিষয় হলো যদি শাস্তিস্বরূপ কোনো শপথ করা হয়, তা ভঙ্গ করা উত্তম চরিত্রের অন্তর্গত বিষয়। উদাহরণস্বরূপ কেউ নিজের সেবক সম্পর্কে এ মর্মে শপথ করলেও যে, আমি তাকে অবশ্যই পঞ্চাশবার জুতাপেটা করব, তার তওবা ও কাকুতিমিনতির কারণে ক্ষমা করা ইসলামী রীতি, যেন تخلق باخلاق الله পূর্ণ হয়; কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বৈধ নয়। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে জিজ্ঞাসাবাদ হবে, কিন্তু শাস্তিমূলক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য নয়।

তার আপত্তিঃ

আর ভবিষ্যদ্‌বাণীর অবস্থা এর চেয়েও শোচনীয়।

আমার উত্তরঃ

হে বিদ্বেষভাবাপন্ন নির্বোধ! তুমি আবার কখন আমার ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো মনোযোগ সহকারে দেখা ও সেগুলো সম্পর্কে অবগত হবার সুযোগ পেলে? তুমি আবার কখন আমার সাহচর্যে থাকা এবং আমার নিদর্শনাবলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছ? আমি কার সাথে তোমাকে তুলনা করব? তুমি সেই অন্ধের সাথে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রাখো– যে সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, কিন্তু নিজের অন্ধত্বের কথা ভাবে না। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি জানে, তোমার ঈমানের অবস্থা শোচনীয় নাকি আমার ভবিষ্যদ্‌বাণীর? বুদ্ধিমানের জন্য তোমার আপত্তির এ নমুনাই যথেষ্ট, যে কথা সব নবীর দৃষ্টিতে স্বীকৃত আর ইসলামের সকল দলের কাছে গৃহীত, সে কথাই তোমার দৃষ্টিতে আপত্তির কারণ। পরিতাপ! এরাই নাকি ইসলামের নেতা সাজতে চায়– যারা খোদার শিক্ষা ও ইসলামী ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কিছুই জানে না, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْن۔ ।

হে অন্যায় আপত্তিকারী! এ পুঁজি নিয়ে কলম হাতে নিয়েছ? জানি, তুমি বিদ্বেষে অন্ধ; কিন্তু নিজের অজ্ঞতা প্রকাশের তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। তোমার সব কথা ষোলো আনা মিথ্যা আর সব সন্দেহ শয়তানী কুমন্ত্রণা। জ্ঞান ও বুদ্ধির এ বহর নিয়ে তোমার হৃদয়ে খোদার পবিত্র ওহীর সম্পর্কে আপত্তি করার সুড়সুড়ি কেন জাগল? তুমি নীরব থাকলে ভালো হতো। অনর্থক পাপ করেছ আর মুখ খুলে নিজের অপ্রকাশিত অজ্ঞতা সম্পর্কে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছ এবং জনসমক্ষে নিজেকে ছোটো করেছ আর নিজের ক্ষেত্রে শেখ সাদী (রা.)-এর সেই পঙ্‌ক্তি সত্য করে দেখিয়েছ যা বুসতানে সংরক্ষিত আছে। তা হলো–

یکے نیک خلق و خَلَق پوش بود کہ در مصر یک چند خاموش بود

একজন সচ্চরিত্র ও সুপোশাকধারী ব্যক্তি ছিল,
যে মিশরে কিছুকাল নীরবেই বসবাস করত।

جہانے برو بود از صدق جمع چو پروانہ ہا وقتِ شب گرد شمع

অনেক লোক পুরো নিষ্ঠার সাথে তার পাশে সমবেত হতো,
যেভাবে রাতের বেলা পঙ্গপাল প্রদীপের চারপাশে সমবেত হয়।

شبے در دِل خویش اندیشہ کرد کہ پوشیدہ زیر زبان است مَرد

একরাতে নিজের সম্পর্কে তার হৃদয়ে এ ধারণা জাগে যে,
আমার নীরব ঠোঁটের অন্তরালে একজন (বিজ্ঞ) পুরুষ লুক্কায়িত আছে।

اگر ماند فطنت نہان در سرم چہ دانند مردم کہ دانش وَرم

আমার বুদ্ধিমত্তা যদি আমার মাথায় লুক্কায়িত থাকে,
তাহলে মানুষ কীভাবে বুঝবে যে, আমি একজন জ্ঞানী মানুষ!

سخن گفت و دشمن بدانست و دوست کہ درمصر ناداں‌تر از وے ہموست

সে কথা বলা শুরু করে আর শত্রুমিত্র জানতে পারে
যে, মিশরে তার চেয়ে বেশি অজ্ঞ আর কেউ নেই।

حضورش پریشاں شدد کارزشت سفر کرد و بر طاقِ مسجد نوشت

তার অনুসারীরা ছত্রভঙ্গ হয় আর তার সুনাম-সুখ্যাতি হারিয়ে যায়;
সে শহর থেকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু (যেতে যেতে) মসজিদ-তোরণে লিখে রেখে যায়–

در آئینہ گر روئے خود دیدمے بہ بیدانشی پردہ ندریدمے

আয়নায় যদি আমি আমার চেহারা দেখতাম
তাহলে আমি আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করতাম না।

এতক্ষণ আমি একরামুল্লাহ খান শাহজাহানপুরীর সেসব আপত্তির খণ্ডন উপস্থাপন করেছি যা দৈনিক পয়সা পত্রিকার ১৯০৫ সনের ২২ মে-র সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠায় ছেপেছে। কিন্তু এরপর আমার বন্ধু মৌলবি আব্দুল করীম সাহেবের নামে এক ব্যক্তি একটি বেনামী পত্র লিখেছে আর তাতে খোদার দোহাই দিয়ে কয়েকটি আপত্তির উত্তর চাওয়া হয়েছে যা সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী-সংক্রান্ত। যদিও সেসব আপত্তির বারাহীনের এ খণ্ডে পর্যাপ্ত উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু আপত্তিকারী যেহেতু খোদার দোহাই দিয়ে আবেদন করেছেন তাই আমরা কথার পুনরাবৃত্তির বিষয়টি উপেক্ষা করে নিছক খোদার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর আপত্তির সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছি।

তার প্রশ্নঃ

জনাব শ্রদ্ধেয় মির্যা সাহেব عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا۔ বাক্যটিকে নিজের ওহী ও এলহাম আখ্যায়িত করছেন অথচ সেটি অতীতের একজন কবির পঙ্‌ক্তি। প্রশ্ন হলো, কোনো নবীর প্রতি কি এমন ওহী অবতীর্ণ হয়েছে যার প্রতিটি অক্ষর নবীর পূর্বের কোনো ব্যক্তির মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে? যদি আপনি তা প্রমাণ করতে পারেন তাহলে দ্বিতীয় আপত্তি এটি দাঁড়াবে যে, তাহলে খোদার কথা ও বান্দার কথায় পার্থক্য কীভাবে নিরুপিত হবে?

আমার উত্তরঃ

এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেও লিখেছি যে, অন্য নবীদের সন্ধান করার কোনো প্রয়োজন নেই, স্বয়ং আমাদের নবী (সা.)-এর প্রতি খোদার এমন কিছু বাক্য ওহী হয়েছে যা ইতিপূর্বে কোনো মানুষের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। যেমন কুরআনে বিধৃত ওহী فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحۡسَنُ الۡخٰلِقِيۡنَ (আল-মুমিনূন: ১৫) বাক্যটি প্রথমে আবদুল্লাহ বিন আবি সারা-র মুখ থেকে বেরিয়েছিল আর সে বাক্যই কুরআনের ওহীতে অবতীর্ণ হয়। দ্রষ্টব্য তফসীরে কবীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৭৬, মিশর। মূল হাদীসটি হলো,

روى الكلبى عن ابن عباس رضى الله عنهما۔ ان عبدالله بن سعد بن ابى سرح كان يكتب هذه الاٰيات لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلما انتهى الى قوله تعالى خلقًا اٰخر عجب من ذالك فقال فتبارك الله احسن الخالقين۔ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اُكتب فهٰكذا نزلت، فشكّ عبد الله وقال ان كان محمد صادقًا فيما يقول فانه يوحٰى اِلَىَّ كما يوحٰى اليه وان كان كاذبًا فلا خير فى دينه فهرب الى مكّة فقيل انه مات على الكفر وقيل انه اسلم يوم الفتح۔

অনুবাদ হলো, কালবী ইবনে আব্বাসের বরাতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সারা কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ করত। অর্থাৎ কুরআনের আয়াত যখন অবতীর্ণ হতো মহানবী (সা.) তার হাতে লেখাতেন। যখন সে আয়াত লেখানো হয় যার শেষ শব্দ হলো 'খাল্‌কান আখার' তখন এ আয়াতের কারণে আবদুল্লাহ বিস্মিত হয়ে যায় আর সে বিস্ময়ের ঘোরে বলে, فتبارك الله احسن الخالقين মহানবী (সা.) বলেন, এটিই লিখে নাও কেননা খোদাও তোমার মুখ থেকে নিঃসৃত এ বাক্যই অর্থাৎ فتبارك الله احسن الخالقين অবতীর্ণ করেছেন। তখন

আবদুল্লাহর হৃদয়ে সন্দেহ জাগে যে, এটি কীভাবে হতে পারে যে, যা আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হলো তা খোদার উক্তি হয়ে গেল? সে বলে, যদি মুহাম্মদ (সা.) সত্য দাবিদার হয়ে থাকেন তাহলে আমার প্রতিও সেই ওহীই অবতীর্ণ হয় যা তাঁর প্রতি হয়ে থাকে, আর যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর ধর্মে কোনো কল্যাণ নেই। এরপর সে মক্কায় চলে যায়। সুতরাং এই রেওয়ায়েত অনুসারে সে অবিশ্বাস নিয়েই মারা যায় আর অপর রেওয়ায়েত অনুসারে সে মক্কা-বিজয়ের সময় পুনরায় মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

এখন দেখো! আবদুল্লাহ বিন আবি সারা-র উক্তির সাথে খোদার বাণীর (ঘটনাচক্রে) সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তার মুখ থেকেও বাক্য فتبارك الله احسن الخالقين নিঃসৃত হয় আর খোদার ওহীতেও তা-ই অবতীর্ণ হয়েছে। যদি বলো, খোদার ওহী ও মানুষের কথায় পার্থক্য কী হলো? তাহলে প্রধানত আমরা এর এই উত্তর দেই যা খোদা তা'লা কুরআন শরীফে দিয়েছেন।

এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করার জন্য আবশ্যক হলো, যে বাণী অন্য কারো বলে আখ্যায়িত হয় তা কুরআনের কোনো সূরার সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়, কেননা নিদর্শন গণ্য হবার জন্য ততটুকুকেই সঠিক (মাপকাঠি) মনে করা হয়েছে; যেমনটি কিনা আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ

[অর্থাৎ আর আমরা আমাদের বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তোমরা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহে থাকলে এর মতো একটি সূরা নিয়ে আসো। –অনুবাদক (আল-বাকারা: ২৪)] একথা বলেন নি যে, فَأْتُوا بِآيَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ (এর মতো কোনো আয়াত নিয়ে আসো। –অনুবাদক) অথবা فَأْتُوا بِكَلِمَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ (এর মতো কোনো শব্দ নিয়ে আসো। –অনুবাদক) আর সত্য কথা হলো বিচ্ছিন্নভাবে খোদার বাণীও তা-ই যা অবিশ্বাসীদের মুখ থেকেও নিঃসৃত হয়েছিল, কিন্তু বাক্যের সৌন্দর্য, ভাষার বিন্যাস এবং অন্যান্য অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যাবলির নিরিখে সেই বাণীই সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিদর্শনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। খোদার কর্মে যে নিদর্শন বিদ্যমান থাকে এর মহিমাও তদ্রূপ। অর্থাৎ তা-ও স্বীয় সার্বিক মর্যাদায় নিদর্শন যেভাবে তাঁর কথা নিজের সার্বিক মর্যাদায় নিদর্শন। অবশ্য খোদা তা'লার পবিত্র মুখ থেকে যে ছোটো ছোটো বাক্য নিঃসৃত হয় তা সেগুলোতে অন্তর্নিহিত মহান অর্থের দৃষ্টিকোণ

থেকে মানুষের বাক্য হতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র মর্যাদার হয়ে থাকে। মানুষ সেগুলোর গোপন তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটনে অক্ষম হলেও এতে সন্দেহ নেই যে, সেসবের ভেতর অবশ্যই প্রচ্ছন্ন জ্যোতি থাকে যা সেসব বাণীর প্রাণ হয়ে থাকে। যেমন বাক্য فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে সম্পর্কের কারণে নিজের মাঝে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রাখে। অর্থাৎ এমন আধ্যাত্মিক দর্শনে সেটি সমৃদ্ধ যে, তা নিজেই একটি নিদর্শন যার দৃষ্টান্ত মানবীয় কথায় দেখা যায় না।

একথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, যে সূরায় খোদা তা'লার আয়াত فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ রয়েছে, অর্থাৎ সূরা আল-মুমিনূন, এর প্রারম্ভে মানুষ কীভাবে ছয়টি স্তর অতিক্রম করে স্বীয় আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উৎকর্ষ সাধন করতে পারে তা বর্ণনা করেছেন, যা তার পূর্ণতার জন্য আবশ্যক। খোদা তা'লা উভয় প্রকার উন্নতিকে ছয় ছয়টি স্তরে বিভক্ত করেছেন আর ষষ্ঠ স্তরকে উন্নতির পরম মার্গ আখ্যায়িত করেছেন। আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উন্নতির এ সামঞ্জস্য এমন অসাধারণভাবে দেখিয়েছেন যে, মানব সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে কোনো মানবের চিন্তাচেতনা এর পূর্বে এ গুঢ়তত্ত্বকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় নি। যদি কেউ তা পূর্বে আবিষ্কৃত হবার দাবি করে তাহলে কোনো মানুষের গ্রন্থ হতে এ পবিত্র দর্শন প্রমাণ করে দেখানোর গুরুভার তার স্কন্ধে বর্তাবে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত সে আদৌ এমনটি করতে পারবে না। আধ্যাত্মিক ও দৈহিক অস্তিত্বের উন্নতির মাঝে যে গভীর সামঞ্জস্য ও মিল রয়েছে খোদা তা'লা তা প্রকাশ করে দিয়েছেন যা পূর্ণ ও উৎকর্ষ সত্তার স্তরে পৌঁছালে দেখা যায়। যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই দৈহিক ও আত্মিক সৃষ্টি এক হাত দ্বারাই সাধিত হয় আর তা হলো খোদার হাত– তাই নিঃসন্দেহে এটি নিদর্শন।

কোনো কোনো নির্বোধ এ আপত্তিও করেছিল যে, খোদা তা'লা শুক্রাণুর প্রারম্ভিক অবস্থা হতে আরম্ভ করে শেষ অবধি কুরআন করীমে যে চিত্র এঁকে দিয়েছেন, তা আধুনিক স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক নয়। তারা এ আয়াতগুলোর অর্থ এটি ধরে নিয়েছে যে, খোদা তা'লা যেন মাতৃজঠরে প্রথমে মানবদেহের একটি অঙ্গ বানান আর সেটি বানানো শেষ করার পর দ্বিতীয়টি বানান– কিন্তু এটি তাদের বুদ্ধিহীনতা। খোদার আয়াতের উদ্দেশ্য বা অর্থ কিন্তু এটি নয়, বরং যেভাবে আমরা স্বচক্ষে মাংস সদৃশ জমাট রক্তবিন্দু থেকে আরম্ভ করে সকল স্তরের শিশুকে দেখেছি। চিরসত্য স্রষ্টা

মাতৃজরায়ুতে বাইরের ও অভ্যন্তরীণ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে একই সময়ে সৃষ্টি করে থাকেন। একই সময়ে সবক'টি গঠিত হয় পূর্বে বা পরে নয়। অবশ্য এটি প্রমাণিত হয় যে, মানুষের পুরো অস্তিত্ব প্রথমে একটি জমাট রক্তবিন্দু হয়ে থাকে আর একসময় পুরো মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। এছাড়া একই সময়ে এর কিছু অংশ নিজ নিজ স্থানে হাড়ে পরিণত হয়। এরপর একই সময়ে পুরো সৃষ্ট মাংসে একটি অতিরিক্ত মাংসের আবরণ চড়ে যা পুরো দেহের চামড়া আখ্যায়িত হয় যার কল্যাণে সৌন্দর্য আসে। এ পর্যায়ে দৈহিক গঠন পূর্ণতা লাভ করে আর এরপর তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এগুলো হলো সেসব অবস্থা যা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

এখন নিম্নে আমরা ছয়টি আধ্যাত্মিক স্তরের কথা উল্লেখ করছি। আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

১)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

[মুমিনরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী। (আল-মুমিনূন: ২-৩) –অনুবাদক]

২)

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ

[আর যারা বৃথা বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (আল-মুমিনূন: ৪) –অনুবাদক]

৩)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ

[এবং যারা (নিয়মতান্ত্রিকভাবে) যাকাত প্রদানকারী, (আল-মুমিনূন: ৫) –অনুবাদক]

৪)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ

[অধিকন্তু যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের সুরক্ষাকারী, তবে তাদের স্ত্রী কিংবা যাদের ওপর তাদের মালিকানাস্বত্ব রয়েছে তাদের বিষয় ভিন্ন, এজন্য নিশ্চয় তারা তিরস্কৃত হবে না; কিন্তু যারা এর বাইরে কিছু কামনা করবে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী; (আল-মুমিনূন: ৬-৮) –অনুবাদক]

৫)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

[আর যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি যত্নবান, (আল-মুমিনূন: ৯) –অনুবাদক]

৬)

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

[এবং যারা নিজেদের নামাযের রক্ষণাবেক্ষণে সদা সোচ্চার, (আল-মুমিনূন: ১০) –অনুবাদক]

আর এসবের বিপরীতে দৈহিক উন্নতির স্তরও ছয়টি বলে আখ্যায়িত করেছেন যেমন তিনি এসব আয়াতের পর বলেন,

১)

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ

[এরপর আমরা তাকে বীর্যরূপে এক সুরক্ষিত অবস্থানস্থলে রাখলাম। (আল-মুমিনূন: ১৪) –অনুবাদক]

২)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

[এরপর আমরা এ বীর্যকে জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করলাম, (আল-মুমিনূন: ১৫) –অনুবাদক]

৩)

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

[অতঃপর এ জমাট রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে (অর্থাৎ মাংস সদৃশ জমাট রক্তে) পরিণত করলাম, (আল-মুমিনূন: ১৫) –অনুবাদক]

৪)

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا

[এরপর এ মাংসপিণ্ডকে অস্থিপুঞ্জ বানালাম, (আল-মুমিনূন: ১৫) –অনুবাদক]

৫)

فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا

[অতঃপর আমরা হাড়গোড়ে মাংস দ্বারা আবৃত করলাম, (আল-মুমিনূন: ১৫) –অনুবাদক]

৬)

ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

[এরপর সেটিকে আমরা এক নতুন সৃষ্টিরূপে বিকশিত করলাম। (আল-মুমিনূন: ১৫) –অনুবাদক]

যেমনটি ওপরে বর্ণনা করেছি যে, প্রথম আধ্যাত্মিক স্তর সেটি যা আয়াত–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

এ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেসব মুমিন সাফল্য লাভ করেছে যারা নিজেদের নামায ও খোদার স্মরণে বিনয়াবনত কাকুতিমিনতি করে আর বিগলিত চিত্তে ও মিনতির সাথে যিকরে এলাহী বা খোদার স্মরণে রত থাকে। এর বিপরীতে দৈহিক উন্নতির প্রথম স্তর যার কথা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো,

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ

অর্থাৎ এরপর আমরা মানুষকে শুক্রাণু বানিয়েছি আর সেই শুক্রাণু একটি সুরক্ষিত স্থানে রেখেছি। অতএব খোদা তা'লা আদমের জন্মের পর দৈহিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সৃষ্টির প্রথম স্তর শুক্রাণুকে আখ্যায়িত করেছেন। এটি জানা কথা যে, শুক্রাণু এমন এক বীজ যা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেসব শক্তিবৃত্তি, গুণাবলি এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল দৈহিক গঠন-গড়নের

সমাহার হয়ে থাকে যা পঞ্চম স্তরে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে যায় আর ষষ্ঠ স্তরে তা পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত* হয়, যদিও শুক্রাণুর পর্যায় বাকি সকল স্তর হতে বেশি ঝুঁকির ভেতর থাকে, কেননা এখনও সেটি সেই বীজতুল্য যা ভূমির সাথে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করে নি আর তখনও তা জরায়ুর আকর্ষণ হতে অংশ লাভ করে নি। গোপন অঙ্গে গিয়ে তা নষ্টও হয়ে যেতে পারে যেমনটি অনেক সময় শস্যবীজ পাথুরে ভূমিতে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া হতে পারে শুক্রাণু নিজেই খুঁতযুক্ত বা অপূর্ণ, অর্থাৎ তাতে কিছুটা ত্রুটি থাকে আর প্রবর্ধন বা বৃদ্ধিশক্তি থাকে না; অধিকন্তু জরায়ু যে একে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে সে যোগ্যতা রাখে না। অর্থাৎ এক লাশের মতো হয়ে থাকে যাতে কোনো প্রাণ থাকে না, ঠিক তেমনই যেভাবে একটি পচা বীজ ভূমিতে বপন করা হয়ে থাকে। জমি ভালো হওয়া সত্ত্বেও বীজ অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে অঙ্কুরিত হওয়া ও বৃদ্ধি পাবার মতো হয় না। অন্য কিছু বিপত্তিও থাকতে পারে যে কারণে শুক্রাণু জরায়ুর সাথে সম্পর্ক গড়তে সক্ষম হয় না আর জরায়ু তাকে নিজের আকর্ষণ হতে বঞ্চিত রাখে; যার বিশদ বিবরণ এখানে দেবার প্রয়োজন নেই। এটি এমনই যেভাবে বীজ অনেক সময় পায়ের তলায় পিষ্ট হয় বা পাখি তা খেয়ে ফেলে বা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এগুলোই মুমিনের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্য। মুমিনের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর সেই বিনয় ও ক্রন্দন এবং বিগলন-সজ্জিত অবস্থা যা নামায ও খোদার স্মরণে তার লাভ হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিগলন, কোমলতা, বিনয় ও নম্রতা এবং আত্মার বিনতি ও ব্যাকুলতা আর উৎকণ্ঠা এবং প্রেমের উষ্ণতা নিজের মাঝে সৃষ্টি করা। আর একটি ভীতিকর অবস্থা নিজের মাঝে সৃষ্টি করে মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদার দিকে মনকে

---

* **টীকাঃ** স্তর বা পর্যায় বলতে এখানে ঐসব ধাপ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর কথা কিছু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম স্তর হলো সেটি– যে পর্যায়ে মাতৃগর্ভে মহান স্রষ্টার পবিত্র ক্ষমতায় মানবদেহ পূর্ণরূপে গঠিত হয়ে যায় আর হাড়ে সুন্দরভাবে মাংস গজায়। আর ষষ্ঠ স্তর হলো সেটি– যে পর্যায়ে এই গঠিত দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, মানুষের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রথম ধাপ হলো নম্রতা, বিনয় আর বিগলিত কাকুতিমিনতি। আসলে, সেটিও সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেসব বিষয়ের সমাহার যেগুলো পরবর্তীতে মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তায় পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়। –লেখক

ঝুঁকানো, যেমনটি কিনা আয়াত–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ۔

-এ বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেসব মুমিন তাদের লক্ষ্য অর্জন করেছে যারা নিজেদের নামায এবং খোদাকে স্মরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিনত হয়ে কাতর প্রার্থনা জানায়। বিগলিত চিত্তে ও (খোদাপ্রেমের) তাপে আর উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠা এবং আন্তরিক উচ্ছ্বাস নিয়ে স্বীয় প্রভুর স্মরণে রত হয়। এই বিনয়াবনত অবস্থা, যার সংজ্ঞার দিকে পেছনে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা আধ্যাত্মিক সত্তার গঠনের যাত্রায় প্রথম পদক্ষেপ বা এভাবে বলতে পারো যে, (খোদা তা'লার) বন্দেগি বা দাসত্বের ভূমিতে বপিত এটি একটি প্রথম বীজ যা সামগ্রিকভাবে সেসব শক্তিবৃত্তি, গুণাবলি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সকল কারুকার্য ও অলংকরণ, রূপ-সৌন্দর্য, গঠন-গড়ন এবং সকল আত্মিক গুণাবলিসংবলিত হয়ে থাকে যা পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ স্তরে পূর্ণ মানবের জন্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় আর চিত্তাকর্ষকরূপে বিকশিত হয়।* আর যেহেতু তা শুক্রাণুর ন্যায় আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর হয়ে থাকে তাই কুরআনের আয়াতে এটিকে শুক্রাণুর মতো প্রথম স্তরে রাখা হয়েছে এবং শুক্রকীটের সাথে তুলনা করা

*** টীকা:** পঞ্চম স্তর বা পর্যায়, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি, সেই স্তর যা আয়াত–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

এ বর্ণনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ স্তর, যেমন আমরা আগেও বলেছি, তা সেই স্তর যা আয়াত–

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

এ উল্লেখ করা হয়েছে। এই পঞ্চম স্তরটি দৈহিক স্তরসমূহের পঞ্চম ধাপের বিপরীতে হয়ে থাকে,

فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا

যার দিকে আয়াত ইঙ্গিত করে। আর ষষ্ঠ স্তরটি দৈহিক স্তরসমূহের ষষ্ঠ ধাপের বিপরীতে, যার প্রতি এ আয়াত ইঙ্গিত করে–

ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ

–লেখক

হয়েছে, যাতে যারা কুরআন শরীফ নিয়ে চিন্তা ও প্রণিধান করে তারা বুঝতে পারে যে, নামাযে বিনয়ভাব আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের জন্য শুক্রাণুর ন্যায়, আর শুক্রকীটের ন্যায় আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণমানবের সমস্ত শক্তিবৃত্তি, গুণাবলি এবং কারুকার্য তাতে অন্তর্নিহিত থাকে। যেভাবে শুক্রাণু জরায়ুর সাথে সংযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ঝুঁকির ভেতর থাকে ঠিক সেভাবে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের এই প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ বিনয়-নম্রতার অবস্থা রহীম খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন না করা পর্যন্ত শঙ্কামুক্ত নয়। স্মরণ রাখা উচিত, কোনো কর্ম ছাড়াই যদি খোদার কোনো কল্যাণরাজি প্রকাশ পায় তাহলে তা রহমানিয়্যত গুণের কারণে হয়। উদাহরণস্বরূপ খোদা মানুষের জন্য যে স্বর্গ-মর্ত্য ইত্যাদি বানিয়েছেন বা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এসব কিছুই রহমানিয়্যতের কল্যাণে হয়েছে। কিন্তু যখন কোনো কল্যাণধারা কোনো কর্ম, ইবাদত ও চেষ্টা-সাধনার ফলে আসে তা রহীমিয়্যতের কল্যাণধারা আখ্যায়িত হয়। এটিই আদম সন্তানের জন্যও আল্লাহ তা'লার নিয়ম। সুতরাং যখন মানুষ নামায ও খোদার স্মরণে বিনয়ের সাথে আকুতি করে তখন সে নিজেকে রহীমিয়্যতরূপী কল্যাণধারা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে। সুতরাং শুক্রাণু ও আধ্যাত্মিক সত্তার প্রথম স্তর তথা বিনয়ের মাঝে একমাত্র পার্থক্য হলো শুক্রাণু জরায়ুর আকর্ষণের মুখাপেক্ষী থাকে আর এটি রহীম খোদার মুখাপেক্ষী থাকে। যেভাবে শুক্রাণুর জরায়ুর নিজের প্রতি আকর্ষণের পূর্বে নষ্ট হয়ে যাবার সমূহ আশঙ্কা থাকে, একইভাবে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর অর্থাৎ বিনয়, রহীম খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক মানুষ প্রাথমিক অবস্থায় নামাযে কাঁদে ও পরম ভালোবাসার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, চিৎকার করে আর খোদাপ্রেমে পাগলপারা হবার বিভিন্ন ভাবে সাক্ষর রাখে আর হরেক প্রকার প্রেমিকসুলভ ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু যেহেতু সেই কৃপার আধার-রহীম সত্তার সাথে তার কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় না আর তাঁর বিশেষ বিকাশের আকর্ষণে তাঁর প্রতি আকৃষ্টও হয় না তাই তাদের সমূহ দহন-বিগলন এবং সব বিনয়াবনত ভাব ভিত্তিহীন হয়ে থাকে। অনেক সময় তারা স্খলিত হয় এমনকি পূর্বের চেয়েও তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে থাকে। সুতরাং এটি এক আশ্চর্যজনক মজার সামঞ্জস্য। যেভাবে শুক্রাণু দৈহিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর আর যতক্ষণ পর্যন্ত মাতৃগর্ভের আকর্ষণ তার সাহায্যের জন্য না আসবে তা কিছুই নয়, একইভাবে বিনয়ও কাকুতিমিনতি রূহানী অস্তিত্বের প্রথম পর্যায়। যতদিন

রহীম খোদার আকর্ষণ তাকে সাহায্য-সহায়তা না দেবে সেই বিনয়াবনত অবস্থা অর্থহীন। এ কারণে সহস্র সহস্র এমন মানুষ দেখবে যারা জীবনের কোনো অংশে খোদার স্মরণ ও নামাযে বিনয়াবনত কাকুতিমিনতিকে উপভোগ করত আর খোদাপ্রেমে আত্মহারা হয়ে কাঁদত, এমন কোনো অভিশাপ এরপর তাদের গ্রাস করে যে, হঠাৎ করে অবাধ্য প্রবৃত্তির দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায় আর দুনিয়া ও জাগতিক কামনা বাসনার মোহে সেই পুরো অবস্থা হাতছাড়া করে বসে। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি অবস্থা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই বিনয় রহীমিয়্যতের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়। রহীম খোদার আকর্ষণ এতে কোনো প্রভাব বিস্তারের পূর্বেই সে অবস্থা হারিয়ে যায়। এই অবস্থাটি আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর যা সেই শুক্রাণুর সাথে সামঞ্জস্য রাখে যা জরায়ুর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুত আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর, যা হলো বিনয়, অপরদিকে দৈহিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর, যা কিনা শুক্রাণু, এ ক্ষেত্রে পরস্পর সামঞ্জস্য রাখে। অর্থাৎ দৈহিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর বা শুক্রাণু, গর্ভের আকর্ষণ ছাড়া অর্থহীন আর আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর বা বিনয়, রহীম খোদার আকর্ষণ ছাড়া তুচ্ছ। যেভাবে পৃথিবীতে সহস্র সহস্র শুক্রাণু ধ্বংস হয় আর বীর্যাবস্থাতেই নষ্ট হয়ে যায় এবং জরায়ুর সাথে সম্পৃক্ত হয় না, অনুরূপভাবে পৃথিবীতে সহস্র সহস্র বিনয় ও বিনম্রতার অবস্থা এমন রয়েছে যে, তা রহীম খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে ব্যর্থ হয় এবং নষ্ট হয়ে যায়। সহস্র সহস্র অজ্ঞ নিজেদের কয়েকদিনের বিনয়ভাব, উন্মত্ত আবেগ এবং ক্রন্দনে আনন্দিত হয়ে মনে করে যে, আমরা ওলী, কুতুব ও গওস হয়ে গিয়েছি আর আবদালদের (বিভিন্ন আধ্যাত্মিক স্তরের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছি এবং খোদাকে পেয়ে গিয়েছি। অথচ এখনও তা কিছুই নয়, শুধু একটি শুক্রবিন্দু। সবে মাত্র প্রভাত কুঁড়ি বা বসন্ত কুঁড়ি। পরিতাপ! এসব খামখেয়ালির কারণে এক বিশাল জনগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে গেছে। স্মরণ রাখা উচিত যে, এই আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রথম স্তর, যা হলো বিনয়, বিভিন্ন কারণে নষ্ট হতে পারে যেমনটি কিনা শুক্রাণু বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনার কারণে নষ্ট হতে পারে যা দৈহিক (অস্তিত্বের) স্তরগুলোর প্রথম স্তর। মোটকথা, সেগুলোর ব্যক্তিগত দুর্বলতাও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সেই বিনয় ও কাকুতির মাঝে কোনো শিরকের বা কোনো বিদাতের অথবা বৃথাচারের সংমিশ্রণ থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা বা নোংরা চিন্তাধারা মাথাচাড়া

দিচ্ছে অথবা হীন সম্পর্কগুলো হৃদয়কে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে বা লাশরূপী জগতের বৃথা চাওয়া পাওয়া আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। সুতরাং এই সমস্ত অপবিত্র বাধাবিপত্তির মুখে খুশূ বা বিনয়াবনত কাকুতি এই যোগ্যতা রাখে না যে, রহীম খোদা এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবেন যেমনটি কিনা সেই শুক্রাণুর সাথে জরায়ু সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না যা নিজের ভেতর কোনো প্রকার দুর্বলতা রাখে। এ কারণেই হিন্দু সন্ন্যাসীদের বিনয় ও ক্রন্দন আর খ্রিষ্টান পাদরিদের বিনয় তাদের কোনো উপকারে আসে না। তারা নিদারুণ মর্মজ্বালায় ভুগে নিজেদের যদি অস্থিচর্মসারও বানিয়ে ফেলে তবুও রহীম খোদা তাদের সাথে সম্পর্ক গড়েন না, কেননা তাদের বিনয় ও আহাজারির মাঝে ব্যক্তিগত একটি ত্রুটি নিহিত আছে। একইভাবে সেসব নূতন রীতি উদ্ভাবনকারী মুসলমান ফকির যারা কুরআন শরীফের অনুসরণ পরিত্যাগ করে সহস্র সহস্র বিদাতে লিপ্ত হয়ে যায়, এমনকি ভাং, গাঁজা ও মদ ইত্যাদি পান করতেও লজ্জা বোধ করে না এবং অন্যান্য পাপাচার ও কদাচার তাদের জন্য মাতৃদুগ্ধের ন্যায় হয়ে থাকে। অধিকন্তু তাদের বাস্তব অবস্থা যেহেতু রহীম খোদা ও তাঁর সাথে সম্পর্কের পরিপন্থি হয়ে থাকে, বরং রহীম খোদার দৃষ্টিতে সেসব অবস্থা অপছন্দনীয় হয়ে থাকে তাই তারা নিজস্ব ধরনের প্রেমাতিশয্য, নৃত্য ও কবিতা পাঠ আর সঙ্গীত ইত্যাদি গাওয়া সত্ত্বেও রহীম খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কঠিন হতভাগাই রয়ে যায় আর সেই শুক্রাণুর ন্যায় হয়ে থাকে যা গনেরিয়া বা সিফিলিস ব্যাধির কারণে জ্বলে যায় আর এ যোগ্যতা রাখে না যে, জরায়ুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। সুতরাং রেহেম ও রহীম (তথা গর্ভাশয় ও রহীম)-এর সাথে সম্পর্ক বা সম্পর্কহীনতার ভিত্তি এক এবং অভিন্ন, পার্থক্য কেবল দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক দুর্বলতার নিরিখে। শুক্রাণু যেভাবে কতিপয় অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে রেহেম বা গর্ভাশয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা রাখে না এবং সেটিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার সামর্থ্য রাখে না, একইভাবে বিনয়– যা শুক্রাণুর স্তরে থাকে, অভ্যন্তরীণ কতক ব্যাধি যেমন অহংকার, আত্মশ্লাঘা ও লোক-দেখানো বা কোনো ধরনের ভ্রষ্টতা অথবা শিরক ইত্যাদির কারণে এই যোগ্যতা রাখে না যে, রহীম খোদার সাথে সম্পর্ক রাখবেন। সুতরাং যেভাবে বিনয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মর্যাদার প্রথম স্তরের সকল শ্রেষ্ঠত্ব রহীম খোদার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপনের মাঝে নিহিত সেভাবেই শুক্রাণুর শ্রেষ্ঠত্ব গর্ভাশয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ওপর নির্ভর

করে। অতএব বিনয়ের এই অবস্থার যদি সেই রহীম খোদার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক না থাকে আর প্রকৃত সম্পর্ক হওয়া সম্ভব না হয়; এমন ক্ষেত্রে ওই অবস্থা সেই অপবিত্র শুক্রবীর্যের ন্যায় যার গর্ভাশয়ের সাথে প্রকৃত সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। স্মরণ রাখা উচিত, নামায এবং খোদার স্মরণে কখনো কখনো মানুষের যে বিনম্রতা ও কাকুতিমিনতির সুযোগ হয় আর আধ্যাত্মিক তৃপ্তি এবং আনন্দ অনুভূত হয় এটি একথার প্রমাণ নয় যে, সে ব্যক্তির রহীম খোদার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যেমন শুক্রাণুর গোপন অঙ্গে প্রবেশ করা আর আনন্দ অনুভূত হবার অর্থ এটি করা হয় না যে, সেই শুক্রাণুর গর্ভাশয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে, বরং সম্পর্কের প্রভাব ও লক্ষণ ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং খোদার স্মরণে আনন্দ ও স্বাদ পাওয়া, যাকে অন্য ভাষায় খুশূ-র অবস্থা বলা হয় তা শুক্রাণুর সেই অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যখন তা বীর্যক্ষরণের মাধ্যমে গোপন অঙ্গে প্রবেশ করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দৈহিক জগতে তা পরম আনন্দের মুহূর্ত হয়ে থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই শুক্রবিন্দুর ভেতরে পতিত হওয়া এই বিষয়টির নিশ্চয়তা নয় যে, গর্ভাশয়ের সেই শুক্রাণুর সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং তা গর্ভাশয়ের দিকে আকৃষ্ট হবে। একইভাবে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি ও আনন্দ এবং বিনয় ও কাকুতি এই নিশ্চয়তা বহন করে না যে, রহীম খোদার সাথে এমন ব্যক্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং তাঁর প্রতি সে আকৃষ্ট হবে, বরং এটি তেমনই যেভাবে অবৈধ পন্থায় শুক্রাণু কোনো পতিতার গোপন অঙ্গে প্রবেশ করে আর তাতেও শুক্রাণুদাতা একই আনন্দ পায় যেমনটি নিজের স্ত্রীর সাথে হয়ে থাকে (কিন্তু এ দুটি বিষয় সমান নয় –অনুবাদক)। অতএব মূর্তিপূজারি ও সৃষ্টিপূজারিদের বিনয়, কাকুতিমিনতি ও সুখানুভূতি হয়ে থাকে পতিতাদের আনন্দের ন্যায়। অর্থাৎ মুশরিক এবং নিছক জাগতিক উদ্দেশ্যে যারা খোদাকে স্মরণ করে তাদের বিনয়ভাব ও নত হওয়া সেই শুক্রাণুর সাথে সামঞ্জস্য রাখে যা অবৈধকর্মে অভ্যস্ত নারীদের গোপন অঙ্গে গিয়ে আনন্দের কারণ হয়। তাই যেভাবে শুক্রাণুতে সম্পর্ক স্থাপনের সামর্থ্য আছে ঠিক সেভাবেই বিনয় ও কাকুতিমিনতির মাঝেও সম্পর্ক স্থাপনের সামর্থ্য আছে, কিন্তু নিছক বিনয় ও কাকুতিমিনতি আর প্রেমানল একথার প্রমাণ নয় যে, সেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। যেভাবে শুক্রাণুর ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক স্তরের বিপরীতে মানুষের পর্যবেক্ষণ প্রকাশ ও প্রমাণ করছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম

করে আর বীর্য মহিলার গোপন অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সে তাতে পরম আনন্দও লাভ করে; কিন্তু সেই আনন্দ একথার প্রমাণ বহন করবে না যে, অবশ্যই সে অন্তঃসত্তা হয়েছে। একইভাবে বিনয় এবং দহন-রোদন আর বিগলন যতই আনন্দদায়ক হোক না কেন তা খোদার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবার কোনো আবশ্যকীয় লক্ষণ নয়।* অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির মাঝে নামায ও খোদার স্মরণে বিনয় ও দহন-রোদন, মন বিগলিত হওয়া ও আহাজারি আবশ্যকীয়ভাবে একথার প্রমাণ বহন করে না যে, খোদার সাথে সে ব্যক্তির সম্পর্ক রয়েছে। এ সমস্ত অবস্থা কোনো ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এমনও হতে পারে, তার খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। যেভাবে অভিজ্ঞতা একথার স্পষ্ট সাক্ষী যে, অনেক মানুষ উপদেশ-নসীহতের বৈঠক আর ওয়ায-মাহফিল ও স্মরণসভায় অথবা নামায ও খোদাকে স্মরণরত অবস্থায় খুব কাঁদে, আর আবেগে আপ্লুত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে, চিৎকার করে ও গভীর বিগলন প্রকাশ করে। আর অশ্রু তাদের গাল বেয়ে পানির ন্যায় গড়িয়ে পড়ে, বরং অনেকের অশ্রুধারা বন্ধই হয় না এবং একটি কথা শুনে সেখানেই কেঁদে ফেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃথা কার্যকলাপ হতে সে বিরত থাকে না আর অনেক বৃথা কাজ, বাজে কথাবার্তা ও অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ ও বিনোদন তাদের গলার হার হিসেবে বিরাজ করে। এটি থেকে প্রতিভাত হয় যে, খোদার সাথে তাদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই আর খোদার মাহাত্ম্য ও ভয় তাদের হৃদয়ে আদৌ নেই। সুতরাং এটি একটি আশ্চর্যজনক বিষয় যে, এমন নোংরা

---

* **টীকা:** প্রাথমিক পর্যায়ে বিনয়, নম্রতা ও হৃদয়ের কোমলতার সাথে সকল প্রকার বাজে কার্যকলাপও যুক্ত থাকতে পারে। যেমন- একটি শিশুর মাঝে অনেক বেশি কান্নাকাটির অভ্যাস থাকে, অল্পতেই ভয় পেয়ে যায় আবার সহজেই বিনয় ও নমনীয়তা প্রকাশ করে। এসব সত্ত্বেও, শৈশবকালে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই নানা ধরনের নিরর্থক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমে তার আকর্ষণ থাকে নিরর্থক কথা ও কাজে। প্রায় সময় বাজে কার্যকলাপ, অনর্থক লাফঝাঁপ বা অপ্রয়োজনীয় খেলাধুলা তার ভাল লাগে যার মাধ্যমে অনেক সময় নিজের শরীরকেও সে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মানুষের জীবন চলার পথে প্রথমে সে সম্মুখীন হয় অনর্থকতার। এই ধাপ না পেরিয়ে সে জীবনের পরবর্তী স্তরে পৌঁছাতেই পারে না। অতএব পরিপক্কতার প্রথম সিঁড়ি হলো শৈশবের অনর্থক অভ্যাসগুলো থেকে বিরত থাকা। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মানবপ্রকৃতির সর্বপ্রথম সম্পর্ক গড়ে ওঠে অনর্থক বিষয়াবলির সঙ্গে। –লেখক

লোকদের মাঝেও বিনয় এবং হৃদয়ের উত্তাপ ও বিগলনের সমাহার দেখা যায়। এটি শিক্ষণীয় বিষয় আর এটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৃথাচার পরিত্যাগ না করে শুধু বিনয় ও ক্রন্দন কোনো গর্বের কারণ নয় আর এটি খোদার নৈকট্য ও খোদার সাথে সম্পর্কের কোনো লক্ষণ নয়। আমি নিজের চোখে এমন অনেক ফকির দেখেছি একইভাবে কিছু অন্য লোকও দেখা গেছে যে, কোনো বেদনাদায়ক পঙ্‌ক্তি পাঠ করলে বা কোনো মর্মস্পর্শী কাহিনি শুনলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের অশ্রু ঝরতে থাকে, যেমনটি কিনা রাতের বেলা কোনো মেঘখণ্ড হতে এত দ্রুত বড়ো বড়ো পানির ফোঁটা বর্ষিত হয় যে, বাইরে যারা ঘুমায় তাদের শুকনো বিছানা নিয়ে ঘরে যাবার সময় দেয় না। কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অধিকাংশ এমন লোককে আমি বড়ো দুরভিসন্ধিবাজ, বরং জগৎপূজারিদের চেয়েও অধম পেয়েছি। কতককে আমি এমন নোংরা প্রকৃতির অধিকারী, অসৎ এবং সকল অর্থে দুর্বৃত্ত পেয়েছি যে, তাদের ক্রন্দন ও কাকুতিমিনতি এবং বিনয়ের অভ্যাস দেখে, কোনো বৈঠকে এমন বিগলিত ভাব ও আহাজারি প্রকাশ করার প্রতি আমার ঘৃণা হয়। এটি সত্য যে, কোনো যুগে এটি অবশ্যই পুণ্যবানদের লক্ষণ ছিল, কিন্তু এখন এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতারক ও ঠগবাজদের রীতি হয়ে গেছে। সবুজ কাপড়, মাথায় লম্বা চুল, হাতে তসবীহ দানা, চোখ থেকে কথায় কথায় অশ্রুপাত, জিহ্বার কিছুটা নড়াচড়া, যেন মুখে সবসময় যিকরে এলাহী চলছে আবার একই সাথে কুপ্রথার পেছনে চলা! এরা নিজেদের ফকিরী ভাব জাহির করার মানসে এসব ভাবভঙ্গিমা প্রকাশ করে, কিন্তু বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের কুণ্ঠ কবলিত হৃদয় খোদার ভালোবাসা হতে সম্পূর্ণভাবে রিক্তহস্ত। অবশ্য পুণ্যবান লোক আমার এ লেখার অর্ন্তভুক্ত নয়– যাদের সকল কথা ও আবেগ-উচ্ছ্বাস তাদের জীবনের বাস্তব চিত্র হয়ে থাকে, কৃত্রিমতার বশেও নয় আর কেবল বুলিসর্বস্ব নয়। যাহোক, এটি প্রমাণিত বিষয় যে, ক্রন্দন ও কাকুতিমিনতি পুণ্যবান হবার বিশেষ কোনো লক্ষণ নয়, বরং এটিও মানুষের মাঝে অন্তর্নিহিত একটি শক্তি যা যুগপৎ স্থানে-অস্থানে সক্রিয় হয়ে যায়। অনেক সময় মানুষ একটি কাল্পনিক কাহিনি পড়ে আর জানে যে, এটি কাল্পনিক ও উপন্যাস শ্রেণির একটি বই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন এর একটি মর্মস্পর্শী স্থানে পৌঁছে তখন তার হৃদয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় আর অবলীলায় অশ্রু বইতে থাকে যা থামে না। এমন বেদনাদায়ক কাহিনি এতটা

প্রভাববিস্তারী হয়ে থাকে যে, অনেক সময় মানুষ নিজেই একটি হৃদয়বিদারক কাহিনি বর্ণনা করা আরম্ভ করে দেয় আর বর্ণনার ধারাবাহিকতায় যখন এর একটি বেদনাদায়ক স্থানে পৌঁছে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় আর তাঁর কণ্ঠও ক্রন্দনরত ব্যক্তির কণ্ঠতুল্য হয়ে যায় আর অবশেষে সে ডুকরে কেঁদে ওঠে এবং কান্নার মাঝে যে একপ্রকার আনন্দ ও স্বাদ রয়েছে তা তার লাভ হয়ে যায়। সে ভালোভাবে জানে, যে কারণে সে কাঁদছে সেটির ভিত্তিই ভ্রান্ত আর তা একটি কল্পনানির্ভর গল্প। অতএব কেন আর কী কারণে এমনটি হয়ে থাকে? এর কারণ হলো বিগলিত হৃদয়ে ক্রন্দনের যে শক্তি মানুষের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে সেটির কোনো ঘটনার সঠিক বা ভ্রান্ত হবার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, বরং যখন এমন কারণ সামনে আসে যা তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্দীপ্ত করার সামর্থ্য রাখে তখন অবলীলায় ও অনিচ্ছায় সেই বিগলিত ক্রন্দনশক্তি সক্রিয় হয়ে যায় আর এমন মানুষ একপ্রকার আনন্দ পায়, সে মুমিন হোক বা কাফিরই হোক না কেন। এ কারণেই শরীয়ত পরিপন্থি বৈঠকেও, যা বিভিন্ন প্রকার বিদাতে পূর্ণ থাকে, বাছবিচারের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন লোকেরা, যারা ফকিরের বেশ ধারণ করে রাখে, তারা বিভিন্ন প্রকার ছন্দযুক্ত লাইন ও কবিতা ইত্যাদি শোনা ও সুরের লহরিতে প্রভাবিত হয়ে উন্মত্ত ভাব নিয়ে নাচতে আরম্ভ করে দেয় এবং নিজেদের মতো করে উপভোগ করে আর মনে করে আমরা খোদা পেয়ে গিয়েছি। কিন্তু এ আনন্দ সেই আনন্দের সাথে সাদৃশ্য রাখে যা একজন অবৈধ পতিতার মাধ্যমে ব্যভিচারী মানুষের লাভ হয়।

এরপর বিনম্র কাকুতি ও শুক্রাণুর মাঝে আরো একটি সাদৃশ্য রয়েছে আর তা হলো, যখন কোনো ব্যক্তির শুক্রাণু তার স্ত্রী বা অন্য কোনো মহিলার ভেতর প্রবেশ করে তখন সেই শুক্রাণুর জরায়ুতে প্রবেশ করা বীর্যপাতের আদলে প্রবাহিত হওয়া, একান্ত ক্রন্দনের সাথে সাদৃশ্য রাখে কেননা বিনম্রতার ফলাফলও ক্রন্দনই হয়ে থাকে। যেভাবে শুক্রাণু অবলীলায় উথলে ওঠে বীর্যপাতের রূপধারণ করে থাকে, চূড়ান্ত বিনয় ও বিগলনের সময় ক্রন্দনের অবস্থাও একই হয়ে থাকে, কেননা ক্রন্দন চোখ থেকে উথলে ওঠে। যেভাবে বীর্যপাতের আনন্দ কখনো বৈধভাবে হয়ে থাকে যখন মানুষ নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করে আর কখনো অবৈধভাবে যখন মানুষ কোনো পতিতার সাথে সহবাস করে থাকে। বিনয় ও দহন এবং রোদন ও ক্রন্দনের অবস্থাও তা-ই, অর্থাৎ কখনো কখনো কাকুতি ও বিনয় আর হৃদয়ের দহন ও রোদন

সম্পূর্ণভাবে এক অদ্বিতীয় খোদার জন্য হয়ে থাকে যার সাথে কোনো বিদাত ও শিরকের মিশ্রণ থাকে না। সুতরাং দহন ও রোদনের সেই আনন্দ এক বৈধ আনন্দ হয়ে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো খুশূ বা আধ্যাত্মিক বিনয় এবং দহন-রোদনের আনন্দ বিদাতী কার্যকলাপ বা সৃষ্টিপূজা, প্রতিমা এবং দেবদেবীর পূজায়ও অর্জন হয়, কিন্তু সেই স্বাদ ও আনন্দ হয়ে থাকে অবৈধ সহবাসের মতো। এককথায় বিনয়ভাব, দহন-বিগলন বা দহন-রোদনের আনন্দ শুধু খোদার সাথে সম্পর্কেরই ফলাফল হবে– তা আবশ্যক নয়; বরং যেভাবে অনেক শুক্রাণু নষ্ট হয়ে যায় আর জরায়ু সেগুলোকে গ্রহণ করে না, একইভাবে অনেক বিনয়-মিনতি ও আহাজারি কেবল চোখ হারানো ছাড়া কিছু নয়; দয়ালু খোদা তা গ্রহণ করেন না। বস্তুত ঐকান্তিক বিনয়, যা আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর, এর দৈহিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর অর্থাৎ শুক্রাণুর অবস্থার সাথে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে যা আমরা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছি। আর এই সামঞ্জস্য কোনো সামান্য বিষয় নয়, বরং আদি স্রষ্টার বিশেষ ইচ্ছায় সে দুটোর মাঝে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এমনকি খোদার কিতাবেও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, পরজগতেও এ উভয় প্রকার আনন্দ বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু সাদৃশ্য এতটা বেড়ে যাবে যে, দুটি একাকার হয়ে যাবে। অর্থাৎ পরকালে যখন এক ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবে বা সহবাস করবে তখন সে পার্থক্য করতে পারবে না যে, সে কি স্ত্রীকে ভালোবাসছে, তার সাথে মিলিত হচ্ছে নাকি খোদাপ্রেমের অকূল সমুদ্রে নিমজ্জিত। যারা খোদাকে পেয়ে যায় এ জগতেই তাদের ওপর এ অবস্থা বিরাজ করে যা জগৎপূজারি ও (আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে) পর্দায় আচ্ছন্ন লোকদের জন্য একটি দুর্বোধ্য বিষয়।

এ পর্যায়ে আমরা এটি বর্ণনা করা শেষ করলাম যে, আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর যা বিনয় ও কাকুতিমিনতির অবস্থা, দৈহিক অস্তিত্বের প্রথম স্তরের সাথে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য রাখে, যা হলো শুক্রাণু। এরপর এটি বর্ণনা করা আবশ্যক যে, আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের দ্বিতীয় স্তরও দৈহিক অস্তিত্বের দ্বিতীয় স্তরের সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য রাখে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের দ্বিতীয় স্তর সেটিই যা আয়াত وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (আল-মুমিনূন: ৪)-এ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মুমিন সে– যে বৃথা কথা, বৃথা কার্যকলাপ, বাজে চালচলন, বাজে বৈঠক ও অসৎ সঙ্গ এবং বাজে সম্পর্ক হতে পৃথক হয়ে যায়। এর বিপরীতে দৈহিক অস্তিত্বের

দ্বিতীয় স্তরকে আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রিয় গ্রন্থে আলাকা নাম দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً (আল-মুমিনূন: ১৫) অর্থাৎ এরপর আমরা শুক্রাণুকে আলাকা বানিয়েছি। অর্থাৎ আমরা সেটিকে অনর্থক নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে গর্ভাশয়ের কল্যাণে ও এর সাথে সম্পর্কের সুবাদে আলাকা বানিয়েছি। এর পূর্বে তা ঝুঁকির মাঝে ছিল আর জানা ছিল না যে, তা মানুষের অস্তিত্বে রূপ নেবে নাকি নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তা গর্ভাশয়ের সাথে সম্পর্কের কারণে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে আর এতে এক পরিবর্তন এসে গেছে যা পূর্বে ছিল না। অর্থাৎ সেটি জমাট রক্তের রূপধারণ করেছে। গঠন কিছুটা শক্ত হয়ে গেছে আর গর্ভাশয়ের সাথে একটি সম্পর্ক রচিত হয়েছে যে কারণে এর নাম আলাকা রাখা হয়েছে আর এমন নারী অন্তঃসত্ত্বা আখ্যায়িত হবার যোগ্য হয়ে গেছে। এ সম্পর্কের কারণে গর্ভাশয় তার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে গেছে আর এর ছায়ায় শুক্রাণুর উন্নতি হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়, কিন্তু এ অবস্থায় শুক্রাণু খুব একটা পবিত্রতা অর্জন করে নি, কেবল একটি জমাট রক্তবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এবং গর্ভাশয়ের সাথে সম্পর্কের কারণে নষ্ট হওয়া হতে রক্ষা পেল। যেভাবে ও যে-রূপে শুক্রাণু অন্যান্য ক্ষেত্রে বাজেভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে এবং বিশ্রিভাবে ভেতর থেকে বেরিয়ে কাপড় নষ্ট করে– এখন এই সম্পর্কের সুবাদে নষ্ট হওয়া থেকে সুরক্ষিত হয়ে গেল। কিন্তু এখনও তা কেবল জমাট রক্ত যা সূক্ষ্ম অপবিত্রতা হতে পরিত্রাণ পায় নি বা পবিত্রতা লাভ করে নি। গর্ভাশয়ের সাথে যদি এর এ সম্পর্ক স্থাপিত না হতো তাহলে তা গোপন অঙ্গে প্রবেশ করেও গর্ভাশয়ে ঠাঁই পেত না এবং বাহিরে বেরিয়ে আসত কিন্তু গর্ভাশয় সুচারুরূপে ও সুপরিকল্পিত বিশেষ আকর্ষণ শক্তি দ্বারা সেটিকে দৃঢ়তা দান করেছে এবং জমাট রক্তের রূপ দিয়েছে। যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি, এ সম্পর্কের কারণে সেটি আলাকা আখ্যায়িত হয়েছে। এর পূর্বে গর্ভাশয় এর ওপর নিজের তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করে নি। কিন্তু এ প্রভাব এটিকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করেছে আর এ কারণে শুক্রাণুর ন্যায় এতে তারল্য অবশিষ্ট থাকে নি। অর্থাৎ এর গঠন পাতলা ও দুর্বল থাকে নি, বরং কিছুটা গাঢ় রূপধারণ করেছে।

দৈহিক অস্তিত্বের দ্বিতীয় স্তর এই আলাকা (বা জমাট রক্ত)-এর বিপরীতে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের দ্বিতীয় স্তর যার কথা এখনই আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি আর যার দিকে পবিত্র কুরআনের আয়াত وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ইঙ্গিত

করে। অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত মুমিন তারা যারা বৃথা কার্যকলাপ ও অনর্থক কথাবার্তা, বাজে আচরণ, বাজে বৈঠক, অসৎ সঙ্গ, অসৎ সম্পর্ক ও অন্যায় রাগ-ক্রোধ এড়িয়ে চলে। তাদের ঈমান এমন পর্যায়ের হয়ে থাকে যে, এসব থেকে দূরে থাকা তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। কেননা ঈমানের উন্নতির কারণে রহীম খোদার সাথে তাদের কিছুটা সম্পর্ক হয়ে যায় যেমনটি আলাকার স্তরে গর্ভাশয়ের সাথে শুক্রাণুর কিছুটা সম্পর্ক স্থাপিত হলে তা পড়ে যাওয়া বা বয়ে যাওয়া বা অন্য কোনোভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে যায়– তবে সামান্য ব্যতিক্রমের কথা ভিন্ন। সুতরাং আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের এই দ্বিতীয় স্তরে দয়ালু খোদার সাথে সম্পর্ক অবিকল সেই সম্পর্কের অনুরূপ হয়ে থাকে যা দৈহিক অস্তিত্বের দ্বিতীয় স্তরে গর্ভাশয়ের সাথে আলাকা-র হয়ে থাকে। যেভাবে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের দ্বিতীয় স্তর প্রকাশিত হবার পূর্বে অসার সম্পর্ক ও বাজে কার্যকলাপ হতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হয়ে থাকে আর কেবল আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর অর্থাৎ বিনয় ও কাকুতি-মিনতির অবস্থা প্রায়শ বৃথা প্রমাণিত হয় আর পরিণাম অশুভ হয়ে থাকে একইভাবে শুক্রাণু, যা দৈহিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর, তা আলাকা বা জমাট রক্তে পরিণত হবার পূর্বে অনেক সময় শত শত বার অজানা কারণে নষ্ট হয়ে যায়। এরপর যখন সেটিকে অসময়ে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য খোদার ইচ্ছা হয় তখন তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি সাপেক্ষে সেই শুক্রাণু গর্ভাশয়ে আলাকা বা জমাট রক্তে রূপ নেয় আর সেটি দৈহিক অস্তিত্বের দ্বিতীয় স্তর আখ্যা পায়। বস্তুত আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের দ্বিতীয় স্তর, যা হলো সকল অনর্থক কার্যকলাপ ও বাজে সম্পর্ক এড়িয়ে চলা এবং অনর্থক ক্রোধ ও আবেগ-উচ্ছ্বাস হতে বিরত থাকা, এ মর্যাদাও তখন লাভ হয় যখন রহীম খোদার সাথে মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কেননা এই সম্পর্ক সৃষ্টি হবার মাঝেই শক্তি ও ক্ষমতা নিহিত থাকে যা অন্যান্য সম্পর্ক ছিন্ন করে আর ব্যর্থ হওয়া থেকে রক্ষা করে। যদিও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রথম স্তরে মানুষের নামাযে বিনয় ও আহাজারির সুযোগ লাভ হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই বিনয় অসার কথা, বাজে কাজ ও অনর্থক রাগ এবং ক্রোধ হতে বিরত রাখতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার সাথে সেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয় যা আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের দ্বিতীয় স্তরে নিহিত। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, এক ব্যক্তি দৈনিক তার স্ত্রীর সাথে বেশ কয়েকবার সঙ্গম করলেও সে শুক্রাণুকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে না যতক্ষণ না গর্ভাশয়ের সাথে শুক্রাণুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতএব খোদা তা'লা বলেন, وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ -এর অর্থ হলো, তারাই মুমিন– যারা বৃথা সম্পর্ক হতে নিজেদের দূরে রাখে। অসার কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা খোদার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কারণ হয়।* অর্থাৎ বৃথা বিষয়াদি হতে হৃদয়কে মুক্ত করা খোদাকে হৃদয়ে স্থান দেবার নামান্তর, কেননা মানুষকে স্থায়ীভাবে ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সহজাতভাবে তার হৃদয়ে খোদার ভালোবাসা বিদ্যমান রয়েছে আর এ কারণেই খোদার সাথে তার হৃদয়ের একটি স্থায়ী সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে যেমনটি কিনা আয়াত اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى (আল-আরাফ: ১৭৩) হতে স্পষ্ট। রহীমিয়্যতের প্রতিফলনস্থল হয়ে, অর্থাৎ ইবাদতের মাধ্যমে খোদার সাথে মানুষের যেই সম্পর্ক স্থাপিত হয় সেই সম্পর্কের প্রথম স্তর হলো খোদার সত্তায় ঈমান এনে সকল অসার কথা, বৃথা কার্যকলাপ ও অসার বৈঠক, বাজে চলাফেরা, বাজে সম্পর্ক ও অনর্থক ক্রোধ ও উত্তেজনা হতে বিরত থাকা। সেটি সেই চিরস্থায়ী সম্পর্ককে সুপ্তশক্তি

*** টীকা:** নিরর্থক বিষয়ে জড়ানো থেকে নিজেকে পৃথক রাখা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার কারণ হিসেবে কাজ করে, কেননা আল্লাহ তা'লা এই আয়াগুলোতে আফলাহা শব্দ ব্যবহার করে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, যে ব্যক্তি খোদার সন্ধানে কোনো কাজ করে সে তার পরিশ্রমের মান এবং প্রচেষ্টার মাত্রা অনুযায়ী খোদাকে পাবে এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়বে। অতএব যে ব্যক্তি খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নিরর্থক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে, اَفْلَحَ শব্দে নিহিত প্রতিশ্রুতি অনুসারে খোদার সাথে তার একটি হালকা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কারণ সে যে কাজটি করেছে তা কোনো বড়ো কাজ নয়, সে শুধুমাত্র অনর্থক কার্যকলাপের সাথে যে হালকা সম্পর্ক রাখত তা ছেড়ে দিয়েছে। স্মরণ রাখা উচিত, যেমন اَفْلَحَ শব্দটি প্রথম আয়াত অর্থাৎ আয়াত–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

(আল-মুমিনূন: ২-৩)-এ বিদ্যমান এই একই শব্দ সংযোজক (অব্যয়) শব্দ দ্বারা পরবর্তী সমস্ত আয়াতের সাথে প্রতিশ্রুতি হিসাবে সম্পর্কিত। অতএব আয়াত–

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ

(আল-মুমিনূন: ০৪)

এ অর্থই বহন করে যে, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ এবং اَفْلَحَ শব্দটি ঈমানের সকল স্তরে একটি বিশেষ অর্থ বহন করে আর একটি বিশেষ সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি দেয়। –লেখক

থেকে বাস্তব জগতে নিয়ে আসা। এটি কোনো নতুন বিষয় নয়। যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি, মানুষের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রথম স্তর নামায ও খোদার স্মরণে বিনয় ও কাকুতিমিনতির এবং দহন ও বিগলনের। এ স্তর নিজ সত্তায় নিছক সাধারণ অর্থে বা প্রাথমিক অর্থে প্রযোজ্য, অর্থাৎ বিনয় অবলম্বনকারী ব্যক্তির জন্য আবশ্যক নয় যে, সে একই সাথে বৃথা কার্যকলাপ পরিত্যাগ করতে পারবে বা এর চেয়ে মহান কোনো উন্নত নৈতিক গুণ ও সুসভ্য অভ্যাসও রপ্ত করতে পারবে। বরং হতে পারে, যে ব্যক্তি নামাযে বিনয় ও কাকুতি করে আর বিগলিত চিত্তে কাঁদে আর এতটা কাঁদে যে, অন্যদের ওপরও এর প্রভাব পড়ে; কিন্তু তা সত্ত্বেও হতে পারে তখনও বাজে কথাবার্তা, অসার কার্যকলাপ ও বাজে চালচলন, অনর্থক বৈঠক, বাজে সম্পর্ক ও প্রবৃত্তির উত্তেজনা হতে তার হৃদয় পবিত্র হয় না অর্থাৎ হতে পারে তখনও সে পাপাচার হতে মুক্তি লাভ করে নি, কেননা কখনো কখনো হৃদয়ে বিনয়ভাব জাগ্রত হওয়া বা নামাযে স্বাদ ও আনন্দ পাওয়া ভিন্ন বিষয় আর নফস বা আত্মা পবিত্র হওয়া একটি ভিন্ন বিষয়। যদি কোনো পুণ্য সন্ধানীর বিনয় ও কাকুতি এবং দহন-রোদন শিরক ও বিদাতের মিশ্রণ হতে মুক্তও হয় তথাপি এমন মানুষ যার আধ্যাত্মিক সত্তা এখনও দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছে নি, বরং কেবল আধ্যাত্মিক গন্তব্যে পৌঁছার সংকল্প করছে কিন্তু পথিমধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে আর এখনও তার পথে বিভিন্ন ধরনের জঙ্গল ও মরু আর কণ্টকাকীর্ণ ও পর্বতবহুল অঞ্চল এবং ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহাসাগর (অতিক্রম করা বাকি থাকে) আর ঈমান ও প্রাণের শত্রু হিংস্র সব প্রাণী প্রতিটি পদক্ষেপে ওত পেতে থেকে যতক্ষণ না সে আধ্যাত্মিক সত্তার দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছে যায়।

স্মরণ রাখা উচিত, বিনয় ও সকাতর প্রার্থনার সামর্থ্য লাভের অর্থ এই নয় যে, খোদার সাথে বাস্তবেই সত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। বরং অনেক সময় দুষ্কৃতকারীরা খোদার শাস্তির নিদর্শন দেখে বিনয়াবনত হয়ে যায়, কিন্তু খোদার সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই থাকে না আর বৃথা কার্যকলাপ হতে তখনও মুক্তি লাভ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই ভূমিকম্প– যা ১৯০৫ সনের ৪ এপ্রিলে আঘাত হেনেছিল, তা আসার সময় লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে এমন বিনয়াবনত ভাব ও বিগলিত আবেগ দেখা যায় যে, খোদার নাম নেওয়া ও ক্রন্দন ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না, এমনকি নাস্তিকরাও তাদের নাস্তিকতা ভুলে গিয়েছিল। সে অবস্থা কেটে গিয়ে ভূমি যখন সুস্থিত হয় তখন বিনয়াবনত

অবস্থাও হারিয়ে যায়। এমনকি আমি শুনেছি, কতক নাস্তিক যারা তখন খোদায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তারা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতার সাথে বলে যে, আমাদের ভুল হয়ে গেছে যে, আমরা ভূমিকম্পে ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম; আসলে কোনো খোদা নেই। বস্তুত আমরা যেভাবে বার বার লিখেছি, বিনয়ের সাথে অনেক নোংরামি একাকার হয়ে যেতে পারে, অবশ্য তা ভবিষ্যৎ সফলতার জন্য বীজ সদৃশ। কিন্তু এ অবস্থাকে শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা আত্মপ্রতারণার শামিল, বরং এরপর আরো একটি মর্যাদা রয়েছে যা এক মুমিনের সন্ধান করা উচিত আর কখনো বসে থাকা উচিত নয়, অলস হওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ না সে মর্যাদা অর্জিত হয়ে যায়। আর সেটি হলো তা– যা খোদার বাণী وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (আল-মুমিনূন: ৪)-এ উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ মুমিন কেবল তারা নয় যারা নামাযে বিনয় অবলম্বন এবং দহন-রোদন করে, বরং তাদের চেয়ে মহান সেসব মুমিন যারা বিনয় ও হৃদয়ের বিগলনের পাশাপাশি সকল বৃথা কথা, বৃথা কার্যকলাপ ও বাজে সম্পর্ক এড়িয়ে চলে আর নিজেদের বিনয়ের মানকে বাজে কার্যকলাপ ও বাজে কথাবার্তার সাথে মিলিয়ে নষ্ট ও ধ্বংস হতে দেয় না, আর স্বভাবজ সকল নিরর্থক বিষয়াদি হতে দূরে সরে যায়। আর বাজে কাজ, কথাবার্তা ও অনর্থক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাদের হৃদয়ে একপ্রকার ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায়। এটি একথার প্রমাণ যে, তাদের খোদার সাথে কিছুটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। কেননা এক দিক থেকে মানুষ তখনই মুখ ফিরিয়ে নেয় যখন অন্য দিকে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুতরাং যখন রহীম খোদার সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয় আর হৃদয়ে তাঁর মাহাত্ম্য ও ভীতি প্রাধান্য বিস্তার করে তখন পৃথিবীর বাজে কথাবার্তা, বাজে কার্যকলাপ, বাজে ভ্রমন ও খেলা-তামাশা এবং অর্থহীন সঙ্গের বিষয়ে তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়। একইভাবে শুক্রাণুও অর্থহীনভাবে নষ্ট হওয়া হতে ঝুঁকিমুক্ত হয়ে যায় যখন জরায়ুর সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয় আর জরায়ুর প্রভাব এর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর সেই সম্পর্কের পর্যায়ে শুক্রাণুর নাম আলাকা হয়ে যায়। একইভাবে আধ্যাত্মিক সত্তার দ্বিতীয় স্তরও আধ্যাত্মিকভাবে আলাকা যা হলো মুমিনের বৃথা কার্যকলাপের প্রতি বিমুখতা। কেননা সেই স্তরে মুমিনের হৃদয়ে খোদার ভয় ও মাহাত্ম্য প্রভাব বিস্তার করে, তাকে অনর্থক কথাবার্তা ও বৃথা কার্যকলাপ হতে মুক্ত করে। খোদার ভয় ও মাহাত্ম্যে প্রভাবিত হয়ে চিরতরে বৃথা বিষয়াদি ও বৃথা কার্যকলাপকে ছেড়ে দেওয়া সেই অবস্থার নাম যাকে

অন্য ভাষায় খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বলা হয়। কিন্তু অনর্থক কার্যকলাপ পরিত্যাগের ফলে খোদার সাথে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তা একটি দুর্বল সম্পর্ক, কেননা এ স্তরে মুমিন শুধু অর্থহীন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু জীবনের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়াদির সাথে এবং এমন বিষয়াদির সাথে, যেগুলোর ওপর জীবিকার সচ্ছলতা সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর সাথে তখনও তার হৃদয়ের সম্পর্ক থাকে, সে কারণে তখনও নোংরামির একটি অংশ তার মাঝে রয়ে যায়। এ কারণে খোদা তা'লা আধ্যাত্মিক সত্তার এ স্তরকে আলাকা-র সাথে তুলনা করেছেন। আলাকা হলো জমাট রক্তের নাম যাতে রক্ত হিসেবে অপবিত্রতার একটি দিক বাকি থেকে যায় আর এ স্তরে এ ত্রুটি থেকে যাবার কারণ হলো এমন মানুষ খোদাকে পুরোপুরি ভয় করে না। আর তাদের হৃদয়ে মহাপ্রতাপান্বিত খোদার মাহাত্ম্য ও ভীতি পুরোপুরি স্থান করে নি। সে কারণে কেবল নিরর্থক ও বৃথা বিষয়াদির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব হয়, অন্য বিষয়াদির সাথে নয়। অতএব এতটা নোংরামি তাদের দুর্বল ব্যক্তিত্বে থেকে যায়। অক্ষমতার কারণে অর্থাৎ তারা খোদার সাথে দুর্বল সম্পর্ক গড়ে বৃথা বিষয়াদি থেকে পৃথক হয়ে যায়, কিন্তু সেসব কাজ পরিত্যাগ করতে পারে না যা পরিত্যাগ করা প্রবৃত্তির জন্য দুরূহ। অর্থাৎ তারা খোদার জন্য সেসব বিষয় ছাড়তে পারে না যা জৈবিক সুখ ও ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। এ বর্ণনা হতে স্পষ্ট যে, নিছক বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা এমন বিষয় নয় যা অনেক বেশি সাধুবাদ পাবার যোগ্য বিষয় গণ্য হবে। এটি মুমিনের একটি নিম্নমানের অবস্থা। তবে বিনয়ের স্তর হতে এক স্তর উন্নত।

আর দৈহিক অস্তিত্বের তৃতীয় স্তরের বিপরীতে আধ্যাত্মিক সত্তার তৃতীয় স্তরও রয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ হলো, দৈহিক অস্তিত্বের তৃতীয় স্তর আয়াত فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً (আল-মুমিনূনঃ ১৫) এ বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ এরপর আমরা জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ড বানিয়েছি। এটি সে স্তর যখন মানুষের দৈহিক অস্তিত্ব অপবিত্রতা থেকে বেরিয়ে আসে আর এতে পূর্বের চেয়ে কিছুটা শক্তভাব ও দৃঢ়তা এসে যায়, কেননা শুক্রাণু ও রক্তমিশ্রিত জমাট রক্তবিন্দু, উভয়টি নিজেদের মাঝে হালকা অপবিত্রতা, অশুদ্ধতা আর গঠনের দিক থেকেও মাংসপিণ্ডের তুলনায় নরম ও দুর্বল হয়ে থাকে। কিন্তু মুযগা, যা মাংসের টুকরা হয়ে থাকে তা নিজের মাঝে একপ্রকার পবিত্র অবস্থা সৃষ্টি করে

আর শুক্রাণু ও আলাকার তুলনায় গঠনে কিছুটা শক্ত বা স্থিতভাব নিজের মাঝে সৃষ্টি করে নেয়। আধ্যাত্মিক সত্তার তৃতীয় স্তরও এমনই হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক সত্তার তৃতীয় স্তরের কথা আয়াত وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ (আল-মুমিনূন: ০৫) এ বর্ণনা করা হয়েছে। এ আয়াতের অর্থ হলো, মুমিন সে– যে প্রথম দুই অবস্থা থেকে এগিয়ে যায়। সে কেবল অনর্থক ও বৃথা বিষয়াদিই বর্জন করে না, বরং মানুষের মাঝে বিদ্যমান কার্পণ্যের নোংরামিকে দূরীভূত করার জন্য যাকাতও দেয়। অর্থাৎ খোদার পথে নিজের সম্পদের একটি অংশ ব্যয় করে। যাকাতের নাম যাকাত রাখার কারণ হলো, মানুষ নিজের সম্পদ, যা তার কাছে অনেক প্রিয়, তা খোদার সন্তুষ্টির জন্য প্রদান করলে কার্পণ্য থেকে পবিত্র হয়ে যায়। কার্পণ্যের নোংরামি, প্রকৃতিগতভাবে যার সাথে মানুষ সম্পর্ক রাখে, মানুষের ভেতর থেকে বেরিয়ে যায়। তখন সে কিছুটা পবিত্র হয়ে যায় এবং খোদার সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য স্থাপন করে, যিনি নিজ সত্তায় পবিত্র;

کوئی اُس پاک سے جو دل لگاوے کرے پاک آپ کو تب اُس کو پاوے

কেউ যদি সেই পবিত্র সত্তাকে ভালোবাসতে চায়,
তার উচিত প্রথমে নিজেকে পবিত্র করা, তাহলে সে তাঁকে পাবে।

আর এই মর্যাদা প্রথম দুই অবস্থায় দেখা যায় না, কেননা নিছক বিনয়, নম্রতা ও মিনতি করা বা কেবল বৃথা কথাবার্তা পরিহার এমন মানুষও করতে পারে যার ভেতর এখনও কার্পণ্যের নোংরামি রয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ যখন খোদার জন্য নিজের প্রিয় সেই সম্পদ ত্যাগ করে যার ওপর তার জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল আর যা জীবিকার উৎস এবং যা পরিশ্রম ও কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা হয়েছে; তখন কার্পণ্যের নোংরামি তার ভেতর হতে বেরিয়ে যায়। একই সাথে ঈমানে এক দৃঢ়তা ও স্থিতি আসে। পূর্বের অবস্থাদ্বয়ে এ পবিত্রতা লাভ হয় না, বরং তাতে একটি সুপ্ত নোংরামি থেকে যায়। এতে যে প্রজ্ঞা নিহিত আছে তা হলো, নিরর্থক বিষয়াদি পরিহার করা হলো কেবল অনিষ্টকে পরিহার করা। আর অনিষ্টও এমন, জীবন ও স্থায়িত্বের জন্য যার কোনো প্রয়োজন নেই। একে পরিহার করতে গিয়ে মানুষের কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না। কিন্তু কষ্টে উপার্জিত সম্পদ সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির জন্য প্রদান করা পুণ্যার্জন বইকি, যার মাধ্যমে প্রবৃত্তির সবচেয়ে ঘৃণ্য অপবিত্রতা অর্থাৎ কার্পণ্য দূর হয়ে যায়। এ হলো ঈমানী অবস্থার তৃতীয় স্তর যা প্রথম দুই

স্তর হতে উন্নত। এর বিপরীতে দৈহিক অস্তিত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মাংসপিণ্ডের স্তর রয়েছে, যা প্রথম দুই স্তর, অর্থাৎ শুক্রাণু ও আলাকা (তথা জমাট রক্তবিন্দু) উভয়টির চেয়ে উন্নত মর্যাদা রাখে আর পবিত্রতার ক্ষেত্রে বিশেষত্ব রাখে, কেননা শুক্রাণু ও জমাট রক্তবিন্দু উভয়টি সুপ্ত নোংরামিতে কলুষিত। কিন্তু মাংসপিণ্ড পবিত্র অবস্থায় রয়েছে। যেভাবে গর্ভাশয়ে শুক্রাণু ও জমাট রক্তের তুলনায় মাংসপিণ্ডের মাতৃগর্ভের সাথে তুলনামূলকভাবে এক অধিক দৃঢ় ও গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে আর শুক্রাণু ও জমাট রক্তবিন্দুর চেয়ে এর সম্পর্কও দৃঢ় হয়ে থাকে, একই অবস্থা আধ্যাত্মিক জীবনের তৃতীয় স্তরের হয়ে থাকে, যাকে খোদা তা'লা এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ (আল-মুমিনূন: ০৫) অর্থাৎ মুমিন তারা যারা নিজেদের নফসকে কার্পণ্য হতে পবিত্র করার জন্য নিজেদের প্রিয় সম্পদ খোদার পথে ব্যয় করে আর সেই কাজ তারা স্বেচ্ছায় করে। সুতরাং আধ্যাত্মিক সত্তার এ পর্যায়ে সেই তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে যা দৈহিক অস্তিত্বের তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ মাংসপিণ্ডের স্তরে থেকে থাকে। কেননা কার্পণ্য হতে মুক্ত হবার জন্য খোদার পথে ব্যয়ের এই যে অবস্থা, আর পরিশ্রম করে উপার্জিত মূলধন শুধু খোদার সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের দেওয়া, অনর্থক কথা ও বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলার চেয়ে একটি উন্নত অবস্থা। এতে স্পষ্টতই ও পরিষ্কারভাবে কার্পণ্যের নোংরামি হতে পবিত্রতা লাভ হয় আর রহীম খোদার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। কেননা নিজের প্রিয় সম্পদ খোদার জন্য ছেড়ে দেওয়া, বৃথা কার্যকলাপ পরিত্যাগ করা হতে মানুষের জন্য বেশি কঠিন। সুতরাং এই বেশি কঠিন ও কষ্টকর কাজের কারণে খোদার সাথে সম্পর্কও দৃঢ়তর হয়। কঠিন কাজ করার কারণে ঈমানের দৃঢ়তাও বৃদ্ধি পায়।

এরপর আধ্যাত্মিক সত্তার চতুর্থ স্তর সেটি যা খোদা তা'লা আয়াত وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ (আল-মুমিনূন: ৬) এ বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায় হতে উন্নত মুমিন সে যে নিজেকে প্রবৃত্তির চাওয়াপাওয়া ও নিষিদ্ধ কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত রাখে। এ স্তর তৃতীয় স্তর হতে উন্নত হবার কারণ হলো, তৃতীয় স্তরের মুমিন শুধু নিজের সম্পদ খোদার পথে খরচ করে যা তার প্রবৃত্তির কাছে অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু চতুর্থ পর্যায়ের মুমিন খোদার পথে সেসব জিনিস উৎসর্গ করে যা অর্থ বা সম্পদ থেকেও বেশি প্রিয়, অর্থাৎ যৌন কামনা-বাসনা। মানুষ তার যৌন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করাকে এত ভালোবাসে যে, এর জন্য নিজের সম্পদকে পানির ন্যায় খরচ করে আর কাম চরিতার্থ করার

জন্য সহস্র সহস্র রুপি নষ্ট করে দেয় আর জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে সম্পদকে কিছুই মনে করে না। এমন কৃপণ প্রকৃতির মানুষ যারা প্রকৃতিগত কার্পণ্যের কারণে অভাবী, ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ লোকদের একটি পয়সাও দিতে পারে না, যৌন ক্ষুধার আতিশয্যে পতিতা মহিলাদের সহস্র সহস্র রুপি দিয়ে নিজেদের ঘর ধ্বংস করে ফেলে। অতএব বুঝা গেল যে, কামপ্রবৃত্তির বন্যা এমন প্রবল যে, তা কার্পণ্যের মতো নোংরামিকেও বয়ে নিয়ে যায়। এটি স্পষ্ট বিষয় যে, সেই ঈমানী শক্তি– যার মাধ্যমে কার্পণ্য দূর হয় আর মানুষ তার প্রিয় সম্পদ খোদার জন্য উৎসর্গ করে থাকে তার চেয়ে এই ঈমানী শক্তি অধিক শক্তিশালী আর শয়তানের বিরুদ্ধে অতি দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে যার মাধ্যমে মানুষ ইন্দ্রিয় লালসার তুফান হতে পরিত্রাণ পায়। কেননা এটি অবাধ্য প্রবৃত্তিতুল্য পুরোনো সাপকে পদপিষ্ট করে। কার্পণ্য, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার চরম মুহূর্তে এবং লোক-দেখানো কাজের সময়ও দূর হতে পারে, কিন্তু যৌন ক্ষুধার আতিশয্যে যে তুফান দেখা দেয় তা অতি ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী তুফান, যা খোদার কৃপা ছাড়া কোনোভাবে দূর হতে পারে না। যেভাবে দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাঝে হাড় অত্যন্ত শক্ত আর এর আয়ুও অতি দীর্ঘ হয়ে থাকে– সেভাবে এ তুফানকে প্রতিহতকারী ঈমানী শক্তিও অত্যন্ত দৃঢ় আর দীর্ঘস্থায়ী, যেন দীর্ঘক্ষণ এমন শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাকে পদদলিত করতে পারে; আর তা-ও খোদার কৃপায় হয়। কেননা যৌন ক্ষুধার তুফান এমন এক ভয়াবহ ও বিপজ্জনক তুফান যা খোদার কৃপা ছাড়া দূর হতে পারে না। হযরত ইউসুফকে এ কারণেই

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفۡسِیۡ ۚ اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیۡ

(ইউসুফ: ৫৪)

বলতে হয়েছে। অর্থাৎ আমি আমার প্রবৃত্তিকে নির্দোষ আখ্যা দেই না, অবাধ্য প্রবৃত্তি পাপের বিষয়ে অনেক বেশি প্ররোচনা জুগিয়ে থাকে। খোদার দয়া যদি না থাকে তাহলে এর হামলা এড়ানো সম্ভব নয়। নূহের তুফানের উল্লেখ করতে গিয়ে এ আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیۡ ব্যবহৃত হয়েছে, কেননা সেখানে আল্লাহ তা'লা বলেন–

لَا عَاصِمَ الۡیَوۡمَ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنۡ رَّحِمَ

(হূদ: ৪৪)

সুতরাং এটি একথার প্রতি ইঙ্গিত যে, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার তুফান স্বীয় প্রকটতা ও ভয়াবহতায় নূহের তুফানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আর এই আধ্যাত্মিক স্তরের বিপরীতে রয়েছে দৈহিক অস্তিত্বের চতুর্থ স্তর যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আয়াত فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا (আল-মুমিনূনঃ ১৫) বিদ্যমান, অর্থাৎ আমরা এরপর মাংসপিণ্ড হতে হাড় বানিয়েছি। এটি জানা কথা যে, হাড় মাংসপিণ্ডের বা মাংসের টুকরার তুলনায় বেশি শক্ত ও দৃঢ় হয়ে থাকে। আর হাড় মাংসপিণ্ডের তুলনায় অনেক বেশি স্থায়ী হয়ে থাকে এবং সহস্র সহস্র বছর পর্যন্ত এর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকতে পারে। সুতরাং আধ্যাত্মিক সত্তার চতুর্থ স্তর এবং দৈহিক অস্তিত্বের চতুর্থ স্তরের মাঝে সামঞ্জস্য স্পষ্ট। কেননা আধ্যাত্মিক সত্তার চতুর্থ স্তরে আধ্যাত্মিক সত্তার তৃতীয় স্তরের বিপরীতে ঈমানের দৃঢ়তা ও পরিপক্কতা অধিক আর রহীম খোদার সাথে সম্পর্কও দৃঢ়তর। একইভাবে দৈহিক অস্তিত্বের চতুর্থ স্তরে হাড় সৃষ্টি হওয়া দৈহিক অস্তিত্বের তৃতীয় স্তরের চেয়ে, যা নিছক 'মুযগা' বা মাংসপিণ্ড, দৈহিকভাবে অধিক পরিপক্ক ও বেশি মজবুত আর মাতৃগর্ভের সাথে এর সম্পর্কও তুলনামূলকভাবে গভীর।

চতুর্থ স্তরের পর আধ্যাত্মিক সত্তার পঞ্চম স্তর সেটি যা খোদা তা'লা আয়াত–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

(আল-মুমিনূনঃ ৯)

-এ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ পঞ্চম স্তরের মুমিন তারা, যারা চতুর্থ স্তর হতে এগিয়ে গিয়েছে, তারা সেসকল লোক যাদের পরাকাষ্ঠা কেবল এটি নয় যে, তারা অবাধ্য প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জয়যুক্ত আর এর আকর্ষণের বিরুদ্ধে তারা মহাবিজয় লাভ করেছে, বরং তারা খোদা ও সৃষ্টির সকল আমানত ও সকল অঙ্গীকারের প্রতিটি দিক ও আঙ্গিক সম্পর্কে যত্নবান থেকে তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথে পদচারণার চেষ্টা করে; যতটা পারে সে পথে অবিচল থাকে। খোদার অঙ্গীকার বলতে সেসব ঈমানী অঙ্গীকার বুঝায় যা বয়আত করা বা ঈমান আনার সময় মুমিন থেকে নেওয়া হয়, যেমন শিরক না করা, অন্যায়ভাবে হত্যা না করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ আয়াতে যে رٰعُوْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর অর্থ হলো, খেয়াল রাখা বা যত্নবান হওয়া। আরবদের পরিভাষা অনুসারে এ শব্দ সে স্থানে বলা হয়

যেখানে কোনো ব্যক্তি নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে কোনো বিষয়ের সূক্ষ্ম পথে বিচরণ বেছে নেয় এবং সে বিষয়ের সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোকেও মেনে চলতে চায় আর এর কোনো দিক বাদ দিতে চায় না। অতএব এ আয়াতের সারকথা হলো, সেই মুমিন– যে আধ্যাত্মিক সত্তার পঞ্চম স্তরে রয়েছে, নিজের বর্তমান শক্তিসামর্থ্য অনুসারে যথাসাধ্য তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলোর ওপর পদচারণা করে আর আমানত ও অঙ্গীকার-সংক্রান্ত তাকওয়ার কোনো দিক বাদ দিতে চায় না। প্রত্যেকটিকে দৃষ্টিতে রাখা তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আর এটি নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে যায় না যে, মোটা দাগে নিজেদের বিশ্বস্ত বা অঙ্গীকার রক্ষাকারী গণ্য করবে। বরং তাদের হাতে অজান্তে কোনো বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ হয়ে যায় কিনা সে সম্পর্কে তারা ভীত থাকে। শক্তিসামর্থ্য অনুসারে নিজেদের সকল বিষয়ে মনোযোগ সহকারে চিন্তা করতে থাকে যে, কোথাও অভ্যন্তরীণভাবে তাদের মাঝে যেন কোনো ত্রুটি বা বিচ্যুতি থেকে না যায়। এই সচেতনতার নাম অন্য ভাষায় তাকওয়া।

কথার সার হলো সেই মুমিন– যে আধ্যাত্মিক সত্তার পঞ্চম স্তরে রয়েছে– সে নিজের বিষয়ে, লাগামহীন হয় না, তা খোদা-সংক্রান্ত হোক বা সৃষ্টি-সংক্রান্ত। বরং এ আশঙ্কায় আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষায় গভীর দৃষ্টি রাখে যে, কোথাও খোদার দৃষ্টিতে কোনো আপত্তির লক্ষ্যে না পরিণত হয়ে যায় আর সদা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকারগুলোকে যাচাই করতে থাকে এবং তাকওয়ার দূরদৃষ্টিতে নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপর দৃষ্টি রাখে, পাছে এমন যেন না হয় যে, নিজেদের অজান্তে তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষায় কোনো ত্রুটি থেকে যাবে। খোদা তা'লার যে-সব আমানত তাদের হাতে রয়েছে যেমন সকল শক্তিবৃত্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রাণ, সম্পদ, সম্মান ইত্যাদিকে তাকওয়ার নিরিখে অতি সাবধানে স্ব স্ব স্থানে ব্যবহার করে থাকে। ঈমান আনার সময় খোদার সাথে যে অঙ্গীকার করেছে, পরম নিষ্ঠার সাথে যথাসাধ্য তা বাস্তবায়নের চেষ্টায় লেগে থাকে। একইভাবে সৃষ্টির যে-সব আমানত তাদের কাছে থাকে বা এমন বিষয়াদি যা আমানতের অর্থ রাখে, তাকওয়ার নিরিখে যথাসাধ্য সেসব রক্ষায় লেগে থাকে। কোনো ঝগড়া হলে তাকওয়ার মাপকাঠিতে তার সিদ্ধান্ত করে– তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও। এ স্তরটি চতুর্থ স্তরের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এতে যথাসাধ্য সকল ক্ষেত্রে তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলোর নিরিখে কাজ করতে হয়। সকল বিষয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ

তাকওয়াকে দৃষ্টিতে রেখে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু চতুর্থ স্তর কেবল একটি মোটা দাগের বিষয়, তা হলো, ব্যভিচার ও কুকর্ম এড়িয়ে চলা। সবাই বুঝবে যে, ব্যভিচার একটি চরম নির্লজ্জ কর্ম আর এতে লিপ্ত ব্যক্তি কামতাড়নায় অন্ধ হয়ে এমন অপবিত্র কাজ করে যা মানব প্রজন্মের বৈধ ধারায় অবৈধ বিষয়ের মিশ্রণ ঘটায় এবং বংশ নষ্ট করার কারণ হয়। এ কারণেই শরীয়ত এটিকে এত বড়ো পাপ আখ্যায়িত করেছে। এ পৃথিবীতে এমন মানুষের জন্য শরীয়তের শাস্তি নির্ধারিত আছে। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, মুমিনের পূর্ণতার জন্য কেবল এটি যথেষ্ট নয় যে, সে ব্যাভিচার এড়িয়ে চলবে, কেননা ব্যাভিচার অত্যন্ত নোংরা স্বভাবের ও নির্লজ্জ মানুষের কাজ। এটি এমন একটি ঘৃণ্য পাপ যে, চরম অজ্ঞ মানুষও এটিকে পাপ মনে করে। কোনো ঈমানহীন ব্যক্তি ছাড়া কেউ এ সম্পর্কে ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না। সুতরাং এটি পরিত্যাগ করা একটি সামান্য ভদ্রতা ছাড়া বড়ো কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নয়। কিন্তু মানুষের সকল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য তাকওয়ার সকল সূক্ষ্ম পথে পদচারণা করার মাঝে নিহিত।* তাকওয়ার সূক্ষ্মতর পথগুলো হলো আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম ছাপ বা কারুকার্য আর দৃষ্টিনন্দন গঠন-গড়ন। আর এটি জানা কথা যে, খোদা তা'লার আমানত ও ঈমানী অঙ্গীকারগুলোর** যথাসাধ্য খেয়াল রাখা আর

---

* **টীকাঃ** ঈমানের জন্য বিনয় ও মিনতির অবস্থাটি বীজতুল্য। বৃথা কার্যকলাপ পরিহার করলে ঈমান নিজের কোমল সব কুঁড়ি নির্গত করে। এছাড়া নিজের সম্পদ যাকাত হিসেবে প্রদান করলে ঈমানী বৃক্ষের শাখা বের হয় যা তাকে কিছুটা দৃঢ়তা দান করে। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার মোকাবিলা করলে এসব শাখায় দৃঢ়তা ও পরিপক্কতা এসে যায়। আমানত ও অঙ্গীকারের সকল শাখার রক্ষণাবেক্ষণ করলে ঈমানের বৃক্ষ স্বীয় দৃঢ় কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। আর ফল ধরার সময় এর ওপর অপর এক শক্তির বারিধারা বর্ষিত হয় কেননা সেই শক্তি লাভ হবার পূর্বে সে বৃক্ষে ফলও ধরে না আর ফুলও হয় না। সেই শক্তিই আধ্যাত্মিক জন্মের ষষ্ঠ পর্যায়ে "খালকে আখার" বা ভিন্ন ধরনের সৃষ্টি আখ্যায়িত হয়। এই ষষ্ঠ পর্যায়ে মানবীয় শ্রেষ্ঠত্বের ফল ও ফুল প্রকাশ পাওয়া আরম্ভ হয়ে যায় এবং মানবরূপী বৃক্ষের আধ্যাত্মিক শাখাগুলো কেবল সম্পূর্ণই হয় না বরং ফলও দিয়ে থাকে। –লেখক

** **টীকাঃ** ঈমানী অঙ্গীকার বলতে সেই অঙ্গীকার বুঝায় যা মানুষ বয়আত ও ঈমান আনার সময় করে থাকে। যেমন- সে হত্যা বা রক্তপাত করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না, খোদার সাথে কাউকে শরীক করবে না আর ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে। –লেখক

মাথা থেকে পা পর্যন্ত যত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে যেগুলোর মাঝে বাহ্যিকভাবে চোখ, কান, হাত ও পা এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর অভ্যন্তরীণভাবে হৃদয় ও অন্যান্য শক্তিবৃত্তি এবং নৈতিক চরিত্র অন্তর্ভুক্ত- সেগুলোকে যথাসাধ্য সঠিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা, অবৈধ স্থানে ব্যবহৃত হওয়া থেকে বিরত রাখা এবং সেগুলোর গোপন হামলা সম্পর্কে সাবধান থাকা, পক্ষান্তরে মানবাধিকার সম্পর্কেও যত্নবান থাকা– এটিই সেই রীতি যার সাথে মানুষের সকল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের সম্পর্ক। খোদা তা'লা কুরআন শরীফে তাকওয়াকে লেবাস বা পোশাক নাম দিয়েছেন। 'লেবাসুত তাকওয়া' কুরআন শরীফেরই শব্দ। এটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত যে, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও শোভা তাকওয়ার মাধ্যমে লাভ হয়। খোদার সকল আমানত ও ঈমানী অঙ্গীকার, একইভাবে সৃষ্টির সকল আমানত ও অঙ্গীকারের যথাসাধ্য খেয়াল রাখা, অর্থাৎ এগুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোর ওপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াই হলো তাকওয়া।

এটি হলো আধ্যাত্মিক সত্তার পঞ্চম স্তর। এর বিপরীতে দৈহিক সত্তার পঞ্চম স্তর সেটি যার উল্লেখ আয়াত فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا (আল-মুমিনূনঃ ১৫) এ রয়েছে। অর্থাৎ এরপর আমরা হাড়ে মাংসের আবরণ চড়িয়েছি আর দৈহিক গঠনের কিছুটা সৌন্দর্য প্রকাশ করেছি। এটি এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য যে, একস্থানে খোদা তা'লা তাকওয়াকে পোশাক আখ্যায়িত করেছেন, একইভাবে كَسَوْنَا শব্দ যা 'কাসওয়াত' থেকে উদ্ভূত, যা পরিষ্কারভাবে বলছে যে, হাড়ে যে মাংস এটে দেওয়া হয় তা-ও একটি পোশাক, যা হাড়ে পরিধান করানো হয়। অতএব এ উভয় শব্দ বলছে যে, তাকওয়ার পোশাক একপ্রকার সৌন্দর্য দান করে। একইভাবে সেই পোশাক যা হাড়ে চড়ানো হয় তা হাড়কে এক ধরনের সৌন্দর্য দান করে। সেখানে 'লেবাস' শব্দ রয়েছে আর এখানে 'কাসওয়াত' শব্দ রয়েছে, উভয়টির অর্থ একই। কুরআনের আয়াত উচ্চৈঃস্বরে বলছে যে, উভয়টির উদ্দেশ্য হলো সৌন্দর্য। যেমনটি মানুষের আত্মা থেকে যদি তাকওয়ার পোশাক খুলে নেওয়া হয় তাহলে এর আধ্যাত্মিক কুৎসিত রূপ প্রকাশ পেয়ে যায়। একইভাবে যদি সেই মাংস ও চর্ম যা প্রজ্ঞার মূর্তপ্রতীক, খোদা তা'লা মানুষের হাড়ে এঁটে দিয়েছেন, হাড় হতে তা তুলে ফেলা হয় তা হলে মানুষের দৈহিক চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত বলে মনে হয়। কিন্তু এ পঞ্চম স্তরে তা দৈহিক হোক বা আধ্যাত্মিক– তাতে পূর্ণ সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না, কেননা

তখনও এর ওপর আত্মার কল্যাণধারা বর্ষিত হয় না। এটি পরীক্ষিত ও জানা বিষয় যে, এক ব্যক্তি যতই সুন্দর হোক না কেন যখন সে মারা যায়, তার ভেতর থেকে তার আত্মা বেরিয়ে যায় আর তখন সেই সৌন্দর্যে তারতম্য এসে যায় যা তাকে সর্বশক্তিমান খোদার কুদরত দান করেছিল; অথচ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সকল গঠন-গড়ন বিদ্যমান থাকে, কেবল একটি আত্মা এর ভেতর থেকে বেরিয়ে যাবার ফলে মানব দেহরূপী ঘর, বিরান ও শূন্য দেখায় আর তাতে ঔজ্জ্বল্যের নামগন্ধও থাকে না। আধ্যাত্মিক সত্তার পঞ্চম স্তরের অবস্থাও এমনই, কেননা এ বিষয়টিও প্রমাণিত ও পরীক্ষিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কোনো মুমিনের মাঝে সেই আত্মার কল্যাণরাজি বিদ্যমান না থাকবে যা আধ্যাত্মিক সত্তার ষষ্ঠ পর্যায়ে লাভ হয়ে থাকে আর যা এক অসাধারণ শক্তি ও জীবন দান করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত খোদা তা'লার আমানত প্রত্যর্পণ এবং সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার, এছাড়া নিষ্ঠার সাথে তার ঈমানী অঙ্গীকার রক্ষা করা, একইভাবে সৃষ্টির প্রাপ্য প্রদান ও তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষায় তাকওয়ার সেই সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হয় না, যার সৌন্দর্য ও গুণাবলি হৃদয়কে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে। যার সকল ভঙ্গি অসাধারণ ও নিদর্শনমূলক বলে মনে হবে। বরং এই রূহ বা আত্মায় ধন্য হবার পূর্বে তাকওয়াতে কৃত্রিমতার একটি মিশ্রণ থাকে, কেননা এতে সেই প্রাণ থাকে না যা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করতে পারে। এটি একান্ত সত্য কথা যে, এমন মুমিনের পদচারণা যা এখনও সেই প্রেরণায় ধন্য হয় নি, পুরোপুরি পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। বরং যেভাবে বাতাসের এক ঝাপটায় লাশের কোনো অঙ্গ নড়তে পারে আর যখন বাতাস বন্ধ হয়ে যায় তখন মৃতদেহ পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়, আধ্যাত্মিক সত্তার অবস্থাও তথৈবচ; কেননা কেবল সাময়িকভাবে খোদার করুণা সমীরণ তাকে পুণ্যকর্মে অনুপ্রাণিত করে থাকে আর এভাবে তাকওয়ার কাজ তার হাতে সাধিত হয় ঠিকই কিন্তু তখনও পুণ্যের প্রাণ তার মাঝে শিকড় বিস্তার করে উঠতে পারে না। তাই সেই উত্তম আচরণ বা উত্তম বিষয়াদি তার মাঝে সৃষ্টি হয় না যা সেই প্রাণ সৃষ্টি হবার পর স্বীয় প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে।

বস্তুত আধ্যাত্মিক সত্তার পঞ্চম স্তর যদিও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একপ্রকার অসম্পূর্ণ সৌন্দর্য অর্জন করে নেয়, কিন্তু এর পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায় আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের ষষ্ঠ স্তরে– যখন খোদা তা'লার জন্য ব্যক্তিগত ভালোবাসা

আধ্যাত্মিক সত্তার জন্য প্রাণ হিসেবে মানুষের হৃদয়ে অবতরণ করে এবং সকল ত্রুটি ও ঘাটতিকে দূর করে। মানুষ নিজ শক্তিবলে কখনো পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ না সেই প্রাণ বা আত্মা খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়। যেমন হাফেয শীরাযী বলেছেন–

مابدان منزلِ عالی نتوانیم رسید ہاں مگر لطف تو چوں پیش نہد گامے چند

আমরা সেই উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাতে পারি না,
অবশ্য তুমি যদি দয়াপরবশ হয়ে কয়েক পা এগিয়ে আসো (তবে তা সম্ভব)।

পঞ্চম স্তরের পর আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের ষষ্ঠ স্তর হলো সেটি– যেটিকে খোদা তা'লা আয়াত وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ (আল-মুমিনূন: ১০) এ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ষষ্ঠ স্তরের মুমিন হলো তারা, যারা পঞ্চম স্তর হতে এগিয়ে গিয়েছে আর নিজেরা নিজেদের রক্ষাণাবেক্ষণকারী অর্থাৎ তারা অন্য কারো নসীহত বা স্মরণ করানোর মুখাপেক্ষী থাকে না, বরং খোদার সাথে তাদের এমন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে আর খোদার স্মরণ তাদের প্রকৃতির কাছে এতটা প্রিয় এবং প্রশান্তিদায়ক ও জীবনের প্রাণকেন্দ্রে রূপ নিয়েছে যে, তারা সদা এর তত্ত্বাবধানে লেগে থাকে আর তাদের প্রতিটি মুহূর্ত খোদার স্মরণে কাটে এবং খোদার স্মরণ হতে মুহূর্তের তরেও পৃথক হতে চায় না।

এখন জানা কথা যে, মানুষ সেই বস্তুর সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধানের পূর্ণ চেষ্টায় সদা লেগে থাকে যা হারিয়ে যাবার মাঝে সে নিজের ধ্বংস নিহিত বলে মনে করে। যেমন- একজন মুসাফির, যে খাদ্য-পানীয়বিহীন একটি জঙ্গলে সফর করে আর যার শত শত মাইল পর্যন্ত কোনো অন্ন-পানি পাবার আশা নেই, সে তার নিজের সাথে রাখা পানাহারের গভীর যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সেগুলোকে নিজের প্রাণের ন্যায় গুরুত্ব দিয়ে থাকে, কেননা সে বিশ্বাস রাখে যে, এটি নষ্ট হবার মাঝে তার মৃত্যু নিহিত। সুতরাং এমন মানুষ যারা সেই মুসাফিরের ন্যায় নিজেদের নামাযের সুরক্ষা করে, সম্পদের ক্ষতি হোক বা সম্মানের বা নামায পড়ার কারণে কেউ অসন্তুষ্টই হোক না কেন, তারা নামায পরিত্যাগ করে না এবং নামায নষ্ট হবার আশঙ্কায় এমনভাবে ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত থাকে যেন মারাই যাবে আর এক মুহূর্তও খোদার স্মরণবিমুখ থাকবে– এটি তারা চায় না। সত্যিকার অর্থে তারা নামায ও খোদার স্মরণকে নিজেদের জন্য একটি আবশ্যকীয় খাদ্য মনে করে যার ওপর নির্ভর করে

তাদের জীবন। এ অবস্থা তখন সৃষ্টি হয় যখন খোদা তাদের ভালোবাসেন আর তাঁর ভালোবাসার একটি জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ তাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে একটি দ্বিতীয় জীবন দান করে, যাকে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের জন্য একটি আত্মা বলা উচিত। সেই আত্মা তাদের পুরো আধ্যাত্মিক সত্তায় আলো ও জীবন দান করে। তখন তারা কোনো কৃত্রিমতার বশে খোদাকে স্মরণ করে না, বরং সেই খোদা– যিনি মানুষের জীবনকে অন্ন ও পানির ওপর নির্ভরশীল রেখেছেন, তিনি তাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে, যাকে তারা ভালোবাসে, নিজের স্মরণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। সে কারণে তারা সেই রুটি ও পানিকে দৈহিক পানাহার থেকে বেশি কামনা করে থাকে আর এর হারিয়ে যাওয়াকে তারা ভয় করে। এটি সেই আত্মার প্রভাব হয়ে থাকে যা একটি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় তাদের মাঝে সঞ্চার করা হয়, যে কারণে তাদের মাঝে খোদাপ্রেমের পূর্ণ উন্মাদনা সৃষ্টি হয়ে যায়। সেকারণে তারা খোদার স্মরণ হতে এক নিমিষের জন্যও বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। তারা তাঁর জন্য দুঃখকষ্ট সহ্য করে আর সমস্যাবলি দেখতে পায়, কিন্তু এক নিমিষের জন্যও তাঁর থেকে পৃথক হতে চায় না। তারা সদা খোদার স্মরণে রত থাকে। নিজেদের নামাযের সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধান করে। এ বিষয়টি তাদের জন্য একান্ত স্বাভাবিক বিষয়, কেননা খোদা স্বীয় ভালোবাসায় সমৃদ্ধ যিকর বা নামাযকে তাদের জন্য এক আবশ্যকীয় খাদ্য আখ্যায়িত করেছেন আর ব্যক্তিগত ভালোবাসার মাধ্যমে তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে খোদার স্মরণের এক আকর্ষণীয় স্বাদ তাদের দান করেছেন। সুতরাং এ কারণে খোদার স্মরণ তাদের কাছে জীবনতুল্য, বরং ততোধিক প্রিয় হয়ে গেছে। খোদার জন্য ব্যক্তিগত ভালোবাসা এক নতুন প্রাণ– যা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় আর তাদের নামায ও খোদার স্মরণকে তাদের জন্য আহারতুল্য বানিয়ে দেয়। সুতরাং তারা বিশ্বাস রাখে যে, তাদের জীবন পানাহারের বলে নয় বরং নামায ও খোদার স্মরণের মাধ্যমে টিকে থাকে।

বস্তুত খোদার ভালোবাসায় সমৃদ্ধ যিকরে এলাহি, যার নাম হলো নামায– তা সত্যিকার অর্থে তাদের খাদ্য হয়ে যায়, যা ব্যতীত তারা জীবিত থাকতে পারে না। যার সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধান একান্ত সেই পথিকের ন্যায় তারা করে থাকে, যে খাদ্য-পানীয়বিহীন এক মরুতে নিজের কয়েকটি রুটির রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে আর নিজের মশকে থাকা যৎসামান্য পানিকে নিজের জীবনতুল্য

মর্যাদা দিয়ে থাকে। পরম দাতা, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এটিও একটি পদমর্যাদা নির্ধারণ করে রেখেছেন যা ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও প্রেমাধিক্য এবং পরম ভালোবাসার চূড়ান্ত মর্যাদা। সত্যিকার অর্থে এ পর্যায়ে খোদার ভালোবাসা-সুরভিত স্মরণ আহারের স্থান নিয়ে নেয়, শরীয়তের পরিভাষায় যার নাম হলো নামায, বরং সে বার বার দৈহিক জীবনকেও এই খাদ্যের জন্য উৎসর্গ করতে চায়। সে এটি ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না যেমনটি কিনা মাছ পানি ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না আর খোদা হতে পৃথক হয়ে এক মুহূর্ত কাটানোকে নিজের মৃত্যু জ্ঞান করে। তার আত্মা সদা খোদার আস্তানায় সিজদাবনত থাকে আর তার সমূহ আরাম খোদার সত্তাতেই নিহিত থাকে। তার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, আমি যদি নিমিষের জন্যও খোদার স্মরণবিমুখ হই তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবো। যেভাবে খাবার খেলে শরীর সতেজ হয় আর চোখ, কান ইত্যাদি অঙ্গেও শক্তি বৃদ্ধি পায়, একইভাবে এ পর্যায়ে প্রেম ও ভালোবাসার আবেগে খোদার স্মরণ মুমিনের আধ্যাত্মিক শক্তিকে উন্নত করে অর্থাৎ চোখে অত্যন্ত পরিষ্কার ও সূক্ষ্মভাবে দিব্যদর্শনের শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায় আর কান খোদার কথা শোনে এবং মুখে তা অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সবচেয়ে পরিষ্কার ও উজ্জ্বলভাবে উচ্চারিত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে সত্যস্বপ্ন দেখে,* যা প্রভাতের উন্মেষ ঘটার ন্যায় প্রকাশ পেয়ে যায় আর মহাসম্মানিত খোদার সাথে স্বচ্ছ সম্পর্কের কারণে শুভসংবাদভিত্তিক অনেক স্বপ্ন তারা দেখে

---

* **টীকাঃ** অনেক নির্বোধ এ অলীক ধারণায় মত্ত থাকে, আমরাও কখনো কখনো সত্যস্বপ্ন দেখি বা সত্য এলহাম হয়, তাই আমাদের এবং এমন উচ্চ মর্যাদার লোকদের মাঝে পার্থক্যইবা কী হলো আর এসব উচ্চ মর্যাদার লোকদের কিবা বিশেষত্ব? এর উত্তর হলো, স্বপ্ন দেখার বা এলহাম লাভের এতটা যোগ্যতা মানুষের প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত রাখার উদ্দেশ্য হলো যেন তাদের কাছেও এ জগতের বাইরের সূক্ষ্ম বিষয়াদির কিছুটা নমুনা বিদ্যমান থাকে। আর এভাবে তারা নিজেদের মাঝে একটি নমুনা দেখে গ্রহণ করা বা মানার মতো সম্পদ থেকে যেন বঞ্চিত না থাকে আর তাদের কাছে যেন সত্যের অকাট্য যুক্তি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি ওহী ও সত্যস্বপ্নের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকত তাহলে অস্বীকার করা ছাড়া তার কিবা করার থাকত? এমন পরিস্থিতিতে তাদের হাত-পা যে কিছুটা বাঁধা। এ দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও বর্তমান যুগের দার্শনিকরা আজ পর্যন্ত ওহী ও সত্যস্বপ্ন অস্বীকার করে, তাহলে ভাবুন সাধারণ লোকদের কী অবস্থা হবে? কেননা তাদের কাছে কোনো দৃষ্টান্তও নেই। এ ধারণা করা যে,

থাকে। এটি সেই মর্যাদা– যে পর্যায়ে মুমিন অনুভব করে, খোদাপ্রেম তার জন্য পানাহারের সমতুল্য। এই নতুন জন্ম তখন লাভ হয় যখন আধ্যাত্মিক দেহকাঠামো পুরোটা প্রস্তুত হয়ে যায় আর সেই রূহ যা খোদার ব্যক্তিগত ভালোবাসার একটি স্ফুলিঙ্গ হয়ে থাকে, সেই মুমিনের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় আর হঠাৎ করে ঊর্ধ্বলোকের এক শক্তি তাকে মানুষরূপী খাঁচার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। এটি সেই মর্যাদা যেটিকে আধ্যাত্মিকভাবে 'খালকে আখার' বা 'ভিন্ন সৃষ্টি' নাম দেওয়া হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে খোদা তা'লা মুমিনের হৃদয়ে নিজের ভালোবাসার একটি প্রজ্জ্বলিত স্ফুলিঙ্গ অবতীর্ণ করেন, যাকে অন্য ভাষায় রূহ বা আত্মা বলা হয় আর এর মাধ্যমে সকল অমানিশার পঙ্কিলতা ও দুর্বলতা দূর করে দেন। এই রূহ বা আত্মা ফুৎকার করা মাত্রই সেই সৌন্দর্য যা নিম্ন মানের ছিল তা পরম মার্গে পৌঁছে যায় আর একটি আধ্যাত্মিক উজ্জ্বলতা এসে যায় এবং নোংরা জীবনের কলুষ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়ে যায়। মুমিন অনুভব করে যে, এক নতুন প্রাণ বা আত্মা তার ভেতর প্রবেশ করেছে যা পূর্বে ছিল না। এ প্রাণ পেয়ে এক বিস্ময়কর আরাম ও প্রশান্তি মুমিনের লাভ হয়ে যায় আর সেই সত্তার জন্য ভালোবাসা এক ফুটন্ত ঝরনার ন্যায় সবেগে উথলে ওঠে এবং খোদার বন্দেগির চারাগাছটিতে তা পানি সিঞ্চন করে। সেই আগুন যা পূর্বে সামান্য তাপ হিসেবে অনুভূত হতো, এ স্তরে তা সম্পূর্ণভাবে জ্বলে ওঠে এবং মানবীয় সত্তার সকল খড়কুটা বা কলুষকে দগ্ধীভূত করে ঐশী নিয়ন্ত্রণ তার ওপর প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই অগ্নি (মুমিনের) পুরো সত্তাকে ঘিরে ফেলে। তখন সেই মুমিনের মাঝে খোদার গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য সেই লোহার ন্যায় প্রকাশ পায় যা আগুনে গরম করা হলে পুরোপুরি লাল হয়ে যায় এবং আগুনের বর্ণ ধারণ করে। যেভাবে লোহাও এ পর্যায়ে অবিকল আগুনের লক্ষণ ও

*** চলমান টীকাঃ** আমাদেরও কখনো কখনো সত্যস্বপ্নের অভিজ্ঞতা হয় বা সত্য এলহাম লাভ হয়ে থাকে! এতে রসূল ও নবীদের মাহাত্ম্যে কোনো তারতম্য আসে না, কেননা এমন মানুষের স্বপ্ন ও এলহাম সন্দেহের ধূম্রজাল হতে মুক্ত থাকে না আর এর পাশাপাশি পরিমাণেও তা কম হয়ে থাকে। যেভাবে একজন দরিদ্র ব্যক্তি এক পয়সা নিয়ে একজন বাদশার মোকাবিলা করতে পারে না আর বলতে পারে না যে, আমার কাছেও তেমনিই সম্পদ আছে যেমনটি তার কাছে আছে! একইভাবে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাও অর্থহীন এবং অজ্ঞতার শামিল। –লেখক

বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, একইভাবে মুমিনও এ পর্যায়ে খোদার রং ধারণ করে, কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে, মুমিন খোদা হয়ে গেছে, বরং খোদাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য এমনই যে, বান্দার বাহ্যিক সত্তাকে নিজের রঙে রঙিন করে তোলে, কিন্তু ভেতরে বান্দা ও তার দুর্বলতা বিদ্যমান থাকে। এ পর্যায়ে খোদা সেই মুমিনের রুটি হয়ে থাকেন যা খাওয়ার ওপর তার জীবন নির্ভরশীল আর মুমিনের পানিও খোদা হয়ে থাকেন যা পান করলে সে মৃত্যু হতে রক্ষা পায়। তার শীতল বাতাসও খোদা হয়ে যান যার মাধ্যমে তার হৃদয় প্রশান্ত হয়। এখানে রূপক ভাষায় এটি বলা অযথা হবে না যে, খোদা এ পর্যায়ের মুমিনের ভেতর প্রবেশ করেন এবং তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থান করে নেন আর তার হৃদয়কে নিজের সিংহাসন বানিয়ে নেন। তখন সে নিজের আত্মার মাধ্যমে নয়, বরং খোদার আত্মার (শক্তির) মাধ্যমে দেখে, তাঁর রূহের (শক্তির) মাধ্যমে শোনে, তাঁর রূহের (শক্তির) মাধ্যমে বলে এবং তার রূহের শক্তিতে হাঁটে আর খোদার রূহের মাধ্যমে শত্রুর ওপর হামলা করে। কেননা এ পর্যায়ে সে আত্মবিলুপ্তি ও নিজেকে মিটিয়ে দেবার পর্যায়ে থাকে। খোদার রূহ তার ওপর স্বীয় ব্যক্তিগত ভালোবাসার সাথে বিকশিত হয়ে তাকে দ্বিতীয় জীবন দান করে। তখন আধ্যাত্মিকভাবে তার জন্য আয়াত ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ (আল-মুমিনূন: ১৫) প্রযোজ্য হয়।

এটি আধ্যাত্মিক সত্তার ষষ্ঠ স্তর যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিপরীতে রয়েছে দৈহিক জন্মের ষষ্ঠ স্তর। দৈহিক স্তরের জন্যও রয়েছে উল্লিখিত একই আয়াত অর্থাৎ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ । এর অনুবাদ হলো, আমরা একবার মানুষকে তৈরি করার পর তাকে একটি ভিন্ন রূপে সৃষ্টি করেছি। 'ভিন্ন' শব্দটি দ্বারা এটি বুঝানো উদ্দেশ্য যে, তা এমন ধারণাতীত সৃষ্টি যা বোঝা মানবীয় বোধবুদ্ধির ঊর্ধ্বের বিষয়, তার জ্ঞানাতীত। অর্থাৎ আমরা আত্মাকে মানুষের ভেতর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয়ভাবে সৃষ্টি করেছি যা দেহের কাঠামো প্রস্তুত করার পর তাতে সঞ্চার করা হয় কিন্তু যার স্বরূপ জানা নেই। এ সম্পর্কে সকল দার্শনিক ও বস্তুজগতের অন্ধ অনুকরণকারীরা অনিশ্চিত যে, তা কী জিনিস। এর স্বরূপ জানতে না পারার কারণে তারা এর বাস্তবতা সম্পর্কে অন্ধকারে ঢিল ছোড়ে। কেউ আত্মা বা রূহের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসে, কেউ এটিকে অনাদি আখ্যা দিয়ে বলে যে, এটি সৃষ্ট নয়। এখানে আল্লাহ তা'লা বলেন, রূহও খোদার সৃষ্টি, কিন্তু তা

মানুষের বোধবুদ্ধির ঊর্ধ্বের বিষয়। যেমনটি কিনা এ পৃথিবীর দার্শনিকরা সেই আত্মা সম্পর্কে অজ্ঞ, যা দৈহিক অস্তিত্বের ষষ্ঠ স্তরে খোদার পক্ষ থেকে দেহকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। অনুরূপভাবে তারা সেই রূহ সম্পর্কেও অনবহিত রয়ে গেল যা আধ্যাত্মিক সত্তার ষষ্ঠ পর্যায়ে সত্যবাদী মুমিন খোদার পক্ষ থেকে লাভ করে থাকে আর এ সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। অনেকেই এমন লোকদের পূজা করা আরম্ভ করে দিয়েছে যাদেরকে সেই রূহ দেওয়া হয়েছে। তারা সেগুলোকে আনাদি, অসৃষ্ট ও খোদা মনে করে বসেছে। অনেকেই এমন পর্যায়ের লোক থাকতে পারে বা এমন রূহ লাভ হতে পারে বলে অস্বীকারই করে বসেছে।

কিন্তু একজন বিবেকবান একথা সহজেই বুঝতে পারে যে, যেখানে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব আর খোদা ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল সকল পশুপাখির ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, সবার ওপর শাসনের কর্তৃত্ব দিয়ে, আর বিবেক বুদ্ধি প্রদান করে এবং খোদাকে চেনার ও বোঝার এক পিপাসা জাগিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে খোদার ভালোবাসা অর্জনের জন্য। তাই প্রশ্ন হলো, একথা কেন অস্বীকার করা হবে যে, মানুষ ব্যক্তিগত ভালোবাসার স্তরে পৌঁছে সেই পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যেখানে তার ভালোবাসায় খোদাপ্রেম একটি রূহের ন্যায় অবতীর্ণ হয়ে তার সকল দুর্বলতা দূর করে দিতে পারে। যেভাবে আল্লাহ তা'লা আধ্যাত্মিক সত্তার ষষ্ঠ স্তর সম্পর্কে বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

(আল-মুমিনূনঃ ১০)

একইভাবে সবসময় নিজেকে খোদার সামনে উপস্থিত বলে বিশ্বাস রাখা, খোদার জন্য গভীর অনুরাগ ও বিগলিত ক্রন্দন ও বন্দেগি মানুষের পক্ষ থেকে প্রকাশ পাওয়া বাঞ্ছনীয় আর এভাবে সে নিজ সত্তার পরম উদ্দেশ্য পূর্ণ করে যেমনটি আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

(আয-যারিয়াতঃ ৫৭)

অর্থাৎ আমি জিন ও মানুষকে ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। অবশ্য এই ইবাদত ও মহাসম্মানিত খোদার সামনে স্থায়ী আত্মনিবেদনের প্রেরণায়

দাঁড়ানো, ব্যক্তিগত ভালোবাসা ছাড়া সম্ভব নয়। ভালোবাসা বলতে একতরফা ভালোবাসা বুঝায় না, বরং স্রষ্টা-সৃষ্টি উভয়ের ভালোবাসা বুঝায়। এটি বিদ্যুতের আগুনের মতো যা মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের ওপর নেমে আসে এবং যা তখন সেই মানুষের ভেতর হতেও বের হয়। এ দুটি মানবীয় সকল দুর্বলতাকে ভস্মীভূত করে আর তার পুরো আধ্যাত্মিক সত্তাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।

এটি সেই পূর্ণ চিত্র যাতে মানুষ সেসব আমানত ও অঙ্গীকার, যার উল্লেখ আধ্যাত্মিক সত্তার পঞ্চম স্তরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা স্ব স্ব স্থানে যথাযথভাবে প্রত্যর্পণ করতে সক্ষম হয়। একমাত্র পার্থক্য হলো পঞ্চম স্তরে মানুষ শুধু তাকওয়ার নিরিখে খোদা ও সৃষ্টির আমানত ও অঙ্গীকারের বিষয়ে দৃষ্টি রাখে আর এ পর্যায়ে ব্যক্তিগত ভালোবাসার দাবির কারণে, যা তার মাঝে খোদার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, খোদার সৃষ্টির ভালোবাসাও তার মাঝে প্রবল রূপে মূর্ত হয়েছে আর সেই বৈশিষ্ট্যের দাবির বশে, যা খোদার পক্ষ থেকে তার প্রতি অবতীর্ণ হয়, এই সমস্ত অধিকার সে সুন্দরভাবে ও সহজাতভাবে প্রদান করে। এমন পরিস্থিতিতে সেসব অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য যা বাহ্যিক সৌন্দর্যের বিপরীতে রয়েছে উত্তমভাবে সে লাভ করে, কেননা আধ্যাত্মিক সত্তার পঞ্চম স্তরে সেই রূহ তখনও মানুষের মাঝে প্রবেশ করে নি যা ব্যক্তিগত ভালোবাসার ফলে সৃষ্টি হয় আর সে কারণে সৌন্দর্যের বিকাশও সে পর্যায়ে উৎকর্ষের স্তরে ছিল না; কিন্তু রূহ প্রবেশের পর সেই সৌন্দর্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এটি জানা কথা যে, মৃত সুন্দর আর জীবিত সুন্দরের ঔজ্জ্বল্য সমান হয় না।

আমরা যেমনটি কিনা বর্ণনা করে এসেছি, মানুষের জন্মের মাঝে দুধরনের সৌন্দর্য বিদ্যমান। একটি হলো আচরণগত সৌন্দর্য। অর্থাৎ খোদার সকল আমানত ও খোদার সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষায় এদিকে দৃষ্টি রাখা, যেন সেসব বিষয়ে যথাসাধ্য কোনোকিছু বাদ না পড়ে, যেমনটি কিনা খোদার বাণীতে 'রাঊন' শব্দ এদিকে ইঙ্গিত করে। একইভাবে মানুষের জন্য আবশ্যক হলো, সৃষ্টির আমানত ও তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারের ক্ষেত্রেও যেন এদিকে দৃষ্টি রাখে। অর্থাৎ খোদা ও বান্দার অধিকারের বিষয়ে যেন তাকওয়ার ভিত্তিতে কার্য সাধন করে। এ উত্তম ব্যবহারই কিংবা এ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যই আধ্যাত্মিক সত্তার পঞ্চম স্তরে সুন্দরভাবে সামনে আসে কিন্তু তখনও তা পুরোপুরি প্রকাশ পায় না। আধ্যাত্মিক সত্তার ষষ্ঠ স্তরে জন্ম সম্পূর্ণ হবার কারণে আর আত্মা বা রূহ প্রবেশ করার কারণে এ সৌন্দর্য নিজের সকল

ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে। স্মরণ রাখা উচিত, আধ্যাত্মিক সত্তার ষষ্ঠ স্তরে রূহের অর্থ হলো খোদার সত্তাগত ভালোবাসা যা মানুষের ব্যক্তিগত ভালোবাসায় একটি স্ফুলিঙ্গের মতো নিপতিত হয় এবং সকল অভ্যন্তরীণ অমানিশা দূর করে দেয় আর আধ্যাত্মিক জীবন দান করে অধিকন্তু একইসাথে থাকে ফেরেশতা বা রূহুল কুদুসের পূর্ণ সাহায্য-সমর্থন।

মানুষের জন্মের মাঝে দ্বিতীয় সৌন্দর্য হলো, দৈহিক সৌন্দর্য। যদিও দৈহিক ও আধ্যাত্মিক জন্মের পঞ্চম পর্যায়ে এ উভয় সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়ে যায়, কিন্তু এর ঔজ্জ্বল্য রূহরূপী কল্যাণ লাভের পর প্রকাশ পায়। যেভাবে দৈহিক অস্তিত্বের রূহ বা আত্মা দেহের কাঠামো প্রস্তুত হবার পর মানুষের অস্তিত্বে প্রবেশ করে; একইভাবে আধ্যাত্মিক সত্তার আত্মা আধ্যাত্মিক সত্তা প্রস্তুত হবার পর আধ্যাত্মিক দেহে প্রবেশ করে। অর্থাৎ যখন মানুষ শরীয়তের সকল নির্দেশাবলি শিরোধার্য করে নেয় আর চেষ্টা সাধনা করে খোদার নির্ধারিত সকল সীমারেখা মেনে চলতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং শরীয়তের অনুশীলন ও খোদার কিতাবের নির্দেশাবলি পালনের ফলে একথার যোগ্য হয়ে যায় যে, খোদার রূহানিয়্যত তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে, সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, নিজের ব্যক্তিগত ভালোবাসার দ্বারা নিজেকে খোদার ব্যক্তিগত ভালোবাসার যোগ্য করে তোলে যা বরফের মতো শুভ্র আর মধুর ন্যায় সুমিষ্ট। যেমনটি কিনা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের সূচনা হয় আধ্যাত্মিক কাকুতিমিনতির অবস্থায়। আধ্যাত্মিক উন্নতির ষষ্ঠ স্তরে অর্থাৎ সেই পর্যায়ে আধ্যাত্মিক দেহ পূর্ণ হবার পর খোদার সত্তার প্রতি ভালোবাসার একটি স্ফুলিঙ্গ মানুষের হৃদয়ে রূহ বা আত্মার ন্যায় প্রবেশ করে আর একটি স্থায়ী বিনয়ের অবস্থা তাকে উপহার দেয় এবং তাকে উৎকর্ষতা দান করে আর তখনই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য স্বীয় পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ সৌন্দর্য, যা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য, যাকে উত্তম আচার-আচরণ নাম দিতে পারি, এটি সেই সৌন্দর্য যা স্বীয় দুর্বার আকর্ষণের সুবাদে চেহারার সৌন্দর্য হতে বেশি কার্যকর, কেননা চেহারার সৌন্দর্য এক বা দুব্যক্তির নশ্বর ভালোবাসার কারণ হবে, যা স্বল্প সময়ে মলিন হয়ে যাবে আর এর আকর্ষণ একান্ত দুর্বল। কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য যাকে আচরণের সৌন্দর্য নাম দেওয়া হয়েছে তা স্বীয় আকর্ষণে এত দুর্বার এবং এমন অসাধারণ যে, এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বিন্দু তার প্রতি

আকৃষ্ট হয়। দোয়া গৃহীত হবার সত্যিকার দর্শন হলো, এমন আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের অধিকারী মানুষ, যার মাঝে ঐশী প্রেমের প্রেরণা জাগে, সে যখন কোনো অসম্ভব ও কঠিন বিষয়ের জন্য দোয়া করে আর সেই দোয়ার পেছনে পুরো শক্তি ব্যয় করে; সে যেহেতু নিজের মাঝে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য রাখে তাই খোদার নির্দেশ ও অনুমতিতে এ বিশ্বের প্রতিটি বিন্দু তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এককথায় এমনসব উপকরণ একত্রিত হয় যা তার সাফল্যের জন্য যথেষ্ট। অভিজ্ঞতা ও খোদার পবিত্র গন্থ হতে প্রমাণিত যে, পৃথিবীর প্রতিটি অণুর এমন ব্যক্তির সাথে এক সহজাত ভালোবাসা থাকে। তার দোয়া এসব অণুকে নিজের দিকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে যেভাবে চুম্বক লোহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। সুতরাং সাধারণ সব কথা যার উল্লেখ কোনো বিজ্ঞান ও দর্শনে নেই, সেই আকর্ষণের কারণে প্রকাশ পেয়ে যায় আর সেই আকর্ষণ সহজাত হয়ে থাকে। সুতরাং কামিল স্রষ্টা বস্তুজগৎকে অণুপরমাণু দ্বারা বিন্যস্ত করার সময় প্রতিটি বিন্দুতে সেই আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি বিন্দু আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের সত্যিকার প্রেমিক। একইভাবে প্রত্যেক পুণ্যবান মানুষও, কেননা সেই সৌন্দর্য খোদার বিকাশস্থল। সেই সৌন্দর্যই ছিল যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ

(আল-বাকারা: ৩৫)

আর এখনও অনেক ইবলীস রয়েছে যারা এই সৌন্দর্যকে চিনতে পারে না কিন্তু সেই সৌন্দর্য অনেক বড়ো বড়ো কাজ করে আসছে।

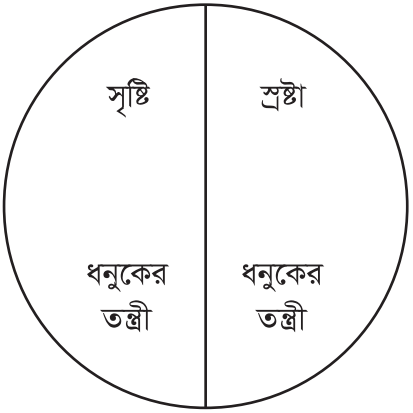
নূহের মাঝে সেই অনুপম সৌন্দর্যই ছিল, যার খাতিরে মহাসম্মানিত খোদা সকল অস্বীকারকারীকে পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর মূসাও একই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য নিয়ে এসেছেন, যিনি গুটি কয়েক দিন কষ্ট সহ্য করে অবশেষে ফেরাউনের ধ্বংস এনেছেন। পুনরায় সবার শেষে নবীকুল শিরোমণি সৃষ্টির সেরা আমাদের মনিব ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এক সুমহান আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য নিয়ে এসেছেন যার প্রশংসায়–

دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

(আন-নাজম: ৯-১০)

-আয়াতই যথেষ্ট। সেই নবী খোদা তা'লার অনেক কাছে চলে গিয়েছেন

এরপর সৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন আর এভাবে উভয় অধিকার অর্থাৎ খোদা ও বান্দার প্রাপ্য প্রদান করেছেন আর উভয় প্রকার আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন আর উভয় ধনুকের তন্ত্রীর মতো হয়ে গেছেন অর্থাৎ উভয় ধনুকের মধ্যবর্তী তন্ত্রীর ন্যায় হয়ে যান আর তার অস্তিত্ব নিম্নের চিত্রের মতো–



কেন্দ্রীয় রেখাটি নির্দেশ করছে মহানবী (সা.)-কে

এই সৌন্দর্যকে অপবিত্র প্রকৃতির মানুষ ও অন্ধরা দেখে নি যেভাবে আল্লাহ তা'লা বলেন,

يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ

(আল-আরাফ: ১৯৯)

অর্থাৎ তারা তোমার প্রতি তাকায় কিন্তু তুমি তাদের গোচরীভূত হও না। অবশেষে সেসব অন্ধ ধ্বংস হয়ে গেছে।

কোনো কোনো অজ্ঞলোক এ পর্যায়ে প্রশ্ন করে যে, কামিল লোকদের কিছু দোয়া কেন গৃহীত হয় না? এর উত্তর হলো তাদের সৌন্দর্যের বিকাশ খোদা তা'লা নিজের হাতে রেখেছেন। যেখানে এই সুমহান বিকাশ ঘটে আর কোনো বিষয়ে তাদের সৌন্দর্য অপরূপ রূপে প্রকাশিত হয় আর স্বীয় দীপ্তি প্রকাশ করে তখন সেই ঔজ্জ্বল্যের দিকে বিশ্বের অণুপরমাণু আকৃষ্ট হয় আর অসম্ভব বিষয়াদি ঘটে যায় যাকে অন্য ভাষায় নিদর্শন বলা হয়। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক

উচ্ছ্বাস সর্বদা সব স্থানে প্রকাশ পায় না আর বহিরাগত উদ্দীপক বা উদ্দীপনার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এর কারণ হলো, যেভাবে বদান্যশীল খোদা পরবিমুখ, তিনি নিজের মনোনীতদের মাঝেও পরবিমুখতার বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন, তাই তারা খোদার ন্যায় পরবিমুখ হয়ে থাকেন। যতক্ষণ কেউ পুরো বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের কাছে দয়ার জন্য আবেদন-নিবেদন না করবে তাদের সেই বৈশিষ্ট্য উদ্দীপ্ত হয় না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা সারা পৃথিবী থেকে অধিক করুণার বৈশিষ্ট্য নিজেদের মাঝে রাখেন কিন্তু এটিকে উদ্দীপ্ত করা তাদের সাধ্যের বিষয় নয় যদিও তারা বার বার চান যে, সেই শক্তি প্রকাশিত হোক কিন্তু খোদার ইচ্ছা ছাড়া তা প্রকাশ পায় না। বিশেষ করে তারা অস্বীকারকারী মুনাফিক এবং দুর্বল বিশ্বাসের লোকদের বিষয়ে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করেন না আর তাদেরকে এক মৃত পোকার ন্যায় মনে করেন। তাদের পরবিমুখতার মান ও মহিমা এমন, যেভাবে এক প্রেমাস্পদ অত্যন্ত সুন্দর বোরকায় নিজের চেহারা লুকিয়ে রাখে। সেই পরবিমুখতার একটি দিক হলো, কোনো দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ তাদের সম্বন্ধে যখন কুধারণা করে তখন ভ্রূক্ষেপহীনতার আতিশয্যে অনেক সময় সেই কুধারণাকে আরো দৃঢ় করে দেন, কেননা তারা تخلّق باخلاق الله-তে সজ্জিত থাকেন যেমনটি কিনা আল্লাহ তা'লা বলেন,

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا

(আল-বাকারা: ১১)

খোদা তা'লা যখন তাদের মাধ্যমে কোনো নিদর্শন প্রকাশ করতে চান তখন তাদের হৃদয়ে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন, একটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাদের হৃদয়ে কঠিন ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন তারা পরবিমুখতার সেই বোরকা নিজেদের মুখ থেকে নামিয়ে নেন আর তাদের সেই সৌন্দর্য যা খোদা তা'লা ছাড়া অন্য কেউ দেখে না তা আকাশের ফেরেশতা এবং প্রতিটি অণুপরমাণুর সামনে প্রকাশিত হয়ে যায়। তাদের মুখ থেকে বোরকা খোলার অর্থ হলো, তারা তাদের পূর্ণ নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার সাথে আর সেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের সাথে যে কারণে তারা খোদার প্রিয়ভাজন হয়ে গিয়েছেন– সে খোদার দিকে এমন অসাধারণ ভাবে এগিয়ে যান আর তারা এমনসব ঐশী প্রভাব গ্রহণ করেন যা খোদার অলৌকিক রহমতকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে আর একই সাথে বিশ্বের প্রতিটি অণুপরমাণু তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের

প্রেমিকসুলভ উষ্ণতার তাপ স্বর্গে একত্রিত হয় আর মেঘমালার ন্যায় ফেরেশতাদেরকে নিজেদের চেহারা দেখায়। তাদের বেদনা যা নিজের মাঝে বিদ্যুৎ গর্জনের বৈশিষ্ট্য রাখে, ঊর্ধ্বলোকে একটি কঠিন হইচই সৃষ্টি করে। তখন খোদা তা'লার ক্ষমতাবলে সেই মেঘমালা সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে ঐশী কৃপার সেই বারি বর্ষিত হয়, যার তারা বাসনা রাখে। তাদের আধ্যাত্মিকতা যখন পুরো মিনতির সাথে বিগলিত চিত্তে কোনো সমস্যার সমাধান চায় তা খোদার দৃষ্টি নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে। কেননা তারা খোদার সাথে ব্যক্তিগত ভালোবাসার কল্যাণে খোদার প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হন। তখন খোদা তা'লার নির্দেশাধীন প্রতিটি বস্তু তাদের সাহায্য করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।* ঐশী রহমত তাদের ইচ্ছার পূর্ণতার জন্য একটি নূতন সৃষ্টি সামনে আনতে উদ্যত হয় আর সেসব বিষয় প্রকাশ পায় যা পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হয় আর যা সম্পর্কে জাগতিক তুচ্ছ জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এমন লোকদের খোদা বলতে পারি না, কিন্তু খোদার নৈকট্য ও খোদার সাথে তাদের ভালোবাসার সম্পর্ক এমন নিষ্ঠাপূর্ণ ও স্বচ্ছ, যেন খোদা তাদের ওপর অবতরণ করেন। আদমের ন্যায় ঐশী রূহ তাদের মাঝে ফুৎকার করা হয়, কিন্তু তারা খোদা নয়। কিন্তু তাদের মাঝে এমন একটি সম্পর্ক বিদ্যমান যেমনটি লোহার সাথে আগুনের সম্পর্ক হয়ে থাকে অর্থাৎ যখন লোহা অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় দগ্ধীভূত হবার পর তা আগুনের রং ধারণ করে। এমন পরিস্থিতিতে যে-সব বস্তু খোদার নির্দেশের অধীনে থাকে, সেসব বস্তু তাদের নির্দেশাধীন এসে যায়। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র সূর্য ও চন্দ্র থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর সমুদ্র, বাতাস ও অগ্নি পর্যন্ত তাদের শব্দ শোনে এবং তাদের চেনে আর তাদের সেবায় রত থাকে। প্রতিটি জিনিস তাদের প্রকৃতিগতভাবে

*** টীকাঃ** কাফির এবং শত্রুও এক অর্থে তাদের সাহায্য করে অর্থাৎ কষ্ট দিয়ে ও অত্যাচার করে তাদের হৃদয়ে আঘাত হানে আর তাদের আধ্যাত্মিকতাকে উদ্দীপ্ত করে।

تا دل مرد خدا نا مد بدرد ہیچ قومے را خدا رسوا نہ کرد۔

যতক্ষণ খোদার কোনো বান্দার হৃদয়ে কেউ আঘাত না করে,
ততক্ষণ খোদা কোনো জাতিকে লাঞ্ছিত করেন না।

–লেখক

ভালোবাসে এবং নিষ্ঠাবান প্রেমিকের ন্যায় তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় কেবল দুষ্কৃতকারী মানুষ ছাড়া, যারা শয়তানের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে। নশ্বরপ্রেম এক অশুভ আসক্তি যা একদিকে সৃষ্টি হয় আবার অপরদিকে উবে যায়। এছাড়া এর ভিত্তি সেই ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের ওপর ধ্বংস পেতে বাধ্য। এছাড়া সেই সৌন্দর্যে প্রভাবিত লোকের সংখ্যা খুব কমই হয়ে থাকে। এটি কত-না আশ্চর্যজনক দৃশ্য যে, সেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য যা উত্তম ব্যবহার ও নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা এবং ঐশী ভালোবাসার বিকাশের পর মানুষের ভেতর সৃষ্টি হয় তাতে একটি সর্বজনীন আবেদন ও আকর্ষণ বিরাজমান থাকে, যা সোচ্চার লোকদের সেভাবে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে যেভাবে মধু পিঁপড়াকে আকর্ষণ করে থাকে। কেবল মানুষ নয় বরং বিশ্বের প্রতিটি বিন্দু সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়। সত্যিকার প্রেমিক মানুষ, যে সত্যিকার অর্থে খোদা তা'লাকে ভালোবাসে, সে সেই ইউসুফ– যার জন্য বিশ্বের প্রতিটি বিন্দু জুলেখার বৈশিষ্ট্য রাখে। অথচ তার সৌন্দর্য তখনও এই পৃথিবীতে প্রকাশিত থাকে না, কেননা এ পৃথিবী তা সহ্য করতে পারে না। খোদা তা'লা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থ কুরআন মজীদে বলেন, মুমিনদের জ্যোতি বা নূর তাদের চেহারায় সক্রিয় থাকে আর মুমিন সেই সৌন্দর্যের মাধ্যমে চিহ্নিত হয়, যার নাম অন্য ভাষায় নূর বা আলো।

একবার দিব্যদর্শনে পাঞ্জাবি ভাষায় মুমিনদের এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ এলহাম হয়–

عشق الٰہی وسے مُنہ پر ولیاں ایہہ نشانی

'মুখে খোদাপ্রেমের কথা বিরাজ করাই ওলীদের পরিচয়।' মুমিনের নূর যার কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তা সেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য যা মুমিনকে আধ্যাত্মিক সত্তার ষষ্ঠ স্তরে পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হয়ে থাকে। দৈহিক সৌন্দর্যের ক্রেতা এক বা দুব্যক্তি হয়ে থাকে কিন্তু এই বিস্ময়কর সৌন্দর্যের ক্রেতা হয়ে থাকে কোটি কোটি মানুষ। এই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের কারণে কেউ কেউ হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জীলানীর* প্রশংসায় নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি লিখেছে আর তাকে অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন আখ্যায়িত করেছে। সেই পঙ্‌ক্তি হলো–

---

* **টীকাঃ** প্রকৃতিগতভাবে কিছু প্রকৃতির অন্য কিছু প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য থাকে। একইভাবে আমার আত্মার সাথে সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানীর রূহের, সৃষ্টিগত প্রকৃতির

آن تُرکِ عجم چون زِ مئے عشق طرب کرد غارت گر ئے کوفہ و بغداد و حلب کرد

সেই বিদেশী সাধক যখন প্রেমের সুরায় মত্ত হলেন,
তিনি কুফা ও বাগদাদ এবং হালবের হৃদয় হরণ করলেন।

صد لالہ رُخے بود بصد حُسنِ شگفتہ نازان ہمہ را زیر قدم کرد عجب کرد

সেখানে ফুলের মতো সুন্দর শত শত চেহারা ছিল,
তিনি সব গর্বিত লোকদের সকলকে ছাপিয়ে গেছেন– এত আশ্চর্যজনক কাজ তিনি করেছেন!

শেখ সাদী (রহ.)-ও এ সম্পর্কে একটি পঙ্‌ক্তিতে লিখেছেন, যা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের সাথে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ আর তা হলো,

صورت گر دیبائے چیں رو صورتِ زیباش بین یا صورتے بر کش چنیں یا توبہ کن صورت گری

হে চীনের চিত্রকার! রেশমে যদি ছবি আঁকতে হয় তাহলে যাও আর তার চেহারার সৌন্দর্য দেখো।
এরপর হয় সেটির ন্যায় কোনো চেহারা অঙ্কন করো অথবা ছবি আঁকা হতে বিরত থাকো।

*** চলমান টীকাঃ** ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আছে যা সম্পর্কে আমাকে স্পষ্ট ও সত্য দিব্যদর্শনের মাধ্যমে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে একরাতে খোদা তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আমাকে তাঁর নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। তখন এই আশ্চর্যজনক দৈব বিষয় ঘটে, একজন প্রায় ৮০ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা সেই রাতে স্বপ্ন দেখেন আর সকালে এসে তিনি আমাকে বলেন যে, রাতে আমি সৈয়দ আব্দুল কাদের জীলানি (রা.)-কে স্বপ্নে দেখেছি, তার সাথে অন্য একজন বুযুর্গও ছিলেন। উভয়েই সবুজ রঙের পোশাক পরিহিত ছিলেন আর এটি ছিল রাতের শেষ প্রহর। দ্বিতীয় বুযুর্গ বয়সে তার চেয়ে কিছুটা ছোটো ছিলেন। প্রথমে তিনি আমাদের জামে মসজিদে নামায পড়েন, এরপর মসজিদের বাইরের উঠানে বের হন। আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ততক্ষণে পূর্বদিক থেকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র উদিত হয়। সে নক্ষত্র দেখে সৈয়্যদ আব্দুল কাদের অনেক আনন্দিত হন আর নক্ষত্রকে লক্ষ করে বলেন, আসসালামু আলাইকুম। একইভাবে তাঁর সাথিও আসসালামু আলাইকুম বলেন। আর সেই নক্ষত্র ছিলাম আমি। المؤمن یَرَی و یُرَی لہ- [অর্থাৎ কখনও মুমিন নিজে (আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে) দেখেন, আবার কখনও মুমিনের খাতিরে অন্যদেরকে কিছু দেখানো হয়। –অনুবাদক] –লেখক

এখন এটিও স্মরণ থাকা বাঞ্ছনীয় যে, খোদার এক বান্দা সদাচরণ প্রদর্শনপূর্বক খোদার জন্য নিজের নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা প্রদর্শন করে কিন্তু খোদা তা'লা এর বিপরীতে তার প্রতি অকল্পনীয় অনুগ্রহ করেন। বান্দার দ্রুত গতির বিপরীতে বিদ্যুতের ন্যায় তার দিকে ছুটে আসেন আর স্বর্গ ও মর্ত্য থেকে তার পক্ষে নিদর্শন প্রকাশ করেন; তার বন্ধুর বন্ধু আর তার শত্রুর শত্রু হয়ে যান। পঞ্চাশ কোটি মানুষও যদি তার বিরোধিতায় দণ্ডায়মান হয়, তাদের এমনভাবে লাঞ্ছিত ও অক্ষম করে দেন যেমনটি এক মৃত পোকা হয়ে থাকে। কেবল এক ব্যক্তির জন্য এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দেন। নিজের আকাশ ও ভূমিকে তার সেবক বানিয়ে দেন আর তার কথায় বরকত রেখে দেন। তার পুরো ঘরদোরে আলোর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তার পোশাক, তার খোরাক আর যে মাটিতে তার পা পড়ে সে মাটিতে একপ্রকার আশিস বর্ষণ করেন। তাকে ব্যর্থ মরতে দেন না। তার বিরদ্ধে উত্থাপিত প্রতিটি আপত্তির তিনি নিজেই উত্তর প্রদান করেন। তিনি তার চোখ হয়ে যান যা দ্বারা সে দেখে, তার কান হয়ে যান যা দ্বারা সে শোনে, তার জিহ্বা হয়ে যান যার মাধ্যমে সে কথা বলে, তার পা হয়ে যান যার দ্বারা সে হাঁটে, তার হাত হয়ে যান যার দ্বারা সে শত্রুর ওপর আক্রমণ করে। তার শত্রুদের মোকাবিলায় তিনি নিজে বের হন। দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে যারা তাকে দুঃখ দেয় তিনি নিজে তরবারি বের করেন। সকল ময়দানে তিনি তাকে বিজয় দান করেন আর অদৃষ্টের গোপন রহস্যাবলি তাকে অবহিত করেন। বস্তুত তার আধ্যাত্মিক শোভা ও সৌন্দর্যের প্রথম ক্রেতা খোদা– যা সুন্দর আচার আচরণ ও ব্যক্তিগত ভালোবাসার পর সৃষ্টি হয়। সুতরাং কত দুর্ভাগা তারা– যারা এমন যুগ পায় কিন্তু তাদের ওপর এমন সূর্য উদিত হওয়া সত্ত্বেও তারা অন্ধকারে বসে থাকে!

কোনো কোনো নির্বোধ বার বার এই আপত্তি করে যে, খোদার প্রিয়দের লক্ষণ হলো তাদের সকল দোয়া গৃহীত হয়। যার মাঝে এই লক্ষণ বা চিহ্ন দেখা যায় না সে খোদার প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত নয়।* পরিতাপের বিষয় হলো, তারা একটি কথা বলে বসে ঠিকই কিন্তু আপত্তি করার সময় চিন্তা করে না যে,

---

*** টীকাঃ** জানা কথা, মুমিনের সাথে খোদা তা'লার সম্পর্ক বন্ধুর মতো হয়ে থাকে। তিনি কখনো মুমিনের ইচ্ছা পূরণ করেন আর কোনো সময় মুমিন তার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট হয়ে যায়। অতএব একস্থানে মুমিনকে সম্বোধন করে বলেন,

এমন অজ্ঞোচিত আপত্তি খোদার সকল নবী-রসূলের বিরুদ্ধে বর্তায়। উদাহরণস্বরূপ সকল নবী চাইতেন যে, তাদের যুগের সকল কাফির মুসলমান হয়ে যাক, যারা তাদের বিরোধিতায় দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু তাদের এ বাসনা পূর্ণ হয় নি। এমনকি আমাদের নবী (সা.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ এদের ঈমান না আনার দুঃখে কি তুমি নিজেকে ধ্বংস করে দেবে? (আশ-শুআরা: ২)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.) কাফিরদের ঈমান আনার জন্য এতটা প্রাণপণে ও বিগলিতচিত্তে দোয়া করতেন যে, এ বেদনায় তার মারা যাবার আশঙ্কা দেখা দেয়! এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এদের জন্য এত দুঃখ করবে না আর নিজের হৃদয়কে এতটা দুঃখে জর্জরিত কোরো না, কেননা এরা ঈমান আনার বিষয়ে উদাসীন, এছাড়া এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এ ইঙ্গিত করেছেন, হে নবী (আ.)! তুমি যতটা দৃঢ়চিত্ত হয়ে পূর্ণ মনোযোগে বিগলিত চিত্তে নিজের আত্মাকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে

*** চলমান টীকা:**

اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থাৎ দোয়া করো, আমি তোমার দোয়া গ্রহণ করব (আল-মুমিন: ৬১)।

এখানে মুমিনের বাসনা পূর্ণ করতে চান আর অন্যত্র নিজের ইচ্ছা মুমিনকে মানাতে চান যেমন তিনি বলেন,

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

[অর্থ: আর আমরা অবশ্যই কিছুটা ভয়ভীতি ও ক্ষুধা আবার কিছুটা ধনসম্পদ ও জীবন এবং ফলফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করব। অতএব তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও, যারা তাদের ওপর বিপদ আসলে বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (বাকারা: ১৫৬-১৫৭) –অনুবাদক]

পরিতাপের বিষয় হলো নির্বোধ মানুষ শুধু একটি দিক দেখে, উভয় দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখে না। –লেখক

তাদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করে থাকো, কার্যকরী হবার ক্ষেত্রে সেসব দোয়ায় কোনো ঘাটতি নেই। কিন্তু দোয়া গৃহীত হবার শর্ত হলো, যার পক্ষে দোয়া করা হয় সে যেন বিদ্বেষী, উদাসীন ও নোংরা প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ না হয়; নতুবা দোয়া গৃহীত হবে না। খোদা যতটা আমাকে দোয়া সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন তা হলো, দোয়া গৃহীত হবার তিনটি শর্ত রয়েছে।

প্রথমত, দোয়াকারী ব্যক্তিকে পরম পর্যায়ের মুত্তাকী হতে হবে। কেননা খোদা তা'লার প্রিয় বান্দা সে হয়ে থাকে যার নীতি বা পরিচিতি হলো তাকওয়া এবং যে তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে। অধিকন্তু যে বিশ্বস্ত ও মুত্তাকী আর অঙ্গীকার রক্ষায় সত্যবাদী হবার কারণে খোদার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে; খোদার সত্তার ভালোবাসায় সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় শর্ত হলো, তার সংকল্প ও মনোসংযোগ এতটা দৃঢ় ও গভীর হওয়া উচিত যে, এক ব্যক্তিকে জীবিত করার জন্য যদি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে হয় তাহলে তার জন্যও যেন প্রস্তুত থাকে। এক ব্যক্তিকে কবর থেকে বের করার জন্য নিজেই কবরে চলে যাবে। এর অন্তর্নিহিত রহস্য হলো, যেভাবে কোনো মায়ের একমাত্র সুদর্শন পুত্র তার কাছে প্রিয় হয়ে থাকে, খোদার প্রিয় বান্দা তাঁর কাছে এর চেয়েও বেশি প্রিয় হয়ে থাকেন। সুতরাং একজন দয়ালু ও কৃপালু খোদা যখন দেখেন, তাঁর একজন প্রিয় ও গৃহীত বান্দা কারো প্রাণ রক্ষা করার জন্য আধ্যাত্মিক কষ্ট বরণ আর বিনয়াবনত প্রার্থনা ও চেষ্টা করতে করতে এমন স্তরে পৌঁছে গেছে যে, তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা, তখন ভালোবাসার সম্পর্কের কল্যাণে সেই অবস্থায় তাকে ধ্বংস করবেন– তা তাঁর পছন্দ নয়। তার কারণে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির পাপ ক্ষমা করে দেন, যে দোষে সে ধরা পড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ সে যদি কোনো ধ্বংসাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে বা কোনো বিপদে পড়ে নিরুপায় ও অসহায় হয়ে যায়, তখন তিনি স্বীয় কুদরতে এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যার সুবাদে সে মুক্তি পেতে পারে। অনেক সময় নিশ্চিতভাবে এক ব্যক্তিকে তিনি ধ্বংস করার বা মিটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, কিন্তু সমস্যাকবলিত ব্যক্তির মাঝে সৌভাগ্যবশত যখন বেদনাঘন কাকুতিমিনতি নিয়ে এমন ব্যক্তি এসে যায় যার মহাসম্মানিত খোদার সন্নিধানে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, তখন শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে সংকলিত মোকাদ্দমার সম্পূর্ণ নথি ছিড়ে ফেলতে হয়; কেননা

বিষয় তখন আর অপরজনের থাকে না বরং বন্ধুর– তাই এটি কীভাবে সম্ভব যে, খোদা তাঁর বন্ধুদের শাস্তি দেবেন?

দোয়া গৃহীত হবার তৃতীয় শর্তটি এমন– যা সকল শর্তের চেয়ে বেশি কঠিন, কেননা এটি পূর্ণ করার বিষয়টি খোদার প্রিয় বান্দাদের হাতে থাকে না বরং তার হাতে থাকে যে দোয়া করাতে চায়। অর্থাৎ তাকে পরম নিষ্ঠা, গভীর শ্রদ্ধা, দৃঢ় বিশ্বাস আর প্রগাঢ় ভালোবাসা ও পূর্ণ দাসত্বের প্রেরণা নিয়ে দোয়ার প্রত্যাশী হতে হয় আর হৃদয়ে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, দোয়া গৃহীত না হলেও তার বিশ্বাস ও ভালোবাসায় কোনো পরিবর্তন আসবে না। দোয়া করানো যেন পরীক্ষাস্বরূপ না হয় বরং সত্য বিশ্বাস হিসেবে হয় এবং অতি ভালোবাসার সাথে যেন তাঁর দ্বারে ধরনা দেয়। যথাসাধ্য ধনসম্পদের মাধ্যমে সেবা করে ও সকল প্রকার আনুগত্য করে তার অন্তরে স্থান করে নেবার মতো নৈকট্য গড়ে তোলে। এর পাশাপাশি যেন পরম সুধারণা পোষণ করে, তাকে পরম মুত্তাকী জ্ঞান করে আর তার পবিত্র মর্যাদার বিরুদ্ধে একটি কথাও চিন্তা করাকে কুফরী মনে করে। এ ধরনের নানা প্রকার আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সত্যিকার বিশ্বাস তার কাছে যেন স্পষ্ট করে দেয় এবং পৃথিবীতে কাউকে তার মতো মনে না করে। প্রাণ, সম্মান ও সম্পদ উজাড় করে যেন তার জন্য নিবেদিত হয়। সম্মানহানি হয় এমন কোনো শব্দ তার সম্পর্কে যেন মুখে না আনে বরং এমন কথা চিন্তাও না করে। একথা তার সামনে যেন প্রমাণ করে দেয় যে, সে সত্যিকার অর্থে এমনই ভক্তি ও ভালোবাসা রাখে এবং সে এ মানের শিষ্য। এত সবকিছু সত্ত্বেও সে যেন ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করে। নিজের কাজে পঞ্চাশ বারও যদি সে ব্যর্থ হয় তবুও ঈমান ও বিশ্বাসে যেন শৈথিল্য না দেখায়, কেননা এ জাতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর চিন্তাধারার অধিকারী হয়ে থাকে আর তাদের বিচক্ষণতা চেহারা দেখে চিনতে পারে যে, এ ব্যক্তি কেমন আন্তরিকতা রাখে। এরা এমন লোক– পরম কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়েও যারপরনাই পরবিমুখ হয়ে থাকে। তাদের হৃদয়কে খোদা তা'লা এমন পরবিমুখ বানিয়েছেন যে, অহংকারী, স্বার্থপর ও মুনাফিক প্রকৃতির মানুষের প্রতি আদৌ তারা ভ্রূক্ষেপ করেন না। কেবল তারাই এসব লোক হতে উপকৃত হয় যারা তাদের এমন ভৃত্যসুলভ আনুগত্য করে, যেন মারাই যাবে। কিন্তু সে ব্যক্তি– যে পদে পদে সন্দেহ করে এবং হৃদয়ে আপত্তি লালন করে আর পূর্ণ ভালোবাসা ও আন্তরিকতা রাখে না, সে উপকৃত হবার পরিবর্তে ধ্বংস হয়।

এসব কথা বলার পর আমরা বলছি যে, খোদা তা'লা মুমিনের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের ছয়টি স্তর বর্ণনা করে সেগুলোর বিপরীতে দৈহিক অস্তিত্বের ছয়টি স্তর দেখিয়েছেন। এটি একটি জ্ঞানগত নিদর্শন। পৃথিবীর যত গ্রন্থ ঐশী গ্রন্থ আখ্যায়িত হয় আর যে-সব জ্ঞানী ব্যক্তি জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে কলম হাতে নিয়েছেন বা যারা সূফীদের রীতি অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের কারো ধ্যান ইতিপূর্বে এদিকে যায় নি যে, তারা দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের তুলনা করে দেখাবে। কেউ যদি আমার এই দাবিকে সঠিক মনে না করে আর মনে করে যে, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার এই তুলনা অন্য কেউ করে দেখিয়েছে তাহলে তার জন্য আবশ্যক হলো, এ জ্ঞানগত বা বৈজ্ঞানিক নিদর্শন অন্য কোনো কিতাব থেকে উপস্থাপন করে দেখানো। আমি তওরাত, ইনজীল এবং হিন্দুদের বেদও দেখেছি। কিন্তু আমি সত্য করে বলছি যে, জ্ঞানগত এমন নিদর্শন আমি কুরআন ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থে পাই নি। কেবল এ নিদর্শনই নয় বরং সমগ্র কুরআন শরীফ এমনই জ্ঞানগর্ভ নিদর্শনে পরিপূর্ণ যাতে একজন বুদ্ধিমান মানুষ দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে সক্ষম। এটি সেই সর্বশক্তিমান খোদার বাণী, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মাঝে যার ক্ষমতা প্রকাশমান অর্থাৎ সেই খোদার– যিনি নিজের কথা ও কাজে অনন্য ও অতুলনীয়। এছাড়া একদিকে যখন আমরা কুরআনে এমন নিদর্শনাবলি দেখতে পাই অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর অক্ষরজ্ঞানহীনতা দেখি এবং একথা চিন্তা করি যে, তিনি একটি অক্ষরও কোনো শিক্ষকের কাছে শেখেন নি, তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনের কিছুই (শিক্ষকের নিকট) আয়ত্ব করেন নি বরং তিনি এমন একটি জাতিতে জন্ম নিয়েছেন যার পুরোটাই ছিল নিরক্ষর ও অশিক্ষিত, যারা বণ্যপ্রাণীর মতো জীবন কাটাতো। অপরদিকে তিনি পিতামাতার পক্ষ থেকে তরবিয়ত বা শিক্ষাদীক্ষার যুগও পান নি। অতএব এসব কথা সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কুরআন শরীফ যে খোদার পক্ষ থেকে এসেছে, সে বিষয়ে এত স্পষ্ট ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমাদের লাভ হয় আর এটির জ্ঞানগত নিদর্শন হওয়া এতটা দৃঢ়ভাবে আমাদের হৃদয়ে বসে যায় যে, আমরা যেন সেটি দেখার মাধ্যমে খোদাকে দেখি। অতএব যখন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, সূরা আল-মুমিনূনের সূচনা থেকে فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحۡسَنُ الۡخٰلِقِيۡنَ (আল-মুমিনূন: ১৫) পর্যন্ত সব ক'টি আয়াত হলো বৈজ্ঞানিক নিদর্শন, সেখানে এতে কী সন্দেহ থাকতে পারে যে, আয়াত فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحۡسَنُ الۡخٰلِقِيۡنَ জ্ঞানগত নিদর্শনের একটি অংশ আর নিদর্শনের অংশ হবার কারণে নিদর্শনের অন্তর্গত আর এটিই প্রমাণ করা হলো উদ্দেশ্য।

স্মরণ রাখা উচিত, উল্লিখিত এই জ্ঞানগত বা বৈজ্ঞানিক নিদর্শন এমন একটি পরিষ্কার, প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল আর স্পষ্ট সত্য যে, খোদার বাণীর এ বিষয়ে পথনির্দেশনা ও স্মরণ করিয়ে দেবার পর বুদ্ধিও সেটিকে নিজের যৌক্তিক জ্ঞানে অত্যন্ত গর্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তুত।

কেননা বিবেকের কাছে একথা স্পষ্ট যে, সর্বপ্রথম একজন পুণ্য প্রকৃতির মানুষের ভেতর খোদাকে সন্ধানের জন্য খোদার দিকে যে একটি গতি সৃষ্টি হয় সেটি হলো বিনয় ও নম্রতা। খুশূ বলতে খোদা তা'লার জন্য বিনয় ও নম্রতা আর কাতরতা বুঝায় আর এর বিপরীতে রয়েছে নোংরা ও মন্দ চরিত্র যেমন অহংকার, আত্মগর্ব, ভণ্ডামি, উদাসীনতা ও অহমিকা। এ সবকিছু খোদা তা'লার ভয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত। একথা স্পষ্ট যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার মন্দ চরিত্র পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ সেসব দুশ্চরিত্রের মোকাবিলায় যে উত্তম চরিত্র রয়েছে যা খোদা পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম, তা গ্রহণ করতে পারে না। কেননা দুটি বিপরীত অবস্থা এক হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'লা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। যেমন সূরা বাকারার প্রারম্ভে তিনি বলেন, هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ কুরআন শরীফ তাদের জন্য হিদায়াত যারা মুত্তাকী অর্থাৎ যারা অহংকার করে না আর বিনয় ও নম্রতার সাথে খোদার বাণী সম্পর্কে চিন্তা ও প্রণিধান করে, আর তারাই অবশেষে হিদায়াত পায়। এখানে একথাও স্মরণ রাখা উচিত, এ আয়াতগুলোতে ছয় স্থানে আফলাহা শব্দ বিদ্যমান। প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

আর পরবর্তী আয়াতগুলোতে আতফ বা সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে বলে বুঝা যায়। অভিধানে আফলাহা-র অর্থ হলো اُصِيْرَ اِلَى الْفَلَاحِ অর্থাৎ সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং গতি সঞ্চার করা হয়েছে। সুতরাং এ অর্থের নিরিখে এটি মুমিনের নামাযে সাফল্যের জন্য প্রথম পদক্ষেপ, যার পাশাপাশি অহংকার ও আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি পরিহার করতে হয়। এক্ষেত্রে সাফল্য হলো, মানুষের নফস বিনয়ের বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের মাধ্যমে খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রস্তুত ও সোচ্চার হয়ে যায়।

সুস্থ বিবেকের দৃষ্টিতে মুমিনের দ্বিতীয় কাজ, যার মাধ্যমে ঈমানী শক্তি দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছে আর পূর্বের চেয়ে ঈমান কিছুটা দৃঢ় হয়ে যায় তা হলো,

বিনয়ের স্তরে উপনীত মুমিনের নিজ হৃদয়কে বাজে চিন্তাধারা ও বাজে কার্যকলাপ থেকে পবিত্র রাখা। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে নিরর্থক চিন্তা ও কাজ বর্জনের ন্যূনতম শক্তিটুকু অর্জন করতে না পারে– যা মোটেও কঠিন কিছু নয় এবং যা নিছক আনন্দহীন ভোগবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়– ততক্ষণ তার থেকে এমনসব কর্ম ত্যাগের আশা করা বৃথা, যা বর্জন করা নফসের (তথা প্রবৃত্তির) জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং যাতে নফসের কোনো না কোনো স্বার্থ বা আনন্দ নিহিত থাকে। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হলো, প্রথম স্তর অর্থাৎ অহংকার পরিহার করার পর দ্বিতীয় স্তর হলো বৃথা কার্যকলাপ বর্জন করা। মুমিনের যখন বৃথা ও বাজে কার্যকলাপের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয় তখন খোদা তা'লার সাথে তার একটি হালকা সম্পর্ক গড়ে ওঠে আর ঈমানের শক্তিও পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। لَعَلَّ (আফলাহা) শব্দের মাধ্যমে এ স্তরে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা এভাবে পূর্ণ হয়। হালকা সম্পর্ক বলার কারণ হলো, বৃথা কার্যকলাপের সাথেও সম্পর্ক হালকা-ই হয়ে থাকে। সুতরাং হালকা সম্পর্ক পরিহার করলে হালকা সম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর সুস্থ বিবেকের মতে মুমিনের তৃতীয় কাজ, যার কল্যাণে ঈমানী শক্তি তৃতীয় স্তরে উপনীত হয় তা হলো, সে কেবল বৃথা কাজ বা বৃথা কথাবার্তাই খোদার জন্য পরিত্যাগ করে না বরং নিজের প্রিয় সম্পদও খোদার জন্য ব্যয় করে। এটি স্পষ্ট যে, নিরর্থক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করার চেয়ে সম্পদ ত্যাগ করা নফসের জন্য অধিক কঠিন বিষয়, কেননা তা কষ্টে উপার্জিত ও একটি বড়ো উপকারী জিনিস হয়ে থাকে, যার ওপর হয়ে থাকে সুখী জীবন ও আরামের ভিত্তি। সে কারণে খোদার সন্তুষ্টির জন্য সম্পদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা নিরর্থক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করার চেয়ে অধিক ঈমানী শক্তির দাবি রাখে। আয়াতে لَعَلَّ শব্দে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এখানে এর অর্থ হলো, অন্য স্তরের তুলনায় এ পর্যায়ে ঈমানী শক্তি ও খোদার সাথে সম্পর্ক অধিক দৃঢ় হয়ে থাকে আর এতে নফস বা আত্মার শুদ্ধি লাভ হয়। কেননা নিজ হাতে কষ্টার্জিত অর্থসম্পদ খোদার ভয়ে খরচ করা নফসের পবিত্রতা ছাড়া সম্ভব নয়।

এরপর সুস্থ বিবেকের কাছে মুমিনের চতুর্থ কাজ, যার ফলে ঈমানী শক্তি চতুর্থ স্তরে উপনীত হয় তা হলো, খোদা তা'লার পথে কেবল সম্পদ ছেড়ে দেয় না বরং সেসব জিনিস পরিত্যাগ করে যেগুলোকে সে খোদার চেয়ে বেশি

ভালোবাসে অর্থাৎ জৈবিক কামনা-বাসনা বা সেসবের অবৈধ দিকগুলো। আমরা বলে এসেছি যে, প্রত্যেকেই নিজের অবাধ্য প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে প্রকৃতিগতভাবে সম্পদ থেকে বেশি প্রিয় জ্ঞান করে এবং নিজের সম্পদ এর জন্য উৎসর্গ করে। সুতরাং নিঃসন্দেহে সম্পদ ছেড়ে দেবার চেয়ে খোদার জন্য কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করা অনেক কঠিন বিষয়। আর اَنْفِقُوْا শব্দ যা এ আয়াতের সাথেও সম্পর্ক রাখে তার এখানে অর্থ হলো, যেভাবে জৈবিক কামনা-বাসনার সাথে মানুষের প্রকৃতিগতভাবে নিবিড় সম্পর্ক থাকে ঠিক সেভাবে তা পরিত্যাগ করার পর খোদার সাথে গভীর সম্পর্ক হয়ে যায়, কেননা যে ব্যক্তি খোদার জন্য কোনো জিনিস হারায় সে তার চেয়ে উত্তম কিছু পায়।

لُطفِ او ترک طالبان نہ کند　　کس بہ کارِ رہش زیان نہ کند

তাঁর স্নেহ কখনো সন্ধানীদের পরিত্যাগ করে না
কেউ তাঁর পথে কাজ করে ব্যর্থ হয় না।

ہر کہ آن راہ جُست یافتہ است　　تافت آن رو کہ سرنتافتہ است

যে-ই সেই পথ সন্ধান করে সে পেয়ে যায়,
সেই চেহারা আলোকিত হয়ে যায় যে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না।

এরপর যুক্তির নিরিখে মুমিনের পঞ্চম কাজ, যার মাধ্যমে ঈমানী শক্তি পঞ্চম স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায় তা হলো, কেবল অবাধ্য প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাই পরিত্যাগ করা নয়, বরং খোদার পথে যেন প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং তা বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রাণ– যা খোদার আমানত, যেন সেই মালিককে প্রত্যর্পণ করে আর প্রাণের সাথে যেন কেবল ততটা সম্পর্ক রাখে যতটুকু কোনো আমানতের সাথে সম্পর্ক থাকে। তাকওয়ার সূক্ষ্ম দাবিসমূহ যেন এমনভাবে পূর্ণ করে যেন নিজের প্রাণ,* সম্পদ তথা সবকিছুকে খোদার পথে উৎসর্গ করে দিয়েছে। এদিকেই আয়াত–

*** টীকাঃ** যেমন আত্মা আল্লাহ তা'লার আমানত, তেমনি সম্পদও আল্লাহ তা'লার আমানত। অতএব যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের সম্পদ থেকে যাকাত দেয়, সে সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পদকে আল্লাহ তা'লার আমানত মনে করে, সে নিজের সমস্ত সম্পদকে আল্লাহ তা'লার সম্পদ জ্ঞান করে এবং সবসময় আল্লাহর পথে দানখয়রাত করা অব্যাহত রাখে, যদিও তার জন্য কোনো যাকাত দেওয়া আবশ্যক নয়। –লেখক

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

(আল-মুমিনূন: ৯)

ইঙ্গিত করে। অতএব যেখানে মানুষের প্রাণ, সম্পদ ও সকল প্রকার আরাম খোদার আমানত যা প্রত্যর্পন করা আমীন হবার শর্ত, তাই প্রাণ দেবার অর্থ হলো, এই আমানত খোদার পথে উৎসর্গ করে সেভাবে খোদার সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ স্বীকার করা। আর দ্বিতীয়ত, ঈমান আনার সময় খোদার সাথে তার যে অঙ্গীকার ছিল, অধিকন্তু সৃষ্টির প্রতি যে অঙ্গীকার ও তাদের আমানতসমূহ তার কাছে গচ্ছিত আছে সেসব এমন তাকওয়া বা খোদাভীতির নিরিখে পালন করা উচিত যেন সেটি এক সত্যিকার কুরবানী গণ্য হয়। কেননা তাকওয়ার সূক্ষ্ম দিকগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করা এক ধরনের মৃত্যুবরণ করা বইকি। এ আয়াতে বিধৃত اَفْلَحَ শব্দের অর্থ হলো, যখন এ স্তরের মুমিন খোদার পথে জীবন বাজি রাখে এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম দিকগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন খোদার পক্ষ থেকে ঐশী জ্যোতি তার সত্তাকে পরিবেষ্টন করে তাকে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য দান করে। এটি ঠিক সেভাবে হয় যেভাবে মাংস হাড়ে চড়ে সেগুলোকে সৌন্দর্য দান করে, যা ইতিমধ্যে আমরা লিখে এসেছি। এ উভয় অবস্থার নাম খোদা তা'লা 'লেবাস' রেখেছেন। তাকওয়ার নামই হলো 'লেবাস' যেমনটি আল্লাহ তা'লা বলেন, لِبَاسُ التَّقْوٰى (আল-আরাফ: ২৭) যে মাংস হাড়ে চড়ে তা-ও লেবাস যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন, فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا (আল-মুমিনূন: ১৫) কেননা كَسَونَا লেবাসকে বলা হয় যা হতে كَسَونَا শব্দ উদ্ভূত।

এখন স্মরণ রাখা উচিত, পুণ্যের যাত্রায় শেষ মার্গ হলো পঞ্চম স্তর। পঞ্চম স্তর যখন পরম মার্গে উপনীত হয় তখন আসে ষষ্ঠ স্তর, যা হলো কেবল একটি দানস্বরূপ। কোনো চেষ্টা ও পরিশ্রম ছাড়া মুমিন এটি প্রদত্ত হয় আর পরিশ্রমের তাতে কোনো ভূমিকা নেই। তা হলো, যেভাবে মুমিন খোদার পথে নিজের প্রাণ বিকিয়ে দেয় সেভাবে তাকে এক প্রাণ প্রদান করা হয়। কেননা সৃষ্টির সূচনা হতে এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যে কেউ খোদার পথে কিছু হারাবে সে তা ফিরে পাবে। তাই যারা প্রাণ বিসর্জন দেয়, তারা তা ফিরে পায়। সুতরাং যেহেতু মুমিন ব্যক্তিগত ভালোবাসার প্রেরণায় খোদার পথে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়, তাই খোদার ব্যক্তিগত ভালোবাসার প্রাণ বা রূহকে পেয়ে যায়, যার সাথে রূহুল কুদুস থাকে। খোদার জন্য ব্যক্তিগত ভালোবাসা একটি রূহ বা প্রাণ হয়ে থাকে যা মুমিনের ভেতর সক্রিয় থাকে। এটি যেহেতু রূহ বা প্রাণ

তাই রূহুল কুদুস তা থেকে পৃথক হয় না। যেহেতু এই ভালোবাসা ও রূহুল কুদুসের মাঝে কখনো বিচ্ছিন্নতা বা (একে অন্য হতে) পৃথক হওয়া সম্ভব নয় সে কারণে আমরা প্রায় স্থানে শুধু খোদার সত্তার ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছি আর রূহুল কুদুসের নাম নেই নি। যেহেতু এগুলো পরস্পর সম্পৃক্ত আর যখন কোনো মুমিনের প্রতি অবতীর্ণ হয় তখন ইবাদতের সকল বোঝা তার মাথা হতে নেমে যায় আর তার ভেতরে এমন একটি শক্তি ও স্বাদ সৃষ্টি হয় যে, সেই শক্তি কৃত্রিমভাবে নয় বরং সহজাত উদ্দীপনার মাধ্যমে তাকে খোদা স্মরণ করায় এবং তাকে প্রেমিকসুলভ আবেগ দান করে। সুতরাং এমন মুমিন জিবরাইল (আ.)-এর মতো সর্বদা খোদার দরবারে উপস্থিত থাকে আর মহাসম্মানিত খোদার স্থায়ী সান্নিধ্য সে লাভ করে যেমনটি কিনা আল্লাহ তা'লা এই স্তর সম্পর্কে বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

(আল-মুমিনূনঃ ১০)

অর্থাৎ কামিল বা সিদ্ধ মুমিন তারা, যাদের এমন স্থায়ী সান্নিধ্য লাভ হয় যার কল্যাণে তারা সদা নিজেদের নামাযের নিজেরাই সুরক্ষা করে থাকে। এটি এদিকে ইঙ্গিত করে যে, এ পর্যায়ের মুমিন নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য নামাযকে একটি আবশ্যকীয় বিষয় বলে মনে করে এবং এটিকে নিজের খাবার আখ্যা দেয় যা ব্যতীত সে জীবিত থাকতে পারে না। এ পদমর্যাদা সেই রূহ বা প্রাণ ছাড়া অর্জিত হতে পারে না, যা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মুমিনের প্রতি অবতীর্ণ হয় কেননা মুমিন যখন খোদা তা'লার জন্য নিজের জীবনের মায়া ছেড়ে দেয় তখন অপর একটি জীবন লাভের সে যোগ্য হয়ে যায়।

এ পুরো বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুস্থ বিবেকের কাছে এ ছয়টি স্তর সেই মুমিনের পথে বিরাজমান– যে নিজের আধ্যাত্মিক সত্তাকে পরম মার্গে পৌঁছাতে চায়। প্রত্যেক ব্যক্তি একটু ভাবলেই অতি সহজে বুঝতে পারে, মুমিনের আধ্যাত্মিক সফরে সে ছয়টি অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করে। এর কারণ হলো, যতদিন মানুষ খোদা তা'লার সাথে পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন না করবে ততদিন তার ব্যক্তিত্ব পাঁচটি ত্রুটিপূর্ণ অবস্থাকে ভালোবেসে থাকে। প্রত্যেক অবস্থার ভালোবাসা দূর করার জন্য এমন একটি বিষয় বা কারণের প্রয়োজন হয় যা এই ভালোবাসার ওপর জয়যুক্ত হবে এবং নূতন ভালোবাসা পূর্বের ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

যেমন প্রথম অবস্থা যাকে সে ভালোবাসে তা হলো, সে একটি ঔদাসীন্যের মাঝে পড়ে থাকে আর খোদার সাথে তার পুরো দূরত্ব বজায় থাকে। তার জীবন একটি অবিশ্বাসের ভেতর কেটে যায়। ঔদাসীন্যের পর্দা তাকে অহংকার, ঔদাসীন্য ও পাষণ্ডতার দিকে নিয়ে যায় আর বিনয় কাকুতিমিনতি নম্রতা ইত্যাদির নামচিহ্নও তার মাঝে থাকে না। নিজের এ অবস্থাকে সে ভালোবাসে এবং এটিকে নিজের জন্য ভালো মনে করে। এরপর খোদার কৃপা যখন তার সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেয় তখন কোনো ঘটনা বা বিপদাপদ দেখা দেবার কারণে তার হৃদয়ে খোদার মাহাত্ম্য, ভীতি ও প্রতাপ তাকে ত্রস্ত করে। এর প্রভাবে তার মাঝে বিনয় ও নম্রভাব সৃষ্টি হয়ে যায়, যা তার অহংকার অবাধ্যতা ও ঔদাসীন্যের অভ্যাসকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয় আর এসব তার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করে। এটি এমন একটি বিষয়, সদা-সর্বদা পৃথিবীতে যার অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। দেখা যায় যে, খোদার রুদ্ররূপ প্রকাশক চাবুক যখন কোনো ভীতিকর পোশাকে অবতীর্ণ হয়, বড়ো বড়ো দুষ্কৃতকারীকে তা ঝুঁকিয়ে দেয় আর ঔদাসীন্যের নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে তাকে কাকুতিমিনতি করতে বাধ্য করে। এটি খোদার দিকে প্রত্যাবর্তনের সেই প্রথম স্তর যা খোদার মাহাত্ম্য ও প্রতাপ প্রত্যক্ষ করার পর বা অন্য কোনোভাবে একজন পুণ্যবান মানুষের অর্জিত হয়। যদিও সে পূর্বে নিজের উদাসীন এবং লাগামহীন জীবনকে ভালোবাসত, কিন্তু যখন প্রথম প্রভাব থেকে শক্তিশালী বিরোধী প্রভাব সৃষ্টি হয় তখন পূর্বের অবস্থা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হয়।

এরপর দ্বিতীয় অবস্থা হলো, এমন মুমিনের খোদার দিকে কিছুটা মনোযোগ নিবদ্ধ হয় ঠিকই কিন্তু সেই প্রত্যাবর্তনের সাথে নিরর্থক কথা, কাজ এবং বাজে বিনোদনের নোংরামি লেগেই থাকে, যেগুলোকে সে পছন্দ করে ও ভালোবাসে। অবশ্য নামাযে কোনো কোনো সময় তার বিনয় এবং কাকুতিও প্রকাশ পায় কিন্ত বাজে কার্যকলাপ তার সাথে লেগেই থাকে। বাজে সম্পর্ক, বাজে বৈঠক ও অর্থহীন হাসিঠাট্টা তার জীবনের অংশ হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে দ্বৈত আচরণ প্রদর্শন করে। এখন একরকম পরক্ষণে ভিন্ন রকম আচরণ করে।

واعظاں کیں جلوہ بر محراب و منبر مے کنند چوں بخلوت مے روند آن کارِ دیگر مے کنند

ওয়াযকারীরা মেহরাব ও মিম্বরে ধার্মিকতা প্রদর্শন করে,
কিন্তু যখন অগোচরে যায়– তখন অন্য কিছু করে।

ঐশী কৃপা যেহেতু তাকে ধ্বংস করতে চায় না তাই খোদার মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও ভীতির এমন প্রকাশ তার হৃদয়ে ঘটে যা পূর্ববর্তী বিকাশ থেকে বেশি প্রখর হয়ে থাকে, যার ফলে ঈমানের শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। এটি মুমিনের হৃদয়ে আগুনের মতো পতিত হয়ে বাজে ধ্যানধারণা নিমিষেই ভস্মীভূত করে ফেলে। খোদার মাহাত্ম্য ও প্রতাপের এই বিকাশ তার হৃদয়ে মহাসম্মানিত খোদার এত গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে যা বৃথা কার্যকলাপ ও বাজে বিনোদনের ওপর জয়যুক্ত হয় আর সেগুলোকে দূর করে সেগুলোর স্থান নিয়ে নেয় খোদার মাহাত্ম্য আর সকল বাজে আকর্ষণের প্রতি হৃদয়কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে, তখন বৃথা কাজের প্রতি হৃদয়ে এক ঘৃণা জন্মে।

বাজে কার্যকলাপ ও নিরর্থক ব্যস্ততা দূর হবার পর মুমিনের মাঝে একটি তৃতীয় অপছন্দনীয় অবস্থা বাকি থেকে যায়, যাকে সে দ্বিতীয় অবস্থার চেয়ে অনেক ভালোবাসে। অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে সম্পদের প্রতি তার হৃদয়ে মোহ থেকে থাকে, কেননা সে সম্পদকে নিজের জীবন ও সুখের কেন্দ্রবিন্দু মনে করে আর নিজের পরিশ্রম ও কষ্টকে তা অর্জনের উপায় বলে মনে করে; এ কারণে খোদার পথে সম্পদ বিসর্জন দেওয়া তার কাছে অনেক ভারি ও কঠিন কাজ বলে মনে হয়।

এরপর ঐশী কৃপা যখন তাকে সেই ভয়াবহ ঘূর্ণি থেকে উদ্ধার করতে চায় তখন খোদার জীবিকা প্রদান-সংক্রান্ত জ্ঞান তাকে দেওয়া হয়ে থাকে আর তার ভেতর খোদা-নির্ভরতার বীজ বপন করা হয়, একই সাথে খোদাভীতিও কাজ করে। খোদার সৌন্দর্য ও মহিমা-সংক্রান্ত বিকাশ তার হৃদয়কে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। তখন সম্পদের ভালোবাসা হৃদয় থেকে বেরিয়ে যায় আর সম্পদ দাতার ভালোবাসা হৃদয়ে বপন করা হয় এবং ঈমান দৃঢ় হয়ে যায়। এই ঈমানী শক্তি তৃতীয় স্তরের ঈমানী শক্তি হতে দৃঢ় হয়ে থাকে কেননা মুমিন কেবল অনর্থক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে না বরং নিজের সম্পদ ছেড়ে দেয়, যার ওপর তার নিজের সুখীসমৃদ্ধ জীবন নির্ভরশীল বলে মনে করে। তার ঈমানকে যদি খোদার ওপর নির্ভর করার শক্তি দেওয়া না হতো এবং সত্যিকার জীবিকা দাতার পানে যদি চোখের দরজা খোলা না হতো তাহলে কার্পণ্যের ব্যাধি দূর হওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। অতএব এই ঈমানী শক্তি কেবল বৃথা কার্যকলাপ থেকেই মুক্ত করে না বরং খোদা যে রিযকদাতা– সে কথায় দৃঢ়বিশ্বাস সৃষ্টি করে আর খোদানির্ভরতা হৃদয়ে সঞ্চার করে। তখন সম্পদ

যেটিকে কলিজার টুকরো মনে করা হয় খুব সহজে ও স্বপ্রণোদিত হয়ে বড়োমনের পরিচয় দিয়ে মুমিন খোদার পথে দিয়ে দেয় আর কার্পণ্যের মাঝে যে দুর্বলতা নৈরাশ্যের কারণে সৃষ্টি হয়, খোদার প্রতি অনেক আশা ও আস্থার কল্যাণে সেসব দুর্বলতা দূর হয়ে যায় আর সম্পদ দাতার ভালোবাসা সম্পদের ভালোবাসার চেয়ে বেড়ে যায়।

এরপর রয়েছে চতুর্থ অবস্থা, যাকে নফসে আম্মারা বা অবাধ্য প্রবৃত্তি অনেক বেশি ভালোবাসে আর যা তৃতীয় অবস্থা হতেও ঘৃণ্য, কেননা তৃতীয় অবস্থায় কেবল নিজের হাত থেকে সম্পদ ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু চতুর্থ অবস্থায় নফসে আম্মারার নিষিদ্ধ কামনা-বাসনাকে পরিহার করতে হয়। এটি জানা কথা যে, কামনা-বাসনা বর্জনের চেয়ে মানুষের জন্য সম্পদ ছেড়ে দেওয়া স্বভাবজভাবে সহজ হয়ে থাকে। এই কারণে এ অবস্থাটি পূর্ববর্তী অবস্থা হতে অনেক কঠিন ও ভয়াবহ। স্বাভাবিকভাবে মানুষের কাছে কামনা-বাসনার সাথে সম্পর্ক সম্পদের তুলনায় অনেক বেশি প্রিয় হয়ে থাকে। এ কারণে সে সম্পদ যা তার দৃষ্টিতে স্বাচ্ছন্দ্যের কেন্দ্রবিন্দু তা সানন্দে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য জলাঞ্জলি দেয়। এ অবস্থায় যে ভয়াবহ উত্তেজনা বিরাজ করে তার প্রমাণ সম্পর্কে আয়াত–

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ

(ইউসুফ: ২৫)-ই যথেষ্ট অর্থাৎ এটি এমন অপ্রতিরোধ্য উত্তেজনা যা দূরীভূত হবার জন্য মানুষ কোনো শক্তিশালী প্রমাণের বা কারণের মুখাপেক্ষী থাকে। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, চতুর্থ স্তরে ঈমানী শক্তি তৃতীয় স্তর হতে অনেক দৃঢ় হয়ে থাকে আর খোদা তা'লার মাহাত্ম্য ও ভীতি এবং প্রতাপের অভিজ্ঞতা তার মাঝে পূর্বের চেয়ে বেশি দেখা যায়। কেবল এতটাই নয় বরং এতে যে নিষিদ্ধ আনন্দ-উল্লাসকে পরিহার করা হয়েছে তার জায়গায় আধ্যাত্মিকভাবে কোনো আনন্দ লাভ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কার্পণ্য দূর করার জন্য যেভাবে জীবিকা দাতা হিসেবে খোদার শক্তিশালী ঈমানের প্রয়োজন আর পকেট খালি থাকা অবস্থায় একটি দৃঢ় খোদানির্ভরতার প্রয়োজন হয়, যেন কার্পণ্য দূর হয়ে যায় আর অদৃশ্য বিজয়ে দৃঢ় আশা জাগে, একইভাবে অবাধ্য প্রবৃত্তির অপবিত্র কামনা-বাসনা দূরীভূত করার জন্য আর কামাগ্নি থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সেই আগুনের অস্তিত্বে শক্তিশালী ঈমান থাকা আবশ্যক যা দেহ ও আত্মা

উভয়টিকে ভয়াবহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। একইসাথে সেই আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ হওয়া আবশ্যক যা সেসব স্থূল সুখের বিষয়ে ভ্রূক্ষেপহীন ও বিমুখ করে তোলে। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কামনা-বাসনার থাবায় বন্দি সে এক সাঁপের মুখে রয়েছে যার বিষ অত্যন্ত ভয়াবহ। সুতরাং এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, যেভাবে অনর্থক কাজের ব্যাধি কার্পণ্যের ব্যাধি হতে বেশি ভয়াবহ, একইভাবে কার্পণ্যের ব্যাধির বিপরীতে নিষিদ্ধ কামনা-বাসনার থাবায় বন্দি হওয়া সকল সমস্যা থেকে বড়ো সমস্যা যা খোদার একটি বিশেষ কৃপার মুখাপেক্ষী। খোদা যখন কাউকে এই সমস্যা হতে মুক্তি দিতে চান তখন তার ওপর স্বীয় মাহাত্ম্য, ভীতি ও প্রতাপের এমন এক বিকাশ ঘটান যার ফলে প্রবৃত্তির নিষিদ্ধ চাওয়া-পাওয়া খান-খান হয়ে যায়। এছাড়া জামালী অর্থাৎ আপন সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যমে স্বীয় সূক্ষ্ম ভালোবাসার আকর্ষণ তার হৃদয়ে সঞ্চার করেন। যেভাবে দুধের শিশু দুধ ছাড়ার পর কেবল এক রাত কষ্টে কাটায় এরপর সে দুধকে এমনভাবে ভুলে যায় যে, স্তনের সামনেও যদি তার মুখ রেখে দেওয়া হয় তবুও দুধ পান করাকে সে ঘৃণা করে; একই ঘৃণা নিষিদ্ধ কামনা-বাসনার প্রতি এই পুণ্যবান ব্যক্তির মাঝে সৃষ্টি হয়ে থাকে, যাকে কামনা-বাসনার দুধ ছাড়িয়ে বিনিময়ে একটি আধ্যাত্মিক খাদ্য দেওয়া হয়ে থাকে।

চতুর্থ অবস্থার পর রয়েছে পঞ্চম অবস্থা, অবাধ্য আত্মার অনাচারগুলোর প্রতি যার রয়েছে প্রবল আকর্ষণ, কেননা এ পর্যায়ে কেবল একটি যুদ্ধ বাকি থেকে যায় আর মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদার ফেরেশতার তার সত্তার সকল দিককে পুরোপুরি জয় ও দখল করে নেওয়া আর কুপ্রবৃত্তির সকল ধারা ও পরম্পরাকে ধ্বংস করে দেওয়া, অবাধ্য প্রবৃত্তিজাত অপশক্তিগুলোর আপন নিবাস ধ্বংস করে দেওয়া, এর মূল হোতাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে দেখানো এবং পূর্ববর্তী রাজত্বের ওপর ধ্বংস আপতিত হবার সময় সন্নিকটবর্তী হয়ে যায়, কেননা বিপ্লব বাস্তবে এমনই হয়।

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

(আন-নামলঃ ৩৫)

এটি মুমিনের জন্য একটি শেষ পরীক্ষা এবং শেষ যুদ্ধ। এ পর্যায়ে তার আধ্যাত্মিক সফরের সকল স্তর বা পর্যায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তার আধ্যাত্মিক যাত্রার ধারাবাহিকতা যা চেষ্টা ও কর্মগুণে সাধিত হয়ে থাকে তা পরম পর্যায়ে

পৌঁছে যায়। মানবীয় প্রচেষ্টা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এরপর কেবল অনুগ্রহ ও কৃপার ভূমিকা অবশিষ্ট থেকে যায় যা দ্বিতীয় সৃষ্টি বা দ্বিতীয় জন্মের সাথে সম্পর্ক রাখে। এই পঞ্চম অবস্থা চতুর্থ অবস্থা থেকে অধিক কঠিন। কেননা চতুর্থ অবস্থায় মুমিনের কাজ হলো, প্রবৃত্তির নিষিদ্ধ কামনা-বাসনা বর্জন করা। কিন্তু পঞ্চম স্তরে মুমিনের কাজ হলো, প্রাণ বিকিয়ে দেওয়া আর সেটিকে খোদার আমানত মনে করে খোদার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া আর খোদার কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করে জীবনকে কাজে নিয়োজিত করা আর খোদার পথে জীবিন বিকিয়ে দেবার সংকল্প করা এবং প্রবৃত্তির অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা। কেননা যতদিন নফস বা অবাধ্য প্রবৃত্তির অস্তিত্ব বাকি থাকবে, পাপের প্ররোচনা ও পাপের প্রবণতা অবশিষ্ট থেকে যাবে, যা তাকওয়ার পরিপন্থি। যতদিন অবাধ্য প্রবৃত্তি থাকবে ততদিন তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথে পদচারণা করা বা পুরোপুরি খোদার আমানত ও অঙ্গীকার বা সৃষ্টির আমানত ও তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করা মানুষের জন্য সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু কৃপণতা খোদার ওপর ভরসা করা ও তাঁর জীবিকা সরবরাহের বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস করা ছাড়া পরিত্যাগ করা সম্ভব নয় আর প্রবৃত্তির নিষিদ্ধ কামনা-বাসনা খোদার মাহাত্ম্য ও তাঁর ভীতির আধিপত্য ও ব্যাপক আধ্যাত্মিক আনন্দ পাওয়া ছাড়া দূরীভূত হতে পারে না। একইভাবে এই মহান মর্যাদা অর্থাৎ অবাধ্য প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করে খোদার সকল আমানত তাঁকে প্রত্যর্পণ করার কাজটি হতে পারে না যতক্ষণ না খোদা প্রেমের একটি প্রবল ঝড় প্রবাহিত হয়ে কাউকে তাঁর পথে পাগলপারা না করে দেয়। এটি সত্যিকার অর্থে খোদাপ্রেমে উন্মাদ ও পাগলপারাদের কাজ, এ পৃথিবীর প্রেমে মত্ত বুদ্ধিমানদের কাজ নয়।

آسماں بار امانت نتوانست کشید قرعۂ فال بنام من دیوانہ زدند

আকাশ আমানতের বোঝা বহনে অক্ষম ছিল,
আমার মতো একজন উন্মাদের অনুকূলে লটারি লেগেছে।

এদিকেই খোদা তা'লা ইঙ্গিত করে বলেন,

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

(আল-আহযাব: ৭৩)

আমরা আমাদের ফেরতযোগ্য আমানত স্বর্গ-মর্ত্যের সকল সৃষ্টির সামনে উপস্থাপন করেছি। সবাই সেই আমানত বহনে অস্বীকৃতি জানায় এবং ভয় পেয়ে যায় যে, কোথাও আমানত গ্রহণ করলে কোনো সমস্যা না দেখা দেয়; কিন্তু মানুষ সেই আমানত নিজের মাথায় তুলে নেয়, কেননা সে নিজের ওপর অবিচারকারী ও পরিণতি সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপহীন। এ উভয় শব্দ মানুষের প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তিরস্কারের জন্য নয়। এগুলোর অর্থ হলো মানবপ্রকৃতিতে একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা হলো, সে খোদার জন্য নিজের প্রতি অবিচার করতে পারে; নিজের প্রতি কঠোর হতে পারে আর আত্মবিস্মৃত হয়ে খোদার চরণে নিজেকে বিনত করতে পারে। এরই সুবাদে নিজের পুরো সত্তাকে আমানততুল্য জ্ঞান করে খোদার পথে নিয়োজিত করা পছন্দ করেছে।

পঞ্চম স্তর সম্পর্কে খোদা যে বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

(আল-মুমিনূনঃ ৯)

অর্থাৎ মুমিন তারা যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকার পালনে যত্নবান থাকে অর্থাৎ আমানত প্রদান ও অঙ্গীকার রক্ষার ক্ষেত্রে তাকওয়া ও সাবধানতা অবলম্বনে কোনো ত্রুটি করে না। এটি এ আমানতের প্রতিই ইঙ্গিত অর্থাৎ মানুষের জীবন, তার সকল শক্তিবৃত্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি বাক্‌শক্তি হাত পায়ের শক্তির সবই খোদাপ্রদত্ত আমানত। যখন তিনি চান নিজের আমানত ফেরত নিতে পারেন। সুতরাং এসব আমানতের বিষয়ে সচেতন হওয়া বলতে যা বুঝায় তা হলো, তাকওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দাবিগুলো মেনে খোদার চরণে আত্মা ও দেহের সকল শক্তিবৃত্তি এবং সকল অঙ্গকে এমনভাবে নিয়োজিত করা যেন সেগুলো তার না থেকে খোদার হয়ে যায়। এসব শক্তিবৃত্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি ও স্থিতি যেন তার নিজের ইচ্ছাধীন না হয়ে খোদার ইচ্ছাধীন হয়ে যায় তার নিজের কোনো ইচ্ছা যেন না থাকে বরং খোদার ইচ্ছা সবগুলোর ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। তার প্রাণ খোদার হাতে যেন তেমনিই হয় যেমনটি জীবিত মানুষের হাতে শবদেহ হয়ে থাকে। নিজের মতামত যেন সে জলাঞ্জলি দেয় আর তার সত্তায় যেন খোদার পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, এমনকি সে যেন তাঁর দেখাতে দেখে, বলাতে বলে আর তাঁর শোনাতে শোনে। তাঁর শক্তিতেই যেন তার গতি ও স্থিতি হয়। প্রবৃত্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

কলুষ যা কোনো অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না, দূরীভূত হয়ে যেন শুধু আত্মা থেকে যায়। বস্তুত খোদার তত্ত্বাবধান যেন তাকে পরিবেষ্টন করে ফেলে আর তাকে তার আপন সত্তা থেকে যেন বের করে দেয় আর তার নিজ অস্তিত্বে যেন তার আধিপত্য না থাকে আর পুরো আধিপত্য খোদার হয়ে যায়। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, খোদার ইচ্ছা যেন তার সত্তায় উচ্ছ্বসিত হতে দেখা যায়। (হৃদয়ে) পূর্বে যার আধিপত্য ছিল তা যেন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায় আর নূতন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমিত্বের গৃহ বিরান হয়ে তার জায়গায় যেন মহান প্রভুর বাসস্থান বা তাঁবু খাঁটানো হয়। যে-সব চারাগাছে অবাধ্য প্রবৃত্তির নোংরা ঝরনা থেকে সেচ দেওয়া হতো ঐশী প্রতাপ ও মহিমা যেন নোংরা স্থান থেকে উপড়ে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পবিত্র ভূমিতে সেগুলোকে রোপণ করে। এছাড়া সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প এবং বাসনা যেন খোদাকে পাবার জন্য নিবেদিত হয়। অবাধ্য প্রবৃত্তির সকল অট্টালিকা ধ্বসিয়ে যেন মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয় আর হৃদয়ে পবিত্রতার ও পরিচ্ছন্নতার এমন এক প্রাসাদ নির্মাণ করা হয় যাতে মহাসম্মানিত খোদা অবতীর্ণ হতে পারেন এবং তাঁর রূহ যেন সেখানে বসবাস করতে পারে। এতটা পরিপূর্ণতা লাভের পর বলা হবে যে, সেসব আমানত যা প্রকৃত দাতা মানুষকে দিয়েছিলেন তা প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। তখন এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আয়াত وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ (আল-মুমিনূন: ৯) সত্য প্রমাণিত হবে যে, এই পর্যায়ে শুধু একটি ছাঁচ বা কাঠামো প্রস্তুত করা হয় আর ঐশী বিকাশের প্রাণ যার অর্থ হলো, মহাসম্মানিত আল্লাহর ভালোবাসা, এরপরই কেবল পবিত্র আত্মা বা রূহুল কুদুস-সহ এমন মুমিনের মাঝে প্রবেশ করে এবং তাকে নতুন জীবন দান করে আর এক নতুন শক্তি তাকে প্রদান করা হয়। যদিও এ সবকিছু রূহের প্রভাবেই হয়ে থাকে কিন্তু এ পর্যায়ে মুমিনের সাথে রূহের কেবল একটা দুর্বল সম্পর্ক থাকে আর তা তখনও মুমিনের হৃদয়ে পুরোপুরি বসতি গড়ে না।

এরপর রয়েছে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের ষষ্ঠ স্তর। এটি সেই স্তর যাতে মুমিনের (খোদার জন্য) ব্যক্তিগত ভালোবাসা পরম মার্গে উপনীত হয়ে খোদার ভালোবাসাকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তখন খোদার সত্তার ভালোবাসা সেই মুমিনের মাঝে প্রবেশ করে এবং তাকে পরিবেষ্টন করে নেয়, যার ফলে একটি নতুন এবং অসাধারণ শক্তি মুমিন লাভ করে। বিশ্বাসের সেই

শক্তি তার বিশ্বাসে এমন এক প্রাণ সঞ্চার করে যেভাবে এক নিষ্প্রাণ দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে থাকে বরং তা মুমিনের মাঝে প্রবেশ করে রূহের বা আত্মার কাজ করে থাকে। এর ফলে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এক জ্যোতি সৃষ্টি হয়। এমন মুমিনের সাথে রূহুল কুদুস বা ফেরেশতার সাহায্য থেকে থাকে অর্থাৎ সেসব বিষয় এবং সেসব জ্ঞান যা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে হয়ে থাকে তা এই পর্যায়ের মুমিনের জন্য উন্মোচন করা হয়। এ স্তরের মুমিন ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতির সকল মার্গ অতিক্রম করে সেসব যিল্লী বা ছায়া-শ্রেষ্ঠত্বগুলো অর্জনের কারণে যা মহাসম্মানিত আল্লাহরই শ্রেষ্ঠত্ব থেকে তার লাভ হয়, ঊর্ধ্বলোকে সে খলীফাতুল্লাহ উপাধি লাভ করে। কেননা এক ব্যক্তি যখন আয়নার সামনে দাঁড়ায় তখন তার চেহারার সকল গঠন-গড়ন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে আয়নায় প্রতিফলিত হয়। একইভাবে উক্ত পর্যায়ের মুমিন, যে কেবল প্রবৃত্তির চাওয়া-পাওয়াকে পরিহার করে তাই নয় বরং আত্মপেষণ ও কুপ্রবৃত্তিকে পরিহারের কাজকে এমন নিখুঁত পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, তার নিজের সত্তার আর কিছুই বাকি থাকে না আর সম্পূর্ণভাবে আয়নার মতো হয়ে যায়। তখন খোদা তা'লার সত্তার সকল ছাপ এবং সকল বৈশিষ্ট্য তার মাঝে খচিত ও গ্রথিত হয়ে যায়। যেভাবে আমরা বলতে পারি, সেই আয়না যা সামনে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তির মুখের পুরো গঠন-গড়ন নিজের মাঝে ধারণ করে সেই চেহারার স্থান নিয়ে নেয়, অবিকল সেভাবে একজন মুমিনও ছায়া হিসেবে খোদা তা'লার সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি নিজের ভেতর ধারণ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবার পদমর্যাদা লাভ করে আর প্রতিচ্ছায়া হিসেবে খোদার পবিত্র চেহারার প্রকাশস্থল হয়ে যায় (অর্থাৎ তার চেহারায় খোদা দেখা যায়)। যেভাবে খোদা মহা অদৃশ্যের পর্দার অন্তরালে বিরাজমান আর নিজ সত্তায় সবচেয়ে প্রচ্ছন্ন, একইভাবে কামিল মুমিনও নিজ সত্তায় সব অদৃশ্যের চেয়েও অদৃশ্য আর বহু পর্দার অন্তরালে থাকে। পৃথিবী তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে না, কেননা সে পৃথিবীর গণ্ডি হতে অনেক দূরে চলে যায়। মজার বিষয় হলো, খোদা যিনি অপরিবর্তনীয় আর চিরঞ্জীব-জীবনদাতা আর চিরস্থায়ী-স্থায়ীত্বদ্বাতা, তিনি কামিল মুমিনের এই পবিত্র পরিবর্তনের পর যখন মুমিন খোদার জন্য নিজের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে দেয় এবং পবিত্র পরিবর্তনের একটি নূতন আলখেল্লা পরিধান করে তা হতে নিজের মাথা বের করে, তখন খোদাও তার জন্য নিজের মাঝে এক পরিবর্তন আনয়ন করেন। কিন্তু এমন নয় যে, খোদার

অনাদি অনন্ত গুণাবলিতে কোনো পরিবর্তন আসে। বরং তিনি আদি হতে অপরিবর্তিত কিন্তু কামিল মুমিনের জন্য (তাঁর) শক্তি বা কুদরতের বিকাশ ঘটে থাকে আর মুমিনের মাঝে পরিবর্তন আসতেই খোদাতে একপ্রকার পরিবর্তন আসে, যার প্রকৃতি ও গভীরতা আমাদের বোধগম্য নয়। এটি এমনভাবে আসে যে, তাঁর অপরিবর্তনশীল সত্তায় পরিবর্তিত নূতন অবস্থার কোনো ধুলাবালি পড়ে না। তিনি সেভাবে অপরিবর্তিত থাকেন যেমনটি তিনি আদি হতে চলে আসছেন। কিন্তু মুমিনের মাঝে পরিবর্তনের সময় যে পরিবর্তন তাঁর (খোদার) মাঝে আসে এর ধরণ সম্পর্কে লেখা আছে যে, মুমিন যখন খোদার পানে অগ্রসর হয়, খোদা তার চেয়ে দ্রুত তার দিকে আসেন। জানা কথা যে, খোদা যেভাবে পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে একই ভাবে তিনি গতি-স্থিতিরও ঊর্ধ্বে। এসব শব্দ তাঁর জন্য প্রকৃতপক্ষে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এভাবে ব্যবহারের কারণ হলো অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য প্রদান করে, যেভাবে একজন মুমিন খোদার পথে নিজেকে ধ্বংস, নিশ্চিহ্ন ও বিলীন করার মাধ্যমে নিজেকে একটি নূতন সত্তায় রূপান্তরিত করে তখন তার এসব পরিবর্তনের বিপরীতে খোদাও তার জন্য নতুন হয়ে যান এবং তার সাথে সেসব আচরণ করেন যা অন্যদের সাথে কখনো করেন না। তাকে তাঁর রাজ্য ও তাঁর রহস্যঘন জগতের সেভাবে পরিভ্রমণ করান যা অন্যদের কখনো করান না। তার জন্য নিজের এমন কাজ প্রকাশ করেন যে, অন্যদের জন্য করেন না আর তাকে এতটা সাহায্য সহায়তা দেন যা মানুষকে বিস্মিত করে। তার জন্য অলৌকিক বিষয়াদি দেখিয়ে থাকেন এবং নিদর্শন প্রকাশ করেন আর সকল দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে বিজয়ী করেন। তার সত্তায় এক চৌম্বক শক্তি রেখে দেন, যে কারণে বিশাল জনগোষ্ঠী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেবল তারাই বাইরে থেকে যায়, স্থায়ী দুর্ভাগ্য যাদের অদৃষ্ট।

সুতরাং এসব কথা থেকে স্পষ্ট যে, কামিল মুমিনের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আসতেই খোদা তা'লাও এক নূতন মহিমায় তার কাছে আত্মপ্রকাশ করেন। এটি একথার প্রমাণ যে, তিনি মানুষকে নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কেননা মানুষ যখন খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে সেদিন থেকে বরং সে মুহূর্ত হতে বরং সেই নিশ্বাস থেকে তার দিকে খোদার প্রত্যাবর্তন আরম্ভ হয়ে যায়। তিনি তার তত্ত্বাবধায়ক, তার লালনপালনকারী, নিরাপত্তা বিধায়ক এবং সাহায্যকারী হয়ে যান। একদিকে যদি সারা বিশ্ব থাকে আর অপর দিকে কামিল মুমিন

থাকে, চূড়ান্ত বিজয় তারই হয়ে থাকে। কেননা খোদা স্বীয় ভালোবাসায় সত্যবাদী আর সত্য ও পূর্ণ প্রতিশ্রুতিদাতা। যে তাঁর হয়ে যায় তিনি কোনো অর্থে তাকে আদৌ ব্যর্থ করেন না। এমন মুমিন আগুনে নিক্ষিপ্ত হয় আর ফুলের উদ্যান হতে বের হয়। তাকে যদি পানির ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করা হয় সে একটি নন্দনকানন হতে বেরিয়ে আসে। শত্রু তার বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করে আর তাকে ধ্বংস করতে চায়, কিন্তু খোদা তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন, কেননা তিনি প্রতি পদক্ষেপে তার সাথে থাকেন। এ কারণে যারা তার লাঞ্ছনার আকাঙ্ক্ষা রাখে তারা লাঞ্ছিত হয় আর ব্যর্থতা তাদের অদৃষ্ট হয়ে যায়। যে পুরো মনে-প্রাণে আর দৃঢ়তার সাথে খোদার হয়ে যায় সে কখনো ব্যর্থ হয়ে মরে না। তাঁর জীবন দীর্ঘ করা হয় আর যতদিন সে তাঁর কাজ শেষ না করবে তার জীবিত থাকা অবশ্যম্ভাবী। সকল কল্যাণ আন্তরিকতার মাঝে নিহিত আর সকল আন্তরিকতা খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানের মাঝে নিহিত আর নিজের সন্তুষ্টি পরিত্যাগের মাঝে খোদার সকল সন্তুষ্টি নিহিত। এটিই হলো মৃত্যু– যার পরে রয়েছে জীবন। কল্যাণমন্ডিত সে– যে এ জীবন থেকে অংশ লাভ করে।

অতএব এটি স্পষ্ট থাকা উচিত যে, সূরা আল-মুমিনূনের আলোচিত আয়াতগুলোর মুজিযা বা নিদর্শন হওয়া সম্পর্কে যতটা লেখার ছিল তার পুরোটাই আমরা লিখে দিয়েছি আর ভালোভাবে প্রমাণ করেছি যে, উল্লিখিত সূরার প্রারম্ভে মুমিনের আধ্যাত্মিক সত্তার ছয়টি স্তর রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে আর ষষ্ঠ স্তর 'খালকে আখার' বা একটি ভিন্ন সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করেছে। উল্লিখিত সূরায় আধ্যাত্মিক জন্মের ছয়টি স্তর উল্লেখ করার পর দৈহিক জন্মের ছয়টি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি জ্ঞানগত নিদর্শন। জ্ঞানের এ গূঢ় কথা কুরআন ছাড়া পূর্বের অন্য কোনো গ্রন্থে উল্লেখ নেই। অতএব এ আয়াতগুলোর শেষাংশ অর্থাৎ

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

(আল-মুমিনূন: ১৫)

নিঃসন্দেহে একটি জ্ঞানগত নিদর্শনের মূল কেননা তা একটি নিদর্শনমূলক স্থানে রাখা হয়েছে। মানুষের জন্য নিজের কথায় এমন নিদর্শনমূলক চিত্র সৃষ্টি করা এবং তার ওপর আয়াত فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ এর প্রয়োগ ও খাপ খাওয়ানো

সম্ভব নয়। যদি কেউ বলে, এর প্রমাণ কী যে, উল্লিখিত আয়াতে মানুষের আধ্যাত্মিক জন্মের ছয় স্তরের সাথে দৈহিক জন্মের ছয় স্তরের যে তুলনা করা হয়েছে তা একটি জ্ঞানগত নিদর্শন? এর উত্তর হলো, নিদর্শন সেটিকে বলা হয়– যার মতো কিছু বানাতে মানুষ অক্ষম রয়ে যায় বা যার মতো কিছু অতীতেও বানাতে মানুষ সক্ষম হয় নি আর ভবিষ্যতেও তা সম্ভব হবার প্রমাণ না থাকে। সুতরাং আমরা দৃপ্তকণ্ঠে বলছি, মানব জন্মের যে সূক্ষ্ম দর্শনের উল্লেখ কুরআন করীমে রয়েছে এটি এমন এক অনন্য বিবরণ যার দৃষ্টান্ত কোনো গ্রন্থে দেখা যায় না আর এ যুগেও কোনো ব্যক্তি– যে কুরআনের জ্ঞান রাখে না সে এ দর্শন বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কুরআনের সাথে সামঞ্জস্য রাখে বলে আমরা শুনি নি। যেখানে কুরআন শরীফ নিজের সকল তত্ত্বজ্ঞান, নিদর্শনাবলি ও বাগ্মিতা আর প্রাঞ্জলতায় নিদর্শন হবার দাবি করে আর এ আয়াতগুলো কুরআন শরীফের একটি অংশ যা নিদর্শনের দাবিতে অংশীদার, সেখানে নিদর্শন হবার দাবি রাখা একই সাথে এটির অনন্য ও অতুলনীয় প্রমাণিত হওয়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান জানানো নিঃসন্দেহে একটি নিদর্শন। আপত্তিকারীর বাকি আপত্তির খণ্ডন নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

তার বক্তব্যঃ

عفت الديار محلها و مقامها [অস্থায়ী আবাসস্থল ও স্থায়ী নিবাস ধ্বংস করে দেওয়া হবে– অনুবাদক] অতীতের একজন কবির পঙ্‌ক্তি। প্রশ্ন হলো, কোনো নবীর প্রতি এমন ওহী হয়েছে কি যার শব্দাবলি হুবহু তা-ই যা সেই নবীর পূর্বে কোনো মানুষের মুখ থেকে বেরিয়েছে?

আমার উত্তরঃ

যেভাবে আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি, এমন ওহী স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর প্রতিও হয়েছিল অর্থাৎ আয়াত

فتبارك الله احسن الخالقين۔

এ বাক্যটি আব্দুল্লাহ বিন আবি সারার মুখ থেকে নিঃসৃত আর হুবহু এটিই ওহী হয়েছিল। এই পরীক্ষায় নিপতিত হয়ে দুর্ভাগা আব্দুল্লাহ মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এমন ধ্যাণধারণা আব্দুল্লাহ মুরতাদের চিন্তাধারার অনুসরণ ছাড়া আর কিছু নয় যা এড়িয়ে চলা উচিত ছিল। বাক্য عفت الديار محلها و مقامها লাবীদ (রা)-এর পঙ্‌ক্তির প্রথম ছত্র, যিনি সাহাবী ছিলেন। পুরো পঙ্‌ক্তি হলো–

عفت الديار محلّها و مقامها بِمنًى تأبّد غولها فرجامها

এর অর্থ হলো আমার প্রিয়দের ঘর ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। সেই ভবনগুলোর নামচিহ্নও বাকি রইল না যা অস্থায়ী আবাসস্থল ছিল আর সেই ভবনগুলোরও কোনো চিহ্ন রইল না যা স্থায়ী আবাস ছিল। উভয় প্রকার ভবন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর সেই ভবনগুলো মিনায় অবস্থিত ছিল যা হলো নজদ প্রদেশে। মিনা দুটো, একটি মক্কায় আর অন্যটি নজদে। এখানে নজদের মিনা-র কথা বলা হয়েছে। এরপর কবি বলেন, এ অঞ্চলের দুটি শহর যেগুলোর একটির নাম হলো গওল অন্যটির নাম ছিল রাজাম তা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে মাটিতে মিশে গেল যে, এখন এসব শহরের জায়গায় একটি জঙ্গল পড়ে আছে যেখানে বন্য প্রাণী তথা হরিণ ইত্যাদি বসবাস করে। এটি পঙ্‌ক্তিভুক্ত শব্দ تَأَبَّدَ এর অর্থ। تَأَبَّدَ শব্দটি اَوَابِد থেকে নেওয়া হয়েছে আর اَوَابِد বন্যপ্রাণী তথা হরিণ ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। আর اَوَابِد শব্দ اَبَد থেকে নেওয়া যার অর্থ হলো চিরঞ্জীব। হরিণ ইত্যাদি যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে মারা যায় না বরং সেগুলোকে শিকার করা হয়, অন্যের হাতে তাদের মৃত্যু হয় সেকারণে সেগুলোর নাম اَوَابِد রাখা হয়েছে।

তার বক্তব্যঃ

যদি মানুষের কথা ও খোদার কথা এক হয়ে যেতে পারে তাহলে খোদার কথা ও মানুষের কথায় পার্থক্য কী থাকল?

আমার উত্তরঃ

আমি ইতিমধ্যে বর্ণনা করে এসেছি, কুরআন শরীফ এ অর্থে নিদর্শন– কোনো মানুষের রচনা কুরআন শরীফের একটি দীর্ঘ অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না, যা দশ আয়াতের কম হবে না। কুরআন শরীফের এমন একটি অংশ এতটা সাহিত্যিক সৌন্দর্য, বাগ্মিতা এবং বিভিন্ন তত্ত্বভাণ্ডার ও সত্য নিজের মাঝে ধারণ করে যে, মানুষ এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে অক্ষম। কুরআনের আয়াত নিদর্শন হবার শর্ত হলো, তা দশ আয়াতের যেন কম না হয়, যেমনটি কিনা কুরআনে এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু একটি বাক্য যা সর্বোচ্চ এক বা দুই আয়াতের সমান– এ পরিমাণ বাক্যে মানুষের উক্তি খোদার কথার মতো হতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ ভাবে খোদার কথায় কতক অপ্রকাশিত তত্ত্বজ্ঞান ও এক ধরনের জ্যোতি ও

নিদর্শনমূলক দিক প্রচ্ছন্ন থাকে যেমনটি কিনা মানুষ ও হরিণের মাঝে পার্থক্য-সংক্রান্ত সার্বিক অবস্থার ওপর দৃষ্টিপাতে প্রকাশ পায় কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের চোখে কিছু এমন শক্তি আছে যা আদৌ হরিণের চোখে নাই।

তার কথাঃ

عفت الديار محلها و مقامها যখন প্রকাশ করা হয় তখন লেখা হয়েছিল, এটি প্লেগ-সংক্রান্ত এলহাম কিন্তু এখন বলা হচ্ছে, এটি ভূমিকম্প-সংক্রান্ত!

আমার উত্তরঃ

عفت الديار -সংক্রান্ত আযাবের, প্লেগের সাথে সম্পর্ক থাকা, সেটিকে হুবহু প্লেগ বানাতে পারে না। এছাড়া عفت الديار বাক্যের প্লেগের সাথে সম্পর্ক রয়েছে– মর্মে বাক্যটি মানুষের বাক্য। আপত্তি করা তখন যুক্তিযুক্ত হতো যদি খোদার ওহীতে এ বাক্য থাকত। খোদার ওহী পরিষ্কার ভাষায় বলে যে, এটি ভূমিকম্প-সংক্রান্ত। দেখো! সেই এলহাম– যা পত্রিকা আল-হাকামে ১৯০৩ সনের ডিসেম্বরের শেষের দিকে ছেপেছে, সেই বাক্যটি হলো, 'ভূমিকম্পের আঘাত'। পুনরায় সেই প্রথম এলহামের ৫ মাস পর একই পত্রিকার ৩১ মে ১৯০৪-এর সংখ্যায় দ্বিতীয় এলহাম এই ব্যাখ্যা দিয়েছে যে, عفت الديار محلها و مقامها পরিতাপ! এটি কেমন যুগ এসে গেল যে, একই পত্রিকায় দুটি স্থানে খোদার বাণী বিদ্যমান এবং এক উক্তি দ্বিতীয় উক্তির ব্যাখ্যা করে, কিন্তু পরেরটির দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না আর মানুষের উক্তি উপস্থাপন করে, যার ভুলের জন্য খোদার এলহাম দায়ী নয়। মুসলমানের সন্তান আখ্যায়িত হয়ে এতটা বিদ্বেষ! ভবিষ্যতে এর কত ভয়াবহ রূপ প্রকাশ পাবে তা খোদা-ই ভালো জানেন।

এছাড়া আমরা একথা অস্বীকার করি না যে, সময় আসার পূর্বে কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণীর পুরো চিত্র প্রকাশ পায় না আর মানুষের ব্যাখ্যায় ভুলও হতে পারে। পৃথিবীতে কখনো এমন কোনো নবী অতীত হন নি যিনি ভবিষ্যদ্‌বাণীর অর্থ করতে ভুল করেন নি। কিন্তু কোনো নবী যদি (ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকাশ পাবার) পূর্বে ব্যাখ্যাগত কোনো ভুল করেন এতে ভবিষ্যদ্‌বাণীর সম্মানের বা মাহাত্ম্যের কোনো হানি হবে না, কেননা ঐশী ভবিষ্যদ্‌বাণী অলৌকিক হয়ে থাকে আর মানবীয় দৃষ্টির বাইরে ও তাদের ধ্যানধারণার ঊর্ধ্বে থাকে। আপনারা কি দাবি করতে পারেন, এতে ওহীর সম্মানের হানি হয়? যদি অবস্থা

এমনই হয় তাহলে আমি এমন ভবিষ্যদ্‌বাণীর একটি দীর্ঘ তালিকা আপনাকে দিতে পারি যা বুঝার ক্ষেত্রে নবীরা ভুল করেছিলেন। কিন্তু আমি আশা রাখি, আপনি কখনো এরপর এমন আপত্তি করবেন না। একটু ভাববেন, এ আপত্তি কোথায় গিয়ে ঠেকে! এটি স্পষ্ট যে, ভবিষ্যদ্‌বাণী যখন প্রকাশ পেয়ে যায় আর প্রকাশিত হয়ে নিজের অর্থ নিজেই স্পষ্ট করে এবং সেসব অর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণীর শব্দের বিপরীতে রেখে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, অর্থ সঠিক– এমতাবস্থায় এ অর্থগুলোকে সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করা ঈমানের পরিচয় বহন করে না। এটি কি সত্য নয় যে, উল্লিখিত এলহামের অর্থ হলো, দেশের একটি অংশের ঘরবাড়ি মাটির সাথে মিশে যাবে। তাই এ এলহাম বাহ্যিক অর্থের নিরিখে প্লেগের ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য হতে পারে? যেহেতু একটি দুর্ঘটনার কারণে বাড়িঘর ধ্বসে পড়ল তাই সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীর পরিপূরণস্থল বা সত্যায়ন সেই দুর্ঘটনার মাধ্যমেই হবে। প্লেগের কারণেও কি বাড়িঘর ধ্বসে পড়তে পারে? এছাড়া এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্বের এলহামে স্পষ্টতই ভূমিকম্প শব্দ বিদ্যমান, যা এ ভবিষ্যদবাণীর কেবল পাঁচ মাস পূর্বে এ পত্রিকায় ছাপ হয়েছিল। এলহামের শব্দ হলো 'ভূমিকম্পের আঘাত'। সুতরাং এতে কি সন্দেহ রইল যে, এ এলহামে একটি ভবিষ্যৎ ভূমিকম্পের সংবাদ দেওয়া হয়েছে?

এখন আপনি নিজেই ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করুন, এলহাম عفت الديار محلها و مقامها শাব্দিকভাবে পূর্বোল্লিখিত ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাকি প্লেগের ক্ষেত্রে? এছাড়া ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণীর অর্থের দিক থেকে যেভাবে বাক্য عفت الديار -এর সাথে সম্পর্ক আছে একইভাবে যুগের নৈকট্যের দিক থেকেও সম্পর্ক আছে। তা হলো, عفت الديار এলহামের ৫ মাস পূর্বে স্পষ্ট ভাষায় ভূমিকম্পের এলহাম হয়েছে আর উভয় ভবিষ্যদ্‌বাণী একের পর এক ছেপে প্রকাশিত হয়েছে অর্থাৎ প্রথমে 'ভূমিকম্পের আঘাত' এরপর عفت الديار محلها و مقامها আর উভয়টির মাঝে প্লেগের কোনো উল্লেখ নেই।

তার আপত্তিঃ

যদি এলহাম عفت الديار সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান দেওয়া না হয়ে থাকে যে, তা ভূমিকম্প সংক্রান্ত তাহলে এমন এলহামের লাভ কী?

আমার খণ্ডনঃ

পরিতাপ! আপনি ঐশী নিয়মের কথা মোটেও জানেন না। নবীর জন্য

কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণীর কোনো বিশেষ দিকের সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক নয়। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে বলা আবশ্যক নয় যে, এভাবে এটি প্রকাশ পাবেই। ভবিষ্যদ্‌বাণীতে একথা থাকা আবশ্যক যে, এর অন্তর্নিহিত বিষয় হবে অসাধারণ আর মানবীয় পরিকল্পনা বা চক্রান্ত এর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু সকল অর্থে এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর অর্থ প্রকাশ করা আবশ্যক নয়। তওরাতে আমাদের নবী (সা.) সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্‌বাণী অস্পষ্টভাবে শুধু একথা বলে যে, বনী ইসরাঈল হতে অর্থাৎ তাদের ভাইদের মধ্য হতে মূসার ন্যায় এক নবী আসবে।* আর কোথাও স্পষ্ট করে বলে নি যে, বনী ইসমাঈল হতে আসবে, তার নাম এই হবে, তার পিতার নাম এটি আর মক্কায় জন্মগ্রহণ করবে আর এত দিন পরে আসবে। এ কারণে ইহুদীদের এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর ফলে কোনো লাভ হয় নি আর এ ভ্রান্তির কারণে লক্ষ লক্ষ ইহুদী জাহান্নামে গিয়ে পড়েছে অথচ কুরআন শরীফের আয়াত–

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

(আল-মুযযাম্মিল: ১৬)

এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করেছে। ইহুদীরা বলে, মূসার মসীল (প্রতিচ্ছায়া) ছিলেন ইউশা নবী– যে মূসার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। খ্রিষ্টানরা বলে, ঈসা-ই হলেন মূসার মসীল (তথা প্রতিচ্ছায়া) কেননা সে-ও মূসার ন্যায় পরিত্রাতা হয়ে এসেছে। এখন বলো তওরাতের এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর লাভ কী হলো যা কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেয় না। যে নবী (আ.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল তাকে ইহুদীরাও চিনতে পারল না আর খ্রিষ্টানরাও না, এমনকি উভয় দল গ্রহণ করার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত থেকে গেল। কিন্তু আমার প্রতি যে ঐশী ওহী অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ عفت الديار محلها و مقامها সেটি অস্পষ্ট নয়– যেমনটি তুমি মনে করে থাকো। কেননা এর পূর্বে একই পত্রিকায় 'ভূমিকম্পের আঘাত' মর্মে এলহাম বিদ্যমান ছিল। এরপর দ্বিতীয় ওহী عفت الديار محلها و مقامها সেই ভূমিকম্পের ধরন ও প্রকৃতি তুলে ধরে, যার কথা পূর্বে এই পত্রিকাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ভবিষ্যদ্‌বাণী কোনোভাবে

---

* **টীকা:** তওরাতে কোনো কোনো স্থানে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, সে তোমাদের মধ্য হতেই আসবে। –লেখক

প্লেগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। উভয় ওহী একই আল-হাকাম পত্রিকায় ৫ মাসের ব্যবধানে বিদ্যমান রয়েছে। এখন আমাকে বলো, এমন মহান ভবিষ্যদ্বাণীকে অকেজো ও বাজে আখ্যা দেওয়া হঠকারিতা নয় কি– যা দুবার একই পত্রিকায় স্পষ্ট ভূমিকম্পের নাম ও বৈশিষ্ট্যসহ উল্লেখ করে সেই দুর্ঘটনার সংবাদ দেয়? যদি বিষয় এটিই হয় তাহলে আপনার ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই কঠিন। নির্ভরযোগ্য সব তফসীরে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, যখন আয়াত سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (আল-কামার: ৪৬) অবতীর্ণ হয় তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি জানি না এ ভবিষ্যদ্বাণী কোন্ স্থান-সময়-ঘটনার সাথে সম্পর্ক রাখে কিন্তু যখন বদরের যুদ্ধে মহান বিজয় লাভ হয় তখন তিনি বলেন, এখন জানা গেল যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী এই মহান বিজয়ের শুভসংবাদ দিচ্ছিল। একবার তিনি (সা.) বলেন, আমাকে একটি আঙুরগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে আর বলা হয়েছে, এটি আবু জাহলের জন্য। আমি আশ্চর্য ছিলাম এ ভেবে যে, আবু জাহল এমন নোংরা প্রকৃতির মানুষ– যে জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য নয়। সত্য বলতে কী! এর অর্থ কিছুই বোঝা যায় নি। অবশেষে সেই ভবিষ্যদ্বাণী আবু জাহলের পুত্র ইকরামার মুসলমান হবার মাধ্যমে পূর্ণ হলো। একবার খোদার ওহী অনুসারে তিনি (সা.) মদীনা থেকে মক্কার দিকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেন। ওহীতে এ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, মক্কায় প্রবেশ করবেন আর খানা কা'বার তওয়াফ করবেন, কিন্তু সময় জানানো হয় নি। কিন্তু মহানবী (সা.) শুধু ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এই সফরের কষ্ট সহ্য করেছেন। সেই ব্যাখ্যা সঠিক সাব্যস্ত হয় নি আর তিনি মক্কায় প্রবেশ করতে পারেন নি। সুতরাং এখানে ভবিষ্যদ্বাণী বুঝতে ভুল হয়েছে। যে কারণে কতক সাহাবী পরীক্ষায় পড়ে গেছেন।

একই ভিত্তিতে হযরত ঈসা নিজের শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, নিজেদের পোশাক বিক্রি করে অস্ত্র ক্রয় করে নাও। অবশেষে জানা গেল যে, এটি হযরত ঈসার ভুল ছিল। রাজত্ব বলতে স্বর্গীয় রাজত্ব বুঝায়, জাগতিক রাজত্ব নয়। আসল কথা হলো, নবীও মানুষই হয়ে থাকেন। তাই ব্যাখ্যায় ভুল করবেন, এতে ক্ষতির কিছু নেই। অবশ্য নবীকে ভ্রান্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেওয়া যেতে পারে না আর কোনো না কোনো সময় তাঁকে তাঁর ভ্রান্তি সম্পর্কে অবশ্যই সতর্ক করা হয়। নবীর ভবিষ্যদ্বাণীকে সব সময় এর অলৌকিক অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। এক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশ না ঘটে আর অন্য কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ পেয়ে যায় আর

অলৌকিক হওয়া যা ভবিষ্যদ্‌বাণীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তা যদি দ্বিতীয় প্রকারের বিকাশে বিদ্যমান থাকে আর ঘটনা প্রকাশের পর সকল বুদ্ধিমান তা বুঝে যায় যে, ভবিষ্যদ্‌বাণীর সঠিক অর্থ এটিই যা ঘটনা প্রকাশ পেয়ে নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছে, তাহলে এতে ভবিষ্যদ্‌বাণীর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব খাটো হয় না। সেটি সম্পর্কে অযথা সমালোচনা করা দুষ্কৃতি, ঈমানহীনতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছু নয়।

তার কথাঃ

একটি গোলমেলে কথা বলে দেওয়া যে, কোনো বিপদ আসতে যাচ্ছে কিন্তু এর প্রকৃতি না জানানো যে, কী বিপদ আসবে আর কখন আসতে যাচ্ছে– এটি কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী নয় বরং রসিকতা আর এমন কথা সবাই বলতে পারে।

আমার উত্তরঃ

এছাড়া আর কী বলব যে, لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ। এমন বিরোধীর কেবল এতটা বলে দেওয়া উচিত যে, এমন বিপদ আসবে না এরপর সে নিজেই চিন্তা করুক, ভবিষ্যদ্‌বাণী অস্পষ্ট কীভাবে হলো! যেখানে এতে স্পষ্টভাবে ভূমিকম্পের নামও বিদ্যমান আর এটিও রয়েছে যে, তাতে দেশের একটি অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর এটিও বিদ্যমান যে, তা আমার জীবদ্দশায় আসবে আর এর সাথে এ ভবিষ্যদ্‌বাণীও রয়েছে যে, এটি তাদের জন্য কিয়ামত সদৃশ হবে যাদের ওপর এই ভূমিকম্প আঘাত হানবে। যদি এটি গোলমেলে হয় তাহলে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্‌বাণী কাকে বলে? একথা বলা যে, তাতে সময় উল্লেখ করা হয় নি! এটি কেবল ইসলামের ওপর নয় বরং আপনি সকল ঐশী পুস্তকের ওপর হামলা করেছেন। কুরআন করীমের বেশিরভাগ ভবিষ্যদ্‌বাণী এমনই, যাতে কোনো সময় উল্লেখ করা হয় নি। তওরাতে নবুকদ নযর ও টাইটাস রূমী সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল তাতে কি কোনো সময় উল্লেখ করা হয়েছে? একইভাবে মূসার মসীল (তথা প্রতিচ্ছবি) আসা সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল তাতে কি সময়ের কোনো শর্ত আরোপ করা হয়েছিল? এছাড়া ভূমিকম্প ও যুদ্ধ সম্পর্কে যে-সব ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে আপনি বলতে পারেন কি সেসবে কোনো সময়ের কথা জানানো হয়েছে কিনা? এছাড়া মসীহ মওউদ-এর আগমন সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে যার মাধ্যমে আপনারা ঈসা ইবনে মরিয়মকে

পুনরায় পৃথিবীতে আনতে চান, এতে খোদা তা'লা কোন্ সময়ের সংবাদ দিয়েছেন যাতে আপনারা দূর থেকে আগমনকারী ব্যক্তিকে স্বাগত জানানোর জন্য কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে প্রথমে পদক্ষেপ নিতে পারেন? যদি বেশি না পারেন তাহলে অন্ততপক্ষে শীতল মণ্ডল পর্যন্ত এগিয়ে যান আর লেপতোষক ইত্যাদি সাথে নিয়ে যাবেন। কিন্তু হায়! আপনারা যদি চিন্তা করতেন যে এমন আপত্তি শুধু আমার ওপর নয়, আপনার এসব আপত্তি ইসলামের বিরুদ্ধে এবং নাউযুবিল্লাহ কুরআনের বিরুদ্ধে বর্তায় বরং এটি অতীতের সকল নবীর ওপর আক্রমণ। আসল কথা হলো, যদি একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিজ গুণে অলৌকিক হয়ে থাকে বা এমন কোনো অদৃশ্য বিষয়-সংবলিত হয়ে থাকে যা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে, আর ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিষ্কার দাবি থাকে যে, এমন ঘটনা এ দেশে শত শত বছর পর্যন্ত কখনো ঘটে নি এরপর সেই ঘটনা দাবি অনুসারে ঘটে যায় তাহলে এমন অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আপত্তি করা ঈমানহীন লোকদের কাজ, যাদের খোদা ও সত্যের প্রতি আদৌ কোনো শ্রদ্ধা নেই। এমন দুর্ভাগারা হৃদয়ের কঠোরতার কারণে সর্বদা সকল নবীর প্রতি আপত্তি করে আসছে। আপনি নিজেই বলুন, এ ভূমিকম্প সম্পর্কে যত স্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণীতে খবর দেওয়া হয়েছে, দুহাজার বছর পর্যন্ত এ দেশে এর কোনো দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন কি? আপনি স্মরণ রাখবেন, এটি শুধু একটি ভবিষ্যদ্বাণী নয় বরং আমার মাধ্যমে আমার প্রভু বার বার বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে এর খবর দিয়েছেন, মওয়াহেবুর রহমানে এর সংবাদ দিয়েছেন, আমীন পুস্তিকায় এর সংবাদ বিদ্যমান আর আল-হাকাম পত্রিকার অনেক সংখ্যায় বিভিন্ন এলহামে এর সংবাদ রয়েছে। তা সত্ত্বেও আপনার দৃষ্টিতে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি গোলমেলে! এখন এর কী চিকিৎসা হতে পারে– اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ- ইসলামের ওপর যে-সব অন্যায় হামলা করা একসময় বিধর্মীদের কাজ ছিল এখন স্বয়ং মুসলমানরা সেসব হামলা করে থাকে। ধর্মের সাহায্য করার যদি সৌভাগ্য না হয় অন্ততপক্ষে চিন্তা করে হামলা করতেন। অনর্থক নিজের মুখে চুনকালি মাখানো আর শেষে হামলায় মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়া, এটি কি ধার্মিকতা?

یکے بر سر شاخ وبُن مے بُرید

এক ব্যক্তি গাছের শাখায় বসে এর মূল কর্তন করছে।

হৃদয়ে ইসলামের জ্যোতি থাকলে নিজেই বুঝতে পারতেন বরং অন্যদের আপত্তির উত্তর দিতেন।

তার আপত্তিঃ

শ্রদ্ধেয় জনাব মির্যা সাহেব পুনরায় ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন কিন্তু একইসাথে এটিও বলেছেন, সেটি কি ভূমিকম্প নাকি অন্য কোনো ভয়াবহ দুর্যোগ তা আমাকে জানানো হয় নি। আর আমাকে অবহিত করা হয় নি, এমন দুর্ঘটনা কবে ঘটবে?

আমার খণ্ডনঃ

আমার এ বাক্যগুলোর ওপর কোনো আপত্তি বর্তাতে পারে না। কেননা কুরআন শরীফে আরবদের জন্য যে একটি শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ তা'লা এ শাস্তির কোনো ব্যাখ্যা দেন নি যে, কোন্ ধরনের শাস্তি হবে আর কোন্ প্রকার শাস্তি হবে? শুধু এটি বলেছেন যে, খোদা আকাশ থেকে বা ভূমি থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করার বিষয়ে বা কাফিরদের মুসলমানদের তরবারির স্বাদ আস্বাদনের বিষয়ে সর্বশক্তিমান। এ আয়াতগুলোতে মহানবী (সা.) স্বয়ং স্বীকার করেন, আমাকে জানানো হয় নি যে, কোন্ ধরনের শাস্তি হবে? যখন জিজ্ঞেস করা হয়, সে শাস্তি কখন আসবে? তখন তিনি কোনো তারিখ উল্লেখ করেন নি। যেমনটি কুরআন শরীফে বলেছেন,

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

(আল-মুলক: ২৬-২৭)

অর্থাৎ কাফির জিজ্ঞেস করে, এই দাবি কখন পূর্ণ হবে, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে শাস্তির তারিখ কোনটি হবে তা বলো। তুমি তাদের বলে দাও, আমি কোনো তারিখ জানি না। এ জ্ঞান কেবল খোদা-ই রাখেন। আমি কেবল একজন সতর্ককারী। অবিশ্বাসীরা পুনরায় শাস্তির দিনক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ (আল-আম্বিয়া: ১১০) উত্তর পেল অর্থাৎ তাদের বলে দাও, আমি জানি না, শাস্তি দূরে নাকি নিকটে। সুতরাং হে শ্রোতারা! স্মরণ রেখো! একথাটি সত্য আর সম্পূর্ণভাবে সত্য। এটি মানা ছাড়া কোনো উপায় নেই যে, খোদার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কোনো কোনো সময় বাহ্যিকভাবে পূর্ণতা লাভ করে আবার কখনো রূপকভাবে। সুতরাং কোনো নবী

বা রসূলের এই সামর্থ্য নেই যে, সর্বত্র এই দাবি করবে– এ ভবিষ্যদ্‌বাণী এভাবে পূর্ণ হবে। অবশ্য যেভাবে আমরা লিখে দিয়েছি, নবীর একথা দাবি করার অধিকার রয়েছে যে, সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী যা তিনি বর্ণনা করেন তা অলৌকিক বা অসাধারণ বা মানবীয় জ্ঞানের ঊর্ধ্বের বিষয়। যদি পাঞ্জাবে প্রত্যেক শতাব্দীতে তেমনই ভূমিকম্প আসে যেমনটি ১৯০৫ সনের ৪ এপ্রিল এসেছিল, সেক্ষেত্রে এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর কোনো গুরুত্বই থাকে না। কেননা সবার একথা বলার অধিকার থাকত যে, পাঞ্জাবে সবসময় এমন ভূমিকম্প এসেই থাকে, এটি অসম্ভব কোনো বিষয় নয়। কিন্তু গত ভূমিকম্প যেহেতু অসাধারণভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যেভাবে অসাধারণ হবার কথা ভবিষ্যদ্‌বাণী উল্লেখ করেছে, তাই সব আপত্তি বৃথা প্রমাণিত হলো। একইভাবে ভূমিকম্প সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে তা কোনো সাধারণ ভবিষ্যদ্‌বাণী নয়। সেটি যদি সাধারণ হয়ে থাকে আর আমার জীবনে তা প্রকাশ না পায়, তাহলে আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে নই। খোদা তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, সেই বিপদ যার নাম তিনি ভূমিকম্প রেখেছেন, কিয়ামত সদৃশ হবে আর এটি পূর্বের চেয়ে ভয়াবহরূপে প্রকাশ পাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পরবর্তী এই ভবিষ্যদ্‌বাণীতেও পূর্বের ভবিষ্যদ্‌বাণীর ন্যায় বার বার ভূমিকম্প শব্দই এসেছে, অন্য কোনো শব্দ নয় যা রূপক অর্থ থেকে বাহ্যিক অর্থই বেশি দিয়ে থাকে। তবে সব নবী যেহেতু খোদার প্রতিপালন বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহর অসীম জ্ঞানের প্রতি সম্মান বজায় রাখতেন, সেই শিষ্টাচার ও আল্লাহর চিরন্তন রীতির প্রতি লক্ষ রেখে একথা বলতে হয়– যদিও বাহ্যত 'ভূমিকম্প' শব্দটিই অবতীর্ণ হয়েছে, তবুও এটি অসম্ভব নয় যে, তা অন্য কোনো (ভয়াবহ) বিপদ বা বিপর্যয়ও হতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ বিপদ হবে যা পূর্বের চেয়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করবে যার বাড়িঘরের ওপর ভয়াবহ প্রভাব পড়বে।* এ ভবিষ্যদ্‌বাণী, তারিখ ও সময় না লেখার কারণে মিথ্যা হতে পারে না কেননা

---

* **টীকাঃ** ইহুদীদেরকে মসীহ মওউদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণীর আদলে যে খবর দেওয়া হয়েছে তা হলো, তিনি ততদিন আসবেন না যতদিন ইলিয়াস নবী আবার আকাশ থেকে অবতীর্ণ না হন। কিন্তু সত্য কথা হলো, আকাশ থেকে কেউ অবতীর্ণ হয় নি অথচ হযরত ঈসা (আ.) দাবি করে বসেছেন যে, তিনি মসীহ মওউদ আর ইলিয়াসের অর্থ হলো ইয়াহইয়া– যে তার পূর্বে এসে গেছে। অতএব ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয়বার আসার

এর সাথে অন্যান্য স্পষ্ট বিষয়াদি এত বেশি পরিমাণে রয়েছে যে, তা দিনক্ষণ লেখার মুখাপেক্ষী রাখে না। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন, সেই ভূমিকম্প তোমার জীবদ্দশায় আসবে আর সেই ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়া তোমার জন্য স্পষ্ট বিজয়। এক বিশাল জনগোষ্ঠী তোমার জামা'তে প্রবেশ করবে আর তোমার জন্য তা ঐশী নিদর্শন হবে। তোমার সাহায্যের জন্য খোদা নিজেই নেমে আসবেন আর স্বীয় আশ্চর্যজনক বিষয়াদি তোমার জন্য প্রদর্শন করবেন যা কখনো পৃথিবী প্রদর্শন করে নি। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসবে এবং তোমার জামা'তে প্রবেশ করবে। সেই ভূমিকম্প পূর্বের ভূমিকম্প হতে ভয়াবহ হবে আর তাতে কিয়ামতের লক্ষণাবলি প্রকাশ পাবে। পৃথিবীতে একটি হইচই সৃষ্টি হয়ে যাবে। খোদা বলেন, আমি তখন আসব যখন হৃদয় কঠোর হয়ে যাবে আর মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে যে, এখন কোনো ভূমিকম্প আসবে না। খোদা বলেন, আমি গোপনে আসব আর এমন সময়ে আসব যে, কেউ জানতে পারবে না অর্থাৎ মানুষ তাদের জাগতিক ব্যাবসাবাণিজ্যে ও জাগতিক ব্যস্ততায় পুরোপুরি নিমগ্ন ও প্রশান্তচিত্তে মত্ত থাকবে। তখন আকস্মিকভাবে বিপদ নেমে আসবে অথচ তার পূর্বে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে যে, ভূমিকম্প আসবে না আর নিজেদের বিপদমুক্ত ও নিরাপদ মনে করবে, তখন হঠাৎ তাদের ওপর বিপদ নেমে আসবে। কিন্তু খোদা বলেন, তা হবে বসন্ত কাল। বসন্তপ্রাতে সূর্য উদিত হবে আর অস্ত যাবে শরতের সন্ধ্যায়। তখন অনেক ঘরে শোকের ছায়া নেমে আসবে কেননা তারা সময়ের গুরুত্ব বোঝে নি। কোনো জ্যোতিষী ও কোনো তথাকথিত ভূতত্ত্ববিদের অদৃশ্যের জ্ঞান থাকা সম্ভব নয় আর কেউ জানে না আগামীকাল কী হবে? কিন্তু খোদা যিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি নিজের সৃষ্টির (হৃদয়ের) গহীনে যা আছে তা-ও জানেন।

তার আপত্তিঃ

যেখানে কুরআনে উভয় ভূমিকম্পের কথা রয়েছে সেখানে কেন বলা হয় যে, তা ভূমিকম্প বা অন্য কোনো বিপদ?

*** চলমান টীকাঃ** ভবিষ্যদ্‌বাণী, যার জন্য ইহুদীরা অপেক্ষমাণ ছিল আর অদ্যাবধি অপেক্ষমাণ রয়েছে তা ইয়াহইয়ার আবির্ভাবের মাধ্যমে রূপকভাবে পূর্ণ হয়েছে। এটি থেকে বুঝা যায়, খোদা তা'লা অনেক সময় বাহ্যিক শব্দ থেকে সরে গিয়ে রূপকভাবে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। –লেখক

আমার খণ্ডনঃ

আমি বার বার বলেছি, কুরআন শরীফের বাহ্যিক শব্দ এবং আমার প্রতি অবতীর্ণ খোদার এই ওহী ভূমিকম্পের সংবাদ দেয়, কিন্তু ব্যাখ্যাগত দিকটাও সামনে রাখতে আমাদেরকে ঐশী রীতি বাধ্য করে। এক জাতি সম্পর্কে এক স্থানে খোদা তা'লা বলেন,

وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا

অর্থাৎ তাদের প্রতি ভয়াবহ ভূমিকম্প এসেছে অথচ তাদের ওপর ইতিপূর্বে কোনো ভূমিকম্প আসে নি। এর অর্থ হলো, এখানে অন্য কোনো বিপদের নাম ভূমিকম্প রাখা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى

অর্থাৎ যে এ পৃথিবীতে অন্ধ থাকবে সে পরকালেও অন্ধই হবে– এটিও একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী, কিন্তু এর অর্থ তা নয় যা বাহ্যিক শব্দের নিরিখে মনে হয়। খোদার জ্ঞানের ব্যাপকতায় বিশ্বাস রাখা আর নিজের জ্ঞানকে এর সমান আখ্যায়িত না করা নবী ও রসূলদের বৈশিষ্ট্য। কুরআন শরীফে বার বার কাফিরদের বিরুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যখন ইসলামের প্রথম যুদ্ধ অর্থাৎ বদরের যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন মহানবী (সা.) ক্রন্দন ও দোয়া আরম্ভ করে দেন। দোয়া করতে করতে তাঁর মুখ থেকে এ শব্দগুলো বেরিয়ে আসে যে,

اَللّٰهم اِن اهلكتَ هٰذه العِصابة فَلن تُعبد فِى الاَرضِ أَبَدًا

অর্থাৎ হে আমার খোদা! যদি আজ তুমি এ জামা'তকে (যারা কেবল ৩১৩জন ছিল) ধ্বংস করে দাও তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ তোমার ইবাদত করবে না। মহানবী (সা.)-এর মুখে হযরত আবু বকর (রা.) এ শব্দগুলো শুনে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এত উদ্‌বিগ্ন কেন? খোদা আপনাকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন যে, তিনি আপনাকে বিজয় দান করবেন। তিনি (সা.) বলেন, এটি সত্য কিন্তু আমি তাঁর পরবিমুখতার কথা চিন্তা করছি অর্থাৎ, কোনো প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা খোদার জন্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব নয়। এখন বুঝতে হবে, যেখানে মহানবী (সা.) খোদার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার রীতিকে এভাবে দৃষ্টিতে রেখেছেন সেখানে সকল নবীর এই স্বীকৃত রীতি হতে কেন

মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হবে। খোদার ভবিষ্যদ্‌বাণী কখনো বাহ্যিকভাবে পূর্ণ হয় কখনো রূপকভাবে। এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া নির্বোধের কাজ। একথা বলা যে, যেই ভবিষ্যদ্‌বাণীর বাহ্যিক শব্দের ওপর বিশ্বাস নেই আর যাতে এর পূর্ণ হবার সময়ও জানানো হয় নি, তা কেমন ভবিষ্যদ্‌বাণী? এটি হীন জীবনে অভ্যস্ত লোকদের ধারণা। এমন লোকের ঐশী রীতিনীতির কোনো জ্ঞানই নেই। সত্য কথা হলো, যখন একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী মাহাত্ম্য, ক্ষমতা ও কোনো অলৌকিক সংবাদ-সংবলিত হয়ে থাকে আর তা প্রকাশিত হবার সময় তাতে স্পষ্টভাবে খোদার হাত দেখা যায় তখন হৃদয় তা মেনে নেয়; কেউ আর তারিখ ইত্যাদির কথা বলে না। সত্যিকার অর্থে এ বিতণ্ডা ও এই আপত্তি, সময় আসার পূর্বেই উত্থাপন করা হয়েছে। সময় আসতে দাও, পরে আপত্তি করো। সময় আসার পূর্বে হা-হুতাশ করা ভালো নয়। পূর্ণ হবার সময় স্বয়ং ভবিষ্যদ্‌বাণী বলে দেবে যে, তা সাধারণ কথা নাকি অসাধারণ।

তার আপত্তিঃ

আপনার কথা অনুসারে যেখানে কুরআন শরীফেও দুটো ভূমিকম্পের সংবাদ রয়েছে, তাই যে বিপদ আসতে যাচ্ছে তা যে ভূমিকম্প তাতে এখন আর কোনো সন্দেহ রইল না!

আমার উত্তরঃ

কুরআনে আয়াত يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (আন-নাযিআত: ৭-৮) বিদ্যমান। অর্থাৎ সেদিন ভূমি খুবই প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হবে আর ভূপৃষ্ঠে চরম ও ভয়াবহ উৎকণ্ঠা দেখা যাবে। এরপর পৃথিবীতে আরো একটি উৎকণ্ঠাপূর্ণ অবস্থা দেখা দেবে যা প্রথমটির পর প্রকাশিত হবে। আক্ষরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াতগুলোতে ভূমিকম্পের কোনো উল্লেখ নেই কেননা অভিধানে রাজফান, ভয়াবহ উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তিকর অবস্থাকে বলা হয় যেমন رَجَفَ الشَّيْءُ -এর অর্থ اِضْطَرَبَ اِضْطِرَابًا شَدِيْدًا কিন্তু যেহেতু ভূমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের কারণেই প্রকম্পিত হয় সে কারণে আমরা এখানে ভূমিকম্পের অধিক সম্ভাবনার কথা ধারণা করে ভূমিকম্পের অর্থ করেছি। নতুবা এটি অসম্ভব নয় যে, এ কম্পন অন্য কোনো দুর্ঘটনার ফলেও হতে পারে, ভূমিকম্পনের কারণে না-ও হতে পারে বা এই ভূমিকম্প বলতে অন্য কোনো বিপদও হতে পারে। সুতরাং এখানেও সেকথাই বিদ্যমান যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি অর্থাৎ, এ আয়াত

নিশ্চিতভাবে ভূমিকম্পের প্রমাণ বহন করে না যদিও تَرجف الرَّاجفة এর খুব সম্ভব অর্থ হলো, ভূমিকম্প; বাকি আল্লাহই ভালো জানেন। আমাদের ভবিষ্যদ্‌বাণীর শব্দের অর্থ ভূমিকম্প নয় বলে আমরা কখন আর কবে মন্তব্য করলাম? বরং আমরা বলি, যালযালা শব্দের প্রধান অর্থ হলো ভূমিকম্প। কিন্তু খোদার প্রাচীন রীতি অনুসারে হতে পারে, এ স্থানে এর অর্থ হলো, কোনো এমন ভয়াবহ ও অসাধারণ এবং কঠিন ধ্বংসলীলা আনয়নকারী বিপদ যা নিজের ভেতর ভূমিকম্পের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব রাখবে। কেননা খোদা তা'লার কথায় প্রায় সময় রূপকের ব্যবহার দেখা যায় যা জ্ঞানীরা অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু প্রাধান্য পাবে বাহ্যিক অর্থ আর এসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর বাহ্যিক শব্দগুলো ভূমিকম্পের প্রমাণ বহন করে।

আপত্তিকারী বার বার এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, ভবিষ্যদ্‌বেত্তা শব্দকে সুনির্দিষ্ট করে ভূমিকম্প আখ্যায়িত করেন নি আর পূর্ণতার সময়ও উল্লেখ করেন নি তাই এটি কীসের ভবিষ্যদ্‌বাণী? এমনিতেও কিয়ামত পর্যন্ত কোনো না কোনো দুর্ঘটনা তো ঘটতেই থাকবে আর সেটিকে সহজেই কেউ নিজের ভবিষ্যদ্‌বাণী আখ্যায়িত করতে পারে!

আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, আমরা বার বার বলে যাচ্ছি, আমাদের ভবিষ্যদ্‌বাণীতে উক্ত ভূমিকম্প বলতে প্রধানত ধারণা হলো ভূমিকম্প। আর যদি তা না হয় তাহলে এর অর্থ হলো, এমন অসাধারণ বিপদ, যা ভূমিকম্পের সাথে গভীর সামঞ্জস্য রাখে এবং পুরো ভূমিকম্পের বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে অন্তর্নিহিত রাখবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপত্তিকারী সাহেব এ ব্যাখ্যায় আশ্বস্ত হন না। আমি জানি না, এমন সন্দেহ নিয়ে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে কীভাবে তিনি আশ্বস্ত হলেন? সবাই জানে নবীদের ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে এতটা যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, তা অলৌকিক ও মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে হবে বা এমন কোনো অদৃশ্য বিষয়-সংবলিত হবে যা সম্পর্কে মানুষ সময় আসার পূর্বে ধারণাও করতে পারে না। যখন কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণীতে অসাধারণ কোনোকিছু ঘটবে বলে উল্লেখ করা হয় যা বর্ণনা করার সময় কোনো মানুষের বোধবুদ্ধি ও চিন্তা চেতনায় আসতেই পারে না যে, এমন বিষয় ঘটতে যাচ্ছে, আর তা সম্পূর্ণভাবে অসাধারণ বিষয় হবে। বিগত শত শত বছরে যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া না যায়, আর ভবিষ্যতেও যা প্রকাশ পাবার লক্ষণ সামনে থাকে না– তা যদি সত্য প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে সুস্থ বিবেক এটিই বলে যে, এমন

ভবিষ্যদ্‌বাণী অবশ্যই খোদার পক্ষ থেকে বলে মনে করা হবে। নতুবা সকল নবীর ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোকে অস্বীকার করতে হবে। এখন একটু মনোযোগ সহকারে শোনো! আগামী ভূমিকম্প সম্পর্কে অর্থাৎ আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে এটি মনে করা যে, তা প্রকাশ পাবার কোনো সীমা বা সময় নির্ধারণ করা হয় নি– এটি সম্পূর্ণরূপে একটি ভ্রান্ত ধারণা। এটি চিন্তা-প্রণিধানের ঘাটতি, অতি বিদ্বেষ ও ত্বরাপরায়ণতা থেকে সৃষ্ট। কেননা খোদার ওহী আমাকে বার বার সংবাদ দিয়েছে যে, সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী আমার জীবদ্দশায় আমারই দেশে এবং আমার কল্যাণার্থে প্রকাশিত হবে। যদি তা সামান্য বিষয় হয় যার পূর্বে ও পরে এর শত শত দৃষ্টান্ত থাকে আর যদি তা এমন কেনো অসাধারণ নিদর্শন না হয় যা কিয়ামতের লক্ষণ প্রকাশ করে তাহলে আমি নিজে স্বীকার করছি যে, এটিকে ভবিষ্যদ্‌বাণী মনে কোরো না। তোমার নিজের কথা অনুসারে এটিকে ঠাট্টা ধরে নিও। আমার বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি। ত্রিশ বছর পূর্বে খোদা তা'লা আমাকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন যে, তোমার আয়ুস্কাল ৮০ বছর হবে বা পাঁচ-ছয় বছর বেশি হবে বা পাঁচ-ছয় বছর কম হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি খোদা তা'লা এই ভয়াবহ বিপদ প্রকাশে অনেক বিলম্ব করেন তাহলে সর্বোচ্চ ১৬ বছর করতে পারেন এর বেশি নয় কেননা এই দুর্ঘটনা আমার জীবদ্দশায় ঘটা আবশ্যক।*

কিন্তু ভবিষ্যদ্‌বাণীর অর্থ এই নয় যে, পুরো ১৬ বছর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী পুর্ণ হওয়া স্থগিত থাকবে বরং হতে পারে আজ হতে এক বা দুই বছরের ভেতর বা তারও পূর্বে এ ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হবে। খোদা তা'লা এ প্রতিশ্রুতিও দেন নি যে, আমার বয়স অবশ্যই আশি বছরের বেশি হবে বরং এ সম্পর্কে খোদার ওহীতে যে বাক্য উল্লিখিত আছে তাতে একটি গোপন আশা দেওয়া হয়েছে যে, খোদা তা'লা চাইলে আশি বছর থেকেও বয়স কিছু বেশি হতে পারে। ওহীতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাহ্যিক শব্দগুলো ৭৪ ও ৮৬-র ভেতর বয়স নির্ধারণ

*** টীকাঃ** খোদার একটি এলহাম হলো, আবার বসন্ত এলো খোদার কথা আবার পূর্ণ হলো, যা থেকে বুঝা যায়, প্রতিশ্রুত ভূমিকম্প বসন্তকালে আঘাত হানবে। কোনো কোনো এলহাম থেকে বুঝা যায় তা প্রভাত বেলা বা এর কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত হবে। খুব সম্ভব সে সময় সন্নিকটে যখন সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণতা লাভ করবে বা হতে পারে খোদা তা কিছুটা বিলম্বিত করবেন। –লেখক

করে। যাহোক, এটি আমার ওপর একটি অপবাদ যে, আমি এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর কোনো সময় নির্ধারণ করি নি আর খোদা তা'লা বার বার ওহীতে বলছেন যে, আমি তোমার জন্য এই নিদর্শন প্রকাশ করব আর তাদের বলে দাও, এ নিদর্শন আমার সত্যতার সাক্ষী হবে। আমি তোমার জন্য অবতরণ করব আর তোমার জন্য আমার নিদর্শন দেখাবো। আমি তোমার কাছে আমার বাহিনী নিয়ে তখন আসব যখন কেউ তা জানতেও পারবে না আর সে সময়টি কখন তা খোদা ছাড়া আর কেউ জানে না। যেমনটি মূসার যুগে হয়েছে যে, ফেরাউন ও হামান ততদিন উদাসীন ছিল যতক্ষণ নীলনদের তুফান তাদের পাকড়াও করে নি আর এখনও এমনিই হবে। এরপর বলেন, তুমি আমার চোখের সামনে নৌকা বানাও এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের পক্ষে সুপারিশ কোরো না; তাদের সুপারিশকারী হয়ো না কেননা আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করব। খোদার এমন স্পষ্ট এলহাম আরো অনেক আছে, সবক'টির সারকথা হলো, এ ভবিষ্যদ্‌বাণী আমার জীবদ্দশায় এবং আমার যুগে প্রকাশিত হবে। এর সীমারেখা সুনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট যা সে পেরিয়ে যেতে পারবে না, কিন্তু এটি জানা নেই যে, তা কি কয়েক মাস, কয়েক সপ্তাহ, নাকি কয়েক বছর পরে প্রকাশিত হবে– কিন্তু তা ষোলো বছর অতিক্রম করবে না। এটি এমনই একটি বিষয় যেমনটি কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর বয়স হযরত আদম থেকে আরম্ভ করে সাত হাজার বছর আর তাতে আমাদের যুগ পর্যন্ত ছয় হাজার বছর কেটে গেছে, যেমনটি কিনা সূরা আসরের গাণিতিক মান থেকে বুঝা যায়। চান্দ্র বছরের হিসাবে আমরা এখন সপ্তম হাজার বছরে রয়েছি। যে মসীহ মওউদ ষষ্ঠ হাজারের শেষের দিকে আসার কথা তিনি এসে গেছেন।* কিয়ামতের সময় জানা নেই মর্মে যা বলা হয় তার অর্থ এই নয় যে, খোদা তা'লা মানুষকে কিয়ামত সম্পর্কে

---

* **টীকাঃ** খোদা তা'লা আদমকে জুমুআর দিন আসরের সময় সৃষ্টি করেছেন; তওরাত, হাদীস ও কুরআন থেকে এটিই প্রমাণিত হয়। এর আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আদম থেকে পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর। ষষ্ঠ হাজার যা ছয় দিনের বিপরীতে তা দ্বিতীয় আদমের আবির্ভাবের দিন অর্থাৎ যা নির্ধারিত তা হলো, ষষ্ঠ হাজারে পৃথিবী থেকে ধার্মিকতা হারিয়ে যাবে আর মানুষ কঠিন উদাসীন ও অধার্মিক হয়ে যাবে। তখন মানুষের আধ্যাত্মিক ধারা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মসীহ মওউদ আসবেন। তিনি প্রথম

কোনো ধরনের জ্ঞানও দান করেন নি, নতুবা কিয়ামতের লক্ষণাবলি বর্ণনা করা নিরর্থক হবে। কেননা যে বিষয়টি খোদা তা'লা এভাবে গোপন রাখতে চান তার লক্ষণাবলি বর্ণনা করার প্রয়োজনইবা কী? তাই এমন আয়াতের অর্থ হলো, কিয়ামতের বিশেষ মুহূর্তের কথা কারো জানা নেই। খোদা অন্তঃসত্ত্বাবস্থার দিনগুলোর ন্যায় মানুষকে এতটা জ্ঞান অবশ্যই দিয়েছেন যে, ৭ম হাজার অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত এ পৃথিবীর অধিবাসীদের ওপর কিয়ামত নেমে আসবে। এর উদাহরণ এভাবে দেওয়া যায়– প্রত্যেক মানুষের গর্ভে থাকা শিশু ৯ মাস ১০ দিনে অবশ্যই ভূমিষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জন্মের বিশেষ মুহূর্ত জানা নেই। একইভাবে কিয়ামতও ৭ হাজার বছর পর্যন্ত এসে যাবে কিন্তু তা সংঘটনের বিশেষ মুহূর্ত জানা নেই। হতে পারে ৭ হাজার পূর্ণ হবার পর ভগ্নাংশস্বরূপ দুই বা তিন শতাব্দী অধিক হবে যা ধর্তব্য নয়।

আপত্তিকারীর দ্বিতীয় আপত্তি হলো– এ দাবি করা হয় নি যে, এটি সত্যিই ভূমিকম্প। এ আপত্তিও বুদ্ধির দৈন্যতা থেকে সৃষ্ট, ওহীর বাহ্যিক শব্দে

*** চলমান টীকা:** আদমের ন্যায় ষষ্ঠ সহস্রের শেষের দিকে আসবেন যা খোদার ষষ্ঠ দিন। অতএব তিনি এসে গেছেন আর যিনি এই রচনার মাধ্যমে এখন সত্যের তবলীগ করছেন, তিনিই সে ব্যক্তি। এখানে আমার নাম আদম রাখার কারণ হলো, মানবজাতির পরিপূর্ণ মানবের সূচনা আদম থেকে হয়েছে আর আদমের মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়েছে, কেননা এ পৃথিবীর গঠন গোলাকার আর বৃত্তের বৈশিষ্ট্য হলো, যে বিন্দু থেকে আরম্ভ হয় সে বিন্দুতে এসে সমাপ্ত হয়। তাই খাতামুল খুলাফার নাম আদম রাখা আবশ্যক ছিল। এ কারণেই যেভাবে আদম যমজ জন্মগ্রহণ করেছিল আমার জন্মও যমজ হয়েছে। যেভাবে আদম জুমুআর দিন জন্ম নিয়েছিল আমিও জুমুআর দিনই জন্মগ্রহণ করেছি। এছাড়া যেভাবে আদম সম্পর্কে ফেরেশতারা আপত্তি করেছিল আমার সম্পর্কেও ঐশী ওহী–

قالوا ا تجعل فيها من يفسد فيها۔ قال انى اعلم ما لا تعلمون۔

(তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে? তিনি বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। –অনুবাদক) অবতীর্ণ হয়েছে। যেভাবে আদমকে সিজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমার সম্পর্কেও খোদার ওহীতে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে যে,

يَخِرُّون على الاذقان سُجَّدًا ربّنا اغْفِرلنا اِنّا كُنّا خاطئين۔

(তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! আমাদের ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আমরা ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। –অনুবাদক)। –লেখক

প্রতিভাত হয় যে, এটি ভূমিকম্পই। সেই ভূমিকম্প হবার সম্ভাবনাই বেশি আর প্রথম ভূমিকম্প এর সাক্ষ্যও দেয় আর কুরআনের আয়াত–

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ

(আন-নাযিআত: ৭-৮)* ও এ অর্থের সমর্থন করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐশী গ্রন্থাবলি এদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, কোনো কোনো সময় এমন ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো রূপকভাবেও পূর্ণ হয়, কিন্তু অলৌকিক ও অসাধারণ দুর্যোগ হবার বৈশিষ্ট্য সেগুলোতে বিদ্যমান থাকে। আমাদের মতামত হলো, শতকরা নব্বই ভাগ লক্ষণ এটিই বলে যে, তা সত্যিকার অর্থে ভূমিকম্প, অন্য কিছু নয়। কেননা এতে ভূকম্পন আর ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হবার কথাও উল্লেখ আছে। এটি আমাদের করা অর্থ বা ইজতেহাদ। ঐশী রহস্যাবলি খোদা তা'লাই ভালো জানেন। হতে পারে আগামীতে তিনি আমাদের সামনে বিষয় আরো স্পষ্ট করবেন, কেননা তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আপনার একথা বলা যে, হযরত ঈসা তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোতে যেই ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করেছিলেন সেগুলোর তিনি কোনো ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন নি, তাই সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো নিজেই নির্দিষ্ট করে দেয়– তা আসলে কী? এটি আপনার অদ্ভূত কথা ও বিদঘুটে মতামত। এটি জানা কথা যে, সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণীতে হযরত ঈসা কোনো বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক এবং অলৌকিক ভূমিকম্পের কথা বলেন নি। যে দেশে হযরত ঈসা বসবাস করতেন সে দেশে বিরলই এমন কোনো বছর অতিবাহিত হয়ে থাকবে যখন ভূমিকম্প আসে না। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে দেশে সবসময় ভূমিকম্প আসে আর কোনো কোনোটি ভয়াবহও হয়ে থাকে। হযরত ঈসা নিজের জীবদ্দশায় কাশ্মীরে হিজরতের পূর্বে অনেক ভূমিকম্প দেখে থাকবেন।** সুতরাং আমি বুঝি না এসব সাধারণ দুর্ঘটনার নাম কী করে ভবিষ্যদ্‌বাণী রাখা যায়। সুতরাং যে হাস্যকর দিক আপনি আমার ভবিষ্যদ্‌বাণীতে সন্ধান করতে

---

* **টীকা:** সেদিন ভূমি তীব্র কম্পনে কেঁপে উঠবে আর এরপর আরো একটি প্রচণ্ড কম্পন হবে অর্থাৎ কিয়ামতের সন্নিকটে দুটি ভয়াবহ ভূমিকম্প আসবে। প্রথম ভূমিকম্পের পর দ্বিতীয় ভূমিকম্প হবে। –লেখক

** **টীকা:** আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি যে, হযরত ঈসার জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠে যাওয়া কেবল একটি মিথ্যা কাহিনি। সত্য কথা হলো, তিনি ক্রুশের মৃত্যু হতে রক্ষা

চেয়েছেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন, তা যদি আপনি হযরত ঈসা (আ.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীতে সন্ধান করতেন তাহলে অনায়াসে পেয়ে যেতেন। আর একথাও সঠিক নয় যে, হযরত ঈসা ভূমিকম্পের নাম ভূমিকম্পই রেখেছেন আর কোনো ব্যাখ্যা করেন নি। আপনি কি আমাকে হযরত ঈসার এমন কোনো বাক্য দেখাতে পারবেন যাতে লেখা আছে যে, এসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর অর্থ সত্যিকার অর্থে ভূমিকম্প, রূপক কোনো বিষয় নয় আর হযরত ঈসার কোনো সনদ ছাড়া আপনার কথা কীভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে? কেননা হযরত ঈসার ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেগুলোর প্রত্যেকটি রূপক। যেমন হযরত ঈসা দাবি করেছিলেন যে, আমি ইহুদীদের বাদশা। এই দাবির পর রোমান সরকারের কাছে গোয়েন্দা তথ্য পৌঁছানো হয় যে, ইহুদীরা তো রোমান সম্রাজ্যের অধীনে, অথচ এ ব্যক্তি দাবি

** **চলমান টীকাঃ** পেয়ে গোপনে ইরান ও আফগানিস্তান হয়ে কাশ্মীরে পৌঁছেছিলেন এবং সেখানে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করেছেন। পরিশেষে তিনি মৃত্যুবরণ করে শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লায় সমাহিত হন এবং আজও তাঁর কবর সেখানেই বিদ্যমান। يُزَارُ وَيُتَبَرَّكُ بِهٖ অর্থাৎ সেই স্থান যিয়ারত করা হয় এবং তা হতে বরকত হাসিল করা হয়। তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন নি। তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত ছিল যার চিকিৎসা 'মরহমে ঈসা' (তথা ঈসার মলম) দিয়ে করা হয়েছিল। এই মলমের নাম সেই কারণেই 'মরহমে ঈসা' রাখা হয়েছিল।* –লেখক

* **পাদটীকাঃ** যেভাবে আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.) উহুদের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন এবং তাঁর পবিত্র কপালে তরবারির বেশ কয়েকটি আঘাত লেগেছিল, যার ফলে তিনি আপদমস্তক রক্তে রঞ্জিত ছিলেন, তেমনিভাবে বস্তুত তাঁর চেয়েও অনেক কম মাত্রায় হযরত ঈসা ক্রুশে আহত হয়েছিলেন। অথচ অজ্ঞ লোকদের হযরত ঈসার প্রতি কী অদ্ভুত শিরক-কলুষিত ভালোবাসা যে, তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আঘাতগুলিকে স্বাভাবিক মনে করে কিন্তু হযরত ঈসার আহত ও ক্ষতবিক্ষত হওয়াকে তাঁর মর্যাদাতীত মনে করে এবং আপত্তি করে বলে, 'তাঁর সম্পর্কে এমন কথা কেন বলছো?'তারা তাঁকে সমগ্র পৃথিবী থেকে আলাদা একটি বিশেষত্ব দিতে চায়– (বলে) তিনিই একমাত্র আকাশে উঠে আবার পৃথিবীতে নেমে আসবেন, তিনিই একমাত্র এত দীর্ঘ জীবন লাভ করার যোগ্য! অথচ আল্লাহ তাঁকে জন্মের সময়ও একা রাখেন নি, বরং তাঁর বেশ কয়েকজন আপন ভাই এবং বোনও ছিল যারা একই মায়ের গর্ভজাত। পক্ষান্তরে আমাদের নবী (সা.) সম্পূর্ণ একাই ছিলেন, দ্বিতীয় কোনো ভাইও ছিল না আর বোনও ছিল না। –লেখক

করে যে, ইহুদীরা তার প্রজা আর সে তাদের বাদশা! রোমান সরকার যখন জিজ্ঞাসাবাদ করে তখন তিনি বলেন, আমার রাজত্ব এ জগতের নয় বরং আমার রাজত্ব হলো স্বর্গীয় রাজত্ব। এখন দেখুন! প্রারম্ভে হযরত ঈসার ধারণা ছিল যে, তিনি পার্থিব রাজত্ব লাভ করবেন আর এ ধারণার বশবর্তী হয়ে অস্ত্রশস্ত্রও ক্রয় করা হয়েছিল কিন্তু অবশেষে তা স্বর্গীয় রাজত্ব সাব্যস্ত হলো। এটিও অসম্ভব নয় যে, ভূমিকম্প বলতে তিনি কোনো ঊর্ধ্বলোকের বিষয় বুঝিয়ে থাকবেন, কেননা সিরিয়ায় সবসময় ভূমিকম্প এসেই থাকে। এমন স্থান সম্পর্কে ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণী করা এক বিরোধীর দৃষ্টিতে হাস্যকর ব্যাপার। একইভাবে হযরত ঈসা (আ.) বলেছিলেন, আমার বারোজন হাওয়ারী জান্নাতে বারোটি সিংহাসনে বসবে। এই ভবিষ্যদ্‌বাণীও ইনজীলে বিদ্যমান, কিন্তু তাদের মাঝে একজন অর্থাৎ ইহুদা ইস্কিরিওতি মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এখন বলো, বারো সিংহাসনের ভবিষ্যদ্‌বাণী কীভাবে সঠিক হতে পারে? আপনি যদি ভেঙেচুরে হিসাব মেলাতে পারেন তাহলে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন, আমরা কৃতজ্ঞ হবো। সত্য কথা হলো, এখানে রূপক অর্থও করা যায় না। একইভাবে হযরত ঈসা বলেছিলেন, এ যুগের লোকদের মৃত্যুর পূর্বেই আমি ফিরে আসবে। সুতরাং খ্রিষ্টান হোক বা মুসলমান, যারা তাঁকে আকাশে উঠিয়ে রেখেছে একথার উত্তর দেবার দায়িত্ব তাদের যে, ১৯০০ বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও হযরত ঈসা আসেন নি। আর ১৯০০ বছর পর্যন্ত যারা মারা গেছে তারা সবাই মাটিতে মিশে গেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ হযরত ঈসাকে আকাশ থেকে আসতে দেখে নি। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, সেই প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল যে, এ যুগের লোক জীবিত থাকবে আর আমি তাদের জীবদ্দশায় ফিরে আসব। বস্তুত এক ভবিষ্যদ্‌বাণী নিয়ে যারা গর্ব করতে চায় তারা করতে পারে, আমরা কুরআন শরীফের কথা অনুসারে হযরত ঈসাকে সত্য নবী বলে মানি। অবশ্য বর্তমানে যে 'ইনজীল' বিদ্যমান এর মাধ্যমে তাঁর নবুয়্যতও প্রমাণিত হয় না। খ্রিষ্টানরা তাঁর খোদা হবার কথা বলে বেড়োয়, কিন্তু আমাদের কাছে কুরআন যদি না থাকতো তা হলে তাঁর নবুয়্যত প্রমাণ করাই অসম্ভব বলে মনে হয়। যদিও এটি সত্য যে, খ্রিষ্টান সাহেবরা এমনভাবে ইনজীলের হাড়পাঁজর ভেঙে দিয়েছে যে, বর্তমানে এর ভালো মন্দের কোনো বিশ্বাস নেই, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত কিতাবকেও যদি আমরা মেনে নেই তবুও মুসলমানদের কাছে হযরত ঈসার ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণী নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা কুরআন শরীফে হযরত ঈসার এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা আদৌ উল্লেখ

নেই। সুতরাং কীভাবে ও কেন আমরা এটিকে সঠিক মানবো? পরিতাপ! আমার ভবিষ্যদ্‌বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার আপনি যত অপচেষ্টা করেছেন আর খোদাভীতি পরিত্যাগ করে জনগণের কাছে এগুলোকে যেভাবে তুচ্ছ প্রমাণের চেষ্টা করেছেন (তা হতে বুঝা যায়,) এমনটি করে আপনি এই বিস্বাদ পাপ বিনামূল্যে ক্রয় করেছেন। যদি প্রমাণাদি খণ্ডনে কিছুটা সফলতা লাভ হতো তাহলে অন্ততপক্ষে খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিতে আপনি সাধুবাদের যোগ্য হতেন। নীরবতায় কিছুটা হলেও মঙ্গল নিহিত থাকে, কিন্তু মুখ খুলে কী পেলেন? আপনি আমার ওপর আক্রমণ করেন নি, বরং সেই খোদার ওপর আক্রমণ করেছেন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। পরিতাপ! কঠোরচিত্ততা ও খ্যাতির বাসনা অধিকাংশ মানুষকে আমার বিরুদ্ধ দাঁড় করিয়েছে নতুবা আমার দাবি ও এর অনুকূলে প্রমাণাদি অনুধাবন কঠিন কিছু ছিল না। অদ্যাবধি সহস্র সহস্র নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে আর স্বর্গমর্ত্যও সাক্ষ্য দিয়েছে, কিন্তু যাদের হৃদয়ে মোহর মারা রয়েছে তারা বিরোধিতা হতে বিরত হয় নি। তারা খোদার কাছে একটি আযাব চেয়েছে যা যথাসময়ে আসবে। যারা খোদার মোকাবিলা করছে তারা যদি শাস্তি আসার পূর্বে মারা যেত তাহলে তাদের জন্য ভালো হতো, কিন্তু বিদ্বেষ ও অহংকারের নেশা তাদের বিভোর করে রেখেছে। সেদিন সন্নিকটে যখন খোদা তাদের বুঝাবেন।

এখন আমরা মৌলবি আবু সাঈদ মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর কয়েকটি সন্দেহ খণ্ডন করছি যা তিনি ১৯০৫ সনের ১৯ জুনের পয়সা পত্রিকায় ছাপিয়েছেন আর তা হলো–

তার আপত্তিঃ

সে লেখে (অর্থাৎ এ অধম) আমি বারাহীনে আহমদীয়ায় এ ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়ে লিখেছিলাম যে, পাহাড় ফেটে যাবে। এটি একটি ডাহা মিথ্যা।

আমার উত্তরঃ

একথায় আপনার কোনো সন্দেহ আছে কি যে, বারাহীনে আহমদীয়ার ৫১৬ পৃষ্ঠায়–

فلمّا تجلّٰى ربّه للجبل جعله دكًّا۔ والله موهن كيد الكافرين ولنجعله اٰيةً للناس ورحمةً منّا وكان اَمْرًا مَّقْضِيًّا

-বাক্য রয়েছে? অর্থাৎ যখন এই অধমের প্রভু এক বিশেষ পাহাড়ে তাজ্জাল্লী করবেন তখন সেটিকে টুকরো টুকরো করে দেবেন আর খোদা অস্বীকারকারীদের চক্রান্ত দুর্বল করে দেবেন আর আমরা পাহাড়ের এ ঘটনাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন বানাবো অধিকন্তু মুমিনদের জন্য এটি আশীর্বাদ হবে। প্রারম্ভেই এ বিষয়টির সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল অর্থাৎ পূর্বের নবীরা খবর দিয়েছিলেন যে, মসীহ মওউদ-এর যুগে এরূপ এক ভয়াবহ ভূমিকম্প আসবে। একইভাবে আমি জিজ্ঞেস করি, আপনার কী এ বিষয়ে সন্দেহ আছে যে, বারাহীনে আহমদীয়ার ৫৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'লার এ দ্বিতীয় ওহী–

فلمّا تجلّى ربّه للجبل جعله دكًّا۔ قوة الرحمٰن لعُبيد الله الصمد۔

যখন তার (অর্থাৎ এ অধমের) প্রভু পাহাড়ে নিজেকে প্রকাশ করবেন আর সেটিকে টুকরো টুকরো করে দেবেন আর এটি স্বীয় বান্দার সমর্থনে অর্থাৎ তার সত্যতা প্রকাশার্থে খোদার শক্তিবলে হবে?

এখন যেখানে এ উভয় বাক্য বারাহীনে আহমদীয়ায় বিদ্যমান আর তাতে অত্যন্ত পরিষ্কার এ প্রতিশ্রুতিটি রয়েছে যে, খোদা নিদর্শন প্রদর্শন করবেন আর সাহায্য ও সমর্থন দেবেন। এছাড়া সে সম্পর্কে যা কিছু বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে তা মিথ্যা কীভাবে হলো? পাহাড় বিদীর্ণ হবার জন্য কী ভূমিকম্প হওয়া আবশ্যকীয় প্রমাণ নয়? এখানে কি পরিষ্কারভাবে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি যে, আমরা পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়াকে আমাদের এ বান্দার জন্য নিদর্শন করব আর এ ঘটনা ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের প্রমাণ বহন করবে? ব্যাখ্যার জন্য ৫১৬ পৃষ্ঠায় ولنجعله اٰية للنّاس যে শব্দ রয়েছে এর চেয়ে বড়ো বাক্য হতে পারে কি? অর্থাৎ আমরা পাহাড় টুকরা টুকরা হবার ঘটনাকে লোকদের জন্য নিদর্শন নির্ধারণ করব। একইভাবে বারাহীনে আহমদীয়ার ৫৫৭ পৃষ্ঠায় যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এর চেয়ে পরিষ্কার ব্যাখ্যা আর কী হবে? কেননা পাহাড় টুকরো টুকরো করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এরপর বলেছেন, قوة الرحمٰن لِعُبَيد الله الصمد অর্থাৎ, এটি খোদার শক্তিবলে তাঁর বান্দার সাহায্য ও সমর্থনের জন্য প্রকাশিত হবে। এতসব ব্যাখ্যা সত্ত্বেও যে এমন স্পষ্ট ভবিষ্যদ্‌বাণীকে মিথ্যা জ্ঞান করল তার সম্পর্কে এছাড়া আর কী বলব যে, তার নিজের চোখই সাদা হয়ে গেছে আর সে আলোকোজ্জ্বল দিনকে রাত মনে

করে। এছাড়া কুরআনে যেখানে এ আয়াত রয়েছে সে স্থানটিও ভূমিকম্পেরই প্রমাণ বহন করে। কেননা এখনও তওরাত থেকে প্রমাণিত হয়, যখন হযরত মূসাকে খোদার নিদর্শন দেখানোর জন্য পাহাড় বিদীর্ণ হয়েছিল তখনও ভূমিকম্পই এসেছিল। এত প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ তা না মানে তাহলে সে দুটি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়ত তার ইন্দ্রিয়গুলোতে কোনো সমস্যা আছে এবং দৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি রয়েছে নতুবা কঠিন বিদ্বেষের পর্দা তাকে এই সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে যে কারণে সে আলো দেখে তা গ্রহণ করতে পারে না। এছাড়াও প্রত্যেক বুদ্ধিমান জানে যে, পাহাড় বিদীর্ণ হওয়া আবশ্যকীয়ভাবে ভূমিকম্পকে নির্দেশ করে আর এ ঘটনা অকাট্যভাবে ভূমিকম্পের প্রমাণ বহন করে। সুতরাং মৌলবি সাহেব কেন বলেন যে, এখানে কোনো স্থানে আদৌ ভূমিকম্পের উল্লেখ নেই। প্রশ্ন হলো– পাহাড় ভূমিকম্প ছাড়াও চূর্ণবিচূর্ণ হয়? মৌলবি সাহেবের বিবেকের ওপর এ কেমন পাথর পড়ল যে, স্পষ্ট বিষয়ও তিনি বোঝেন না? সত্তর বছর বয়সে পৌঁছে পুনরায় শিশু বয়সের অতি সরলতা প্রকাশ পাওয়া আরম্ভ হয়েছে। এর সাথে যেখানে খোদা বলেন, আমি এটিকে নিদর্শন বানাবো আর এর মাধ্যমে এই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির সাহায্য ও সমর্থন করব, সেখানে যে ব্যক্তির হৃদয়ে চরম দুর্ভাগ্যের মরিচা লেগেছে সে ছাড়া কে একথা অস্বীকার করতে পারে যে, পাহাড় বিদীর্ণ হওয়া– যার কথা বরাহীনে আহমদীয়ায় উল্লিখিত রয়েছে– তা এমন কোনো ঘটনা যাকে খোদা স্বীয় প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির জন্য নিদর্শন বানাবেন। যেমনটি কিনা সে স্থানে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন যে ولنجعله اٰيَةً لِّلنّاس– অর্থাৎ আমরা একে মানুষের জন্য নিদর্শন বানাবো।

তার কথাঃ

সরকার ও সাধারণ মানুষ বারাহীনে আহমদীয়ার উল্লিখিত পৃষ্ঠাগুলো লক্ষ করুন; এ বাক্য কী কোথাও দেখা যায়? এটি চরম পর্যায়ের ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

আমার উত্তরঃ

এই ধৃষ্টতা ও দাম্ভিকতা এবং বড়ো বড়ো বুলির বিপরীতে এছাড়া আমরা আর কী লিখতে পারি যে, আল্লাহ তা'লার অভিসম্পাত তার ওপর নিপতিত হোক। হে খোদার বান্দা! একদিন মরতে হবে। একবার তো সেই মুহূর্তের কথা চিন্তা করো যখন মৃত্যু যন্ত্রণার গোঙানি আরম্ভ হবে। যে দুটি আরবী

বাক্যের আমি আমার বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছি, তা কি বারাহীনে আহমদীয়ার ৫১৬ ও ৫৫৭ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান নেই? এই বয়সে এত বড়ো মিথ্যা বলছেন! বারাহীনে আহমদীয়া সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, কেবল আপনার কাছেই নেই। তাই প্রশ্ন হলো, এমন অহংকার ও দুষ্কৃতির আশ্রয় নিয়ে লাভ কী? এটি কি সত্য নয় যে, এই আয়াতগুলোতে পাহাড় বিদীর্ণ হবার উল্লেখ রয়েছে? এ এলহামে আল্লাহ তা'লা বলেন, আমরা পাহাড় বিদীর্ণ হওয়াকে মানুষের জন্য নিদর্শন বানাবো আর কতকের জন্য এই নিদর্শন রহমতের কারণ হবে। এটি কি সত্য নয় যে, এসব এলহামে খোদা তা'লা বলেন– এই নিদর্শন আমার বান্দার সাহায্য ও সমর্থনে প্রকাশ করব? যে এলহাম বারাহীনে আহমদীয়ার ৫৫৭ পৃষ্ঠায় আরবী ভাষায় লেখা আছে সেটির শিরোনামে উর্দূ ভাষায় এই এলহাম রয়েছে যে, পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন আর বড়ো শক্তিশালী আক্রমণের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন–* এটি কি সত্য নয়? এ বাক্যাবলি একসাথে দেখলে কি প্রমাণ হয় না যে, বারাহীনে আহমদীয়ায় পাহাড় বিদীর্ণ হবার যে কথাটি লেখা হয়েছে তার সাথেই উল্লিখিত পুস্তকে লিখে দেওয়া হয়েছে যে, এটি একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সময়ের পূর্বে আমরা বারাহীনে আহমদীয়ার এই ভবিষ্যদ্‌বাণীকে নির্দিষ্ট করতে পারি নি যে, তা কীভাবে

---

* **টীকাঃ** পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থাবলিতে এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর সমার্থক ভবিষ্যদ্‌বাণী হযরত ঈসা সম্পর্কে বিদ্যমান রয়েছে। যাতে লেখা রয়েছে যে ইহুদীরা তাঁকে গ্রহণ করবে না। এসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর বরাতে ইনজীলেও লেখা রয়েছে যে, যেই পাথরকে গাঁথকরা প্রত্যাখ্যান করেছে তা-ই কোণের প্রধান পাথর হলো; অর্থাৎ তিনি ইসরাঈলী নবীদের খাতামুল আম্বিয়া হলেন। অতএব এ ভবিষ্যদ্‌বাণীও সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর সাথে সামঞ্জস্য রাখে। কেননা খোদা তা'লা বলেন, মানুষ তাকে গ্রহণ করে নি কিন্তু আমি তাকে গ্রহণ করব আর জোরালে সব আক্রমণের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করব। অতএব যতদিন এসব কথা প্রকাশ না পেয়ে যাবে ততদিন পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যেভাবে ইনজীলে আছে, 'যেই পাথরকে গাঁথকরা প্রত্যাখ্যান করেছে সেটিই কোণের প্রধান পাথর হলো'। একইভাবে খোদা আমাকে বলেছেন যে, তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু আমি তোমাকে খাতামুল খোলাফা বানাবো। এ সম্পর্কে কয়েকভাবে খোদার ওহী রয়েছে, যদি সব লেখা হয় তাহলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। –লেখক

প্রকাশ পাবে। এটি এমন একটি বিষয় যাতে সকল নবী সমান। কিন্তু আমি বারাহীনে আহমদীয়া বা অন্য কোনো কিতাবে অস্বীকার করি নি যে, এটি একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী আর কীভাবে অস্বীকার করতাম কেননা বারাহীনে আহমদীয়ার পৃষ্ঠা ৫১৬-তে পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে যে,

ولنجعله اٰيةً لِّلنّاس ورحمةً منّا

অর্থাৎ পাহাড় বিদীর্ণ হওয়াকে আমরা মানুষের জন্য নিদর্শন করব। আবার পৃষ্ঠা ৫৫৭-তে পরিষ্কার লেখা আছে যে,

قوة الرحمٰن لعُبَيد الله الصمد

অর্থাৎ নিজ বান্দার সমর্থনে পাহাড় বিদীর্ণ হওয়া খোদার শক্তিবলে হবে। সুতরাং এখানে একজন দুষ্কৃতকারী নোংরা ব্যক্তি ছাড়া যে ঈমান, খোদা এবং বিচার দিবসের বিষয়ে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করে না আর কে একথা অস্বীকার করতে পারে যে, এটি একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী আর এতে একটি নিদর্শন প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে? যেখানে খোদা তা'লা এর নাম নিদর্শন রেখেছেন আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কোনো এক সময় আমরা এটি মানুষের কল্যাণের জন্য প্রকাশ করব সেখানে একথা বলার ধৃষ্টতা কে প্রদর্শন করতে পারে যে, তা নিদর্শন নয় এবং ভবিষ্যদ্‌বাণীও নয়? আমরা এটা মানি যে, আমরা বারাহীনের যুগে এ ভবিষ্যদ্‌বাণীকে কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করতে পারি নি কিন্তু এতে বিরোধীদের যে কোনো লাভ হবে– তা নয়, কেননা নবীর জন্য সময়ের পূর্বে সব ভবিষ্যদ্‌বাণী নির্দিষ্ট করা আবশ্যক নয়। এ বিতর্ক এ পুস্তকে ইতঃপূর্বে আমরা অনেক করেছি তাই এটি বার বার লেখা আমাদের জন্য আবশ্যক নয়। ঘরে কেউ আছে কিনা তা বুঝার জন্য একটি শব্দই যথেষ্ট।

তার আপত্তিঃ

এই তিন বাক্যে কৃষ্ণ কাদিয়ানী মিথ্যা বলেছে অর্থাৎ পূর্বের একটি বাক্য যার উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, একথা বলা যে, ভূমিকম্পের পর বার বার এ ধারণা মাথায় আসে যে, ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণী যেভাবে প্রচার করা উচিত ছিল সেভাবে প্রচার না করে আমি বড়ো পাপ করেছি।* তৃতীয়ত,

---

* **টীকাঃ** মৌলবি মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব আমার বাক্য 'আমার বার বার মনে হলো যে, আমি অনেক বড়ো পাপ করেছি' নিয়ে অনেক উল্লাস করেছেন। মৌলবি হবার দাবি করে

একথা বলা যে, যদিও আমি তখন জানতাম এমন লেখা হৃদয়গুলোকে আবশ্যকীয় সাবধানতার প্রতি আকৃষ্ট করবে না, তা সত্ত্বেও এ দুঃখ আমার হৃদয়কে জর্জরিত করে রেখেছে যে, যে সংবাদ আমি সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান খোদা থেকে লাভ করেছি, তা আমি যথাযথভাবে প্রচার করি নি।

আমার উত্তরঃ

কুধারণা করা এমন একটি জিনিস যার কোনো চিকিৎসা নাই। নতুবা জানা কথা, কোনো মানুষকে যদি জ্ঞান দেওয়া হয় যে, অমুক দলের ওপর অমুক ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসতে যাচ্ছে আর সে যদি সেই জাতিকে যতটা উচিত ততটা সতর্ক করতে না পারে আর একই সাথে তার এ বিশ্বাসও থাকে যে, আমার তাদেরকে বলা না বলা সমান; কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই ধ্বংসের পর সে এটি ভেবে মর্মাহত হবে– যদি তারা আমার ডাকে সাড়া দিয়ে বেঁচে যেত (কত ভালো হতো!) আমি মনে করি, এ বৈশিষ্ট্য সকল হৃদয়ে রয়েছে। কিন্তু হতে

*** চলমান টীকাঃ** তারা এটি জানে না, মানুষের মারিফাতের (তত্ত্বজ্ঞানের) পূর্ণতা এতেই নিহিত যে, মানুষ তার মহিমান্বিত প্রভুর সামনে প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে দোষী জ্ঞান করবে। এটাই নবীগণের আদর্শ। শয়তান সে– যে আল্লাহ তা'লার সম্মুখে বিনয়াবনত হয় না। নবীগণ– যারা কাঁদতেন, আর্তনাদ করতেন, আকুল হয়ে ডাকতেন, এই অন্তর্দাহ ও ব্যাকুলতার কারণ হলো, তাঁরা মনে করতেন, আমরা পাপ করেছি, কারণ প্রচারের দায়িত্ব যেভাবে পালিত হওয়া উচিত ছিল– আমরা সেভাবে পালন করতে পারি নি। নিজের প্রভু ও মনিবের সামনে এই অপরাধ স্বীকার করার মাঝেই সমস্ত পুণ্য নিহিত। যেমন আমাদের মহানবী (সা.)-এর সমস্ত ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) এই ভিত্তিতেই ছিল। অর্থাৎ তিনি ভয়ের মাঝে সময় অতিবাহিত করতেন– যে দায়িত্ব আমার প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছে তথা প্রচারের দায়িত্ব এবং আল্লাহর পথে জীবনবাজি রাখার দায়িত্ব যেভাবে পালন করা উচিত ছিল, আমি তা পূর্ণরূপে করতে পারি নি। এই দায়িত্ব মহানবী (সা.)-এর মতো কেউ পালন করে নি। তথাপি আল্লাহর মহিমা ও প্রতাপের ভয় তাঁর হৃদয়ে ছিল অপরিসীম। এ কারণেই নিরন্তর ইস্তিগফার ছিল তাঁর নিত্য অভ্যাস। তওরাতেও উল্লেখ আছে: "তখন মূসা তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা অবনত করলেন এবং বললেন, 'হে প্রভু! ... আমাদের পাপ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করো' (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৯)।" শাউল নবী বলেন, 'আমি পাপ করেছি কারণ আমি প্রভুর আদেশ অমান্য করেছি' (দেখুন ১ শমুয়েল ১৫:২৫)। দাউদ নবী আল্লাহ তা'লাকে সম্বোধন করে বলেন, 'আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি' (দেখুন গীতসংহিতা ৫১:৪)। –লেখক

পারে এ যুগের কতক মৌলবির হৃদয় এমন হবে যাদের মধ্য হতে খোদা এমন বৈশিষ্ট্য প্রত্যাহার করে থাকবেন। আর যদি কারো মনে এ প্রশ্নের উদয় হয় যে, কীভাবে বিশ্বাস করব عفت الديار محلّها ومقامها এলহামের অর্থ ভূমিকম্প বলে এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির দৃঢ়বিশ্বাস ছিল? এর উত্তর আমরা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি যে, এটি এমন এক পরিষ্কার এলহাম– যার অর্থ সম্পর্কে অবগত হলে একজন শিশুরও দৃঢ়বিশ্বাস জন্ম নিতে পারে– এতে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্‌বাণী অন্তর্নিহিত রয়েছে যার ভবন ও বাড়িঘরের ওপর প্রভাব পড়বে। এর এক বছর পাঁচ মাস পূর্বে আল-হাকাম পত্রিকায় অর্থাৎ ১৯০৩ সনের ডিসেম্বরের শেষের দিকের সংখ্যায় পরিষ্কার ভাষায় ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে। এছাড়া ১৯০২ সনে প্রকাশিত মাওয়াহেবুর রহমানেও একই ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণী বিদ্যমান। অধিকন্তু আমীন পুস্তিকায়ও এ ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে যা ১৯০১ সনে ছাপা হয়েছে। এত নিরবচ্ছিন্ন প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কোনো বিবেকবান কীভাবে ভাবতে পারে যে, আমরা এ ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অনবহিত ছিলাম? অবশ্য যেমনটি আমার রীতি– আমি বার বার বলেছি, ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে এ দাবি করা সম্ভব নয় যে, এগুলো কেবল একটি বিশেষ আঙ্গিকে প্রকাশ পাবে। হতে পারে সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান খোদা এগুলো প্রকাশের জন্য অন্য কোনো দিকও অবলম্বন করবেন, যাতে একই মাহাত্ম্য, শক্তি এবং প্রতাপ থাকবে, যার কথা ভবিষ্যদ্‌বাণীতে উল্লিখিত থাকে।

যেখানে عفت الديار محلّها ومقامها ভবিষ্যদ্‌বাণীর মাহাত্ম্য ও ভয়াবহতায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল আর আমি সেটিকে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে খোদার বাণী মনে করতাম, অধিকন্তু এর প্রকাশ আমার সামনে স্পষ্ট করেছিল যে, ভবিষ্যদ্‌বাণী আক্ষরিক অর্থে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সেটি কি মানবজাতির জন্য আমার সহানুভূতি উদ্‌বেলিত হবার আর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার সময় ছিল না যাতে তারা আগত ভূমিকম্প হতে রক্ষা পাবার জন্য তওবা, ইস্তেগফার এবং অন্য কোনো উত্তম ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগী হয়? যে বিপদের জ্ঞান আমাকে দেওয়া হয়েছে, তা আমি মানুষকে জানিয়ে দিয়ে কি মন্দ কাজ করলাম? কোনো বিপদ সম্পর্কে সংবাদ পেয়ে মানবজাতির জন্য হৃদয় উদ্‌বেলিত হওয়া কি মানুষের প্রকৃতিগত বিষয় নয়? অবশ্য কিছু কসাই প্রকৃতির লোক হয়ে থাকে যারা অন্যদের কষ্ট ও বিপদাপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না; এমন লোকদেরকে আমি মানুষ মনে করি না।

তার আপত্তিঃ

সুতরাং তার (অর্থাৎ এ অধমের) পক্ষ থেকে এই নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ নিজের এক বড়ো পাপে লিপ্ত হবার কথা মেনে নিয়েছে, ফলে নিজের নবী হওয়া-সংক্রান্ত আসল দাবির মূল কেটে দিয়েছে।

আমার খণ্ডনঃ

ইহুদীদের মতো আপনি যতটা চান প্রক্ষেপণ করুন, আমরা আপনাকে কিবা বলতে পারি? নতুবা যারা খোদা তা'লাকে ভয় করে তারা নবী ও রসূল হওয়া সত্ত্বেও স্বীকার করে যে, তবলীগ যেমনটি এবং যেভাবে করা উচিত ছিল, সেভাবে করা হয় নি;* আর একেই তারা মহাপাপ মনে করেন। একথা ভেবেই তারা চিৎকার করেন, কাঁদেন এবং ব্যথায় জর্জরিত হন আর সবসময় ইস্তেগফারে রত থাকেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন হতে রিক্তহস্ত মৌলবি– যাদের কাছে শুষ্ক হাড় ছাড়া আর কিছু নেই– তারা এ আধ্যাত্মিকতার কথা কিবা জানে। কোনো নবী নিষ্পাপ হবার কোনো আত্মপ্রসাদ নেন নি। পৃথিবীতে যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল অতিবাহিত হয়েছেন, তাঁর পবিত্র মুখ থেকেও এটি বেরিয়েছে–

ربنا اغفرلنا ذنوبنا وباعد بيننا وبين خطايانا

(অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের ও আমাদের ভুলত্রুটিগুলোর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন –অনুবাদক)। আর মহানবী (সা.) সবসময় বলতেন, সূরা হূদ আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে। তিনি সবচেয়ে বেশি ইস্তেগফার পড়তেন এবং বলতেন, আমি দিনে ৭০ বার ইস্তেগফার করি। অধিকন্তু খোদা তা'লা তাঁর (সা.) সম্পর্কে বলেছেন,

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

(আন-নাসর: ২-৪)

---

* **টীকাঃ** মহানবী (সা.) বলতেন, ما عبدناك حقّ عبادتك অর্থাৎ 'হে আমাদের খোদা! যেভাবে তোমার ইবাদত করার দায়িত্ব ছিল আমরা সেভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি

এ সূরা মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল। এতে আল্লাহ তা'লা জোরালো ভাষায় স্বীয় সাহায্য-সমর্থন ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যের পূর্ণতার সংবাদ প্রদান করে বলেন, 'হে নবী! এখন তুমি খোদার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো এবং খোদার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; তিনি বার বার তওবা গ্রহণকারী।' এ স্থানে ক্ষমার বা মাগফেরাতের কথা বলা এ দিকে ইঙ্গিত যে, এখন তবলীগের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। খোদার কাছে দোয়া করো, তবলীগের কাজে কোনো যদি ঘাটতি থেকে থাকে তাহলে খোদা যেন তা ক্ষমা করে দেন। মূসাও তওরাতে নিজের দুর্বলতা স্মরণ করে ক্রন্দন করেছিলেন। যাকে খ্রিষ্টানরা খোদা বানিয়ে রেখেছে, কেউ তাকে বলে যে, হে পুণ্যবান শিক্ষক! তখন তিনি উত্তর দেন– 'আমাকে পুণ্যবান বলো কেন? খোদা ছাড়া অন্য কেউ পুণ্যবান নয়।' সব ওলীর এটিই রীতি ও নীতি ছিল। শয়তান ছাড়া সবাই এ ইস্তেগফারকে নিজের রীতি ও পরিচিতি আখ্যায়িত করেছেন।

فرس کشتہ چنداں کہ شب راندہ اند سحر گہ خروشاں کہ وا ماندہ اند

বহু অশ্ব প্রাণ হারিয়েছে যাদের সারা রাত হাঁকানো হয়েছে,
প্রভাতে এটি নিয়ে বিলাপ করে যে তারা পিছিয়ে আছে।

সে (অর্থাৎ এ অধম) বারাহীনে আহমদীয়ার ভবিষ্যদ্‌বাণীকে সত্য বানানো আর এর সাথে ভূমিকম্পের সম্পর্ক দেখানো এবং একইভাবে অদৃশ্যের জ্ঞান ও নবুওয়তের প্রমাণকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দাবি করে বসেছে যে, বারাহীনে আহমদীয়ার ভবিষ্যদ্‌বাণীতে অতি স্পষ্টভাবে খোদার পক্ষ থেকে যে সংবাদ লাভ হয়েছিল তা ভূমিকম্প সম্পর্কিত ছিল। কিন্তু তবুও জাতির অপলাপ ও কুধারণার ভয়ে সেটি গোপন রেখেছে আর আরবীর উর্দূতে অনুবাদ করে প্রচার করে নি। এ কাজ করে সে খোদার বিরুদ্ধে কবিরা গুনাহ করেছে আর পঁচিশ (২৫) বছর পর্যন্ত এ পাপে অটল ও অবিচল থাকে।

আমার খণ্ডনঃ

মৌলবি সাহেব! আজ আপনি প্রক্ষেপণ বা মূল কথা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার ক্ষেত্রে ইহুদীদের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। মৌলবি আখ্যায়িত হওয়া

---

* **চলমান টীকাঃ** নি।' আপনি কি এখানে আপত্তি করবেন, যেখানে মহানবী স্বয়ং ইবাদতের দায়িত্ব পালনে অক্ষম ছিলেন সেখানে অন্যদের কেন নসীহত করেন? –লেখক

আবার এক পরিষ্কার বাক্যের অর্থ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে জেনেশুনে অসৎ পন্থা অবলম্বন করা কি সেসব লোকের কাজ হতে পারে– যারা পরকালে ঈমান রাখে? আমি আমার বিজ্ঞাপনে আবার কখন ও কোথায় লিখলাম যে, আমি ২৫ বছর পর্যন্ত এ পাপে লিপ্ত ছিলাম আর বারাহীনে আহমদীয়ার আরবী এলহামের অনুবাদ প্রকাশ করি নি? বারাহীনে আহমদীয়ার পৃষ্ঠা ৫১৬ ও ৫৫৭ খুলে দেখুন। উভয় স্থানে আরবী এলহামের অনুবাদ বিদ্যমান রয়েছে। তাই আমার পক্ষে এটি বলা কীভাবে সম্ভবপর ছিল যে, আমি আরবী এলহামের অনুবাদ উর্দূতে প্রকাশ করি নি আর ২৫ বছর পর্যন্ত সে পাপে লিপ্ত ও অটল ছিলাম? কোনো বিবেকবান ভাবতে পারে কি যে, এ উভয় এলহাম সম্পর্কে যা বারাহীনে আহমদীয়ার পৃষ্ঠা ৫১৬ ও ৫৫৭-তে উর্দূ অনুবাদসহ বিদ্যমান, আমি বিজ্ঞাপনে লিখব যে, আমি বারাহীনে আহমদীয়ায় এসব এলহামের অনুবাদ প্রকাশ করি নি? প্রকৃত বিষয় হলো, আমার এ উক্তি ১৯০৫ সনের ১১ মে তারিখের বিজ্ঞাপনের আরবী এলহামের সাথে সম্পর্ক রাখে– যা ১৯০৪ সনের ৩ মে তারিখের আল-হাকামে অনুবাদ ছাড়া প্রকাশ করা হয়েছিল। অর্থাৎ عفت الديار محلّها ومقامها এলহাম এর উর্দূ অনুবাদ লেখা হয় নি। মৌলবি সাহেব আমার ওপর এ অপবাদ আরোপের জন্য এই প্রক্ষেপণ করেছেন। তার মতে আমি জেনেশুনে ২৫ বছর পর্যন্ত বারাহীনে আহমদীয়ার আরবী এলহামের অনুবাদ করি নি আর গোপন রেখেছি!

এছাড়া ভূমিকম্প সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়ায় দুটি ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল। একটি ৫১৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ছিল আর দ্বিতীয়টি পৃষ্ঠা ৫৫৭-তে।* আমার ১৯০৫ সনের ১১ মে-র বিজ্ঞাপনে শুধু একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে লেখা আছে যে, এর উর্দূ অনুবাদ হয় নি। অতএব এখানে যদি ১৯০৫ সনের ১১ মে-র বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত সে দুটো ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা বলা হয়ে থাকে তাহলে তাতে এ বাক্য থাকার কথা নয় যে, আরবী ভবিষ্যদ্‌বাণীর অনুবাদ হয় নি বরং বাক্য হওয়া উচিত ছিল, আরবী দুটো ভবিষ্যদ্‌বাণীর অনুবাদ হয় নি। কিন্তু এটি লেখাও মিথ্যা হতো, কেননা উভয় আরবী ভবিষ্যদ্‌বাণীর অনুবাদ বারাহীনে আহমদীয়ায় বিদ্যমান রয়েছে যার ইচ্ছা হয় দেখে নিতে পারে।

*** টীকাঃ** রূহানী খাযায়েন-এর ২০০৮ সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ৬১৫ এবং ৬৬৫ পৃষ্ঠায় এই উদ্ধৃতিটি পাওয়া যায়। –অনুবাদক

এছাড়া তিনি ১৯০৫ সনের ১১ মে-র যে এলহামের ভিত্তিতে সমালোচনা করছেন, এখনও দুনিয়া থেকে তা হারিয়ে যায় নি বরং অনেকের কাছে তা সংরক্ষিত থাকবে। এর আসল বাক্য হলো, সেই ভূমিকম্পের পর আমার বার বার মনে হলো যে, আমি অনেক বড়ো পাপ করেছি, কেননা যেভাবে তা প্রচার করা উচিত ছিল, সেভাবে প্রচার করি নি; সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী আরবী ও উর্দূর কেবল দুটি পুস্তিকায় ছাপা হয়েছিল। এছাড়া আরো যে ঘাটতি রয়ে গিয়েছিল তা হলো, আরবী ভবিষ্যদ্‌বাণীর অনুবাদও হয় নি। এখন এটি স্পষ্ট যে, বারাহীনে আহমদীয়ার আরবী ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো– যা পৃষ্ঠা ৫১৬ ও ৫৫৭-তে উল্লিখিত আছে– তা দুটি উর্দূ পত্রিকায় প্রকাশিতও হয় নি আর অনুবাদও বাদ পড়ে নি, এছাড়া অন্য কোনো পত্র-পত্রিকায় সেগুলোর উল্লেখও করা হয় নি, বরং সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী যা দুটি উর্দূ পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল আর যার আরবী থেকে উর্দূতে অনুবাদ করা হয় নি তা হলো عفت الديار محلّها ومقامها। কেননা তা দুটি পত্রিকা ছাড়াও যেগুলোর একটি হলো ১৯০৫ সনের ৩১ মে-র আল-হাকাম আরো দুটি পুস্তিকায় উল্লিখিত হয়েছিল। অর্থাৎ মৌলবি মুহাম্মদ আলী এম.এ. সেটি তাঁর উভয় পত্রিকায় ১৯০৪ সনের ২০ মার্চ ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন টীকায় তাঁর নিজের হাতের লেখা নোট রয়েছে।*

এখন একটু চোখ খুলে প্রধানত আপনি মৌলবি সাহেবের নোট পড়ে নিন আর লজ্জায় ডুবে মরুন! এর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। হে খোদার বান্দা! এতটা চালাকি হয়ত সেসব ইহুদীরাও করত না, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ [অর্থাৎ তারা (কিতাবের) শব্দগুলো এর যথাস্থান থেকে রদবদল করে। (আল-মায়েদা: ১৪) –অনুবাদক] তাই প্রশ্ন জাগে, এ কেমন মৌলবিগিরি আপনি প্রকাশ করলেন? আমি ভাবতে পারি না যে, আপনি এত নির্বুদ্ধিতা দেখাবেন অর্থাৎ অতি সরলতাবশত বাক্য বুঝতে ভুল করে

---

* **টীকা:** সৈয়্যদী! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এই এলহাম عفت الديار محلّها ومقامها মার্চ মাসের উভয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং পত্রিকার ১২৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই এলহাম পড়ে এবং পরে সংবাদপত্রে ভূমিকম্পের খবর পড়ে চার্লস সোরাইট আবদুল হক, যিনি সেই সময় নিউজিল্যান্ডে ছিলেন– একটি চিঠি লিখেছিলেন। যাতে তিনি ভূমিকম্পের মাধ্যমে এই এলহাম পূর্ণ হবার বিষয়ে গভীর আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। –মুহাম্মদ আলী

থাকবেন। আপনি বারাহীনে আহমদীয়ার রিভিউ লিখেছেন আর আপনি খুব ভালোভাবে জানতেন যে, বারাহীনে আহমদীয়ার সেসব আরবী এলহাম যার আমি আমার বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছি, তা অনুবাদ না করে লেখা হয় নি। এছাড়া আপনি ভালোভাবে জানতেন যে, বারাহীনে আহমদীয়ার এসব আরবী এলহামের উল্লেখ আমাদের জামা'তের সেই দুই পত্রিকা অর্থাৎ আল-বদর ও আল-হাকামেও করা হয় নি আর আমদের জামা'তের কেউ এমন দুটি পত্রিকাও প্রকাশ করে নি যাতে বারাহীনে আহমদীয়ার এই দুটি এলহামের উল্লেখ করা হয়ে থাকবে। যেখানে অন্য কোনো পত্রিকা বা পুস্তিকায় নয়, বরং বারাহীনে আহমদীয়ায় এ দুটি এলহামের অনুবাদ বিদ্যমান। এছাড়া তা কেবল একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী নয় যে, ১৯০৫ সনের ১১ মে-র বাক্য এর ক্ষেত্রে পূর্ণ হবে অর্থাৎ আরবী ভবিষ্যদ্‌বাণীর অনুবাদও করা হয় নি; বরং তা দুটি ভবিষ্যদ্‌বাণী। এমন পরিস্থিতিতে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার কাছে প্রশ্ন হলো, আপনি কেন এত বড়ো মিথ্যার আশ্রয় নিলেন? হয়ত করম দীনের মামলায় মৌলবিরা পরিস্থিতির দাবি অনুসারে মিথ্যা বলাকে সঠিক বলে যে ফতোয়া দিয়েছিল আপনিও তার ওপর আমল করে থাকবেন। যাহোক, আপনি বলুন, عفت الديار محلّها ومقامها এলহাম সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়ার এ দুটি আরবী এলহাম সম্পর্কে পৃষ্ঠা ৫১৬ ও ৫৫৭-তে যে উল্লেখ ছিল তা আপনি কেন উলটে দিলেন? মৌলবি হিসেবে এমন মিথ্যা রচনা করাই কি আপনাদের সততা ও বিশ্বস্ততা! আপনারা একটুও খোদাকে ভয় করলেন না? এখানেই শেষ নয়, বরং আপনি নিজের পক্ষ থেকে নিছক দুষ্কৃতি ও ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে এই প্রবন্ধে একটি বাক্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করতে চান যে, আপনি আমার প্রতি যা আরোপ করেছেন তা যেন আমারই লেখা! সেই বাক্য যা আপনি প্রতারণামূলকভাবে আমার প্রতি আরোপ করেছেন তা হলো, "বারাহীনে আহমদীয়ার ভবিষ্যদ্‌বাণীর মাধ্যমে খোদার পক্ষ থেকে অতি পরিষ্কারভাবে আমার এ সংবাদ লাভ হয়েছিল, এর দ্বারা ভূমিকম্প বুঝানো হয়েছে, তা সত্ত্বেও মানুষের কুধারণা ও অপলাপের ভয়ে তা গোপন রেখেছি আর আরবীর অনুবাদ উর্দূ করে ছাপিয়ে দিয়েছি। এ কাজ করে খোদার বিরুদ্ধে আমি কবিরা গুনাহ করেছি এবং ২৫ বছর পর্যন্ত এ পাপে অটল ও অনড় ছিলাম!" হে প্রতারক অকর্মণ্য! আমি কি এখনও বলব না যে, মিথ্যাবাদির প্রতি খোদার অভিসম্পাত। তুমি নিজে বাক্য বানিয়ে আমার প্রতি

আরোপ করেছ! হে পাষাণ সীমালঙ্ঘনকারী! মৌলবি নাম রেখে তুমি আমার প্রতি এত বড়ো মিথ্যারোপ করলে! তোমার লজ্জা হলো না? তুমি কি আমার ১৯০৫ সনের ১১ মে-র বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো বিজ্ঞাপনে বা কোনো পুস্তিকায় এ বাক্য দেখাতে পারবে যা তুমি লিখেছ? لعنة الله على الكاذبين (মিথ্যাবাদীর প্রতি খোদার অভিসম্পাত)।

এখানে সেসব লোকের সতর্ক থাকা উচিত, যারা এমন লোকদের মৌলবি ও সৎ বলে মনে করে, তাদের কথা অনুসারে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়; (স্মরণ রাখবেন,) এই হলো এদের সততার চিত্র। মিথ্যাবাদীর কথায় অবশ্যই স্ববিরোধ থাকে, তাই উল্লিখিত মৌলবি সাহেবের এ বিবৃতিও স্ববিরোধে ভরা। যেমন তিনি উল্লিখিত পত্রিকার পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামের ১৫শ ও ২৪শ লাইনে আমার বিজ্ঞাপনের বাক্য এভাবে লিখছেন, "আমি বারাহীনে আহমদীয়ায় এ ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছিলাম যদিও তখন এ অসাধারণ কথার দিকে হৃদয় আকৃষ্ট হয় নি, কিন্তু এখন এসব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি দৃষ্টিপাতে বুঝা যায় যে, এটি ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ভূমিকম্প সম্পর্কে ছিল, যা তখন দৃষ্টির বাইরে ছিল।"

এখন দর্শক নিজেই দেখুন, উল্লিখিত বাক্যের অর্থ হলো– সে যুগে অর্থাৎ বারাহীনে আহমদীয়া লেখার যুগে, দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয় নি যে, ভূমিকম্প বলতে ভূমিকম্প বুঝায় আর এ বিষয়টি তখন দৃষ্টির আড়ালে ছিল। এখন পঁচিশ বছর পর যেহেতু ভূমিকম্প প্রকাশ পেয়ে গেল তাই জানা গেল যে, বারাহীনে আহমদীয়ার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ছিল আগত ভূমিকম্প সম্পর্কে।

তিনি আমার পক্ষ থেকে এই স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন আর এটি শতভাগ সঠিক কথা। কেননা আমি আমার বিজ্ঞাপন النداء من وحى السماء (আন-নিদা মিন ওয়াহয়িস সামা)-তে যা ১৯০৫ সনের এপ্রিলে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে সত্যিকার অর্থে এ বাক্য বিজ্ঞাপনের ৭ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছি যা লাহোরের নোভেল কিশওয়ার ছাপাখানায় ছেপেছে। পুরো বাক্যটি হলো– "স্মরণ রাখতে হবে যে, এ উভয় ভূমিকম্পের উল্লেখ আমার বই বারাহীনে আহমদীয়ায় বিদ্যমান যা আজ থেকে ২৫ বছর পূর্বে বহু দেশে প্রেরণ করা হয়েছিল। তখন সেই আসাধারণ বিষয়ের প্রতি যদিও দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নি, তবুও

এখন এসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রতি দৃষ্টিপাতে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তা ছিল ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ভূমিকম্প-সংক্রান্ত, যা তখন দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গিয়েছিল।"

এখন পাঠক বুঝতে পারেন, আমি সেই বিজ্ঞাপনে পরিষ্কারভাবে লিখে দিয়েছি যে, ১৯০৫ সনের ৪ এপ্রিলের ভূমিকম্প সংঘটিত হবার পূর্বে একথার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নি। আক্ষরিক অর্থে পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া বলতে বারাহীনে আহমদীয়ার এই এলহামের শব্দে ভূমিকম্পই বুঝায়। একথার পক্ষে একটি প্রমাণও আছে আর তা হলো– বারাহীনে আহমদীয়ায় যেখানে এ দুটি এলহামের অনুবাদ করা হয়েছে; সেখানে আক্ষরিক অনুবাদ হয় নি। বস্তুত এ ১৯০৫ সনের ২১ এপ্রিলের বিজ্ঞাপন যা আমি ১৯০৫ সনের ৪ এপ্রিলের পরে লিখেছিলাম তাতে পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেছি যে, বারাহীনে আহমদীয়ার উভয় স্থানের এলহামকে যা কিনা فلمّا تجلّٰی ربّه للجبل শুধু ভূমিকম্পের জন্য নির্ধারণ করতে পারি নি। কিন্তু ৪ এপ্রিল ১৯০৫ সনের ভূমিকম্পের পর প্রকাশ পেয়ে যায় যে, তা এ ভূমিকম্প সম্পর্কে ছিল। এটি সে বিষয়– যা আমার ১৯০৫ সনের ২১ এপ্রিলের বিজ্ঞাপন থেকে প্রমাণিত হয়।

এখন এ বিজ্ঞাপনের বিপরীতে মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন সাহেব নিছক প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়ে নিজেই একটি বাক্য বানিয়ে আমার প্রতি যে দাবি আরোপ করেছেন, সেই বাক্য আমি পুনরায় লিখে দিচ্ছি। তা হলো, "বারাহীনে আহমদীয়ার ভবিষ্যদ্‌বাণীর মাধ্যমে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে খোদার পক্ষ থেকে এ মর্মে আমার সংবাদ লাভ হয়েছিল যে, এর অর্থ হলো ভূমিকম্প, কিন্তু আমি মানুষের কুধারণা ও অপলাপের ভয়ে সেটি গোপন রেখেছি আর আরবীর উর্দূতে অনুবাদ করে তা প্রচার করি নি। এ কাজ করে আমি খোদার বিরুদ্ধে কবিরা গুনাহ করেছি এবং ২৫ বছর পর্যন্ত এ পাপে অটল ও অনড় ছিলাম।"

এখন পাঠকগণ ন্যায়ের দৃষ্টিতে বলুন, উক্ত মৌলবি সাহেব আমার প্রতি এই যে বিবৃতি আরোপ করেছেন, এটি কি আমার ১৯০৫ সনের ২১ এপ্রিলের বিজ্ঞাপনের পরিপন্থি নয় যা আমি এখনই উদ্ধৃত করেছি? কেননা আমি উল্লিখিত বিজ্ঞাপনে পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করেছি যে, সেই বিজ্ঞাপনের পূর্বে

যা বারাহীনে আহমদীয়ার ২৫ বছর পর আমি ১৯০৫ সনের ১১ মে তারিখে প্রকাশ করেছি একথার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় নি যে ভূমিকম্প বলতে সত্যিকার অর্থে আক্ষরিক ভূমিকম্প বুঝায়, বরং ২৫ বছর পর যখন ভূমিকম্প এলো তখন এসব এলহামের অর্থ স্পষ্ট হলো।

সুতরাং যেখানে এই উভয় বিবৃতি স্ববিরোধী আর আমি এই উভয় বিবৃতির কেবল একটি গ্রহণ করি যা মৌলবি সাহেবের এই প্রবন্ধে তাঁর হাতে লিখিত; অর্থাৎ ২৫ বছর পর্যন্ত রারাহীনে আহমদীয়ার ৫১৬ ও ৫৫৭ পৃষ্ঠার এলহামকে নির্দিষ্ট করে কোনো একটি দিকে প্রযোজ্য করতে পারি নি তাহলে এতে কী সন্দেহ থাকতে পারে যে, দ্বিতীয় বিবৃতি ততক্ষণ মৌলবি সাহেবের মিথ্যাচার বলে গণ্য হবে যতক্ষণ তিনি আমার কোনো পুস্তক বা বিজ্ঞাপন হতে প্রমাণ করে না দেখাবেন যে, সেই বাক্য আমি নিজে কোনো স্থানে লিখেছি। অথবা কোনো স্থানে আমি এটি লিখে থাকব যে, ২৫ বছর পর্যন্ত এ পাপে হঠকারিতামূলকভাবে অনড় ছিলাম অথচ বারাহীনে আহমদীয়ার যুগ থেকেই ভূমিকম্প সম্পর্কে আমার সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমি এ সংবাদ গোপন রেখেছি।

পাঠক, এখন ঈমানের দোহাই! নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে আমাকে বলুন, যে-ব্যক্তি এত পরিমাণ মিথ্যাচার করে আর মিথ্যা বাক্যাবলি গঠন করে আমার প্রতি আরোপ করে সে-ব্যক্তি কোনো ভর্ৎসনা বা শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তির যোগ্য কিনা? পরিষ্কার কথা বলুন– আপনাদের প্রতিদান দেওয়া হবে। এছাড়া খোদার খাতিরে বলুন, এমন ব্যক্তি– যে এমন ধৃষ্টতার সাথে ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেয়– সে ভবিষ্যতে মৌলবি সম্বোধিত হবার যোগ্যতা রাখে কি? আলেমদের একটি বৈঠক ডেকে তাকে সেখানে তলব করে এটি জিজ্ঞেস করা কি যথাযথ হবে না, যেই কাল্পনিক বাক্য সে আমার প্রতি আরোপ করেছে, তা আমি কোন পুস্তকে বা পত্রিকায় লিখেছি? মৌলবি হবার দাবি করে এই অপবাদ ও প্রক্ষেপণ এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা আর এই দুঃসাহস আর এই অহংকার! এসব কথা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। আমাকে যারা কাফির ও বেইমান আখ্যায়িত করে থাকে, তারা মহানবীর সেই হাদীস স্মরণ রাখে না যাতে লিপিবদ্ধ আছে যে, শেষ যুগের বেশিরভাগ মৌলবি ইহুদীদের সাথে সামঞ্জস্য রাখবে। বরং কতিপয় হাদীসে এর চেয়েও অধিক কতিপয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এতটা সাদৃশ্য থাকবে– যদি কোনো

ইহুদী মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে তাহলে তারাও তা-ই করবে।* যদিও বাটালভী সাহেব এত পরিমাণ মিথ্যা বলে ও খিয়ানত এবং প্রক্ষেপণ করে আমাকে দুঃখ দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও তিনি যদি আমার কোনো কিতাবে সেই বাক্য দেখাতে পারেন যা তিনি আমার প্রতি এ মর্মে আরোপ করেছেন যে, 'আমি ২৫ বছর পর্যন্ত সেই পাপে প্রতিষ্ঠিত ও অনড় ছিলাম' তাহলে আমি তাকে নগদ ৫০ রুপি দেবার জন্য প্রস্তুত নতুবা আমার পক্ষ থেকে لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ বাক্যই যথেষ্ট।

তার আপত্তিঃ

কোনো সত্য নবী বা এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির চিহ্ন এটি নয় যে, খোদা তাকে যে কথা প্রচারের নির্দেশ দেবেন, সে তা জেনেশুনে ২৫ বছর পর্যন্ত গোপন রাখবে আর প্রচার করা থেকে বিরত থাকবে।

*** টীকাঃ** শেষ যুগের সে-সব আলেম যাদের মহানবী (সা.) এ উম্মতের ইহুদী আখ্যায়িত করেছেন তারা হলো বিশেষভাবে সেসব মৌলবি যারা মসীহ মওউদ-এর বিরোধী ও তাঁর প্রাণের শত্রু এবং তাঁর ধ্বংসের অভিসন্ধিতে লিপ্ত। তারা তাঁকে কাফির, বেইমান ও দাজ্জাল আখ্যায়িত করে থাকে। যদি সম্ভব হয় তাহলে তারা তাঁকে ক্রুশে মারার জন্য প্রস্তুত, কেননা ইহুদীদের ফকীহ ও ফরিসী (অর্থাৎ ইহুদী ধর্মীয় নেতা ও পণ্ডিত; –অনুবাদক) হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে একই আচরণ করেছিল এবং তাকে হত্যা করতে চাইত। কিন্তু যে-সব আলেম এমন নয়, তাদেরকে আমরা এ উম্মতের ইহুদী বলতে পারি না, বরং হযরত ঈসার শত্রুদের ন্যায় যারা আমাকে দাজ্জাল, কাফির ও বেইমান বলে থাকে– তারাই ইহুদী। আমি তাদের ইহুদী বলি না বরং খোদা তা'লার বাণী তাদের ইহুদী বলে। এটি অনস্বীকার্য একটি ব্যাপার, যেখানে আমি সত্যবাদী– কাফির বা দাজ্জালও নই আর বেইমানও নই– সেখানে যে ব্যক্তি সত্য মসীহকে এমন ভাষায় সম্বোধন করে, তাকে মহানবী (সা.) ইহুদী আখ্যা দিয়েছেন। আবু সাঈদ মুহাম্মদ হোসেন সাহেব যদি আমাকে বেইমান, কাফির ও দাজ্জাল আখ্যা না দিয়ে থাকেন এবং ওয়াজিবুল কতল মনে না করেন তাহলে আমরা তাকে ইহুদী বলি না আর তিনি যদি আমাকে এসব শব্দে সম্বোধন করেন অথচ খোদার দৃষ্টিতে আমি যদি সত্য মসীহ হয়ে থাকি, এমন পরিস্থিতিতে তিনি নিজে মহানবী (সা.)-এর হাদীসের সত্যায়নকারী বা পরিপূরণস্থল হয়ে নিজেকে ইহুদী বানান। তারা আমাকে বলে যে, তুমি কেন ঈসা হলে? এর উত্তর হলো– আপনাদের কল্যাণে। আপনারা যদি ইহুদী না হতেন তাহলে আমার নাম ঈসা হতো না। –লেখক

আমার উত্তরঃ

এই অপবাদের উত্তর পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমি কোনো বিজ্ঞাপনে এ দাবি করি নি যে, বারাহীনে আহমদীয়ার এই দুটি ভবিষ্যদ্‌বাণী যা লেখা হয়েছে অর্থাৎ, فلّما تجلّى ربّه للجبل جعله دكًّا এগুলোতে বিধৃত মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি সে যুগে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, বরং বার বার লিখেছি যে, পঁচিশ বছর পর এগুলোর প্রকৃত বিষয় আমার কাছে খোলাসা হয়েছে। পূর্বেই যদি আমার কাছে এগুলোর প্রকৃত মর্ম প্রকাশ পেত তাহলে এই এলহামের সেই অনুবাদ যা বারাহীনে আহমদীয়ায় লেখা হয়েছে তাতে কেন ভুল হলো?

এই নির্বোধ মৌলবির একথায় আমি আশ্চর্য হই যে, সে বলে, সত্য নবী বা এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ এটি নয় যে, খোদা তাকে যে কথা প্রচারের নির্দেশ দেন সে জেনেশুনে তা পঁচিশ বছর পর্যন্ত গোপন রাখবে। এ নির্বোধ অদ্যাবধি এটিও জানে না যে, তবলীগের নির্দেশ শুধু শিক্ষার সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন ভবিষ্যদ্‌বাণীর সাথে নয় যা প্রচারের জন্য এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রত্যাদিষ্ট নয়। তা প্রচার করা বা না করার বিষয়ে সে স্বাধীনতা রাখে। এছাড়া যেখানে এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রকৃত মর্ম তখনও আমার কাছে প্রকাশিত হয় নি, সেখানে এর অর্থ ও উদ্দেশ্য মানুষের কাছে প্রকাশ করার বিষয়ে আমার দায়িত্ব ছিল না। অধিকন্তু যতটা আমি বুঝতে পেরেছি এসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর ততটা অনুবাদ বারাহীনে আহমদীয়ায় ছাপিয়ে দিয়েছি। সুতরাং আমি তবলীগে কী ত্রুটি করলাম?

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

(আল-বাকারা: ২৮৭)

বারাহীনে আহমদীয়ার এসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর সে মর্ম যা ৪ এপ্রিল ১৯০৫ এর ভূমিকম্পের পর আমার সামনে প্রতিভাত হয়েছে, বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশের যুগে আমার যদি জানা থাকতো আর সেক্ষেত্রে যদিও আমি তা প্রচারের জন্য প্রত্যাদিষ্ট ছিলাম না, তা সত্ত্বেও মানবজাতির সহানভূতির নিমিত্তে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব হতো, এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আমি লোকদের অবগত করতাম।

তার আপত্তিঃ

পাপের এই অদ্ভুত খোঁড়া অজুহাত দেখানো পাপ করার চেয়েও গুরুতর

পাপ অর্থাৎ ভবিষ্যদ্‌বাণীর অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, নবীরাও অর্থ বের করার ক্ষেত্রে ভুল করেন!

আমার খণ্ডনঃ

এসব কথার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়, আপনি একজন পেশাদার দুর্নীতিবাজ। আমি ভালোভাবে জানি– আপনি দুধের শিশু নন। আপনি হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে ততটা অজ্ঞ নন– যাদেরকে প্রথম সারির অজ্ঞ বলা যেতে পারে। আপনি এমন উন্মাদও নন– যাদের আদৌ কোনো কাণ্ডজ্ঞান নাই। সেক্ষেত্রে এটি বিশ্বাসঘাতকতা অথবা অন্যকিছু যে, 'কোনোকিছুর অর্থ বুঝার বা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে নবীদের ভুল হতে পারে'– আপনি একথা অস্বীকার করেন। সবাই জানে যে, ভুল হতে পারে কিন্তু তাদেরকে সবসময় সেই ভ্রান্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয় না। এ সম্পর্কেও আমি এ পরিশিষ্টে অনেক কিছু লিখে এসেছি; তাই পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

তার আপত্তিঃ

আপনার বিরুদ্ধে কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা হবার অভিযোগ যখন সত্য প্রমাণিত হয়ে যায় তখন আপনি একই বাহানার আশ্রয় নিয়ে অভিযোগকে অপনোদনের চেষ্টা করেন!

আমার খণ্ডনঃ

হে মৌলবি সাহেব! খোদা আপনাকে হিদায়াত দিন আর সে দিনটি নিয়ে আসুন যখন আপনার চোখ খুলবে। আপনি সে ব্যক্তির মতো যার ঘাড়ের পেছনে অনেক বড়ো ফোঁড়া বিদ্যমান, ফলে সে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না বরং সব সময় নীচের দিকে ঝুঁকে থাকে। সে ঊর্ধ্বলোকের জ্যোতি হতে বঞ্চিত আর সেগুলো হতে আদৌ উপকৃত হয় না। অদ্যাবধি আমার সমর্থনে খোদা তা'লা দশ হাজারের অধিক নির্দশন প্রকাশ করেছেন যেগুলো দিবালোকের ন্যায় সত্য প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে সবগুলো ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে আসছে আর আমি যেন মিথ্যাকে সত্য বানানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা করে আসছি। এ স্থলেও আমি لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ছাড়া আর কী বলব! আমার সাহচর্যে কেউ যদি চল্লিশ দিনও অবস্থান করে তবে সে খোদা তা'লার কোনো না কোনো নিদর্শন দেখে। এ

কারণে খোদার সহস্র সহস্র বান্দা এ দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, এছাড়া আপনার বিদ্বেষ ও কৃপণতা সত্ত্বেও আর নিত্যদিনের অপলাপ সত্ত্বেও এক বিশাল জনগোষ্ঠী আমার কাছে এসেছে এবং আসা অব্যাহত আছে; আপনার ফুৎকারে কোনো ক্ষতি হয় নি। আকাশে খোদা তা'লা আমার জন্য চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত করেছেন, কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে সে হাদীস ভ্রান্ত। আমি চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে এসেছি আর খোদার কৃপায় (দাবির পর) মুহাদ্দিসদের নির্ধারিত শর্ত অনুসারে (আমার দাবির পর) শতাব্দীর সিকিভাগ অতিক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে এ হাদীসও ভুল। লেখা ছিল যে, মসীহ মওউদ-এর যুগে প্লেগ দেখা দেবে আর ভয়াবহ রূপধারণ করবে, কিন্তু আপনার চোখে এটিও ভ্রান্ত। লিখিত আছে যে, সে সময় আকাশে একটি নিদর্শন প্রকাশ পাবে। যেমন এখনও সেটি বিদ্যমান আর দূরবীক্ষণ দিয়ে তা দেখা হয়, কিন্তু আপনার মতে এই হাদীসও ভুল। এছাড়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই সময় পুচ্ছবিশিষ্ট নক্ষত্র তথা ধূমকেতু উদিত হবে। সেই ধূমকেতু উদিত হবার পর অনেক দিন কেটে গেছে, কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে এ হাদীসও ভুল। লেখা রয়েছে যে, মসীহ মওউদ এ উম্মতের মধ্য হতে হবেন আর তিনি দামেস্ক নগরীর পূর্ব দিকে আবির্ভূত হবেন; কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে এ হাদীসও ভুল। এছাড়া লেখা আছে যে, মসীহ মওউদ-এর যুগে উট পরিত্যক্ত হবে আর এতে ইঙ্গিত হলো, সে যুগে মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত রেল নামক বাহন চলাচল করা আরম্ভ হবে, কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে এ হাদীসও ভুল। অতএব যেখানে মহানবী (সা.)-এর হাদীসগুলো আপনার দৃষ্টিতে ভুল, সেখানে আমার ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোকে ভ্রান্ত আখ্যা দিতে গিয়ে আপনার লজ্জা হবার কথা নয়।*

সত্য কথা হলো, হাদীস এবং আমার ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোর কথা বাদই দিলাম, আপনি তো মুসলমান হবার দাবি করেও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। খোদা বলেন, ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন অথচ আপনি তাকে জীবিত আখ্যা দিয়ে আকাশের কোনো কক্ষে বসিয়ে রেখেছেন। খোদা তা'লা কি হযরত ঈসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে বলেন নি যে,

---

*** টীকাঃ** কোনো কোনো হাদীসে এটিও রয়েছে যে, সে যুগে মানুষকে হজ্জ করতে দেওয়া হবে না কিন্তু এসব হাদীস আপনার দৃষ্টিতে ভ্রান্ত কেননা এগুলোতে আমার দাবির সত্যতার পক্ষে প্রমাণ দেখা যায়। –লেখক

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

(আল-মায়েদা: ১১৮)

এ আয়াতের অর্থ কি এটি নয় যে, আমাকে মত্যু দেবার পর তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে? উক্ত আয়াতে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্টভাবে কি প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ঈসা খোদার প্রশ্নের এই উত্তর প্রদান করেন– আমি যতদিন আমার উম্মতে ছিলাম ততদিন তাদের কর্মের সাক্ষী ছিলাম এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলাম। এরপর তুমি যখন আমাকে মৃত্যু দিলে, তখন তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলে? অতএব এ আয়াতগুলোর স্পষ্টতই কি এ বিশেষ অর্থ নয় যে, আমার উম্মত আমার জীবদ্দশায় পথভ্রষ্ট হয় নি, বরং আমার মৃত্যুর পর বিভ্রান্ত হয়েছে, মৃত্যুর পর আমার জানা নেই তাদের কী অবস্থা হয়েছে এবং তারা কোন ধর্ম অবলম্বন করেছে? অতএব খোদা তা'লার এ বাণী হতে স্পষ্ট, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, হযরত ঈসা অদ্যাবধি জীবিত, তাহলে সাথে এটিও মানতে হবে যে, খ্রিষ্টানরা এখনও বিভ্রান্ত হয় নি আর সত্য ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত; কেননা হযরত ঈসা তাঁর জীবিত থাকা পর্যন্ত স্বীয় উম্মতের সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। একইসাথে 'আমাকে ও আমার মাকে খোদা হিসেবে মান্য করো'– এ মর্মে কোনো শিক্ষা দেবার কথা তিনি অস্বীকার করেন। তিনি খোদার দরবারে নিবেদন করেন– 'যতদিন আমি উম্মতের মাঝে ছিলাম ততদিন তাদেরকে সে শিক্ষাই প্রদান করেছি যার তুমি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলে। তুমি যখন আমাকে মৃত্যু দিলে, তখন পরবর্তী অবস্থার কোনো জ্ঞান আমার নেই।' এসব আয়াত হতে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, হযরত ঈসা পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন না, অন্যথায় কিয়ামত দিবসে খোদার সামনে আবশ্যকীয়ভাবে তিনি মিথ্যা বলবেন কেননা কিয়ামতের পূর্বে তিনি যদি পুনরায় পৃথিবীতে আসতেন তাহলে তার একথা বলা– 'আমার অবর্তমানে আমার জাতি কী বিশ্বাস ধারণ করেছে তার আমি কিছুই জানি না'– স্পষ্টতই মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। যে ব্যক্তি পুনরায় পৃথিবীতে আসবে আর স্বচক্ষে দেখে যাবে যে, তার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে আর কেবল একদিন নয় বরং অনবরত চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের কুফরি পর্যবেক্ষণ করবে; সে কিয়ামত দিবসে কীভাবে বলতে পারে যে, আমি আমার উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ? এখন হযরত ঈসা জীবিত আছেন আর পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন মর্মে আপনার বিশ্বাস স্পষ্টতই কুরআন শরীফের আয়াতের পরিপন্থি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি এ বিশ্বাস পরিত্যাগ

করেন না! এমতাবস্থায় আপনার জন্য কিবা আক্ষেপ করব? আমার শত শত নিদর্শন দেখেও আপনি তা অস্বীকার করে বসে আছেন। যেভাবে কোনো মানুষের মাটি খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যায় আর উন্নতমানের সব খাবার থাকলেও মাটি খাওয়ারই প্রবণতা থাকে; আপনার অবস্থাও তেমনই। এটিও মিথ্যা কথা যে, হাদীসের আলোকে আপনি হযরত ঈসাকে জীবিত মনে করেন। সহীহ বুখারী যেটিকে আপনি اصح الكتب بعد كتاب الله [কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব– অনুবাদক] আখ্যা দিয়ে থাকেন তাতেও পরিষ্কার লেখা আছে যে, মিরাজের রাতে মহানবী (সা.) হযরত ঈসা (আ.)-কে সেসব মৃত আত্মাদের মাঝে দেখেছেন যারা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, কেবল তা-ই নয় বরং প্রয়াত ইয়াহইয়া (আ.)-এর কাছে স্থান পেয়েছেন। হে খোদার বান্দা! কিছুটা হলেও খোদাকে ভয় করো। হযরত ঈসা (আ.) যদি রূহ কবজ হওয়া ছাড়াই সশরীরে আকাশে চলে গিয়ে থাকেন, তাহলে তার সেসব আত্মার সাথে কী সম্পর্ক– যারা মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জগতে চলে গিয়েছে? তার জন্য যারা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছে এমন জগতের লোকদের কাছে না গিয়ে পৃথক কোনো কামরার প্রয়োজন ছিল যেখানে তিনি দৈহিক জীবন কাটাতেন। অতএব এটি কত বড়ো মিথ্যা যা আপনার গলার হার হয়ে আছে অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে জীবিত আখ্যা দিচ্ছেন যিনি ১৯০০ বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। এখন যেহেতু ন্যায়বিচারক এসে গেছেন আর সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং কুরআন শরীফের আলোকে হযরত ঈসার মৃত্যু প্রমাণিত হয়ে গেছে, অধিকন্তু হাদীস অনুসারে মৃতদের মাঝে তাঁর জীবন কাটানোর সাক্ষ্য হস্তগত হয়েছে, এছাড়া খোদার উক্তি এবং মহানবী (সা.)-এর কর্ম অর্থাৎ দর্শনের মাধ্যমে হযরত ঈসার মৃত্যু লাভ করা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে, বরং বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসের মাধ্যমে এটিও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, আগমনকারী মসীহ এই উম্মতের মধ্য থেকেই হবেন আর এই মসীহও হাকাম হিসেবে কুরআন শরীফ এবং সেসব হাদীস অনুসারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন; অতএব এখনও কি মানবে না। বলো তো, এটি কি ঈমানের পরিচয় নাকি ঈমানহীনতা? অতএব এমন লোক আমাদের নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করলে আক্ষেপ করে কী লাভ? কেননা সে খোদার কথাকেও মানে নি আর রসূল (সা.)-এর সাক্ষ্যকেও গ্রহণ করে নি এবং খোদাকে ভয় করে নিজের ভুলভ্রান্তিও পরিত্যাগ করতে চায় নি। অতএব এমন মানুষ যদি আমার বিরুদ্ধে বানিয়ে মিথ্যা বলে তাহলে আমি কেন আক্ষেপ করব? একজনের ভুল অন্যের জন্য সনদ হতে পারে না। বক্র যুগে

যদি এমন ধারণা হৃদয়ে স্থান করে নিয়ে থাকে যে, হযরত ঈসা (আ.) জীবিত আকাশে চলে গিয়েছেন, তবে তা কোনো সনদ হতে পারে না। শ্রেষ্ঠ শতাব্দীতে এ ধারণার নামচিহ্নও ছিল না। যদি থাকত তাহলে তারা কেন একথা মেনে নিলেন যে, সব নবী (আ.) ইন্তেকাল করেছেন? ইসলামে সর্বপ্রথম ইজমা এটিই ছিল যে, সব নবী ইন্তেকাল করেছেন, কেননা মহানবী (সা.)-এর যখন ইন্তেকাল হয় তখন কোনো কোনো সাহাবীর ধারণা ছিল, তিনি ইন্তেকাল করেন নি; আবার পৃথিবীতে আসবেন এবং মুনাফিকদের নাক-কান কর্তন করবেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সকল সাহাবীকে মসজিদে নববীতে সমবেত করেন এবং আয়াত مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ পাঠ করেন অর্থাৎ মহানবী (সা.) একজন নবী মাত্র, আর তার পূর্বের সকল নবী ইন্তেকাল করেছেন। তখন উপস্থিত সকল সাহাবী (রা.) বুঝতে পারেন যে, মহানবী (সা.) সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন আর তাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, কোনো নবীই জীবিত নেই। কেউ এ মর্মে আপত্তি করে নি যে, হযরত ঈসা এ আয়াতের অর্থের বাইরে আছেন আর তিনি আজও জীবিত। এটি কি সম্ভব যে, রসূল-প্রেমিকরা এ কথায় সন্তুষ্ট হবেন, তাদের নবী স্বল্পকাল জীবিত থেকে ইন্তেকাল করবেন আর হযরত ঈসা ৬০০ বছর যাবৎ জীবিত, বরং কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন? বরং এমন ধারণার সামনে তারা জীবিতই মারা যেতেন। অতএব এ কারণেই হযরত আবু বকর (রা.) তাদের সবার সামনে আয়াত مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ পড়ে সবাইকে আশ্বস্ত করেছেন। এ আয়াত সাহাবীদের হৃদয়ে এরূপ প্রভাব বিস্তার করল যে, তারা মদীনার বাজারে এ আয়াত পড়ে বেড়াতেন যেন সেই আয়াত সে-দিনই অবতীর্ণ হয়েছে। আর ইসলামে এটি সর্বপ্রথম ইজমা ছিল যে, সব নবী ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু হে মৌলবি সাহেব! সাহাবীগণের এই ইজমার যে আপনার কাছে কোনো গুরত্বই নেই! কিন্তু আপনার ধর্ম ইসলাম নয় বরং বিদ্বেষ।

ইসলাম ধর্ম এমনসব মিথ্যা বিশ্বাসের কারণে প্রতিনিয়ত ধ্বংস হয়ে চলেছে, কিন্তু আপনারা আনন্দিত।

رونق دیں عقائدت بُردہ　　دشمناں شاد و یار آزردہ

তোমার বিশ্বাস ধর্মের সৌন্দর্যকে পদদলিত করেছে
শত্রু আনন্দিত আর বন্ধু (অর্থাৎ খোদা) দুঃখভারাক্রান্ত (কাশিফ)।

মনে হয় সব নবীর মৃত্যু সম্পর্কে যে ইজমা হয়েছিল, তার পূর্বে কতক

জ্ঞানহীন সাহাবী– যারা দিরায়েতের (হাদীসের মতন সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যুক্তির কষ্টিপাথরে যে সমালোচনার) কোনো জ্ঞান রাখতেন না তারা এ বিশ্বাস সম্পর্কে তখনও জানতেন না যে, সব নবী ইন্তেকাল করেছেন। এ কারণেই সিদ্দীক (রা.)-এর এ আয়াত শোনাতে হয়েছে। এ আয়াত শোনার পর সবাই বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, অতীতের সকল লোক কবরে সমাহিত। এ কারণেই হাসসান বিন সাবিত (রা.) মহানবীর বিয়োগ বেদনায় একটি কবিতা লিখেছেন যেখানে তিনি এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন; আর তা হলো,

كنتَ السّواد لناظرى فعمى عليك الناظر

من شاء بعدك فليمت فعليك كنت احاذر

অনুবাদ: "আপনি আমার চোখের পুতলি ছিলেন। আপনার মৃত্যুতে আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছি। আপনার মৃত্যুর পর যে চায় মৃত্যুবরণ করুক (ঈসা হোক বা মূসা হোক) আমার তো কেবল আপনার মৃত্যুর ভয় ছিল।" খোদা তাকে উত্তম প্রতিদান দিন; একেই বলা হয় ভালোবাসা।*

*** টীকা:** এ উম্মতের প্রতি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর অনুগ্রহ এত বড়ো যে, এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাওয়া ভার। তিনি যদি সকল সাহাবী (রা.)-কে মসজিদে নববীতে একত্রিত করে এ আয়াত না শোনাতেন যে, সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন, তাহলে এই উম্মত ধ্বংস হয়ে যেত। কেননা এমন পরিস্থিতিতে এ যুগের নৈরাজ্যবাদী আলেমরা বলত, সাহাবীরা (রা.) হযরত ঈসার জীবিত থাকায় বিশ্বাস রাখতেন! কিন্তু সিদ্দীকে আকবর (রা.) কর্তৃক উপরুল্লিখিত আয়াত উপস্থাপনের মাধ্যমে এ বিষয়ে সব সাহাবীর এ মর্মে ইজমা হয়েছে যে, অতীতের সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন বরং সেই ইজমা সম্পর্কে কবিতা রচনা করা হয়েছিল। আবু বকরের আত্মার ওপর আল্লাহ তা'লা অঝোরে কৃপাবারি বর্ষণ করুন, তিনি সকল আত্মাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সেই সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে (ইজমা) সব সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনও বাইরে ছিলেন না। এটি ছিল সাহাবীদের প্রথম ইজমা এবং কৃতজ্ঞতা কুড়ানোর যোগ্য পদক্ষেপ। আবু বকর (রা.) এবং মসীহ মওউদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে তা হলো, আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি কুরআন শরীফে উভয়ের সম্পর্কেই এই ছিল যে, যখন ইসলামের ওপর ভয়াবহ বিপদ নেমে আসবে এবং ধর্মত্যাগের ধারা সূচিত হবে, তখনই তাঁদের আবির্ভাব হবে। বাস্তবেও হযরত আবু বকর এবং মসীহ মওউদের সময়ে ঠিক এমনটিই ঘটেছিল। হযরত আবু

বিন্দু পরিমাণ সততা থাকলে বুঝা যায় যে, স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.) কারো আকাশে গিয়ে আবার পৃথিবীতে আগমনে বিশ্বাসের বিরোধী ছিলেন। এ কারণে তাকে যখন ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয়বার আগমন সম্পর্কে ইহুদীরা জিজ্ঞেস করে আর এ মর্মে শাস্ত্র দেখায় যে, ইলিয়াস আবার পৃথিবীতে আসবেন, ইলিয়াসের আসার পরেই কেবল মসীহ আসবেন যার আগমনের প্রতিশ্রুতি ইহুদীদের দেওয়া হয়েছিল, বলা হয়েছিল যে, তিনি তাদের খাতামুল আম্বিয়া হবেন; তখন তাদের আপত্তি শুনে ঈসা (আ.) বলেন, তোমাদের মাঝে যে ইয়াহইয়া নবী রয়েছে আর যিনি আমার পূর্বে এসেছেন তিনিই ইলিয়াস, চাইলে মানতে পারো। তাঁর এই উক্তি ছিল ইহুদীদের কাছে একেবারেই অপছন্দনীয়। তারা তাকে কাফির, বিদআতী এবং ইজমা বা উম্মতের সর্ববাদীসম্মত বিশ্বাসের বিরোধী কথার দাবিকারক আখ্যা দেয়। যেমন আমার কাছে গচ্ছিত একজন ইহুদী পণ্ডিতের সম্প্রতি লেখা একটি পুস্তকের লেখক, হযরত ঈসা (আ.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য অনেক হইচই করেছে আর তাকে সে (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী, কাফির ও অবিশ্বাসী আখ্যা দিয়েছে। একইসাথে মানুষের কাছে আপিল করে বলে যে, তোমরা স্বয়ং লেখক হিসেবে চিন্তা করো, যেখানে খোদা তাঁর কিতাবে সংবাদ দিয়েছিলেন– যেমনটি মালাকি নবীর কিতাবে লেখা আছে আর যে কিতাবের সঠিক ও খোদার পক্ষ থেকে হবার কথা সে স্বীকার করে। অর্থাৎ ইহুদীদের মসীহ মওউদ আসবেন না যতক্ষণ না ইলিয়াস নবী পুনরায় আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। জানা কথা, এখন পর্যন্ত ইলিয়াস নবী আকাশ হতে অবতরণ করেন নি যার মসীহ মওউদ-এর পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। অতএব আমরা কীভাবে তাকে সত্য মসীহ মওউদ মানতে পারি? আমরা কি আমাদের ঈমান নষ্ট করব অথবা তওরাতকে অবজ্ঞা করব? কী করব? যেখানে পরিষ্কার ভাষায় মালাকী

*** চলমান টীকাঃ** বকরের সময়ে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর শত শত অজ্ঞ আরব ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিল এবং শুধুমাত্র দুটি মসজিদ অবশিষ্ট ছিল যেখানে নামায আদায় করা হতো। হযরত আবু বকর (রা.) তাদেরকে পুনরায় ইসলামের পথে ফিরিয়ে এনেছিলেন। অনুরূপভাবে মসীহ মওউদের সময়েও লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এই উভয় পরিস্থিতিই কুরআন শরীফে ভবিষ্যদ্‌বাণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। –লেখক

নবী খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ওহী লাভ করে আমাদের সংবাদ দিয়েছেন যে, ইহুদীদের মাঝে প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইলিয়াস নবী পুনরায় পৃথিবীতে না আসা পর্যন্ত মসীহ মওউদ জন্মগ্রহণ করতে পারেন না; অতএব এ ব্যক্তি কীভাবে মসীহ মওউদ হতে পারে?* যেখানে এত স্পষ্টভাবে মসীহ মওউদ-এর আসার পূর্বে ইলিয়াস নবী আসার সংবাদ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আর যে কথার অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যাও করা যায় না, সেখানে আমরা যদি কৃত্রিমভাবে প্রকাশ্য বিষয়কে অবজ্ঞা করে এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর অন্য কোনো অর্থ করি তাহলে এ কাজ কঠিন ঈমানহীনতার পরিচায়ক হবে। খোদা আমাদেরকে নিজ পুস্তকে একথা বলেন নি যে, মসীহ মওউদের পূর্বে ইলিয়াস নবীর কোনো প্রতিচ্ছবি আসবেন বরং তিনি পরিষ্কারভাবে আমাদের সংবাদ দিয়েছেন যে, স্বয়ং ইলিয়াসই পুনরায় আকাশ হতে অবতরণ করবেন। অতএব এমন

---

* টীকা ইহুদীদের বিশ্বাস হলো, মসীহ দুইজন। (১) একজন হলেন সেই মসীহ– যার প্রথমে আসার কথা, যার আগমনের শর্ত হলো, তার আগমনের পূর্বে ইলিয়াস পৃথিবীতে পুনরায় আসবেন। হযরত ঈসা (আ.) এ মসীহ হবারই দাবি করেছিলেন। কিন্তু ইহুদী পণ্ডিতরা এ দাবি গ্রহণ করে নি এবং বলেছে যে, এই দাবি আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট কথার পরিপন্থি। কারণ হলো, যেমন আল্লাহর কিতাব বলে, ইলিয়াস আকাশ থেকে পৃথিবীতে আসেন নি। হযরত ঈসা বার বার বলেছিলেন, এমন উক্তি রূপকার্থে ব্যবহৃত হয় এবং এখানে ইলিয়াস বলতে ইয়াহইয়া অর্থাৎ নবী যোহনকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু যেহেতু ইহুদীরা কঠোরভাবে বাহ্যিকতার পূজারি ছিল, তারা এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নি এবং এখনও এই কারণে হযরত ঈসাকে স্বীকার করে না আর তাঁকে অনেক অপমান করে। (২) দ্বিতীয় মসীহ– যার জন্য ইহুদীরা অপেক্ষা করছে, তার সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস হলো, তিনি ষষ্ঠ সহস্রাব্দের শেষে আসবেন। তাই আজকাল ইহুদীদের মধ্যে চরম উদ্‌বেগ বিদ্যমান কারণ চান্দ্র গণনা অনুযায়ী আদম থেকে ষষ্ঠ সহস্রাব্দ শেষ হয়ে গেছে এবং এখন সপ্তম সহস্রাব্দ চলছে, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত মসীহ এখনও আসেন নি। খ্রিষ্টান পণ্ডিতদেরও একই বিশ্বাস ছিল যে, তাদের মসীহের দ্বিতীয় আগমন ষষ্ঠ সহস্রাব্দের শেষে হবে। এখন তারাও হতাশায় নিপতিত কারণ ষষ্ঠ সহস্রাব্দ পার হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে তারা এই মতামত প্রকাশ করেছে যে, গির্জাকেই মসীহ হিসেবে বিবেচনা করুন এবং কারো আসার আশা ছেড়ে দিন। মোটকথা, ইহুদীদের মতে মসীহ দুইজন। শেষ প্রতিশ্রুত মসীহ– যার ষষ্ঠ সহস্রাব্দের শেষে আসার কথা ছিল, তিনি তাদের দৃষ্টিতে প্রথম মসিহের চেয়ে অনেক উত্তম এবং ভাগ্যবান, কিন্তু তারা উভয় মসীহ থেকেই বঞ্চিত রয়ে গেছে– না সেটি পেয়েছে, না এটি পেয়েছে। –লেখক

পরিষ্কার খবর আমরা কীভাবে অস্বীকার করতে পারি? এরপর প্রবন্ধের শেষের দিকে লেখে যে, খোদা যদি কিয়ামত দিবসে আমাদের জিজ্ঞেস করেন– 'তোমরা এ ব্যক্তি অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরিয়মকে কেন গ্রহণ করো নি; কেন তার প্রতি ইমান আনো নি?' তখন আমরা তাঁর সামনে মালাকী নবীর কিতাব রেখে দেবো?

বস্তুত প্রাচীনকাল থেকে ইহুদীদের এ বিশ্বাস চলে আসছে যে, তাদের সত্য মসীহ মওউদ তথা প্রথম মসীহ কেবল ইলিয়াস নবী আসার পরেই পৃথিবীতে আসবেন। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) তাদের কোনো কথা শোনেন নি আর তাদের একথাই শুনিয়েছেন যে, এর অর্থ হলো ইয়াহইয়া নবী। এটিই হযরত ঈসা (আ.)-এর সিদ্ধান্ত যার বিরুদ্ধে আপনারা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে রেখেছেন। ইলিয়াস নবী কি পৃথিবীতে পুনরায় এসে গেছেন যে, ঈসাও এসে যাবেন? সত্য কথা হলো, কোনো ব্যক্তির যদি পুনরায় পৃথিবীতে আসা বৈধ হয় বা আসে তাহলে হযরত ঈসা (আ.) সত্য নবী প্রমাণিত হতে পারেন না। তাঁর নবুওয়ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়, কেননা এমতাবস্থায় মানতে হবে যে, তিনি নিজের কথা মানানোর জন্য অন্যায়ভাবে ইয়াহইয়া নবীকে ইলিয়াস বানিয়ে দিয়েছেন। সত্য কথা হলো, ইলিয়াস এখনও আকাশ থেকে আসেন নি। বুদ্ধিমান মানুষের জন্য ইলিয়াস নবীর পুনরাগমনের কাহিনিতে শিক্ষার উপকরণ রয়েছে, যে-কারণে লক্ষ লক্ষ ইহুদী হযরত ঈসা (আ.)-কে প্রত্যাখ্যান করে জাহান্নামী হয়েছে।

যেখানে ইলিয়াস নবী, যার আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়াকে হযরত ঈসার দাবির সত্যতার একটি লক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছিল, তিনি যদি না এসে থাকেন তাহলে আজকে কেন আবার একই পথ এ যুগের মুসলমানরা অবলম্বন করে যে-কারণে এর পূর্বে ইহুদীরা কাফির হয়ে গিয়েছে? আকাশ থেকে আসা যদি খোদার নিয়মের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হতো তাহলে ইলিয়াসের পথে কোনো বাধা ছিল যে, খোদার পুস্তকে প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও আসতে পারলেন না। যে কারণে হযরত ঈসাকে ইহুদীদের সামনে লজ্জিত হতে হয়েছে আর অবশেষে তিনি ইয়াহইয়া নবীকে ইলিয়াসের প্রতিচ্ছবি আখ্যা দিয়ে ইহুদীদের অপলাপ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন।

ভাবা উচিত, হযরত ঈসা (আ.) ইহুদীদের এমন কূটতর্কে কতটা কষ্ট

পেয়ে থাকবেন যখন কিনা তারা বার বার বলত যে, তুমি কীভাবে সত্য মসীহ মওউদ হতে পারো? কেননা তোমার মাঝে মসীহ মওউদ এর লক্ষণাবলি দেখা যায় না। ঐশী গ্রন্থ পরিষ্কারভাবে বলে যে, যতদিন ইলিয়াস নবী পুনরায় পৃথিবীতে না আসবেন, ততদিন মসীহ মওউদ পৃথিবীতে আসবেন না। এই যুক্তি প্রদানে বাহ্যত ইহুদী সত্যের ওপর ছিল কেননা ইলিয়াস তখনও আকাশ থেকে অবতরণ করেন নি বরং অদ্যাবধি আসেন নি। ইহুদীরা দুষ্কৃতি ও অসম্মানজনক আচরণে যতটা ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, খোদার কিতাবে মসীহ মওউদের লক্ষণের বর্ণনায় যে-সব শব্দ ব্যবহার হয়, সেসব লক্ষণ হযরত মসীহতে পাওয়া যায় নি। হযরত মসীহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর উত্তর কেবল ব্যাখ্যামূলক ছিল যা ইহুদীরা গ্রহণ করবে না। সে কারণে তিনি কোমল ভাষায় বলেন, যে ইলিয়াসের পুনরায় পৃথিবীতে আসার কথা তিনি হলেন যাকারিয়ার পুত্র ইয়াহইয়া, ইচ্ছা হলে মেনে নাও। একইভাবে আমাদের নবী (সা.)-এর কাছে আকাশে আরোহণ ও অবতরণের নিদর্শন চাওয়া হয়েছিল, যার কথা কুরআন শরীফে উল্লিখিত আছে। তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় উত্তর দেওয়া হয়েছে। খোদা তা'লা বলেছেন,

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا

(বনী ইসরাঈল: ৯৪)

আর খ্রিষ্টানদের অদ্যাবধি ইহুদীরা তিরস্কার ও টিটকিরি করে যে, যদি ঈসা সত্যিই মসীহ মওউদ হয়ে থাকতেন তাহলে প্রথমে ইলিয়াস নবী কেন অবতরণ করলেন না? খ্রিষ্টানরা এ আপত্তির সামনে সব সময় নির্বাক থাকে, তাদের সামনে কোনো উত্তর দিতে পারে না।

অতএব আমাদের বিরোধীদের ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয়বার আসার ভবিষ্যদ্‌বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত কেননা কোথাও তাদের পরিণাম যেন ইহুদীদের মতো না হয়। কিন্তু সাদৃশ্যের পূর্ণতার জন্য যেভাবে তাদের পূর্বের ইহুদীরা হযরত ইলিয়াসের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে হযরত ঈসার সাথে অনেক বাকবিতণ্ডা করেছিল আর তাকে বেদীন, কাফির ও খোদাদ্রোহী আখ্যায়িত করেছিল, সেভাবে হযরত ঈসার দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কেও আমার সাথে এদের ঝগড়া হয়। নির্বোধরা জানে না যে, যার দ্বিতীয়বার আসার জন্য এরা কাঁদে আর আমাকে গালি দেয়, সেই ব্যক্তিই আমার দাবির সমর্থনে

তাদের মিথ্যবাদী আখ্যায়িত করেন। কেননা হুবহু যে ব্যাখ্যা হযরত ঈসার দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে আমি তাদের সামনে উপস্থাপন করি, সে কথাই হযরত ঈসা ইহুদীদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। যেভাবে খোদা আমার নাম ঈসা রেখেছেন, সেভাবে খোদা ইয়াহইয়া নবীর নাম ইলিয়াস রেখেছিলেন। উল্লিখিত এই দৃষ্টান্তটি একজন ঈমানদার মানুষের জন্য প্রশান্তির কারণ হতে পারে। এছাড়া খোদা তা'লাও বলেন যে,

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

(আল-আম্বিয়া: ৮)

ইহুদীরা কিছুটা নিরুপায় ছিল, কেননা ঐশী গ্রন্থে তখনও কোনো মানুষের দ্বিতীয়বার আগমনের সিদ্ধান্ত (বা নজির) ছিল না কিন্তু এখন যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো ঈসার আকাশ থেকে আসার অপেক্ষা তারা কেন করে? ইলিয়াস নবী কি মালাকী নবীর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারে পুনরায় পৃথিবীতে এসে গিয়েছিলেন? সহীহ হাদীসে 'দ্বিতীয়বার আসা' শব্দ নেই, কেবল 'নযূল' শব্দ রয়েছে যা কোনো ব্যক্তির প্রতাপ ও সম্মান প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক সম্মানিত অতিথির আগমনের ক্ষেত্রে বলা যায় যে 'তিনি আমাদের ঘরে নাযিল হবেন'। এর অর্থ কি এটি নেওয়া হয় যে, তিনি আকাশ থেকে ফিরে আসবেন? ফিরে আসার জন্য আরবী ভাষার শব্দ হলো 'রজূ', 'নযূল' নয়। পরিতাপের বিষয় হলো, অনর্থক সেই বিশ্বাস যা খ্রিষ্টধর্মের সমর্থন করে, তা মুসলমান দাবিকারকদের গলায় শোভা পাচ্ছে।

আমাদের বিরোধীরা অবশেষে চরম লজ্জিত ও নির্বাক হয়ে এ অজুহাত দাঁড় করায় যে, আমাদের পূর্বসূরিরা এমনই বলে আসছেন। এরা চিন্তা করে না যে, সেই জ্যেষ্ঠরা ভুলের ঊর্ধ্বে ছিল না। ইহুদীদের জ্যেষ্ঠরা যেভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণী বুঝতে ভুল করেছে, সেভাবে এসব বুযুর্গও হোঁচট খেয়েছে এবং ঐশী প্রজ্ঞার বিচারে এমনই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস তাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে যেভাবে ইহুদীদের মাঝে ইলিয়াস নবী পুনরায় আকাশ থেকে আসার বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল। ইহুদীদের জ্যেষ্ঠরা গভীর ভালোবাসা ও আগ্রহ নিয়ে ইলিয়াস নবীর পুনরাগমনের অপেক্ষায় ছিল। তাদের গদ্য ও পদ্যে গভীর আগ্রহ ও উচ্ছ্বাসের সাথে অপেক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায়। তোমাদের প্রবীণরা নিষ্পাপ ছিল না। তাদের মাঝে যদিও নবী ও খোদার পক্ষ থেকে ওহী

লাভকারীও ছিল তবুও তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল আর এই প্রহেলিকা রহস্যাবৃতই রয়ে যায় যে, ইলিয়াস নবীর আসার অর্থ হলো অন্য কোনো নবী আসা। আক্ষরিক অর্থে ইলিয়াস অবতরণ করবেন না। হযরত ঈসা পর্যন্ত কোনো ওলী বা নবী এই অপ্রকাশিত রহস্য বুঝতে পারেন নি যে, ইলিয়াস নবীর পুনরায় আগমনের অর্থ হলো ইয়াহইয়া নবীর আগমন, পূর্বের ইলিয়াস নন। অতএব এ উম্মতের কিছু জ্যেষ্ঠ কোনো কথা বুঝার ক্ষেত্রে ভুল করতে পারেন– এটি কোনো নূতন বিষয় নয়। অদ্ভুত কথা হলো, এ বিষয়েও এসব বুযুর্গের মাঝে মতৈক্য নেই। বহু এমন আলেম-ওলামা অতীত হয়েছেন যারা হযরত ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের মাঝে রয়েছেন হযরত ইমাম মালিক (রা.)। যেমন তিনি লেখেন,

قد اختلف فی عیسٰی علیه السلام هل هو حیّ او میّت وقال مالك مات۔

অর্থাৎ হযরত ঈসা কি জীবিত নাকি মৃত সে সম্পর্কে মতভিন্নতা রয়েছে কিন্তু মালিক (রা.) বলেন, তিনি মারা গেছেন। মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী সাহেব তাঁর শেষ পুস্তকে লিখেছেন, ঈসা আসবেন কিন্তু রূপকভাবে অর্থাৎ এই উম্মতের অন্য কোনো ব্যক্তি এ উম্মতে ঈসার বৈশিষ্ট্যে আসবেন। সূফীদের মাঝে এটি নিশ্চিত ও সুবিদিত কথা যে, কোনো কোনো কামিল মানব পৃথিবীতে যেভাবে পুনরাগমন করেন তা হলো, তাদের আধ্যাত্মিকতা অন্য কারো মাঝে বিকশিত হয়। সে কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তি এভাবে প্রথম ব্যক্তি হয়ে যায়। হিন্দুদের মাঝেও এমনই নীতি বিদ্যমান আর তারা এমন ব্যক্তির নাম রাখে 'অবতার'।

কোনো ব্যক্তি জীবিত আকাশে চলে গেছে অথবা হারিয়ে গেছে– এরূপ ধারণা মূলত প্রাচীন চিন্তাধারার মাঝে পাওয়া যায় আর প্রাচীনকালে এর অর্থ ভিন্ন কিছু ছিল। পরবর্তীতে অজ্ঞরা ধরে নিয়েছে যে, আক্ষরিকভাবে কোনো ব্যক্তি সশরীরে আকাশে চলে যায়, আবার ফিরে আসে। সৈয়্যদ আহমদ বেরলভী সাহেব সম্পর্কেও এমন ধারণা তার জামা'তের লোকদের মাঝে আজও বিদ্যমান– যেন তিনিও হযরত ঈসার ন্যায় আবার আসবেন। যদিও প্রথম আগমনে তিনি হযরত ঈসার ন্যায় ব্যর্থ ছিলেন কিন্তু দ্বিতীয়বার এসে ভয়াবহ তরবারি যুদ্ধ করবেন। সত্য কথা হলো, যারা বড়ো বড়ো দাবি করে পৃথিবী থেকে ব্যর্থ ও বিফলমনোরথ চলে গেছে তাদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য এ ধরনের কথা বানানো হয়েছে।

আমাদের নবী (সা.) সম্পর্কে কেউ বিশ্বাস রাখে না যে, তিনিও আবার আসবেন কেননা তিনি তাঁর প্রথম আগমনে কাফিরদের এমনভাবে শায়েস্তা করেছেন যে, তারা আজও তা স্মরণ করে। পূর্ণ সাফল্য অর্জনের পর তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মনে হয় ইবনে আরাবী সাহেব শেষ বয়সে তাঁর প্রথম কথা থেকে ফিরে গিয়েছেন, এ কারণে তাঁর শেষ উক্তি প্রথম উক্তির বিরোধী। একইভাবে সূফীদের আরো অনেক ফিরকা রয়েছে যারা প্রকাশ্যে হযরত ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাসী। আমি এখনই বর্ণনা করে এসেছি, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সময় এ বিষয়েই সাহাবীদের ইজমা হয়েছে যে, পূর্বের সব নবী ইন্তেকাল করেছেন যাদের মাঝে হযরত ঈসাও অন্তর্ভুক্ত আছেন। তাদের মাঝে একজনও জীবিত নেই। কিন্তু ইসলাম ধর্মে যতই অজ্ঞতা ও বিদাত প্রসার লাভ করতে থাকে, এ বিদাতও ধর্মের একটি অংশ হয়ে যায় যে, হযরত ঈসা প্রয়াত আত্মাগুলোর জামা'ত থেকে বেরিয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। এ বিশ্বাস ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি করেছে, কেননা সারা পৃথিবীতে কেবল একজন মানুষকে সশরীরে আকাশে যাওয়া ও কোনো যুগে সশরীরে ফিরে আসবে বলে বিশেষত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ বিশ্বাস হযরত ঈসাকে খোদা বানানোর প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর, কেননা তাকে এমন এক বিশেষত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে অন্য কেউ অংশীদার নয়। খোদা ইসলামের চেহারা থেকে দ্রুত এই দাগ দূর করুন। আমীন।

শেষের দিকে আমি মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন সাহেবকে শুধু খোদার খাতিরে নসীহত করব যে, আপনি জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন। এখন খোদার বিরুদ্ধে বৃথা সব চালাকি ছেড়ে দিন। আপনি চূড়ান্ত জোর লাগিয়েছেন, সকল প্রকার ষড়যন্ত্র করেছেন আর খোদার জ্যোতিকে নেভানোর জন্য লজ্জাকর ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। আমি যদি মিথ্যাবাদী হতাম তাহলে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে আপনি সফল হতেন আর আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। এমন মানুষ– যে প্রতিদিন খোদা সম্পর্কে মিথ্যা বলে আর নিজেই একটি কথা বানিয়ে বলে যে, এটি খোদার ওহী যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে; এমন পাপিষ্ঠ মানুষ তো কুকুর, শূকর ও বানর হতেও নিকৃষ্ট। তাই এমন মানুষকে খোদা কীভাবে সাহায্য করতে পারেন? এ কাজ যদি মানুষের বানানো হতো আর খোদার পক্ষ থেকে না হতো তাহলে তার

নামচিহ্নও থাকত না। আমার খোদা কর্তৃক প্রেরিত হবার দাবির পর ২৫ বছর, বরং তারও বেশি সময়কাল কেটে গিয়েছে। যদিও এ দাবির পর এক বিশাল জনগোষ্ঠী চরম বিরোধিতায় মেতে ওঠে। হে মৌলবি সাহেব! আপনি আমাকে কষ্ট দেবার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করেন নি। আপনি শুধু জনগণকে নয় বরং সরকারকেও অনবরত প্রতারিত করে বলেছেন যে, এ ব্যক্তি মিথ্যা রচনাকারী ও সরকারের অমঙ্গলকামী। আমার বিরুদ্ধে হত্যার মতো গুরুতর মামলা করা হয়েছে। আপনি এমন মামলার (অভিযোগ) প্রমাণের জন্য স্বয়ং সাক্ষী হিসেবে আদালতে হাজিরা দিয়েছেন। আমার বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া লিখিয়েছেন, মানুষকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপাতে চেয়েছেন। এটি সে যুগের কথা যখন আমার সাথে মাত্র গুটি কতক মানুষ ছিল কিন্তু আপনার বিরোধিতাপূর্ণ অপচেষ্টার পর বেশ কয়েক লাখ মানুষ আমার জামা'তভুক্ত হয়েছে। আমি যদি খোদার পক্ষ থেকে (প্রেরিত) না হতাম তাহলে আমাকে ধ্বংস করার জন্য আপনার চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না, আমি স্বয়ং আমার মিথ্যা রচনা ও অপকর্মের কারণে ধ্বংস হয়ে যেতাম। সুস্থ বিবেক একথা মানতে পারে না যে, একজন প্রতারক বা মিথ্যা রচনাকারীকে এত দীর্ঘ অবকাশ দেওয়া হবে যা মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তকালের চেয়েও দীর্ঘ হবে কেননা এভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা লোপ পায়। এছাড়া সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। আমার দাবির পর আমার বিরুদ্ধে বহু ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে, আমাকে গ্রেফতার করানোর অনেক চেষ্টা করা হয়েছে আর আপনিও এমন মামলার সমর্থনে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি; এখন আমাকে বলুন, আপনি বা আপনার দল কোনো মোকদ্দমায় সফল হয়েছে কি? আমি যদি সত্যবাদী না হতাম তাহলে সকল জায়গায় ও সকল উপলক্ষ্যে খোদা তা'লা মিথ্যাবাদীকে কেন সমর্থন করে আসছেন আর যারা সত্যবাদী হবার দাবি করত তাদের মুখ কালিমালিপ্ত কেন হয়েছে? অভিশাপ দিতে দিতে সিজদায় তাদের নাক ক্ষয় হয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রতিনিয়ত খোদা আমায় সাহায্য করা অব্যাহত রেখেছেন আর আমার বিরুদ্ধে তাদের কোনো দোয়া গৃহীত হয় নি। বাকি রইলেন আপনি! আজ পর্যন্ত আপনার রীতি হলো, বার বার আমার বিরুদ্ধে নিজের পুস্তিকায় ও পত্রপত্রিকায় অসত্য কথাবার্তা নোট করিয়ে ইংরেজ সরকারকে উসকে দেওয়া আর আমার বিরুদ্ধে ভুল ধারণা সৃষ্টির অপচেষ্টা করা। এমন দুষ্কৃতির আশ্রয় নিয়ে লাভ কী? আপনি স্মরণ রাখবেন,

এমন দুষ্কৃতিমূলক কার্যকলাপের আশ্রয় নিয়ে আপনি সবসময় বিফলমনোরথ হবেন। পৃথিবীতে কোনোকিছু সংঘটিত হতে পারে না যতক্ষণ ঊর্ধ্বলোকে তার সিদ্ধান্ত না হয়।

এই অনুগ্রহশীল সরকারের বিরুদ্ধে আমার হৃদয়ে কোনো দুরভিসন্ধি নেই। আমি যুবক ছিলাম আর এখন বৃদ্ধ। সূচনা থেকেই আমি আমার অনেক পুস্তকে বার বার এটিই প্রকাশ করে এসেছি যে, আমাদের প্রতি এ সরকারের বহু অনুগ্রহ রয়েছে। এর নিরাপত্তার ছায়ায় আমরা স্বাধীনভাবে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করি। আপনি জানেন, বাহ্যিক উপকরণের দিক থেকে আপনার বসবাসের জন্য আরো অনেক দেশ আছে আর আপনি এদেশ ছেড়ে যদি মক্কা, মদীনা অথবা কুস্তনতুনিয়া চলে যান তাহলে সব দেশকে আপনার ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অনুকূল পাবেন। কিন্তু আমি যদি যাই তাহলে আমি দেখছি, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তারা সবাই আমার জন্য হিংস্র প্রাণীতুল্য। এমতাবস্থায় জানা কথা যে, এটি আমার প্রতি খোদা তা'লার অনুগ্রহ, তিনি আমাকে এমন সরকারের ছত্রছায়ায় প্রেরণ করেছেন, অনুভূতিতে আঘাত করা যাদের রীতি নয়। এ সরকার প্রজাদের নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। তা সত্ত্বেও কেবল এক-অদ্বিতীয় সত্তার ওপর আমি নির্ভর করি। তিনি যে এ সরকারকে আমার প্রতি অনুগ্রহশীল করে রেখেছেন আর কোনো দুষ্কৃতকারী গোয়েন্দার কথা সফল হতে দেন নি, আমি জানি এটি তাঁর সুপ্ত শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ। আমি আশা করি, এ পৃথিবী থেকে আমার চলে যাবার পূর্বে আমার সেই সত্যিকার মনিব ছাড়া আমি অন্য কারো মুখাপেক্ষী হব না। তিনি সকল শত্রুর হাত থেকে আমাকে নিজের নিরাপত্তার বেষ্টনিতে আশ্রিত রাখবেন।

فَالحمد لله اوّلًا واٰخرًا وظاهرًا وباطنًا هو ولیّ فی الدّنیا والاٰخرة وهو نعم المولٰی ونعم النّصیر۔

(অর্থ: সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য– প্রারম্ভে ও শেষে, প্রকাশ্য ও গোপনে। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে (আমাদের) অভিভাবক; আর তিনি কত-না উত্তম বন্ধু এবং কত-না চমৎকার সহযোগী। –অনুবাদক)

আমি দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে, তিনি আমাকে সাহায্য করবেন আর আমাকে আদৌ ব্যর্থ করবেন না। সারা পৃথিবীও যদি আমার বিরোধিতায় হিংস্র প্রাণীর চেয়েও ঘৃণ্য আচরণ করে তবুও তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। আমি

কোনোভাবে ব্যর্থতা নিয়ে কবরে যাব না কেননা আমার খোদা আমার প্রতিটি পদক্ষেপে আমার সাথে আছেন আর আমি তাঁর সাথে আছি। আমার ভেতরের খবর তিনি যতটা জানেন তা অন্য কেউ জানে না। সবাই আমাকে পরিত্যাগ করলেও খোদা একটি জাতি প্রস্তুত করবেন যারা আমার সাথি হবে। নির্বোধ বিরোধী মনে করে– তার পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রে এ কাজ ব্যর্থ ও লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু নির্বোধ জানে না– ঊর্ধ্বলোকে যা নির্ধারিত হয়ে গেছে ভূলোক তা মেটানোর শক্তি রাখে না। আমার খোদার ভয়ে আকাশ ও পৃথিবী কম্পমান। খোদা সেই মহান সত্তা যিনি আমার প্রতি পবিত্র দৈববাণী অবতীর্ণ করেন আর অদৃশ্য রহস্যাবলি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। তিনি ছাড়া অন্য কোনো খোদা নেই। যতদিন তিনি পবিত্র ও অপবিত্রদের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট না করছেন ততদিন অবশ্যই এই জামা'তকে পরিচালনা করা, বর্ধিত করা ও উন্নতি দেওয়া অব্যাহত রাখবেন। প্রত্যেক বিরোধী এ জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করুক; চূড়ান্ত জোর প্রয়োগ করুক; তারপর দেখুক, অবশেষে কে বিজয়ী হয়– সে নাকি খোদা। পূর্বে আবু জাহল, আবু লাহাব ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা সত্যকে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে হেন কাজ নেই যা তারা করে নি, কিন্তু আজ তারা কোথায়? সেই ফেরাউন, যে মূসাকে ধ্বংস করতে চাইত, এখন সে কোথায়? নিশ্চিত জেনো! সত্যবাদী কখনো ধ্বংস হতে পারে না। সে ফেরেশতা বাহিনীর মাঝে বিচরণ করে। দুর্ভাগা সে– যে তাকে চেনে না।

আপনারা নিজেরা চিন্তা করুন! আপনাদের সেই (কথিত) মুজাদ্দিদ সাহেব কোথায় যাকে আপনারা মুজাদ্দিদ উপাধি দিয়েছিলেন।* তার এই উপাধি যদি ঊর্ধ্বলোকে নির্ধারিত হতো তাহলে তিনি তার কথা অনুসারে যা 'হুজাজুল কিরামা'য় প্রকাশ করেছেন এ শতাব্দীর ২৫ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতেন কিন্তু তিনি যে শতাব্দীর শিরোভাগেই ইন্তেকাল করেছেন আর যাকে আপনারা মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেন তিনি শতাব্দীর প্রায় এক চতুর্থাংশ পেয়ে গেছেন।

আমি শুধু খোদার খাতিরে আপনাদের আবার স্মরণ করাচ্ছি, সব নবীর বিরোধী এ দাবিই করে যে, সেই নবীর হাতে কোনো নিদর্শন প্রকাশ পায় নি

---

* **টীকাঃ** এখানে ভূপালের নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ সাহেবের কথা বুঝানো হচ্ছে। –অনুবাদক

আর তার কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণীও পূর্ণ হয় নি যেমনটি আমরা ইহুদীদের পুস্তকে হযরত ঈসার ক্ষেত্রে দেখতে পাই। এটিই আমরা খ্রিষ্টানদের পুস্তকে আমাদের নবী (সা.) সম্পর্কে লিপিবদ্ধ পাই। কিন্তু আমি আপনাদের ভালো পরামর্শ দিচ্ছি, এখনও সময় আছে পাশবিকতা ছেড়ে দিয়ে আমার সম্পর্কে সত্যাসত্য খতিয়ে দেখুন। প্রধানত এ উম্মতের মসীহ উম্মত থেকেই আসা উচিত, শাস্ত্রমূলে এ বিষয়ে আমার নিকট থেকে প্রমাণ নিন। দ্বিতীয়ত দেখুন যে, আমার দাবির সমর্থনে আমার হাতে কী পরিমাণ নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। বলা হয়, অমুক অমুক ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয় নি– এগুলো নিছক মিথ্যা রটনা।* সত্য কথা হলো, সব ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয়েছে। আমার কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে এমন কোনো আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না যা পূর্ববর্তী নবীদের ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে অজ্ঞ ও ঈমানহীন লোকেরা উত্থাপন করে নি।

*** টীকা:** যেহেতু পবিত্র কুরআনের আয়াত فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ (যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে) দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সাব্যস্ত হয় এবং সহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাস (রা.) مُتَوَفِّيْكَ শব্দের অর্থ করেছেন مُمِيْتُكَ (অর্থাৎ আমি তোমাকে মৃত্যু দেবো –অনুবাদক)। আর শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) তাঁর 'ফাউযুল কবীর' গ্রন্থেও مُمِيْتُكَ -এর অর্থ مُتَوَفِّيْكَ -ই করেছেন। এমনকি পবিত্র কুরআন দ্বারা এটিও প্রতিষ্ঠিত যে, رَفَعَ -এর অবস্থান হচ্ছে توفّى (তাওয়াফফী)-এর পরে, কারণ আল্লাহ তা'লা বলেন,

يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَىَّ

[হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দেবো এবং তোমাকে আমার দিকে উন্নীত করব। –অনুবাদক (আলে ইমরান: ৫৬)]

এখানে আয়াতটি এমন নয় যে– يَا عِيْسٰى اِنِّىْ رَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُتَوَفِّيْكَ- (হে ঈসা! আমি তোমাকে আমার দিকে উন্নীত করব এবং তোমাকে মৃত্যু দেবো। –অনুবাদক)। আর নিজের খেয়ালখুশি মতো পবিত্র কুরআনের শব্দাবলিকে প্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে ফেলা এই আয়াতের সত্যায়ন করবে–

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ

[তারা শব্দসমূহকে তাদের সঠিক স্থান থেকে রদবদল করে। –অনুবাদক (আল-মায়েদা: ১৪)]

তাছাড়া কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস এ আয়াতে رَافِعُكَ -এর আগে مُتَوَفِّيْكَ -কে স্থান দেবার

খোদাভীতি যদি থাকে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, আমার প্রতি আপনাদের বিরোধ একটি তাকওয়া-বিবর্জিত কাজ, কেননা আপনাদের দলিল-প্রমাণ হলো কেবল সেসব হাদীস যার কতক মওযু আর কতক যয়ীফ আর সেগুলোর কিছু এমন– যেগুলোর অর্থ আপনারা বুঝেন না। কিন্তু আপনাদের বিপরীতে আমার দাবি হলো সত্য ও বাস্তবভিত্তিক। যে ওহী আমাকে হযরত ঈসা ইন্তেকাল করেছেন আর আগমনকারী মসীহ মওউদ এই অধম মর্মে সংবাদ দিয়েছে– সেই ওহীতে আমি তেমনই ঈমান রাখি যেমনটি আমি কুরআন শরীফে ঈমান রাখি। এ ঈমান নিছক কথার কথা নয়, বরং খোদার ওহী আমাকে এ ঈমান দান করেছে, যা আমার সামনে সূর্যের আলোর ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে প্রতিভাত হয়। যে বিশ্বাসকে খোদা অলৌকিক নিদর্শনাবলির নিরবচ্ছিন্ন ধারা আর সুনিশ্চিত তত্ত্বজ্ঞানের আধিক্য এবং নিত্যদিনের নিত্যনূতন ও সুনিশ্চিত বাক্যালাপ এবং কথোপকথনের মাধ্যমে পরম মার্গে পৌঁছে দিয়েছেন, আমি তা কীভাবে মন থেকে বের করে দিতে পারি? আমি কি তত্ত্বজ্ঞানের সেই অমিয় ধারা ও সঠিক জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করব যা আমাকে দেওয়া হয়েছে? অথবা উর্ধ্বলোকের যে-সব নিদর্শন আমাকে দেখানো হয় আমি কি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেব? অথবা আমি কি আমার মনিব ও মালিকের নির্দেশের প্রতি বিদ্রোহ প্রদর্শন করব? সেই মহান সত্তা যিনি স্বীয় সকল সৌন্দর্য ও আকর্ষণ নিয়ে আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছেন, আমি কি তার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করব? এমনটি করা থেকে মৃত্যুবরণ করা আমার কাছে সহস্র গুণ শ্রেয়। এই ইহজীবন আর কয়দিনের? এ পৃথিবীর মানুষ আমার প্রতি কিবা বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করবে যে, আমি তাদের জন্য সেই প্রিয় বন্ধুকে ছেড়ে দেবো? আমি ভালোভাবে জানি, আমার বিরোধীদের হাতে কেবল একটি খোলস রয়ে গেছে যাতে পোকা লেগেছে। তারা চায়, এমন শাঁসকে বাদ দিয়ে আমি যেন খোলসকে অবলম্বন করি। তারা আমাকে ভয়

---

* **চলমান টীকাঃ** অনুমতি দেয় না। সুতরাং হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রতিটি দিক থেকেই প্রমাণিত। এটিও প্রমাণিত, যে ঈসা-র আগমন হবার কথা ছিল, তিনি এ উম্মতের মধ্য থেকেই হবেন; যেমনটি বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে– اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ (তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবেন। –অনুবাদক) এবং মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে– اَمَّكُمْ مِنْكُمْ (তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবেন। –অনুবাদক)। –লেখক

দেখায় ও হুমকি দেয়। কিন্তু আমি সেই প্রিয় সত্তার নামে শপথ করে বলছি যাঁকে আমি শনাক্ত করেছি, তাঁর মোকাবিলায় আমি তাদের হম্বিতম্বিকে কিছুই মনে করি না। অন্যদের সাহচর্যে আনন্দ-উল্লাসে থাকার চেয়ে তাঁর সান্নিধ্যে দুঃখ আমার কাছে প্রিয়। তাঁকে ছেড়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করার চেয়ে তাঁর সান্নিধ্যে মৃত্যু আমার কাছে প্রিয়। যেভাবে আপনারা দিন দেখে সেটিকে রাত বলতে পারেন না, সেভাবে যে জ্যোতি আমাকে দেখানো হয়েছে সেটিকে আমি অন্ধকার মনে করতে পারি না। আপনারা যেখানে আপনাদের এসব বিশ্বাস ছাড়তে পারেন না, যা কেবল সন্দেহ ও কুসংস্কারের সমাহার, সেখানে আমি কীভাবে সে পথ ছাড়তে পারি যার ওপর সহস্র সূর্য ঝলমল করতে দেখা যায়। আমি কি উন্মাদ নাকি পাগল, খোদা তা'লা আমাকে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলিতে সজ্জিত করে সত্য দেখানো সত্ত্বেও আমি কি সত্য গ্রহণ করব না? আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, সহস্র সহস্র নিদর্শন আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমার প্রতি প্রকাশিত হয়েছে যার কতক আমি মানুষকে অবহিত করেছি আর কতক বলিও নি। আমি জানি, এসব নিদর্শন খোদার পক্ষ থেকে। সেই এক অদ্বিতীয় খোদা ছাড়া কেউ এ কাজ করার ক্ষমতা রাখে না।

এছাড়া আমাকে কুরআনের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে আর হাদীসের সঠিক অর্থ আমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। তাই প্রশ্ন হলো, আমি এমন সমুজ্জ্বল পথ ছেড়ে কেন ধ্বংসের পথ অবলম্বন করব? আমি যা কিছু বলি, অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে বলি আর আপনারা যা বলেন তা কেবল ধারণার বশে বলেন।

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

(আন-নাজমঃ ২৯)

আর এ উদাহরণটি এভাবেও দেওয়া যায়– যেমন এক অন্ধ ব্যক্তি অন্ধকারে অসমতল জায়গায় হাঁটে আর জানে না, কোথায় পা ফেলছে। অতএব যে আলো আমাকে দেওয়া হয়েছে, আমি এই আলো ছেড়ে অন্ধকারকে কীভাবে গ্রহণ করতে পারি? আমি যখন দেখি, খোদা আমার দোয়া গ্রহণ করেন আর আমার জন্য বড়ো বড়ো নিদর্শন প্রকাশ করেন এবং আমার সাথে বাক্যালাপ করেন আর অদৃশ্য সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন, শত্রুর বিপরীতে আমার সাহায্যার্থে দৃঢ় শক্তিমত্তা প্রকাশ করেন, সকল ময়দানে আমাকে বিজয় দান করেন এবং আমাকে কুরআনে বিধৃত সত্য ও তত্ত্বের জ্ঞান

দান করেন; তাই এমন সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী খোদাকে ছেড়ে তাঁর স্থানে আমি কাকে গ্রহণ করব?

আমি নিশ্চিত জ্ঞান রাখি, খোদা সেই মহান সত্তা– যিনি আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। নিজ সত্তা, নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে আমাকে (নিজের সম্পর্কে) অবহিত করেছেন। আমি দৃঢ়বিশ্বাস রাখি, সেসব ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ যা তাঁর পক্ষ থেকে আমি দেখি আর সেই অদৃশ্যের জ্ঞান যা তিনি আমার প্রতি প্রকাশ করেন আর সেই শক্তিশালী হাত– যার পক্ষ হতে প্রতিটি ভয়াবহ মুহূর্তে আমি সাহায্য লাভ করি– তা সেই কামেল ও সত্য খোদার গুণাবলি, যিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন আর যিনি নূহের কাছে প্রকাশিত হয়েছেন এবং তুফানের নিদর্শন দেখিয়েছেন। তিনিই সেই মহান সত্তা– যিনি মূসাকে তখন সাহায্য করেছেন যখন ফেরাউন তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত ছিল। তিনি সেই মহান সত্তা– যিনি রসূলদের নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে কাফির ও মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করে পরিপূর্ণ বিজয় দান করেছেন। তিনি শেষ যুগে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

নোংরা ও বজ্জাত শ্রেণির কোনো কোনো নির্বোধ বলে যে, তোমার কাছে যে আত্মপ্রকাশ করেছে সে শয়তান হবে। لعنة الله عليهم الى يوم القيامة۔ এই নির্বোধরা জানে না, শয়তান সবার ওপর জয়যুক্ত হতে পারে না। কিন্তু সেই খোদা যিনি আমার কাছে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি সবার ওপর পরাক্রমশালী। কেউ তাঁর মোকাবিলা করতে পারে কি? বিরোধীরা মুর্দা আর শত্রুরা মৃত কীট। কেউ নেই যে সেসব শক্তিমত্তার মোকাবিলা করতে পারে যা তাঁর বাণী ও কাজের মাধ্যমে আমার কাছে প্রকাশ পায়। তিনি সকল গুণাবলি ও পূর্ণ শক্তিমত্তার গুণে গুণান্বিত। দ্যুলোক ও ভূলোকে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। সেই সত্তা যিনি প্রতিদিন আমার কাছে প্রকাশিত হন, আমাকে স্বীয় শক্তিমত্তার প্রমাণ দিয়ে থাকেন আর গভীর ও গূঢ় রহস্যাবলি আমার কাছে প্রকাশ করেন। তিনি ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীতে যদি অন্য কোনো খোদা থেকে থাকে তাহলে তোমরা তার প্রমাণ দাও; কিন্তু তোমরা আদৌ তা পারবে না। আমি দেখছি যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো খোদা নেই। তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমার কাছে সূর্যের মতো দেদীপ্যমান আর তিনি আমাকে পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন। স্বীয় শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেছেন আর আমাকে

সত্য জ্ঞান দান করে নিজ সত্তা সম্পর্কে আমাকে আলোকিত করেছেন। অতএব আমি তাঁকে কীভাবে পরিত্যাগ করতে পারি? সেই খোদাকে পরিত্যাগ করার চেয়ে আমার জীবন জলাঞ্জলি দেওয়া সহজ, যিনি আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

অন্ধ শত্রু অনর্থক অপলাপ করে। সে খোদা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখে না। তার হৃদয় কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত আর চোখ দৃষ্টিশক্তি হতে বঞ্চিত। এদের জ্ঞান কেবল এতটুকু যে, তারা কুধারণার প্রতিমাকে পূজা করছে তাদের মতে একমাত্র এই প্রতিমাই সব, এর বাইরে তাদের ভাগ্যে আর কিছু নেই। সেই খোদা থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে রিক্তহস্ত যাকে নিত্যনূতন নিদর্শনের মাধ্যমে চেনা যায়। তারা সে অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় চলে যে সম্মুখে অগ্রসর হবার জন্য পা বাড়ায় কিন্তু জানে না সামনে গর্ত রয়েছে নাকি সমতল ভূমি, পবিত্র ভূমি নাকি অপবিত্র স্থান!

এরা অজ্ঞতাবশত একটি দিকের ওপর জোর দিয়ে দ্বিতীয় দিককে অবজ্ঞা করে। তারা বলে, ঈসা অবতরণ করবেন আর তিনি উম্মতি হয়ে যাবেন। তাদের কথা ও খোদার কথার মাঝে পার্থক্য হলো তারা হযরত ঈসাকে উম্মতি বানায় আর খোদা উম্মতিকে ঈসা বানান। অতএব এটি* এমন কোনো মতভেদ নয় যার ভ্রান্তি দূর হতে পারে না। যেখানে খোদা এক উম্মতিকে ঈসা বানানোর ক্ষমতা রাখেন।

আর এভাবে যেখানে বনী ইসরাঈলের ওপর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়া সম্ভব সেখানে মরিয়ম তনয় ঈসাকে আকাশ হতে নামানো এবং খোদার প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে যাবার দরকার কী ছিল? (কেউ চলে গেলে সে কখনো পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না)** হযরত ঈসা বনী ইসরাঈলের শেষ

*** টীকাঃ** চিন্তা করে না যে, যেখানে তোমরা হযরত ঈসার নাম উম্মতি রেখে দিয়েছ সেখানে খোদা তা'লা একজন উম্মতির নাম ঈসা রেখে দিলে আপত্তি কীসের? হাদীস امامكم منكم-এর অর্থ কি এটি নয় যে, হে উম্মতি লোকগণ আগমনকারী ঈসা তোমাদের মধ্য থেকে হবেন অন্য কোনো জাতি হতে হবেন না। –লেখক

**** টীকাঃ** আল্লাহ তা'লা বলেন,

فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنهَا تُخْرَجُونَ

(আল-আরাফ: ২৬)

খলীফা ছিলেন। একজন উম্মতিকে ঈসা আখ্যায়িত করার অর্থ হলো তিনিও এ উম্মতের শেষ খলীফা হবেন আর এ উম্মতের ইহুদীরা তার ওপর হামলা করবে এবং তাকে গ্রহণ করবে না। কিন্তু একজন নবীকে উম্মতি আখ্যায়িত করার যৌক্তিকতা কী? অবশ্য কুরআন থেকে প্রমাণিত যে, সব নবী মহানবী (সা.)-এর উম্মতভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন:

لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ

(আলে ইমরান: ৮২)

এভাবে সব নবী (আ.) মহানবী (সা.)-এর উম্মত গণ্য হলেন তাই হযরত ঈসাকে উম্মতি বানানোর বিশেষ কী অর্থ থাকতে পারে? আর এর বিশেষত্বইবা কী? তিনি কি তাঁর পূর্বের ঈমান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন– যা তিনি সব নবীর সাথে এনেছিলেন? নাউযুবিল্লাহ সে কারণে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে পুনরায় ঈমান নবায়নের শাস্তি দেওয়া হলো আর অন্যান্য নবীর জন্য পূর্বের ঈমানই যথেষ্ট হলো! এমন কাঁচা কথাবার্তা ইসলামের প্রতি বিদ্রুপ নয় কি?

কথা পরিষ্কার ছিল, যেভাবে ইহুদী খেলাফতের ধারার শেষ প্রান্তে ঈসা এসেছিলেন, যাকে তারা গ্রহণ করে নি বরং প্রত্যাখ্যান করেছে; একইভাবে

** **চলমান টীকা:** অর্থাৎ পৃথিবীতে জীবনযাপন করবে আর পৃথিবীতেই মরবে এবং ভূমি থেকেই উত্থিত হবে। তাই এক ব্যক্তির জন্য শত শত বছর জীবিত থাকা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে? আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ

(আল-বাকারা: ৩৭)

অর্থাৎ তোমাদের জন্য বসবাসের স্থান হবে পৃথিবী। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, হযরত ঈসার বসবাসস্থল কী করে আকাশ হতে পারে? কেননা খোদা তা'লা বলেন,

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا

(আল-মুরসালাত: ২৬)

অর্থাৎ আমরা পৃথিবীকে এমন বানিয়েছি যে, তা প্রত্যেক বস্তুকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে আর প্রতিটি বস্তুকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাই এটি কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে যে, হযরত ঈসা পৃথিবীর (মাধ্যাকর্ষণের) নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যাবেন? –লেখক

ইসলামী খেলাফতের শেষ প্রান্তে এক খলীফার জন্ম নেওয়া আবশ্যক ছিল, যাকে মুসলমানরা প্রত্যাখ্যান করবে এবং গ্রহণ করবে না আর এ কারণেই তিনি ঈসা আখ্যায়িত হবেন, কেননা তিনি খাতামুল খোলাফা অধিকন্তু তাকে ঈসার ন্যায় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যেমন সাদৃশ্য দেখানোর জন্য বারাহীনে আহমদীয়ায় আল্লাহ তা'লা নিজেই বলেন যে,

دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اُس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اُس کی سچائی ظاہر کردے گا۔

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি কিন্তু খোদা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং বড়ো জোরালো আক্রমণের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন।" অতএব এটি একটি সামান্য বিষয় ছিল আর প্রত্যেকেই এমন তুলনার সময় মানুষের এমন নাম রেখে দেয়। বিনা কারণে তিলকে তাল করা হয়েছে।

আমাদের বিরোধীরা যদি শুধু এ বিশ্বাস পোষণ করত যে, ঈসা আসবেন বটে তবে ইনজীলের শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। তিনি মুসলমানদের হালাল-হারাম মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন না আর পৃথকভাবে নিজস্ব রীতিতে নামাযও পড়বেন। নামাযে কুরআনের পরিবর্তে 'ইনজীল' পড়বেন এবং নিজেকে উম্মতি নয় বরং স্বাধীন নবী জ্ঞান করবেন। বস্তুত এমন কোনো রীতিনীতি প্রদর্শন করবেন না যার কারণে তাঁকে উম্মতি বলা যেতে পারে বরং তওরাত ও ইনজীলে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন এবং সেই পথ অনুসরণ করে চলবেন। এমতাবস্থায় যা খতিয়ে দেখার বিষয় তা হলো, এমন ব্যক্তি– যে ব্যবহারিক আচরণের মাধ্যমে নিজেকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এর বিরোধী হিসেবে প্রকাশ করে, সে আবার এসে ইসলামের জন্য কল্যাণকর হতে পারে কি? একথা স্পষ্ট যে, এমন মানুষের আগমন মুসলমানদের জন্য শুভ নয় কেননা যেখানে তিনি সেই মর্যাদার মানুষ হয়ে নিজেকে ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণভাবে বিরোধী হিসেবে প্রকাশ করবেন আর সেভাবে নামায পড়বেন না যেভাবে মুসলমানরা পড়ে, কুরআনের পরিবর্তে মানুষকে 'ইনজীল' শোনাবেন আর সেসব জিনিস খাবেন যা মুসলমান খায় না, মদ পান করবেন; এমন ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তির অস্তিত্ব ইসলামের জন্য মহা নৈরাজ্যের কারণ হবে। এমনকি তার ও মুসলমানদের মাঝে দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে যাবার উপক্রম হবে।

এমন বিপজ্জনক মানুষ মুসলমানদের জন্য পদস্খলনের কারণ হবে। সত্য বলতে কি! এমতাবস্থায় মানুষ খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া আরম্ভ করলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু ঈসা আসতেই যদি সরল মনে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ পড়ে নেন আর মুসলমানদের নামাযে প্রতিষ্ঠিত হন আর সেই রোযার ওপর প্রতিষ্ঠিত হন যা মুসলমানদের শেখানো হয় আর সকল হারাম ও হালালের ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষানুসারে চলেন তাহলে কী সন্দেহ থাকতে পারে যে, তিনি নিজেকে উম্মতি আখ্যায়িত করবেন। উম্মতিদের মাথায় কোনো শিং তো থাকে না, উম্মতি হবার জন্য প্রয়োজনীয় সব কাজ করলেই উম্মতি হয়ে গেল। বস্তুত ঈসা (আ.)-কে যখন তওরাতের শিক্ষা ছাড়িয়ে উম্মতি বানানো হলো, সেক্ষেত্রে সংশোধনের বিষয় এটি হবে যে, ঈসা– যিনি ইহুদীদের খাতামুল খোলাফা ছিলেন– তাকে পুনরায় উম্মতি বানিয়ে মুহাম্মদী ধর্মের খাতামুল খোলাফা বানিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, এর মাধ্যমে কি সেই ঐশী প্রজ্ঞা যথাযথভাবে প্রমাণিত হয় যা প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য ছিল?

বুদ্ধিমানদের একথা জানা আছে যে, ইসরাঈলের বিপরীতে একটি ধারা বনী ইসমাঈল প্রতিষ্ঠা করে খোদা তা'লা এ ধারাকে সকলভাবে ইসরাঈলী ধারার সদৃশ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চেয়েছেন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মূসা সদৃশ বানিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا

(আল-মুযযামমিল: ১৬)

অর্থাৎ আমরা এ রসূলকে সেই রসূলের সদৃশ করে পাঠিয়েছি যাকে ফেরাউনের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। এ ধারার সমাপ্তিতে এ উম্মতের খাতামুল খোলাফা ঈসা সদৃশ হওয়া আবশ্যক ছিল, যার ঈসার ন্যায় মূসার মসীলের চৌদ্দশত বছর পর আবির্ভূত হওয়া অবশ্যক কেননা মূসীয় ধারার শেষ খলীফা ঈসা ছিলেন যিনি মূসার চৌদ্দশত বছর পর আবির্ভূত হয়েছিলেন। এছাড়া যারা ঈসাকে গ্রহণ করে নি তারা ছিল ইসরাঈলী ধারার ইহুদী। সে কারণে খোদার বাণী এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে যে, এই উম্মতেও শেষ যুগে তথা মসীহ মওউদ-এর যুগে ইহুদী প্রকৃতির লোক জন্ম নেবে।

এখন এটি জানা কথা যে, যেখানে মূসার মসীল হুবহু মূসা নন আর শেষ যুগের ইহুদী প্রকৃতির লোক পূর্বের ইহুদী নয়, সেখানে কারণ কী যে, আগমনকারী ঈসা হুবহু পূর্বের ঈসা হবেন যিনি অতীত হয়ে গিয়েছেন। এমনটি মনে করা খোদার কিতাবের পরিপন্থি, কেননা সূরা ফাতিহায় খোদা তা'লা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, উম্মতের কতক দল বনী ইসরাঈলের নবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে আর এ উম্মতের কতক লোক ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে– যারা হযরত ঈসাকে গ্রহণ করে নি। আর ক্রুশে হত্যা করতে চেয়েছে যারা তারা মাগযূব আলাইহিম আখ্যায়িত হবে। এ কারণেই খোদা তা'লা পাঁচ বেলার নামাযে এই দোয়া করতে বলেছেন। যেমন সূরা ফাতিহায় আল্লাহ তা'লা এ শিক্ষা দেন যে,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

(আল-ফাতিহা: ৬-৭)

অতএব اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বলতে ইহুদীদের নবীদের বুঝায় আর مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বলতে সেসব ইহুদী বুঝায় যারা হযরত ঈসাকে গ্রহণ করে নি। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, এই উম্মতে এমন ইহুদী প্রকৃতির লোক জন্ম নিতে যাচ্ছে যারা হযরত ঈসার সময়ে ছিল। অতএব তাদের সাথে এ উম্মতের এক ঈসা থাকাও আবশ্যক যাকে অস্বীকার করে তারা সে ধরনের ইহুদী হয়ে যাবে যারা হলো مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ। এখন যারা আমাকে এ মর্মে সমালোচনা করে যে, তুমি নিজেকে কেন ঈসা বানিয়েছ? সত্যিকার অর্থে তারা নিজেরাই এই তিরস্কারের লক্ষ্যে পরিণত হয় কেননা তারা যদি ইহুদী না হতো তাহলে আমি ঈসা হতাম না। কিন্তু খোদার বাণী পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল। এরা অদ্ভুত নির্বোধ! ইহুদী হবার জন্য নিজেরা প্রস্তুত কিন্তু ঈসা আসবে অন্যদের মধ্য হতে বা বাহির থেকে।

সারকথা হলো, ইসমাঈলী ধারার ভবন শতভাগ ইসরাঈলী ধারা মোতাবেক বানানো হয়েছে। এ কারণেই এ ধারার ঈসা ইসমাঈলী বংশের নয়, কেননা মসীহও বনী ইসরাঈলী নন। বনী ইসরাঈলের কেউ যেহেতু হযরত ঈসার পিতা ছিল না, শুধু মা বনী ইসরাঈলী ছিলেন, তাই একই সাদৃশ্য এখানেও বিদ্যমান। আমি বর্ণনা করে এসেছি যে, আমার কতক নানি সৈয়দ বংশের ছিলেন আর খোদার ওহীও আমার প্রতি এটিই প্রকাশ করেছে যে, যেভাবে হযরত ঈসা পিতার মাধ্যমে রূহ অর্জন করেন নি, একইভাবে আমি

জ্ঞান ও তত্ত্বভাণ্ডারের রূহ কোনো আধ্যাত্মিক পিতার পক্ষ থেকে অর্থাৎ শিক্ষক হতে অর্জন করি নি। অতএব এসব বিষয়ে আমার ও হযরত ঈসার মাঝে অত্যন্ত গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। খোদা তা'লা ইসরাঈলী ধারার বিপরীতে ইসমাঈলী ধারা প্রতিষ্ঠা করে ঈসা হিসেবে আমাকে মনোনীত করেছেন। ইসলামের সূচনাতে রয়েছেন আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) যার নাম রাখা হয়েছে মূসা, যাঁর পিতামাতা উভয়েই কুরাইশ ছিলেন আর এই ধারার শেষ প্রান্তে রয়েছে এ অধম যিনি শুধু মায়ের দিক থেকে কুরাইশ আর যার নাম রাখা হয়েছে ঈসা।

مردم نا اہل گویندم کہ چوں عیسیٰ شدی　　بشنو از من ایں جوابِ شاں کہ اے قومِ حسود

নির্বোধরা আমাকে বলে যে, তুমি কীভাবে ঈসা হলে?
হে হিংসুক জাতি! আমার কাছে একথার উত্তর শোনো! আর তা হলো–

چوں شمارا شد یہود اندر کتابِ پاک نام　　پس خدا عیسیٰ مرا کرد است از بہرِ یہود

পবিত্র কুরআন যেহেতু তোমাদের নাম ইহুদী রেখেছে,
তাই খোদা আমাকে ইহুদীদের জন্য ঈসা বানিয়েছেন।

ورنہ از روئے حقیقت تخمِ ایشاں نیستید　　نیز ہم من ابن مریم نیستم اندر وُجود

নতুবা বংশের দিক থেকে তোমরা ইহুদী নও,
আর আমি দৈহিকভাবে একই ইবনে মরিয়ম নই।

گر نہ بودندے شما مارا نبودے ہم اثر　　از شما شد ہم ظہورم پس زِ غوغاہا چہ سُود

তোমরা না হলে আমার চিহ্নও থাকত না,
আমার আগমন তোমাদের কারণে হয়েছে, অতএব এত হইচই কেন?

ہرچہ بود از نیک و بد در دینِ اسرائیلیاں　　آں ہمہ در ملّت احمد نقوشِ خود نمود

ইহুদীদের ধর্মে যে-সব ভালো-মন্দ বিষয়াদি ছিল,
সে সবকিছু আহমদ (সা.)-এর ধর্মেও সৃষ্টি হয়েছে।

قومِ مادر ہر قدم ماند بقومِ موسوی　　بعض زیشاں صالحان و بعض دیگر چوں غدود

আমাদের জাতি সকল ক্ষেত্রে মূসার জাতির সদৃশ হয়ে গিয়েছে,
কতক ভালো আর কতক টিউমারের ন্যায় (ক্ষতিকর)।

چونکہ موسیٰ شد نبیٔ ما۔ کہ صدرِ دینِ ماست لاجرم عیسیٰ شدم آخر ازاں ربِّ ودود

আমাদের নবী যেহেতু আমাদের ধর্মের শিরোমণি, মূসা সদৃশ ছিলেন,
স্বাভাবিকভাবেই আমি সেই স্নেহশীল প্রভুর পক্ষ থেকে ঈসা।

نیز ہم اینجا یہودِ بد گہر پیدا شدند تا بیازارند عیسیٰ را چو آں قومے کہ بود

এখানেও নোংরা প্রকৃতির ইহুদী জন্ম নিয়েছে,
অতীতের জাতির ন্যায় এই ঈসাকে যেন কষ্ট দিতে পারে।

الغرض آں ذوالمنن در ہر صلاح و ہر فساد ہمچو اسرائیلیاں بر قوم ما ہر در کشود

বস্তুত সেই অনুগ্রহশীল খোদা সকল পাপ ও পুণ্যের দ্বার–
ইহুদীদের ন্যায় আমাদের জাতিতেও খুলে দিয়েছেন।

چوں خدا نامِ رسولِ پاک ما موسیٰ نہاد نام شد بوجہل را فرعون چوں کینش فزود

খোদা যেহেতু আমাদের পবিত্র রসূলের নাম মূসা রেখেছেন,
আবু জাহলের তাঁর প্রতি শত্রুতা বেড়ে গেলে তার নাম ফেরাউন রাখা হয়েছে।

پس در اوّل چوں کلیم آمد بحکمِ کردگار ہم بپے تکمیل عیسیٰ را در آخر شد ورُود

যেভাবে খোদার ইচ্ছায় সূচনাতে এই উম্মতে একজন কলীম এসেছেন,
তাই সাদৃশ্যের পূর্ণতার জন্য তিনি শেষ যুগে একজন ঈসাও পাঠিয়েছেন।

بعد ازیں روتافتن از مقتضائے شقوت است ورنہ ایں گفتارِ ما ہر شک و شبہت را ربود

একথা বুঝার পরও মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চরম দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছু নয়,
কেননা আমাদের একথা তোমার সকল সন্দেহ দূরীভূত করার কথা।

پس چہ حاصل تیر ہا انداختن برصادقاں
ہر کہ از بد باز ناید نار را گردد و قُود

অতএব সত্যবাদীর প্রতি তির ছুড়ে লাভ কী?
কেননা যে অন্যায় হতে বিরত হয় না– সে জাহান্নামের ইন্ধনের কাজ করে থাকে।

সারকথা হলো, আমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি আর আমার দাবি কুরআন ও হাদীস সম্মত। আমার সত্যতার সাক্ষী সহস্র সহস্র নিদর্শন। সত্যান্বেষীদের জন্য ভবিষ্যতেও নিদর্শনের পথ রুদ্ধ নয়। বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে বলা হয় যে, অমুক ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয় নি– এটি মূলত তাদের অন্ধত্ব। বাস্তবে সব ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে আর কতক পূর্ণতার অপেক্ষায় আছে। বিদ্বেষের কারণে তাদের চিন্তার সূক্ষ্মতা হারিয়ে গিয়েছে। এ কারণে তারা কেবল সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী যেগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। সেগুলোর পূর্ণতার কথা তাদের স্বীকার করতে হয় কিন্তু সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী যেগুলোর পূর্ণতার বিষয়টি বুঝার জন্য কিছুটা সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন, তা তাদের দৃষ্টিতে যেন পূর্ণই হয় নি; কিন্তু এমন ভবিষ্যদ্‌বাণী হয়ত দশ হাজারে একটি হবে। অতএব কতটা অভিশাপের দাগ সে হৃদয়কে কলুষিত করে রেখেছে যে হৃদয় দশ হাজার ভবিষ্যদ্‌বাণীকে কাজে লাগায় না আর বার বার কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করে বলে– অমুক ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয় নি। কেবল এতটাই নয় বরং চরম নির্লজ্জতার সাথে আবার গালিও দেয়। এমন মানুষ যদি পূর্বের কোনো নবীর যুগে থাকত তাহলে তাকে কি গ্রহণ করত? মোটেও না, কেননা প্রত্যেক নবীর কোনো না কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী কাফিরদের দৃষ্টিতে সন্দেহপূর্ণ ছিল।

হে নির্বোধ! প্রথমে নিজের চোখ থেকে বিদ্বেষের পর্দা সরাও, তখন বুঝতে পারবে যে, সব ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয়েছে। খোদার সাহায্য একটি প্রবল খরস্রোতা নদীর ন্যায় বিরোধীদের ওপর হামলা করে চলেছে কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, তারা আদৌ বুঝে না। জমিনও নিদর্শন দেখিয়েছে আর আসমানও। বন্ধুদের মাঝেও নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে আর শত্রুদের মাঝেও। তবে অন্ধদের মতে এখনও কোনো নিদর্শন প্রকাশ পায় নি। কিন্তু পবিত্র ও নোংরাদের মাঝে পার্থক্য না করা পর্যন্ত খোদা এ কাজকে অসম্পূর্ণ ছাড়বেন না।

বিরোধীরা চায় আমি যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই আর তাদের এমন কোনো চালাকি সফল হোক যার মাধ্যমে আমার নাম চিহ্নও যেন না থাকে কিন্তু তারা সেসব বাসনায় ব্যর্থ থাকবে আর ব্যর্থতা নিয়ে মরবে। তাদের অনেকেই আমাদের চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে গেছে আর আক্ষেপ নিয়ে কবরে গিয়েছে। কিন্তু খোদা আমার সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণ করবেন। এই নির্বোধরা জানে না যে, আমি যেখানে আমার নিজের পক্ষ থেকে নয় বরং খোদার পক্ষ থেকে এই যুদ্ধে জড়িয়েছি তাই আমি কেন ব্যর্থ হবো আর কে

আছে যে আমার ক্ষতি করতে পারে? জানা কথা, কেউ যখন কারো হয়ে যায় তখন তাকেও তার হয়েই যেতে হয়।

কেউ কেউ বলে, যদিও একথা সত্য যে, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে লেখা আছে– আগমনকারী ঈসা এ উম্মত থেকেই হবেন। কিন্তু মুসলিম শরীফে স্পষ্ট ভাষায় তার নাম নবীউল্লাহ রাখা হয়েছে। তাই তিনি এ উম্মতের মধ্য হতে হবেন– একথা আমরা কীভাবে মানতে পারি?

এর উত্তর হলো, সব দুর্ভাগ্যের উৎপত্তি হয়েছে নবী শব্দের প্রকৃত অর্থ নিয়ে চিন্তা ও প্রণিধান না করার কারণে। নবী শব্দের একমাত্র অর্থ হলো, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে সংবাদ লাভ করা এবং কথোপকথন ও বাক্যালাপের সম্মান লাভ করা। শরীয়ত নিয়ে আসা তার জন্য আবশ্যক নয় আর শরীয়তধারী রসূলের অনুসারী হওয়া তার জন্য আবশ্যক নয়। অতএব একজন উম্মতিকে এমন নবী আখ্যা দিলে ভয়ের কিছু নেই, বিশেষ করে তখন– যখন কিনা সেই উম্মতি তার অনুসরণীয় নবীর কল্যাণে আশিসমণ্ডিত হয়। বরং সমস্যা তখন দেখা দেবে, যখন সেই উম্মতকে মহানবী (সা.)-এর পর কিয়ামত পর্যন্ত বাক্যালাপ থেকে বঞ্চিত আখ্যা দেওয়া হয়। সেই ধর্ম ধর্ম নয় আর সে নবী নবী নয় যার অনুসরণে মানুষ খোদার এতটা নৈকট্যও লাভ করতে পারে না যে, সে খোদার সাথে বাক্যালাপের সম্মানে ভূষিত হবে। সে ধর্ম অভিশপ্ত ও ঘৃণার যোগ্য– যা এটি শেখায় যে, কেবল কিতাবের কয়েকটি কথার ওপর মানুষের উন্নতি নির্ভরশীল। ওহী অতীতের বিষয়, ভবিষ্যতে আর ওহী হতে পারে না! চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী খোদার আওয়াজ শোনা এবং তার সাথে বাক্যালাপের আশা রাখা এখন নিরাশা ছাড়া কিছু নয়। অদৃশ্য হতে কোনো ধ্বনি কারো কানে আসলে তা-ও এমন সন্দেহযুক্ত যে, বলার উপায় নেই– তা খোদার বাণী নাকি শয়তানের। অতএব এমন ধর্ম দয়ালু খোদার পক্ষ হতে আখ্যায়িত হবার চেয়ে শয়তানী আখ্যায়িত হবার অধিক যোগ্য। ধর্ম সেটি– যেটি অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে প্রবেশ করায় আর মানুষের খোদাকে চেনার বিষয়টি কেবল কাহিনি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখে না বরং তাকে তত্ত্বজ্ঞানের একটি জ্যোতি দান করে। অতএব সত্য ধর্মের অনুসারী যদি অবাধ্য প্রবৃত্তির পর্দায় আচ্ছন্ন না থাকে তাহলে খোদার কথা শুনতে পারে। অতএব একজন উম্মতিকে এ ধরনের নবী বানানো সত্য ধর্মের একটি আবশ্যকীয় নিদর্শন। নবী হবার অর্থ যদি হয় কারো প্রতি শরীয়ত অবতীর্ণ

হওয়া অর্থাৎ নূতন শরীয়ত আনয়ন করা, তাহলে এসব অর্থ হযরত ঈসার ক্ষেত্রে সত্য হবে না কেননা তিনি মুহাম্মদী শরীয়তকে রহিত করতে পারেন না। তাঁর প্রতি এমন কোনো ওহী অবতীর্ণ হতে পারে না যা কুরআন শরীফকে রহিত করবে। বরং তাঁকে দ্বিতীয়বার আনলে সন্দেহ জাগে যে, হয়ত তাঁর মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তকে কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হবে। পক্ষান্তরে নবী শব্দের অর্থ যদি কেবল এটি করা হয় যে, আল্লাহ তা'লা তার সাথে বাক্যালাপ করেন এবং তার প্রতি কিছু অদৃশ্যের রহস্য প্রকাশ করেন আর এমন অর্থের নিরিখে কোনো উম্মতি যদি নবী হয়ে যান– তাতে সমস্যা কোথায়? বিশেষ করে যেখানে খোদা তা'লা কুরআন শরীফে বেশিরভাগ স্থানে এই আশার আলো দেখিয়েছেন যে, একজন উম্মতি বাক্যালাপের সম্মানে ভূষিত হতে পারে বরং এ নিয়ামত অর্জনের জন্য সূরা ফাতিহার দোয়া اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ শিখিয়েছেন যা দৈনিক ৫ বেলার নামাযে পাঠ করা হয়, সেখানে কোনো উম্মতির এ নিয়ামত লাভ হবার সম্ভাবনাকে কেন উড়িয়ে দেওয়া হয়? প্রশ্ন হলো, সূরা ফাতিহায় নবীদের প্রদত্ত যে নিয়ামতের জন্য দোয়া করা হয়, তা কি টাকা-পয়সা? একথা স্পষ্ট যে, নবীরা খোদার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথনের আশিস লাভ করেছিলেন, যার কল্যাণে তারা দৃঢ়বিশ্বাসভিত্তিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন আর বাক্যালাপ খোদাকে দর্শনের স্থলাভিষিক্ত ছিল। অতএব এই যে দোয়া করা হয়, হে খোদা! আমাদেরকে সেই পথ দেখাও যার মাধ্যমে আমরা সেই নিয়ামতের উত্তরাধিকারী হতে পারি– সেটির অর্থ এছাড়া আর কী হতে পারে যে, আমাদেরকেও বাক্যালাপ ও কথোপকথনের সম্মান দান করো?

কোনো কোনো নির্বোধ এস্থলে বলে যে, এ দোয়ার একমাত্র অর্থ হলো, আমাদের ঈমান দৃঢ় করো আর সৎকর্মের সামর্থ্য দান করো এবং আমাদের হাতে সেই কাজ সাধন করাও যার কল্যাণে তুমি আমাদের সাথে সন্তুষ্ট হবে। কিন্তু এসব নির্বোধ জানে না যে, ঈমান দৃঢ় হওয়া আর সৎকর্ম করা এবং খোদার ইচ্ছা অনুসারে পথ চলা– সবই পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের ফসল হয়ে থাকে। যে হৃদয় খোদার তত্ত্বজ্ঞান থেকে বঞ্চিত, সে হৃদয় দৃঢ় ঈমান ও সৎকর্ম হতেও বঞ্চিত। তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমেই হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়। আর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলেই খোদার ভালোবাসা হৃদয়ে উথলিত আবেগে প্রকাশিত হয়। পৃথিবীতে দেখা যায়, সব জিনিসের প্রতি ভালোবাসা বা ভয় সে সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানের

অনুপাতে হয়ে থাকে। অন্ধকারে যদি একটি সিংহ তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে আর তোমার জানা না থাকে যে, এটি সিংহ বরং সেটিকে ছাগল মনে করো, তাহলে তোমার কোনো ভয় হবে না। আর যদি জানতে পারো যে, এটি তো সিংহ, তাহলে তুমি পড়িমরি করে সেখান থেকে পালাবে। একইভাবে কোনো জঙ্গলে পড়ে থাকা কয়েক লক্ষ রুপি মূল্যের এক খণ্ড হীরাকে যদি শুধু একটি পাথরের টুকরা মনে করো তাহলে তুমি এর প্রতি ভ্রূক্ষেপই করবে না। কিন্তু তুমি যদি সে হীরার মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারো তাহলে তুমি এর ভালোবাসায় উন্মাদের মতো হয়ে যাবে আর তুমি যথাসাধ্য তা হস্তগত করার চেষ্টা করবে। অতএব জানা গেল, সকল ভালোবাসা ও ভয় তত্ত্বজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। মানুষ সে গর্তে হাত ঢুকাতে পারে না, যা সম্পর্কে তার জানা থাকে যে, এ জঙ্গলে একটি বিষাক্ত সাপ রয়েছে আর সেই ঘরকেও পরিত্যাগ করতে পারে না যা সম্পর্কে তার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, এর তলায় বিশাল ধনভাণ্ডার চাপা পড়ে আছে। যেহেতু খোদার প্রতি সকল ভয় ও ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হলো তত্ত্বজ্ঞান, তাই খোদা তা'লার প্রতিও মানুষ সম্পূর্ণরূপে তখন বিনত হতে পারে যখন খোদা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হবে বা তাঁকে চিনবে। প্রধানত তাঁর সত্তাকে যদি জানে আর দ্বিতীয়ত তাঁর সৌন্দর্যাবলি ও তাঁর পূর্ণ শক্তি যদি প্রকাশ পায়। কেউ যদি খোদার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথনের সম্মান লাভ না করে এবং খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে তার দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মে যে, তিনি অদৃশ্যের পূর্ণ জ্ঞান রাখেন আর এমন সর্বশক্তিমান যিনি যা চান– তা-ই করেন, তাহলে এমন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? অতএব প্রকৃত নিয়ামত (যার ওপর ঈমানের ও সৎকর্মের গুণগত মান নির্ভরশীল) তা হলো, খোদার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথন– যার মাধ্যমে প্রথমে তাকে চেনা যায়, এরপর তাঁর শক্তিমত্তার জ্ঞান লাভ হয়, অতঃপর সেই জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ সেসব শক্তিমত্তা স্বচক্ষে অবলোকন করে। নবীদেরকে এ নিয়ামতই দেওয়া হয়েছিল। এরপর উম্মতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা আমার কাছে এই নিয়ামত যাচনা করো; আমি তোমাদেরকে তা দান করব। অতএব যার হৃদয়ে এই পিপাসা বিদ্যমান, সে নিঃসন্দেহে সেই নিয়ামত লাভ করবে।

কিন্তু যারা খোদার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন, খোদা তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন। খোদার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথনই তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র মূল আর সকল কল্যাণের উৎসস্থল। এই উম্মতের জন্য যদি এ দ্বার রুদ্ধ থাকত তাহলে

সৌভাগ্যের ও পুণ্যের সকল পথ বন্ধ থাকত কিন্তু খোদার বাক্যালাপ ও কথোপকথনের অর্থ এমন কথা বা বাক্যালাপ বুঝায় না যা সম্পর্কে এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজেই সন্দেহে থাকবে যে, তা শয়তানী কথোপকথন নাকি রহমানী। এমন অশুভ বাক্যাবলি যাতে শয়তানও অংশীদার হতে পারে, সেগুলোকে শয়তানী কথাই মনে করা উচিত কেননা খোদা তা'লার সমুজ্জ্বল, আশিসময় ও প্রাণসঞ্জীবনী বাণী শয়তানের কথার মতো হতে পারে না। যাদের হৃদয়ে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জনের কারণে শয়তানের কোনো স্থান থাকে না তাদের ওহীতেও শয়তানের কোনো অংশ থাকে না। শয়তান সেসব নোংরা হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় যারা শয়তানের ন্যায় নিজেদের ভেতর অপবিত্রতা রাখে। পবিত্রদের ওপর পবিত্র সত্তার বাণী অবতীর্ণ হয় আর নোংরাদের ওপর নোংরাদের বাণী।

একজন মানুষ যদি নিজের এলহাম সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারে আর না জানে যে, তা শয়তানের পক্ষ থেকে নাকি খোদার পক্ষ থেকে, সেই মানুষের এলহাম তার জন্য মহা সমস্যার কারণ হয়ে যায় কেননা হতে পারে সেই এলহামের ভিত্তিতে কোনো পুণ্যবান মানুষকে সে পাপী আখ্যা দিয়ে বসবে অথচ সে এলহাম শয়তানের পক্ষ থেকে বা কোনো পাপিষ্ঠকে পুণ্যবান আখ্যায়িত করবে অথচ তা শতভাগ শয়তানী (এলহাম)। এটিও হতে পারে যে, এলহামে অবগত একটি বিষয়কে খোদার নির্দেশ মনে করে পালন করবে অথচ শয়তান সে নির্দেশ দিয়ে থাকবে। একইভাবে এটিও হতে পারে যে, একটি নির্দেশকে শয়তানের নির্দেশ মনে করে পরিত্যাগ করবে অথচ তা খোদার নির্দেশ।

এটি সুস্পষ্ট যে, সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত ছাড়া অর্থাৎ হৃদয় যদি এ সুনিশ্চিত বিশ্বাসে পরিপূর্ণ না থাকে যে, সত্যিকার অর্থে এটি খোদার নির্দেশ, তাহলে পুরো দৃঢ়তা বা অবিচলতা অর্জিত হতে পারে না। বিশেষত কিছু বিষয় এমনও থাকে, বাহ্যত শরীয়তের দৃষ্টিতে এর ওপর কিছুটা আপত্তিও বর্তায় যেমন- বাহ্যত খিযরের কাজে শরীয়তের আপত্তি ছিল। নবীদের সকল শরীয়তের মাঝে কোনো শরীয়তে নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করার নির্দেশ নেই। অতএব যদি খিযরের এ বিশ্বাস না থাকত যে, এ ওহী খোদার পক্ষ থেকে, তাহলে তিনি কখনো হত্যা করতেন না। মূসার মায়ের যদি দৃঢ়বিশ্বাস না থাকত যে, তার ওহী খোদার পক্ষ থেকে, তাহলে কখনো নিজের সন্তানকে নদীতে ফেলে দিতেন না।

এখন জানা কথা, এমন এলহাম কীভাবে গর্বের কারণ হতে পারে আর এর ক্ষতি থেকে মানুষ কীভাবে নিরাপদ থাকতে পারে– যা সম্পর্কে কখনো সে মনে করে যে, এটি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আবার কখনো ভাবে যে, এটি শয়তানে পক্ষ থেকে। এমন এলহাম যে জীবন ও ঈমানের জন্য বিপদ ছাড়া কিছু নয় বরং একটি মহা সমস্যা, যার ফলে সে কোনো এক সময় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। খোদা তা'লা এমন নন যে, নিজের এমন বান্দাদের শয়তানের থাবায় ছেড়ে দেবেন যারা অবাধ্য আত্মার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে তাঁর হয়ে যায় আর তাঁর ভালোবাসার অগ্নিতে আল্লাহ ছাড়া বাকি সবাইকে জ্বালিয়ে দেয়। সত্য কথা হলো, যেভাবে আলো ও অন্ধকারের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান, ঠিক সেভাবেই শয়তানি কুমন্ত্রণা ও খোদা তা'লার পবিত্র ওহীতে পার্থক্য বিরাজমান।

আধ্যাত্মিকভাবে মৃত কিছু মোল্লা অস্বীকারে এতটা সীমা ছাড়িয়ে যায় যে, তারা বলে, খোদার সাথে বাক্যলাপের দ্বারই রুদ্ধ আর এই দুর্ভাগা উম্মতের জন্য সম্ভবই নয় যে, এই নিয়ামত লাভ করে নিজেদের ঈমান পরিপূর্ণ করবে এবং ঈমানী আকর্ষণের সুবাদে সৎকর্ম করবে। এমন চিন্তাধারার উত্তর হলো, এ উম্মত যদি সত্যিই এত দুর্ভাগা ও অন্ধ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট উম্মত হয়ে থাকে তাহলে খোদা কেন এর নাম সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত রেখেছেন? সত্য কথা হলো, যারা এমন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে তারাই আহাম্মক ও নির্বোধ, কেননা যেখানে খোদা তা'লা এ উম্মতকে সূরা ফাতিহায় বিদ্যমান দোয়া শিখিয়েছেন আর একই সাথে তিনি এই উম্মতকে সেই নিয়ামত দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা নবীদের দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ খোদার সাথে বাক্যালাপ– যা সকল নিয়ামতের উৎস– সেখানে প্রশ্ন হলো, খোদা তা'লা কি সেই দোয়া শিখিয়ে শুধু প্রতারিত করেছেন? এমন অকর্মণ্য ও হীন উম্মতে কিবা কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে যারা বনী ইসরাঈলের নারীদের চেয়েও অধম?

এটি জানা কথা, হযরত মূসা ও ঈসার মা নারী ছিলেন। আমাদের বিরোধীদের কথা অনুসারে নবী ছিলেন না কিন্তু খোদার সাথে নিশ্চিত কথোপকথন ও বাক্যালাপের সম্মানে তারা ভূষিত ছিলেন। এ উম্মতের কোনো ব্যক্তি যদি পবিত্রতায় এতটা কামিল হন যে, নিজের মাঝে ইবরাহীমের হৃদয় সৃষ্টি করেন আর খোদার এতটা অনুগত হন যে, অবাধ্য প্রবৃত্তির সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দেন আর খোদাপ্রেমে এতটা বিলীন হন যে, নিজ সত্তাকে মিটিয়ে

দেন, কিন্তু এত পরিবর্তন সত্ত্বেও মূসার মায়ের মতোও খোদার ওহী পেতে পারেন না? তাহলে প্রশ্ন হলো, কোনো বিবেকবান খোদা তা'লার প্রতি এমন কার্পণ্য আরোপ করতে পারে কি? আমরা لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ছাড়া আর কী বলব?

আসল কথা হলো, এমন মানুষ যখন সম্পূর্ণভাবে জগৎপূজারি হয়ে গেল আর ইসলামের পরিচিতি কেবল পাগড়ি, দাড়ি, মুসলমানি ও মৌখিক কিছু স্বীকারোক্তি এবং প্রথাগত নামায-রোযায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেল, তখন খোদা তা'লা তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিলেন। সহস্র সহস্র অমানিশার পর্দা চোখের সামনে এসে গেল, হৃদয় মরে গেল এবং আধ্যাত্মিক জীবনের কোনো জীবন্ত দৃষ্টান্ত তাদের হাতে থাকল না। সে কারণে খোদার সাথে বাক্যালাপ করাকে তাদের অস্বীকার করতে হলো। এ অস্বীকার সত্যিকার অর্থে ইসলামকে অস্বীকার করা। কিন্তু হৃদয় যেহেতু মৃত, তাই তারা অনুভব করতে পারে না যে, তারা কোন্ অবস্থায় আছে।

এ নির্বোধরা জানে না, অবস্থা যদি এটিই হয় তাহলে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ভেতর পার্থক্যইবা কী? আপাত দৃষ্টিতে ব্রাহ্মসমাজিরাও খোদাকে এক অদ্বিতীয় বলে দাবি করে, জন্মান্তরবাদেও বিশ্বাস রাখে না, শিরকও করে না, শাস্তি ও পুরস্কার দিবসেও বিশ্বাস রাখে আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-তেও বিশ্বাসী। সব বিশ্বাসে যেখানে ব্রাহ্মসমাজিরা আমাদের সমান, মুসলমানরাও ততটাই উন্নতি করেছে যতটা তারা করেছে! তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাদের ও ব্রাহ্মসমাজিদের মধ্যে পার্থক্য কী? অতএব ইসলাম ধর্ম যদি কোনো সতন্ত্র আশিসে ধন্য না করে আর মানবীয় ধ্যানধারণা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখে, তাহলে তা খোদার পক্ষ থেকে আগত ধর্ম বলে গণ্য হতে পারে না। বস্তুত এক ব্যক্তি ইসলামের সকল পবিত্র বিশ্বাস তথা শিক্ষাসম্মত ধর্মবিশ্বাস রাখে, কিন্তু একই সাথে মহানবী (সা.)-কে ব্রাহ্মসমাজিদের ন্যায় প্রতারক জ্ঞান করে তাহলে এমন দৃষ্টিভঙ্গি লালনকারী মুসলমান তার সামনে নিজের ধর্মের পার্থক্যসূচক কোন বিষয়টি উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে যা কেবল গল্প বা কাহিনি হবে না বরং এমন দেখা ও পরীক্ষিত নিয়ামত হবে যা কেবল তারা প্রদত্ত হয়েছে আর অন্যদের তা দেওয়া হয় নি? হে হতভাগা ও দুর্ভাগা জাতি, শোনো! তা সেই নিয়ামতই– যা খোদার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথন, যার মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞান অর্জন হয় আর খোদার সাহায্য-সমর্থনসূচক ক্ষমতা প্রকাশ

পায়। খোদার সেসব সাহায্য ও সমর্থন প্রকাশ পায়, যার ওপর খোদার ওহীর মোহর খচিত থাকে আর তাদেরকে সেই মোহরের মাধ্যমে চেনা যায়। এছাড়া দুয়ের মাঝে অন্য কোনো পার্থক্য নেই। যেখানে তোমরা নিজেরা বিশ্বাস করো যে, খোদা দোয়া কবুল করেন, তাই হে দুর্বল ঈমানের লোকেরা ও অন্ধ হৃদয়ের মানুষ! তিনি শুনতে পারলে কথা বলতে পারেন না? শুনলে যদি তার অসম্মান না হয় তাহলে নিজেদের বান্দাদের সাথে কথা বললে কেন তার অসম্মান হবে? নতুবা তোমাদের এ বিশ্বাস লালন করতে হবে যে, যেভাবে কিছুকাল থেকে খোদার এলহামে মোহর লেগে গেছে, একইভাবে তখন থেকে তাঁর শ্রবণশক্তির ওপরও মোহর লেগে গেছে। এখন তিনি নাউযুবিল্লাহ صُمٌّ بُكْمٌ ! কোনো বিবেকবান একথা গ্রহণ করতে পারে কি যে, এ যুগে খোদা শুনলেও কথা বলেন না? এরপর এ প্রশ্ন উঠবে যে, তিনি কেন কথা বলেন না? তাঁর জিহ্বায় কি কোনো ব্যাধি দেখা দিয়েছে আর তাঁর কান ব্যাধিমুক্ত– যেক্ষেত্রে বান্দা ঐ একই আর খোদাও অভিন্ন আর ঈমানের পূর্ণতার জন্য চাহিদাও একই? বরং প্রকৃত কথা হলো, এ যুগে হৃদয়ে যে নাস্তিকতা ছেয়ে গেছে, সে নিরিখে কথা বলার ততটাই প্রয়োজন ছিল– যতটা শোনার। তাই প্রশ্ন ওঠে, শোনার বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু বলার বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে– এর কারণ কী?

পরিতাপের বিষয় হলো, চতুর্দশ শতাব্দীর ২২ বছর কেটে গেছে আর আমার দাবির যুগ এতটা দীর্ঘ হয়ে গেছে যে, যারা আমার দাবির প্রারম্ভে মাতৃগর্ভে ছিল, তাদের সন্তানরাও সাবালক হয়ে গেছে! কিন্তু আপনারা এখনও বুঝতে পারলেন না যে, আমি সত্যবাদী। বার বার বলেন, আমাদের হাদীসগুলোতে লেখা আছে যে ৩০জন দাজ্জাল আসবে।

হে দুর্ভাগা জাতি! তোমাদের ভাগ্যে কি কেবল দাজ্জালই রয়ে গেল। তোমরা সকল দিক থেকে এমনভাবে ধ্বংস হয়েছ যেভাবে এক ফসলকে রাতের বেলা কোনো অজানা মানুষের গবাদি পশু ধ্বংস করে দেয়। অভ্যন্তরীণভাবে তোমরা অনেক বিকৃতির শিকার হয়েছে আর বহিরাগত হামলাও চরম রূপধারণ করেছে। শতাব্দীর শিরোভাগে যে মুজাদ্দিদ আসত, খোদা হয়ত নাউযুবিল্লাহ বেমালুম সে কথা ভুলে গেছেন। পক্ষান্তরে এবার শতাব্দীর শিরোভাগে যদি কেউ এসে থাকে তাহলে একজন দাজ্জাল আসলো। তোমারা মাটিতে মিশে গিয়েছ কিন্তু খোদা তোমাদের খবর নিলেন না। তোমরা

বেদাতে ডুবে গেলে অথচ খোদা তোমাদের হাতে হাত রাখলেন না। তোমাদের মধ্য থেকে আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে যেতে থাকল আর সততা ও নিষ্ঠার নামগন্ধও রইল না। সত্যি করে বলো, তোমাদের মাঝে এখন আধ্যাত্মিকতা কোথায়? খোদার সাথে সম্পর্কের নিদর্শন ও চিহ্ন কোথায়? ধর্ম হলো তোমাদের দৃষ্টিতে কেবল মৌখিক চালাকি, দুষ্কৃতিমূলক বিতণ্ডা, বিদ্বেষপ্রসূত ক্রোধ এবং অন্ধদের ন্যায় হামলার নাম। খোদার পক্ষ থেকে একটি নক্ষত্র উদিত হয়েছে কিন্তু তোমরা তাকে শনাক্ত করো নি। তোমরা অমানিশাকে পছন্দ করেছ, সে কারণে খোদা তোমাদেরকে অমানিশায় ছেড়ে দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় তোমাদের ও অন্যান্য জাতির মাঝে পার্থক্যইবা কী রইল? একজন অন্ধ ব্যক্তি অন্ধদের মাঝে বসে একথা বলতে পারে কি যে, তোমাদের অবস্থা থেকে আমার অবস্থা উত্তম?

হে নির্বোধ জাতি! আমি কার সাথে তোমাদের তুলনা করব? তোমরা সেসব হতভাগার ন্যায় যাদের ঘরের কাছে এক দানবীর একটি বাগান লাগিয়েছে, তাতে সকল প্রকার ফলবান বৃক্ষ রোপণ করেছে আর একটি সুপেয় পানির জলধারাও সচল রেখেছে, যার পানি অত্যন্ত সুপেয় এবং সেই বাগানে বড়ো বড়ো ছায়াবহুল বৃক্ষ রোপণ করেছে, যা সহস্র সহস্র মানুষকে রোদ থেকে বাঁচাতে পারত। সেই উদার ব্যক্তি তখন যারা রোদে পুড়ছিল এবং যাদের জন্য কোনো ছায়া, ফল কিংবা কোনো পানিও ছিল না, তাদেরকে ছায়াতে বসার আর ফল খাওয়ার ও পানি পান করার জন্য আমন্ত্রণ জানালো কিন্তু সেই হতভাগা জাতি সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল আর সেই রোদের প্রচণ্ড তাপে, পিপাসায় এবং ক্ষুধায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। সে কারণে খোদা বলেন, তাদের স্থানে আমি অন্য জাতি আনব যারা সেই বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসবে এবং ফল খাবে আর সুপেয় পানি পান করবে। খোদা তা'লা কুরআন শরীফে অত্যন্ত সুন্দর উপমা দিয়ে বলেন, যুল-কারনাইন এক জাতিকে রোদে দগ্ধ হতে দেখেন। তাদের ও সূর্যের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না কিন্তু সেই জাতি যুল-কারনাইনের কাছে কোনো সাহায্য চায় নি। ফলে তারা সেই বিপদেই পড়ে রইল। কিন্তু যুল-কারনাইন অন্য একটি জাতিও দেখতে পান, যারা শত্রু থেকে রক্ষা পাবার জন্য যুল-কারনাইনের কাছে সাহায্য যাচনা করে। অতএব তাদের জন্য একটি দেয়াল বানানো হয় যার ফলে তারা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

আমি সত্য বলছি, কুরআন শরীফের ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারে সেই যুল-কারনাইন আমি, যে সকল জাতির মাঝে প্রচলিত শতাব্দীগুলো পেয়েছে। রোদে তারা জ্বলছে– যারা মুসলমানদের মধ্য হতে আমাকে গ্রহণ করে নি। কাদার চশমায় ও অন্ধকারে বসে থাকা জাতি হলো খ্রিষ্টান, যারা সূর্যকে চোখ তুলেও দেখে নি। যে জাতির জন্য দেয়াল বানানো হয়েছে তারা হলো আমার জামা'ত। আমি সত্য সত্যই বলছি, তাদের ধর্মই কেবল শত্রুর হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পাবে। প্রত্যেক দুর্বল (বিশ্বাসের) ভিত্তিকে শিরক ও নাস্তিকতা ধ্বংস করবে। কিন্তু এ জামা'ত দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর এর ওপর শিরক বিজয়ী হতে পারবে না এবং শয়তানী দল তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে না। তাদের যুক্তিপ্রমাণ তরবারির চেয়ে বেশি ক্ষুরধার এবং বর্শার চেয়ে বেশি গভীরে প্রবেশ করার মতো। কিয়ামত পর্যন্ত সকল ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে।

পরিতাপ সেসব নির্বোধদের জন্য যারা আমাকে চেনে নি। সেসব চোখ কত বক্র ও দৃষ্টিশক্তিহীন! যারা সত্যের জ্যোতি দেখতে পায় নি। আমি তাদের চোখে পরিদৃষ্ট হতে পারি না, কেননা বিদ্বেষ তাদের চোখকে অন্ধ করে দিয়েছে। তাদের হৃদয়ে মরিচা আর চোখে ছিল পর্দা। তারা যদি সত্যিকার অর্থে সন্ধান করে এবং নিজেদের হৃদয়কে বিদ্বেষমুক্ত করে দিনের বেলা রোযা রাখে আর রাতে উঠে নামাযে দোয়া করে এবং আহাজারি করে তাহলে আশা করা যায়, মহা সম্মানিত খোদা প্রকাশ করে দেবেন– আমি কে। তাদের উচিত খোদা তা'লার আত্মভিমানকে ভয় করা।

ইহুদীরা যখন মহানবী (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান করল আর হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে বিরত হলো না তখন খোদা তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন অথচ তাদের মাঝে শত শত ফকীহি ও ফরিসি (আইনজ্ঞ ও ধর্মীয় আলেম) তথা তওরাতের আলেম ও বিদগ্ধ লোকেরা ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সত্য বোঝে নি আর খোদাও কোনো স্বপ্ন বা এলহামের মাধ্যমে তাদের কাছে সত্য প্রকাশ করেন নি। অতএব এ উম্মতও যেহেতু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, তাই কোনোভাবে তাদের চোখ খুলতে পারে না। যতদিন তাদের সত্যিকার তাকওয়া লাভ না হবে, ততদিন তারা আমাকে শনাক্তও করতে পারবে না। শুধু অর্থহীন কথাবার্তায় খোদা সন্তুষ্ট হন না। হৃদয়ের ওপর তাঁর দৃষ্টি রয়েছে।

প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজের কোনো অসৎপন্থাকে গোপন করে, সে তাঁর

গভীর দৃষ্টি থেকে তা গোপন করতে পারে না। মুত্তাকী সে– যে খোদার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মুত্তাকী প্রমাণিত হয়, কেননা মুত্তাকী খোদার স্নেহপাশে তেমনই হয়ে থাকে যেমনটি এক প্রিয় সন্তান তার মাতৃক্রোড়ে। জগদ্‌বাসী তাকে ধ্বংস করার জন্য তার ওপর হামলা করে আর পরিপার্শ্ব তাকে হুল ফোঁটায়, কিন্তু খোদা তাকে রক্ষা করেন। স্বাভাবিকভাবে, যখন সূর্য উদিত হয় তখন এর উজ্জ্বল কিরণ খোদার পৃথিবীতে পড়ে, একইভাবে খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থন দিবালোকের ন্যায় মুত্তাকীদের সাথে থাকে। তিনি তার শত্রুদের শত্রু হয়ে যান আর তাদের চোখের সামনে সেই মুত্তাকীকে সম্মান দেন যার তারা লাঞ্ছনা দেখতে চেয়েছে। সে ব্যর্থও হয় না আর ধ্বংসও হয় না, যতদিন নিজের কাজ পূর্ণ না করে। তাঁর বিরোধিতা করা মানে হলো একটি ধারালো তরবারির ফলার ওপর হাত মারা।

تـرى نصـر ربّى كيـف يأتـى ويظهرُ ويسـعٰى الينـا كل مـن هـو يُبصـرُ

আমার প্রভুর সাহায্য কীভাবে আসছে আর প্রকাশ পাচ্ছে তা তুমি দেখছ,
প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার চোখ আছে সে আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

اتعلـم مفتريًـا كمثلـى مؤيّـدًا ويقطـع ربـى كلمـا لا يثمـرُ

তুমি কি কোনো মিথ্যা দাবিকারকে জানো, যে আমার মতো ঐশী মদদপুষ্ট?
আমার খোদার রীতি হলো, যে শাখা ফল দেয় না (তা তিনি) কেটে ফেলেন।

تقولون كذّاب وقد لاح صدقنا بآيٍ تجلّت ليس فيها تكدّرُ

তোমরা বলো, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, অথচ আমার সত্যতা প্রকাশ পেয়ে গেছে;
সেসব নিদর্শনের মাধ্যমে সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে যাতে অস্পষ্ট কোনো দিক নেই।

وهل يستوى ضوءًا نهارٌ وليلةٌ فكيف كذوبٌ والصدوق المُطهّرُ

রাত ও দিন আলোর ক্ষেত্রে সমান হতে পারে কি?
অতএব একজন মিথ্যাবাদী ও সেই সত্যবাদী কীভাবে সমান হতে পারে–
যাকে পবিত্র করা হয়েছে?

ففكّر ولا تعجل علينا تعصّبًا وان كنت لا تخشٰى فكذّب وزوّرُ

অতএব চিন্তা করো আর বিদ্বেষবশত আমাদের ওপর হামলা কোরো না,
তোমার যদি খোদাভীতি না থাকে তাহলে মিথ্যা বলো আর সত্যকে প্রত্যাখ্যান করো।

وكفّر وما التكفير منك ببدعةٍ كمثلك قال السابقون فدمّروا

আমাকে কাফির বলো আর তোমার পক্ষ থেকে কাফির বলা কোনো বিদাত নয়;
তোমার ন্যায় পূর্বের অস্বীকারকারীরাও কাফির আখ্যায়িত করেছে আর অবশেষে তাদের ধ্বংস করা হয়েছে।

وهٰذا هو الوقت الذى لك نافع فتب قبل وقتٍ فيه تُدعٰى وتحضرُ

এ সময়টিই তোমার জন্য কল্যাণকর হতে পারে,
অতএব সে সময় আসার পূর্বে তওবা করো যখন তোমাকে ডেকে উপস্থিত করা হবে।

وقد كبّدت شمس الهدٰى وامورنا انارت كيأْقوت وانت تُعفّرُ

আর হিদায়াতের সূর্য মধ্য গগনে এসে গেছে এবং আমাদের বিষয়াবলি মণিমুক্তার ন্যায় ঝলমল করে ওঠে আর তুমি সেগুলোকে ধূলিমলিন করতে চাও।

ولو لا ثلٰث فيك تغلى لجئتنى فمنهن جهل ثم كبر مثوّرُ

তিনটি অভ্যাস যদি তোমার মাঝে মাথাচাড়া না দিত তাহলে তুমি আমার কাছে আসতে,
সেগুলোর একটি হলো অজ্ঞতা, দ্বিতীয়টি হলো অহংকার– যা ফুঁসে উঠছে।

واٰخر اخلاقٍ يبيدك سمّها هو الخوف من قومٍ بحُمقٍ تنفّروا

আর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য যার বিষ তোমাকে ধ্বংস করছে তা হলো,
সে জাতির ভয় যারা দুর্ভাগ্যবশতঃ কারণে (আমাকে) ঘৃণা করে।

ومن كان يخشى الله لا يخشى الورٰى هو الشجرة الطوبٰى ينُور ويُثمرُ

যে খোদাকে ভয় করে সে সৃষ্টিকে ভয় করে না,
সেটি সৌভাগ্যের বৃক্ষ যা ফুল ও ফল বহন করে।

ومن كان بالله المهيمن مؤمنًا على نائبات الدهر لا يتفكّرُ

যে তত্ত্বাবধায়ক খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে,
সে যুগের দুর্বিপাককে ভয় করে না।

سلامٌ على قومٍ رؤا نَور دوحتى فراق نواظرهم وللقطف شمّروا

সে জাতির প্রতি শান্তি– যে আমার বৃক্ষের কেবল একটি কুঁড়ি দেখেছে,
সেই কুঁড়ি তাদের ভালো লেগেছে আর তারা ফল কুড়াতে উদ্যত হলো।

فاىّ غبى انت يا ابن تصلّفٍ ترىٰ ثمراتى كلها ثم تُقصِرُ

অতএব হে বড়ো বড়ো দাবিকারক! তুমি কেমন মোটা মাথার মানুষ যে,
তুমি আমার সব ফলফলাদি দেখা সত্ত্বেও তা কুড়াতে ব্যর্থ!

سيهديك ربّى بعد غىٍّ وَشِقوةٍ وذٰلك من وحى اتانى فأُخبرُ

আমার প্রভু তোকে ভ্রষ্টতার পর হিদায়াত দেবেন,
এটি আমি খোদার ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি আর আমি অবহিত করছি।

و نحن علمنا المنتهٰى من وليّنا فَقرّت به عَيْنِى وكنت أُذكّرُ

তোমার কাজের পরিণতি আমি আমার বন্ধুর কাছে জানতে পেরেছি,
এর কারণে আমার নয়ন জুড়েছে আর আমি স্মরণ করিয়ে আসছি।

وَوَالله لَا انسٰى زَمانَ تعلّق وليس فؤادى مثل ارضٍ تحجّرُ

খোদার কসম! আমি বন্ধুত্বের সম্পর্কের যুগ ভুলতে পারব না,
আমার হৃদয় এমন নয় যেমনটি পাথুরে ভূমি হয়ে থাকে।

ارٰى غيظ نفسى لاثبات لغليهٖ كموجٍ من الرجّاف يعلو ويحدرُ

আমি দেখি আমার রাগ মোটেও স্থায়ী নয়,
তা নদীর সেই ঢেউয়ের ন্যায় যা নিমিষে ওঠা-নামা করে।

اذا احسن الانسان بعد اساءةٍ فنسى الاساءة والمحاسن نَذكرُ

মানুষ যখন পাপের পর পুণ্য করে,
আমরা দুর্ব্যবহার ভুলে যাই আর পুণ্য স্মরণ রাখি।

وان قلتُ مُرًّا فى كلامٍ لطالما رأيتُ أَذًى منكم وقلبى مكسّرٌ

আমি যদি কোনো তিক্ত কথা বলে থাকি,
(তাহলে স্মরণ রেখো!) আমি দীর্ঘকাল তোমাদের পক্ষ থেকে কষ্টের সম্মুখীন ছিলাম আর আমার মন ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ

وما جئتكم الّا من الله ذى العُلى وما قلتُ الّا كلّما كنتُ أُومرُ

আমি খোদার পক্ষ থেকে এসেছি,
আর আমি তা-ই বলেছি যা আমাকে আদেশ করা হতো।

وان شاء لم أُبعَث مقام ابن مريم ولِلّهِ فى اقدارهٖ ما يُحيّرُ

যদি খোদা চাইতেন তাহলে আমি ইবনে মরিয়ম হিসেবে প্রেরিত হতাম না,
ঐশী নিয়তি এমনসব বিষয়ের সিদ্ধান্ত করে রেখেছে যা বিস্ময়াভিভূত করে।

ولا يُسئلُ الرحمٰن عن امرٍ قضٰى ويُسئل قومٌ ضلّ عمّا تخيّروا

খোদা তাঁর কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন না,
যে জাতি পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়।

كذٰلك عادتهُ جرت فى قضائهٖ فيختار ما يُعمى عيونا وَيأطَرُ

তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁর রীতি এভাবেই চলমান রয়েছে,
অতএব তিনি এমন বিষয় অবলম্বন করেন যার কারণে চোখ অন্ধ হয়ে যায় আর যা চোখকে বাঁকা করে দেয়।

وما كان لى ان اترك الحق خيفةً جوادٌ لنا عند الوغٰى يَتَمَطَّرُ

আমি এমন নই যে, ভয় পেয়ে সত্য ছেড়ে দেবো;
আমাদের সেই ঘোড়া রয়েছে, যে যুদ্ধের সময় দ্রুত ছোটে।

وقالوا اذا ما الحرب طال زمانها لنا الفتح فانظر كيف دُقّوا وكُسّروا

একটি যুদ্ধ যখন দীর্ঘ হয়ে গেল তখন তারা বলতে আরম্ভ করল,
বিজয় আমাদের, অতএব দেখো! তাদের কীভাবে পিষে ফেলা হয়েছে।

وما ان رَأَينا فى الميادين فتحهم ومن غرّه حولٌ رأيناه يُدبرُ

আর আমরা রণক্ষেত্রে তাদের বিজয় দেখি নি,
যাকে কোনো শক্তি অহংকারী করে তুলেছে আমরা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে দেখেছি।

رَأَينا عناية حِبّنا عند أُثرةٍ وكل صديقٍ فى الشدائد يُخبرُ

আমরা কঠিন সময়ে আমাদের বন্ধুর দান ও সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছি,
কঠিন সময়েই সকল বন্ধুর পরীক্ষা হয়।

أَرى النفس لا تدرى لغوبًا بسبُله وما اَن أَرَاهَا عند خوف تأَخّرُ

আমি আমার প্রাণকে দেখি যে, তা তাঁর পথে ক্লান্ত হয় না;
আর আমি ভয়ের সময় তাকে পিছু হটতে দেখি না।

وانّى نسيت الهمّ والغمّ والبلا اذا جاءنى نصرٌ ووحى يُبشرُ

আমি দুঃখ-বেদনা ও বিপদাপদ ভুলে গিয়েছি,
যখন আমার কাছে তাঁর সাহায্য ও শুভসংবাদবাদী ওহী এলো।

وانّا بِفضل الله نطوى شعابنا على هاجراتٍ مثل ريح تُصَرْصِرُ

আমরা আল্লাহর কৃপায় আমাদের পথ অতিক্রম করছি,
এমন উটের পিঠে চড়ে যা প্রবল বায়ুর গতিতে পথ অতিক্রম করে।

لهن قوائم كالجبال كأَنّها سفائن فى بحر المعارف تمخرُ

সেসব উটের পা পাহাড়ের ন্যায়,
যেন সেগুলো তত্ত্বজ্ঞানের সাগরে সন্তরণরত নৌকা।

تَدلّت علينا الشمس شمس المعارف فكنا بضوء الشمس نمشي وننظرُ

তত্ত্বজ্ঞানের সূর্য আমাদের কাছে এসে গেছে,
অতএব আমরা সূর্যের আলোতে হাঁটি ও দেখি।

رأينا مراداتٍ تعسّر نيلها ترجّز غيثٌ بعد مكثٍ يحذّرُ

আমরা এমন অভিষ্ট অর্জন করেছি যা অর্জন করা কঠিন ছিল,
ধীরে ধীরে মেঘমালা আমাদের পানে সচল হয়েছে সেই বিলম্বের পর যা ছিল ভীতিপ্রদ।

علٰى هٰذه نيف وعشرين حجةً اذا اختارنى ربّى فكنت أُبشّرُ

এতে বিশ বছরের পর অতিরিক্ত আরো কিছু বছর অতিক্রান্ত হয়েছে,
যখন খোদা আমাকে মনোনীত করেছেন আর আমি শুভ সংবাদ লাভ করি।

فقال سيأتيك الأُناس ونصرتى ومن كل فجٍّ يأتينّ وتُنصرُ

তিনি বলেছেন, তোমার কাছে অনেক লোক আসবে আর সাথে আমার সাহায্যও আসবে;
সকল পথ পাড়ি দিয়ে লোক তোমার কাছে আসবে আর তোমাকে সাহায্যও করা হবে।

فتلك الوفود النازلون بدارنا هو الوعد من ربّى وان شئت فاذكرُ

অতএব দলে দলে আগমনকারী এসব লোক যারা আমাদের ঘরে এসেছে,
(তাদের আগমনে পূর্ণ হয়) খোদার প্রতিশ্রুতি, যদি তুমি চাও তাহলে স্মরণ করো।

وان كنت فى ريبٍ ولا تؤمنَن بهٖ وتحسبُ كذبًا ما اقول واسطرُ

যদি তোমার সন্দেহ থাকে আর তোমার বিশ্বাস না হয়,
আর আমি যা বলি ও লিখি তা যদি মিথ্যা মনে করো;

فإنّا كتبنا فى البراهين كلّه امورٌ عليها كُنْتَ من قبل تعثرُ

তাহলে আমরা সেসব এলহাম বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখে দিয়েছি,
আর এগুলো এমন বিষয় যা সম্পর্কে তুমি পূর্বেই অবগত ছিলে।

فلا تتبع أَهواء نفسٍ مُبِيدةٍ ولا تختر الزّوراءَ عمدًا فتخسرُ

অতএব ধ্বংসাত্মক অবাধ্য প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না,
আর বক্রপথে চলো না তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

أَتعلم هيْنًا عَثْرَة الله ذِى العُلٰى و اِنّ حسامَ الله بالمَسّ يبتر

তুমি কি মহান খোদার সাথে যুদ্ধ করাকে সহজ ও সামান্য বিষয় মনে করো?
নিশ্চয় খোদার তরবারি ছোঁয়া মাত্রই টুকরো টুকরো করে ফেলে।

وَاِن كنت أَزمعتَ النِّضال تَهوّرًا فنأتى كما يأتى لصيد غَضنفرُ

তুমি যদি যুদ্ধ করারই সংকল্প করে থাকো,
তাহলে আমরা সেভাবে আসব যেভাবে শিকারের জন্য সিংহ হামলা করে থাকে।

لنا أُثرةٌ فِى الله مَورٌ مُعبّد اذا ما أُمرنا منه لا نتأخّرُ

কষ্টদায়ক অবস্থা আমাদের জন্য খোদার পথে ব্যবহৃত একটি মসৃণ পথের ন্যায়,
আমাদের যখন নির্দেশ দেওয়া হয় আমরা আর বিলম্ব করি না।

انترك قول الله خوفًا من الورٰى انخشٰى لئام الحىّ جبنًا ونحذرُ

আমরা কি মানুষের ভয়ে খোদার কথা ছেড়ে দেবো,
আমরা কি ভয় ভীরুদের ন্যায় হীনদের গোত্রকে ভয় করব?

يرى الله باديهم وتحت اديمهم ولو من عيون الخلق يُخفٰى ويُستر

খোদা তাদের ভেতর ও বাহিরকে খুব ভালো করে জানেন,
মানুষের দৃষ্টি হতে তা গোপনই করা হোক না কেন।

فلا تذهبَن عيناك نحو عمائمٍ وما تحتها الّا رءوس تُزوّرُ

অতএব তোমার চোখ যেন তাদের পাগড়িগুলোকেই কেবল না দেখে,
সেগুলোর নীচে প্রতারণায় লিপ্ত মাথা রয়েছে।

أَتطلب دنياهم وتبلٰى رياضها وتنسٰى رياضًا ليس فيها تغيّرُ

তুমি কি তাদের জাগতিক চাকচিক্যে মুগ্ধ অথচ সেই বাগান (একদিন) আকর্ষণ হারিয়ে বসবে?
তুমি কি সেসব বাগানকে ভুলে যাও যাতে কোনো পরিবর্তন আসবে না?

وانت تظنّ بی الظنون تغیّظًا وَاِنّی بریئٌ من امورٍ تصوّرُ

তুমি রাগের ঘোরে আমার সম্পর্কে অনেক কুধারণা পোষণ করো,
তুমি যে-সব কথা ভাবো ও চিন্তা করো আমি সেসবের ঊর্ধ্বে।

نزلتُ بحرّ الدار دار مهیمن وتاللّٰہ انّک لا ترانی وتهذرُ

আমি আমার খোদার ঘরের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছি,
আর খোদার শপথ! তুমি আমাকে দেখো না কিন্তু অনর্থক অপলাপ করো।

أَنَا اللیث لا أَخشی الحمیر و صوتهم وکیف وهم صیدی وللصید اَزءرُ

আমি সিংহ আর আমি গাধার আওয়াজকে ভয় করি না,
কেনইবা ভয় করব, তারা যে আমার শিকার আর শিকারের জন্য আমি গর্জন করি।

أَتُذعِرنی بالفانیات جهالةً وِانّ اذی الدنیا یمرّ ویَطمرُ

তুমি কি আমাকে নশ্বর বিষয়ের ভয় দেখাও, এটি তো অজ্ঞতা;
নিশ্চয় জগতের কষ্ট কেটে যায় আর এর চিহ্নও বাকি থাকে না।

ولسنا علی الاعقاب موتٌ یردّنا ولو فی سبیل اللّٰہ نُدمٰی و نُنحرُ

আমরা এমন নই যে, কোনো মৃত্যু আমাদেরকে খোদার পথ থেকে বিচ্যুত করবে,
খোদার পথে আমরা আহত বা জবাই হয়ে গেলেও।

تنکّر وجه الجاهلین تغیّظًا اذا اُعثروا من موت عیسٰی واُخبروا

রাগের কারণে অজ্ঞদের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে,
যখন তাদেরকে হযরত ঈসার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

وقالوا کذوبٌ کافرٌ یتبع الهوٰی وحثّوا علٰی قتلی عوامًا وعَیّروا

তারা বলেছে এক মিথ্যাবাদী কাফির, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করে;
তারা আমাকে হত্যা করার জন্য জনসাধারণকে ক্ষেপিয়েছে আর (আমাকে) বকাঝকা করেছে।

فضاقت علينا الارض من شرّ حزبهم ولو لا يد المولٰى لكنّا نُتَبَّرُ

তাদের বিভিন্ন দলের দুষ্কৃতির কারণে আমাদের জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে গেছে,
যদি খোদার হাত না হতো আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম।

فلم يُغن عنهم مكرهم حِيْن أَشرقت شموس عنايات القدير فادبروا

অতএব তাদের ষড়যন্ত্র তাদের কোনো কাজে এলো না,
যখন খোদার অনুগ্রহের সূর্য ঝলমল করে উঠল তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালালো।

رجَعنا وقد رُدّت اليهم رماحهم قَضَى الأَمرَ حِبٌّ لا يُبَاريه منكرُ

আমরা ফিরে আসলাম আর তাদের বর্শা তাদের দিকেই ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে,
সেই বন্ধু সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন যার কোনো অস্বীকারকারী মোকাবিলা করতে পারে না।

من الضغن والشحناء يهذون كُلّهم وأَمرى مبينٌ واضح لو تفكّروا

শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে তারা সকলে অপলাপ করছে,
আমার কথা উজ্জ্বল ও স্পষ্ট যদি তারা চিন্তা করে।

واصل التنازع والتخالف بيننا رخيمٌ قليلٌ ثُمَّ باللّغو يُكثر

আমাদের ও তাদের মাঝে যে মতভেদ রয়েছে সত্যিকার অর্থে,
তা সংক্ষিপ্ত ও সামান্য কিন্তু বাজে কথা বলে সেটিকে অনর্থক বৃদ্ধি করে।*

---

* **টীকা:** হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে মূল বিতর্কিত বিষয় হলো তাঁর জীবন মৃত্যুর বিষয়টি যা চিন্তাশীল লোকদের কাছে একটি সুস্পষ্ট বিষয়। আল্লাহ তা'লা বলেছেন,

يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ

(আলে-ইমরান: ৫৬)

তিনি তাওয়াফফা (মৃত্যু)-কে 'রাফা' (উত্থান)-এর আগে উল্লেখ করেছেন, যেমনটি আপনারা পাঠ করে থাকেন। এটিই আল্লাহর বিধান। আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান

جنحنا لسلمٍ شائقين لسلمهم وجئنا بمُرّانٍ اذا ما تشذّروا

আমরা তাদের মীমাংসার আগ্রহের কারণে মীমাংসার হাত বাড়িয়েছি,
তারা যখন লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিল আমরা তরবারি নিয়ে বের হলাম।

أرى الله اٰياتٍ ولٰكن نفوسهم نفوسٌ معوّجة كنارٍ تسعّرُ

আল্লাহ নিদর্শন দেখালেন কিন্তু তাদের প্রবৃত্তি হলো,
বক্র আর আগুনের ন্যায়– যা জ্বলে ওঠে।

ولسنا نحب تضاغنا عند سلمهم ومَن جاءنا سلمًا فانا نُوقّرُ

তারা যদি শান্তি চায় তাহলে আমরা যুদ্ধ পছন্দ করি না,
যদি কেউ শান্তি সন্ধানী হয়ে আসে তাহলে আমরা তার সম্মান করি।

ومن هرنا فنعافه بجزائهٖ ومَن جاءنا سلمًا فبالسلم نَحضرُ

যে আমাদের ঘৃণা করে আমরা তাকে ঘৃণা করি,
(এর বিপরীতে) যে আমাদের কাছে মীমাংসার মানসে আসে আমরাও
মীমাংসার হাত বাড়াই।

*** চলমান টীকা:** অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। আল্লাহর বাণীকে এর প্রকৃত স্থান থেকে বিচ্যুত করা কারো জন্যই সঙ্গত নয়, আর আল্লাহ তা'লা প্রক্ষেপণকারীদের অভিশাপ দিয়েছেন, যেমনটি আপনারা অবগত আছেন।

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, আল্লাহ তা'লার উক্তি–

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ

(আল-মায়েদা: ১১৮)

অতএব সুসংবাদ সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা গভীরভাবে চিন্তা ও প্রণিধান করে।

কুরআনের তৃতীয় প্রমাণ হলো, আল্লাহ তা'লার উক্তি–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

(আলে-ইমরান: ১৪৫)

অতএব এর পরে কোনো বাণীতে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করবে? নিঃসন্দেহে আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেরাজের রাতে হযরত ঈসাকে মৃতদের মধ্যে দেখেছিলেন, অথচ তোমরা এখনও অবিশ্বাস করে যাচ্ছ। –লেখক

وكان عدوى بعضهم فى مساءهم فاضحوا بايمانٍ ورُشْدٍ وابصروا

তাদের কতক সন্ধ্যার সময় আমার শত্রু ছিল,
দিন হতেই তারা ঈমান ও হিদায়াতে ধন্য হয় আর দৃষ্টিশক্তি অর্জন করে।

وقد زادنى فى العلم والحلم جهلهم وسكّنتُ نفسى عند غيظ يكرّرُ

তাদের অজ্ঞতা আমার জ্ঞান ও নমনীয়তা বৃদ্ধি করেছে,
বারংবার মাথাচাড়া দেয়া রাগের মুখে আমি আমার নফসকে
শান্ত করেছি।

واعجبنى غيظ العِدا وجنونهم أَرَاهم كقومٍ من غبوقٍ تخمروا

শত্রুর রাগ ও উন্মাদনা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে,
আমি তাদেরকে এমন এক জাতি দেখছি যারা রাতে মদের নেশায় বুঁদ হয়ে
থাকে।

تبصر عدوى هل ترى من مزوّرٍ يؤيّده ربّى كمثلى وينصرُ

হে আমার শত্রু! ভালোভাবে দেখো, এমন কোনো প্রতারক আছে কি–
যাকে আমার প্রভু আমার ন্যায় সাহায্য ও সমর্থন জোগান?

تبصّر وانّ العمر ليس بدائمٍ كلانا وان طال الزمان سيندر

চোখ খোলো, জীবন স্থায়ী নয়;
জীবন দীর্ঘ হলেও আমাদের প্রত্যেকেই একদিন মৃত্যুবরণ করবে।

فمالك لا تخشى الحسيب وناره ومالك تختار الجحيم وتُؤْثِرُ

তোমার কী হলো যে, তুমি হিসাব গ্রহণকারীকে ও তাঁর আগুনকে ভয় করো
না?
তোমার কী হয়েছে যে, তুমি জাহান্নাম বেছে নিয়েছ?

أَتجعل تكفيرى لكفرك مُوجبًا ولا تتّقى يومًا الى القبر يَهصِرُ

তুমি কি আমাকে কাফির আখ্যায়িত করে নিজে কাফির হবার পথ ধরেছ?
আর তুমি সেদিনকে ভয় করো না, যা কবরের দিকে টেনে নেবে।

اذا بُغتَ فی الدنیا من العیش باردًا فمالك لا تبغی المعادَ وتَنتزُ

তুমি পার্থিব জীবনের আরাম চাও,
তোমার কী হয়েছে যে, পরকালের আরাম প্রত্যাশা করো না আর অলস হয়ে পড়ছ?

فان کنت جوعان الهدی فتحرّنا الا اننا نقری الضیوف وننحرُ

অতএব তুমি যদি হিদায়াতের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে থাকো তাহলে আমাদের সন্ধান করো,
আমরা মেহমানদের আমন্ত্রণ জানাই এবং তাদের জন্য জবাই করি।

إِذَا أَشرقت شمس الهدی وضیاءها تجلّٰی فلیس الفخران صرت تُبصرُ

যখন হিদায়াতের সূর্য ও এর আলো ঝলমল করে উঠল,
তখন তোমরা দেখতে আরম্ভ করা কোনো গর্বের বিষয় নয়।

ولو کان خوف الله مثقال ذرةٍ لو افیتنی والسَیلَ بالصدقِ تعبرُ

খোদার বিন্দুমাত্র ভয় যদি থাকত,
তুমি আমার কাছে আসতে আর নিষ্ঠার মাধ্যমে (প্রবৃত্তির) বন্যা অতিক্রম করতে।

بلَمَّاعةٍ قَفرٍ رضیت جهالةً و تسعٰی لفانیةٍ وفی الدین تُقصِرُ

মরীচিকা কবলিত ভূমি– যা তৃণলতাশূন্য হয়ে থাকে, অজ্ঞতার কারণে তাতেই তুমি সন্তুষ্ট,
নশ্বর পৃথিবীর পেছনে ছুটছ অথচ ধর্মের বিষয়ে আলস্য দেখাও।

أَثَرتَ غبارًا للاناس لیحسبوا وجودی مُضِلًّا للوٰری ولیکفروا

তুমি ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছ যেন মানুষ মনে করে
আমি পথভ্রষ্টকারী, আর যেন তারা অস্বীকার করে।

فَاَلْهَمَ لی ربّی قلوبًا لیرجعوا الیّ فصرنا مرجع الخلق فانظرُ

অতএব আমার প্রভু আমার পক্ষে মানুষের হৃদয়ে এলহাম করলেন, যেন তারা আমার দিকে ফিরে আসে;
আর এর ফলে আমরা সৃষ্টির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে গেলাম, অতএব দেখো!

كبَيْتٍ اذا طاف المُلبّون حوله أُزارُ ولى تؤذى النفوس وتُنْحَرُ

যেভাবে মানুষ কাবা শরীফের তওয়াফ করে;
সেভাবে আমার যিয়ারত করা হয় আর আমার জামা'তের লোকদের আমার কারণে কষ্ট দেওয়া হয় এবং জবাই করা হয়।

تريدون توهينى و ربّى يُعزّنى تريدون تحقيرى و ربّى يُوقّرُ

তোমরা আমার লাঞ্ছনা কামনা করো অথচ আমার খোদা আমাকে সম্মানিত করেন,
তোমরা চাও আমি যেন হেয় হয়ে যাই অথচ আমার প্রভু আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

أَتبغى بمكرك ذلّتى وهلاكتى فذٰلك قصدٌ لستَ فيه مظفّرُ

তুমি কি তোমার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাকে লাঞ্ছিত ও ধ্বংস করতে চাও?
এটি এমন এক সংকল্প যাতে তুমি কখনো সফল হবে না।

فدع ايّها المجنون جهدًا مضيّعا كمثلى نخيلٌ باسق لا يُبعكَرُ

অতএব হে উন্মাদ! এমন বৃথা চেষ্টা ছেড়ে দাও,
আমার মতো ফলবান ও সুউচ্চ খেজুর গাছ কখনো কাটা হবে না।

أَتكفر بالله الجليل وقدره أَتحسب كالشيطان انّك اَقدرُ

তুমি কি মহাসম্মানিত খোদা ও তাঁর সম্মানকে অস্বীকার করো?
তুমি কি শয়তানের ন্যায় মনে করো যে, তুমি বেশি শক্তিশালী?

تسبّ وما ادرى علٰى ما تسبّنى أَتطلب ثَأْرًا ثَأْرَجدٍّ مُدمّرُ

তুমি আমাকে গালি দাও, আমি জানি না কেন?
আমি কি তোমার কোনো পিতামহকে হত্যা করেছি যার তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও?

ترانى بفضل الله مرجع عالمٍ وهل عند قفر من حمامٍ يُهدّرُ

তুমি দেখছ, খোদার কৃপায় আমি সৃষ্টির সমাগমস্থল;
একটি বিরানভূমিতে কি কবুতর সুমধুর বাক্ বাকুম শব্দে গাইতে পারে?

ولا يستوى عبد شقى ومقبل لحاك الحسيبُ ترى القبول وتنكرُ

এক গৃহীত বান্দা ও একজন দুর্ভাগা সমান হতে পারে না,
খোদা তোমাকে ধিক্কার দিন তুমি আমাকে গৃহীত হতে দেখেও অস্বীকার করো।

و انت الذى قلّبت كل جريمةٍ عَلَىَّ كَأَنّى شرّ ناسٍ وأَفجرُ

তুমি সে ব্যক্তি– যে সকল অপরাধ আমার ওপর চাপিয়েছে,
যেন আমি সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও সবচেয়ে বড় পাপাচারী মানুষ।

فمالك لا تخشى الحسيب وقهره واين تقاةٌ تدّعى يا مُزوّرُ

তোমার কি হয়েছে যে, তুমি হিসাবগ্রহণকারী খোদাকে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করো না?
হে মিথ্যাবাদী! তোমার তাকওয়া কোথায় গেল যার তুমি দাবি করো?

وانّكَ ان عاديتنى لا تضرّنى وان صِرتَ ذِئبًا او بغيظٍ تنمّرُ

তুমি আমার বিরোধিতা করলেও আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না,
তুমি নেকড়ে হয়ে যাও বা চিতা-ই হয়ে যাও না কেন।

وما الدّهر الّا تارتان فمنهما لك التارة الاولٰى باخرٰى نؤَزّرُ

কালের প্রবাহে শুধু দুটি পালা আসবে, প্রথম পালা তোমার;
আর দ্বিতীয়টি আমাদের– যাতে আমাদের সাহায্য করা হবে।

وما النفس يا مسكين الّا وديعةٌ ولا بُدّ يومًا ان تُردّ وتحضرُ

হে হতভাগা! জীবন একটি আমানত মাত্র,
একদিন তোমাকে আবশ্যকীয়ভাবে প্রত্যাবর্তিত করে উপস্থিত করা হবে।

أَتبغى الحياة ولا تريد ثمارها وما هى الّا لعنةٌ لو تفكّرُ

তুমি কি জীবন চাও আর এর ফল চাও না?
তুমি যদি চিন্তা করো তাহলে বুঝবে যে, ফল ব্যতীত জীবন এক অভিশাপের নাম।

اغرّتك دنياك الدنيّة زينةً حذارِ من الموت الذى هو يبدرُ

তোমার হীন পার্থিব জীবন নিজ চাকচিক্যের মাধ্যমে কি তোমাকে প্রতারিত করেছে?
সেই মৃত্যুকে ভয় করো যা অচিরেই তোমার ওপর আপতিত হবে।

تُريد هوانى كل يومٍ وليلة وتبغى لوجهٍ مشرقٍ لَو يُغبّرُ

তুমি সকল রাতে ও দিনে আমার লাঞ্ছনা কামনা করো,
আর তুমি চাও একটি আলোকিত চেহারা যেন ধূলিমলিন হয়ে যায়।

وانّا وأنتم لا نغيب من الذى يَرَى كلما ننوى وما نتصوّرُ

আমরা ও তোমরা সেই সত্তার দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারি না,
যিনি আমাদের সেসব নিয়তের ওপর দৃষ্টি রাখেন যা আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান এবং যা আমরা ধারণ করি।

وما المَرء اِلَّا كالحباب وجوده فان شئتَ نَم فالموت كالصبح يُسفرُ

মানুষের অস্তিত্ব কেবল একটি বুদবুদের ন্যায়,
যদি তুমি চাও ঘুমিয়ে পড়ো কিন্তু মৃত্যু প্রভাতের ন্যায় প্রকাশিত হবে।

لدى النخل والرّمان تنقف حنظلًا فايّ غبىّ منك فى الدّهر اكبرُ

তুমি খেজুর ও ডালিমকে ছেড়ে হানযাল* সংগ্রহ করছ,
অতএব তোমার চেয়ে বড়ো দুর্ভাগা আর কে হবে?

و اين ضياء الصدق ان كنت صادقًا وكل صدوقٍ بالعلامات يظهرُ

তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে সত্যের জ্যোতি কোথায়?
প্রত্যেক সত্যবাদীকে লক্ষণাবলির মাধ্যমে চেনা যায়।

اتؤذى عباد الله يا عابد الهَوَى ولا تتّقى ربًّا عليمًا وتجسرُ

হে কামনা-বাসনার পূজারি! তুমি কি খোদার বান্দাদের কষ্ট দাও?
আর সর্বজ্ঞানী খোদাকে ভয় করো না এবং ধৃষ্টতা দেখাও।

---

* **টীকাঃ** একপ্রকার তিতা ফল। –অনুবাদক

اولئك قومٌ قد تولّى امورهم قديرٌ يُواليهم ويهدى وينصرُ

এরা এমন এক জাতি যাদের কাজের তত্ত্বাবধায়ক হলেন
একজন সর্বশক্তিমান– যিনি তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন, তাদের পথপ্রদর্শন করেন ও তাদের সাহায্য করেন।

وتالله للأيّام دَورٌ ونوبةٌ فجئنا بأيّام الهدى ونُذكّرُ

খোদার কসম! বিশেষ দিনের জন্য বিশেষ যুগ ও পালা নির্ধারিত থাকে;
অতএব আমরা হিদায়াতের যুগে এসেছি এবং হিদায়াতের পথ স্মরণ করাই।

ترٰى بدعات الغىّ والنَقْعَ ساطعًا وما انا الّا غيث فضلٍ فأَمطرُ

তুমি ভ্রষ্টতায় ঠেলে দেবার মতো বিদাত ও উড়ন্ত ধুলাবালিকে দেখতে পাও,
আর আমি হলাম খোদার বর্ষণশীল কৃপাবৃষ্টি।

ولستُ بفظٍّ كاهرٍ غير انّنى إذا استنفر الاعداءُ بالكَهرِ أَنفِرُ

আর আমি রূঢ় ও দুরাচারী নই,
কিন্তু শত্রু যখন তিক্ততা প্রদর্শনপূর্বক আমাকে ঘৃণা করে তখন আমি ঘৃণা করি।

رأينا الأَعاصير الشديدة والأَذٰى وصرنا كوحشٍ عند قومٍ يُكَفّرُ

আমরা কঠিন ঝঞ্ঝাবায়ু ও দুঃখ দেখেছি,
আর আমরা কাফিরদের দৃষ্টিতে বন্য প্রাণীদের ন্যায় গণ্য হয়েছি।

وما نحذر الأَمر الذى هو واقع من الله مولانا ولو كان خنجرُ

আর আমরা আমাদের খোদার পক্ষ থেকে যা আসার থাকে তাতে শঙ্কিত হই না,
এমনকি তা খঞ্জরই হোক না কেন।

كفى الله علمًا بالعباد وسِرّهم فلا تقف ظنًّا لستَ فيه تبصّرُ

বান্দা ও তার গোপন বিষয়াদি খোদার বিশেষভাবে জানা আছে,
অতএব তুমি এমন ধারণার অনুসরণ কোরো না, যা সম্পর্কে তোমার কোনো অন্তর্দৃষ্টি নেই।

وما كنتَ فى ايذاء نفسى مُقصّرًا تمنّيتَ عند جدارنا لو تسوّرُ

আমাকে কষ্ট দিতে তুমি কোনো ত্রুটি করো নি,
তুমি আমার দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে তা টপকানোর অভিসন্ধি করেছ।

ووالله اِن اُجعَل عليك مسلّطًا فاِنّ يدِى عمّا يجازيك تُقصِرُ

খোদার কসম! যদি আমাকে তোমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়,
তাহলে তোমাকে শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে আমি কোমলতা প্রদর্শন করব।

ووالله لى فى باطن القلب مُضمَرٌ سريرة اِشفاق ولو انت تُنكِرُ

খোদার কসম! আমার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছে
সহানুভূতির বৈশিষ্ট্য, তুমি তা অস্বীকারই করো না কেন!

أَتَتْنِىْ أمورٌ منك قد شَقّ وقعها علىّ ولا كالسّيف بل هى أَبهرُ

তোমার কিছু কথা আমার কাছে পৌঁছেছে যা আমার জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল,
যা তরবারির মতো নয়, বরং তীক্ষ্ণতার দিক থেকে তার চেয়েও প্রখর।

وما كان لى ان اترك الحق خيفةً انا المنذر العُريان لِلّٰه اُنذرُ

আমি এমন নই যে, ভয়ের কারণে সত্য পরিত্যাগ করব,
আমি প্রকাশ্য সতর্ককারী আর শুধু খোদার খাতিরে সতর্ক করি।

وان كنت تزرينا فنبغى لك الهُدٰى صبرنا وان تُغرى العدا او تهتّرُ

তুমি আমাদের দুর্বলতা সন্ধান করলেও আমরা তোমার হিদায়াত চাই,
তুমি শত্রুকে আমাদের বিরুদ্ধে উসকে দাও বা আমাদের অসম্মানই করো।

وان كنت منّى تشتكى فى مقالةٍ فما هو اِلّا دون سيفٍ تُشهّرُ

তুমি যদি আমার কোনো কথায় মনে কষ্ট পেয়ে থাকো,
তাহলে তা সেই তরবারির চেয়ে ধারালো নয় যা তুমি চালাচ্ছো।

فلا تجز عَن من كلمةٍ قلتَ ضعفها وانّك للإيذاء بالسوء تجهرُ

অতএব এমন কথা শুনে হা-হুতাশ কোরো না যার দ্বিগুন তুমি নিজেও বলেছ,
তুমি কষ্ট দেবার জন্য নগ্নভাবে কাজ করো।

اضيف الينا مِن عماياتِ قومنا فساد وكفر وافتراءٌ مُجعثرُ

আমাদের প্রতি জাতির অন্ধত্বের কারণে
স্তূপীকৃত একটি নৈরাজ্য, কুফরী ও মিথ্যা রচনা আরোপ করা হয়েছে।

كَأَنَّا جعلنا عادةً كل ليلةٍ نُرقّع ثوب الإفتراء ونَنشرُ

যেন আমরা প্রত্যেক রাতে
মিথ্যা রচনা করে এরপর তা ছড়িয়ে দেবার অভ্যাস রপ্ত করে রেখেছি।

صبرنا علٰى إيذاءهم وعُواءهم وكلَّ خفيٍّ فى العواقب يظهرُ

আমরা তাদের দেওয়া কষ্টে ও অপলাপে ধৈর্য ধরেছি,
সকল গোপন কথা অবশেষে প্রকাশ পেয়ে যায়।

عجبتُ لِأَعْدَائِى يصولون كلهم ولو كان منهم جاهلٌ أَوْ مزوّرُ

শত্রুদের আচরণে আমি আশ্চর্য হই, তারা সবাই আমার ওপর হামলা করছে;
যদিও তাদের লোকেরা অজ্ঞ এবং সাজিয়ে মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত।

وهل يصقل الإيمان او يكشف العمٰى أَقَاوِيلُ قومٍ ليس معهم تطهّرُ

ঈমানে কি ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করতে পারে বা অন্ধত্ব দূর করতে পারে,
এমন মানুষের কথা– যাদের মাঝে পবিত্রতা নেই?

يفرّون منّى والظنونُ تعفّنت وما أَن أرى أهل النهٰى يستنفرُ

তারা আমার থেকে দূরে পালায় অথচ তাদের কুধারণার দুর্গন্ধ বের হচ্ছে,
আর আমি বুদ্ধিমানদের আমাকে ঘৃণা করতে দেখি না।

واوذِيتُ من عُمى ولكن كمثلهم تعامٰى عنادًا من رأيناه ينظرُ

আমি অন্ধদের হাতে দুঃখ পেয়েছি কিন্তু তাদের ন্যায়
সে ব্যক্তিও অন্ধ সেজেছে যার সম্পর্কে আমরা জানি যে, সে অন্ধ নয়।

ترى الأرض والاموال مبلغ هَمِّهم وزرعًا ودين الله نبتٌ مُشَرشَرُ

তুমি দেখবে, তাদের পরম চাওয়া-পাওয়া হলো এ জায়গা-জমি, ধনসম্পদ
এবং খেতখামার;
খোদার ধর্ম সেই চারাগাছের মতো হয়ে গিয়েছে যাকে ওপর থেকে গবাদি পশু
খেয়ে ফেলেছে।

وتدرى اليهودَ وما رؤا فى مآلهم كذالك فيهم سنّةٌ لا تغيّرُ

তুমি ইহুদীদের জানো, তারা নিজেদের পরিণামের কথা ভুলে গেছে;
একইভাবে এদের ক্ষেত্রে (খোদার) যে রীতি রয়েছে তাতেও পরিবর্তন আসবে না।

أَرَى كل يومٍ فى الفجور زيادةً يقِلّ صلاح الناس والفسق يكثرُ

আমি প্রতিদিন অপকর্মের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে দেখি,
মানুষের পুণ্য কমছে আর পাপাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

أَرَى كلّهم مُستأنسين بظلمةٍ وفسقٍ وعن دار العفاف تقتروا

আমি সবাইকে দেখি অন্ধকার ও পাপাচারকে ভালোবাসছে,
আর পবিত্রতা থেকে দূরে যাচ্ছে।

شعرتُ لهم لمّا رأيت مزيةً لهم فى ضلال و اعتسافٍ تخيّروا

আমি তাদের জন্য কবিতায় এসব কথা তখন লিখলাম
যখন তাদের মাঝে ভ্রষ্টতা ও সীমাতিক্রমের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি দেখলাম।

يريدون ان اُعفٰى واُفنٰى واُبتر وما هو الّا هَرّ كلبٍ فيهطرُ

তারা চায় আমাকে যেন মিটিয়ে দেওয়া হয়, নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়
এবং কর্তিত করা হয়,
কিন্তু এটি কেবল এক কুকুরের ঘেউ ঘেউ– যাকে অবশেষে ধ্বংস করা হয়।

ومن كان نجمًا كيف يخفٰى بريقه ومن صار بدرًا لا محالة يبهرُ

যে নক্ষত্র– তার আলো কীভাবে গোপন থাকতে পারে?
যে পূর্ণ চন্দ্র হয়ে গেছে, সে অবশ্যই জয়যুক্ত হবে।

و انّى ببرهانٍ قوىٍّ دعوتُهم وانّى من الرحمٰن حَكَمٌ مُغَذْمِرُ

আর আমি একটি শক্তিশালী যুক্তির ওপর নির্ভর করে তাদের ডেকেছি,
আর আমি খোদার পক্ষ থেকে মতভেদের মীমাংসাকারী হয়ে এসেছি।

وقد جئتُ فی بدر المئین لیعلموا کما لی ونوری ثم هم لم یَبْصُرُوا

আর আমি তাদের কাছে চতুর্দশ শতাব্দীতে এসেছি যা সব শতাব্দীর জন্য পূর্ণচন্দ্র,
যেন তারা আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও আমার জ্যোতি চিনতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা দেখে না।

أَلالَیت شعری هل رؤا من تجسّسٍ من الکذب فی امری فکیف تصوّر

হায় তারা যদি বুঝত! তারা কি যাচাইয়ের পর আমার কাজে কোনো মিথ্যা প্রমাণ করেছে?
অতএব তারা কীভাবে এমন ধারণা করল?

وإنّ الوَرَی من کلّ فجٍ یجیئنی ویسعٰی إلینا کلّ من کان یُبصرُ

নিশ্চয় সৃষ্টি সকল দিক থেকে আমার কাছে আসছে,
আর যাদের দেখার শক্তি আছে তারা সবাই আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

وکم من عبادٍ اٰثرونی بصدقهم علی النفس حتّٰی خُوّفوا ثمّ دُمّروا

অনেক এমন বান্দা আছে যারা নিষ্ঠার কারণে আমাকে নিজেদের প্রাণের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে,
যদিও তাদের ভয় দেখানো হয়েছে ও হত্যা করা হয়েছে।

ومن حزبنا عبد اللطیف فانّه أَرَی نور صدقٍ منه خلق تهکّروا

আমাদের জামা'তের আব্দুল লতীফ–
স্বীয় নিষ্ঠার জ্যোতি এমনভাবে দেখিয়েছেন যে, তাঁর নিষ্ঠায় মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়েছে।*

---

* **টীকাঃ** আবদুল লতীফ, যাঁর কথা কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি সাহেবযাদা মৌলবি আবদুল লতীফ নামে পরিচিত এবং কাবুল দেশে তাঁকে শাহজাদা মৌলবি আবদুল লতীফও বলা হয়। তিনি একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রধান এবং জ্ঞান, গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রায় পঞ্চাশ হাজার অনুসারী, ছাত্র ও মুরিদ ছিল। সেই দেশে মৌলবি সাহেবের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে হাদীসশাস্ত্রের বীজ বপন ও প্রচার-প্রসার হয়েছিল। এত জ্ঞান, গুণ ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও, যে-কারণে তিনি সেসব দেশে অতুলনীয়

جزى الله عنّادائمًا ذٰلكَ الفتٰى قضٰى نحبه لِلّٰه فاذكر وفكّرُ

খোদা এই যুবককে আমাদের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করুন,
তিনি খোদার পথে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, অতএব সে ঘটনা মনে
করো ও চিন্তা করো।

*** চলমান টীকাঃ** গণ্য হতেন, তাঁর স্বভাবে এত বিনয় ও নম্রতা ছিল যে, মনে হতো অহংকার ও গর্বের বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে জন্মই নেয় নি। প্রকৃতপক্ষে কাবুলের ভূমিতে (যা হৃদয়ের কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, অহংকার ও দম্ভের জন্য কুখ্যাত) এমন নিঃস্বার্থ, বিনয়ী ও সৎ মানুষের অস্তিত্ব অস্বাভাবিক ব্যাপার।

সংক্ষেপে, চিরন্তন সৌভাগ্য সেই প্রশংসিত মৌলবি সাহেবকে দুর্বার আকর্ষণে টেনে কাদিয়ানে নিয়ে এসেছিল। যেহেতু তিনি একজন জাগ্রত বিবেক, নিঃস্বার্থ এবং সঠিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন এবং হাদীসশাস্ত্র ও কুরআনের খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানে ধন্য ছিলেন আর আমার সম্পর্কে কয়েকটি শুভ স্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন, সেজন্য মুখ দেখার সাথে সাথেই তিনি আমাকে গ্রহণ করে নিলেন ও পূর্ণ প্রসন্নতার সাথে আমার প্রতিশ্রুত মসীহ হবার দাবিতে ঈমান আনলেন আর জীবন উৎসর্গ করার শর্তে বয়আত করলেন। প্রথম সাক্ষাতেই এমন হয়ে গেলেন যেন বহু বছর ধরে আমার সাহচর্যে ছিলেন। শুধু এতটুকুই নয়, তাঁর ওপর আল্লাহর এলহামের ধারাও সূচিত হয়ে গেল। সত্য ঘটনাবলি তাঁর ওপর অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হলো এবং তাঁর হৃদয়কে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু হতে সম্পূর্ণভাবে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দেওয়া হলো। তারপর তিনি এই স্থান থেকে তত্ত্বজ্ঞান ও খোদাপ্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে স্বদেশে ফিরে যান। তাঁর ঘরে পৌঁছার পর কাবুলের আমীরের কাছে গোপনে সংবাদ দেওয়া হয় হয় যে, তিনি কাদিয়ান গিয়েছেন আর বয়আত করে এসেছেন। এখন তিনি বিশ্বাস করেন, তিনি (মির্যা সাহেব) হলেন সেই মসীহ মওউদ ও মাহদী যার আসার কথা ছিল আর তিনিই তাঁর প্রথপ্রদর্শক। এই সংবাদের ভিত্তিতে দেশের স্বার্থের নামে মৌলবি সাহবকে গ্রেফতার করা হয় এবং একটি বড়ো শিকল তাঁর পায়ে পরিয়ে দেওয়া হয়। কাবুলের আলেমরা ফতোয়া দেয়, যদি এ ব্যক্তি তওবা না করে তাহলে সে ওয়াজেবুল কতল (বা হত্যাযোগ্য)। কাবুলের মৌলবিদের সাথে তার বিতর্ক করানো হয়। সকল বিষয়ে তিনি মৌলবিদের নির্বাক করে দেন। এরপর এই আপত্তি তোলা হয় যে, এ ব্যক্তি জিহাদে বিশ্বাস রাখে না। এ আপত্তি সত্য ছিল, কেননা এটিই আমার শিক্ষা অর্থাৎ এখন তরবারি চালানোর সময় নয়। এ যুগে জোরালো বক্তৃতা ও সমুজ্জ্বল যুক্তি-প্রমাণ আর দোয়ার মাধ্যমে জিহাদ করা উচিত। বস্তুত এই শেষ কথায় মৌলবি সাহেব অপরাধী প্রমাণিত হয়েছেন। কাবুলের আমীর বেশ কয়েকবার তাকে অনুরোধ করে বলেন, আপনি কেবল এ ব্যক্তির হাতে কৃত বয়আত থেকে বেরিয়ে আসুন, যে মসীহ মওউদ হবার দাবি করে আর যে তরবারির যুদ্ধের বিরোধী; তাহলে

عباد يكون كمُبسراتٍ وجودهم إذا ما اتوا فالغيث يأتى ويمطرُ

এরা এমন মানুষ যাদের অস্তিত্ব মৌসুমী বায়ুর মতো হয়ে থাকে,
যখন আসে তখন রহমতবারিও সাথেই আসে।

أَتَعلم اَبْدَالًا سواهم فانهم رمُوا بالحجارةِ فاستقاموا واَجمروا

তুমি কি তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো আবদাল (তথা আধ্যাত্মিক সুফি-সাধক)-কে জানো?
কেননা তারা এমন মানুষ যাদেরকে লক্ষ করে পাথর মারা হয়েছে, কিন্তু তারা অবিচল ছিলেন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তায় এতটুকুও চিড় ধরে নি।

تجلّى عليهم ربهم ربُّ ما بدا فَفَرّوا إلى النور القديم واَبدروا

তাদের প্রভু তাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন যিনি পুরো সৃষ্টির খোদা,
অতএব তারা চিরন্তন জ্যোতির দিকে দ্রুত ছোটেন।

تَرَاهُمْ تفيض دموعهم من صَبابةٍ وفى القلب نيرانٌ ورأسٌ مُغْبَرُ

তুমি দেখবে, ঐশী ভালোবাসার আতিশয্যে তাদের অশ্রু বহমান,
আর তাদের হৃদয়ে নানা প্রকার অগ্নি বিরাজমান আর মাথা হলো ধূলিমলিন।

انارت بنور الاتقاءِ وجوههم فتعرفهم عيناك لو لا التكدرُ

তাকওয়ার জ্যোতিতে তাদের চেহারা উজ্জ্বল,
যদি ঘোলাটে না হয় তাহলে তোমার চোখ তাদের শনাক্ত করতে সক্ষম হবে।

*** চলমান টীকাঃ** আপনি নির্দোষ খালাস পেয়ে যাবেন বরং আপনাকে আরো বেশি সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রদান করা হবে; কিন্তু মৌলবি সাহেব মানেন নি, বরং বলেন– আজ আমি আমার জীবনের ওপর ঈমানকে অগ্রগণ্য করলাম আর আমি জানি, যার হাতে আমি বয়আত করেছি, তিনি সত্যবাদী এবং পৃথিবীর বুকে তাঁর মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তাঁর ঈমান হতে তওবা করা বা ঈমান বিসর্জন দেবার বিষয়ে যখন তারা নিরাশ হলো তখন বড়ো নির্দয়ভাবে তাঁকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করে, অদ্যাবধি তাঁর কবর হতে কস্তুরীর সৌরভ আসে। খোদা তাঁর প্রতি কৃপা করুন এবং তাকে নিজ জান্নাতে স্থান দিন। আটক করার পর তাঁকে বলা হয়, আপনার স্ত্রী-সন্তানদের সাথে সাক্ষাৎ করে নিন। তিনি উত্তর দেন, আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর সম্পর্কে একটি বিশেষ পুস্তিকা ছাপা হয়েছে। খোদা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। –লেখক

يُمِيلُون قلب الخلق نحو نفوسهم بناظرةٍ تصبو إليها الخواطرُ

তারা মানুষের হৃদয় নিজেদের প্রতি সেই দৃষ্টির কল্যাণে আকর্ষণ করেন–
যার দিকে হৃদয় আকৃষ্ট হয়ে থাকে;

كانّ حيات القومِ تحت حياتهم بهم زرع دين الله يبدو ويَجدرُ

যেন জাতির জীবন তাদের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত,
তাদের কল্যাণে ধর্মের ফসল উদ্‌গত হয় ও সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে।

وان كنت تبغى زَورهم زُربخلّة وجوهٌ من الاغيار تخفٰى وتُستترُ

তুমি যদি তাদের দেখতে চাও তাহলে বন্ধুত্বের চোখে দেখো,
সেগুলো এমন চেহারা যা অন্যদের কাছে গোপন ও প্রচ্ছন্ন রাখা হয়।

كذٰلك طلعت شمسنا فى ستارةٍ فقلتُ امكثى حتّٰى اُنِيرَ وابهرُ

এভাবে আমাদের সূর্য পর্দার অন্তরালে উদিত হলো,
আমি বললাম থামো, যতক্ষণ না আমি আলোকিত হয়ে যাই আর অন্যান্য
আলোর ওপর জয়যুক্ত হয়ে যাই।

ولسنا بمستورٍ علٰى عين طالب يرانا الذى يأتى ويرنو وينظرُ

আর অণুসন্ধানীর চোখ থেকে আমরা লুক্কায়িত নই,
যে আসবে ও স্থায়ীভাবে দৃষ্টি রাখবে, সে আমাদের দেখতে পাবে।

ولا جبَر اِن تكفر وان كنت مؤمنًا فحسبك ما قال الكتاب المطهرُ

তুমি যদি অস্বীকার করো তাহলে তোমাকে বাধ্য করা হবে না,
যদি তুমি ঈমান আনো তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট।

ووالله لا انسٰى همومًا لقيتُها بتكفير قومى حين اٰذوا وكَفّروا

আর খোদার কসম! আমার জাতি আমাকে
কাফির আখ্যা দিয়ে যে দুঃখ দিয়েছে,
তা আমি ভুলব না।

علٰى صادقٍ فَأسٌ من الظلم وَالْاَذٰى فكيف كذوبٌ من يد الله يَستترُ

সত্যবাদীর ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের কুঠার চলছে,
অতএব মিথ্যাবাদী কীভাবে খোদার হাত থেকে পালাতে পারে?

علٰى موت عيسٰى صار قومى كحيّةٍ وكم من سمومٍ اخرجوها واظهروا

ঈসার মৃত্যুর বিষয়ে আমার জাতি সাপের ন্যায় হয়ে গেছে,
আর নানা প্রকার বিষোদগার করেছে ও বিষ ছড়িয়েছে।

توفّى عيسٰى ثم بَعدَ وفاتِهٖ عرا الموتُ عقل جماعتٍ ما تفكّروا

ঈসা মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু তার মৃত্যুর পর এ জাতির বিবেকের ওপর মৃত্যু
এসে গেছে– যারা একটুও চিন্তা করল না।

ولو انّ انسانًا يطير إلى السّما لكان رسول الله اولٰى واَجدرُ

যদি কোনো মানুষ আকাশ পানে উড়তে পারত,
তাহলে এ কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি যোগ্য ছিলেন আমাদের রসূল (সা.)।

اتترك قول الله قولا مصرحًا وإنّ كتاب الله اَهدٰى وَاَنورُ

তুমি কি খোদার স্পষ্ট কথা পরিত্যাগ করবে?
অথচ খোদার বাণী বেশি সঠিক ও অনেক বেশি আলোকিত।

فدَع ذكر اخبارٍ تُخالف قوله وايّ حديثٍ بعده يُستَأثرُ

অতএব সেসব খবরের কথা বলা ছেড়ে দাও যা তাঁর কথার বিরোধিতা করে,
খোদার বাণী ছেড়ে কোন কথা প্রাধান্য লাভের যোগ্য?

ودع عنك كبرًا مهلكًا وَاتَّقِ الرَّدَى وإنّ تقاة المرء تنجى وتثمرُ

ধ্বংসকারী অহংকার পরিত্যাগ করো ও ধ্বংস এড়িয়ে চলো,
নিশ্চয় মানুষের তাকওয়াই মুক্তি দেয় ও ফল বহন করে।

أَتصبح كالخفّاش اَعمٰى وما تَرٰى وامّا لدى الليل البهيم فتُبصرُ

তুমি কি প্রভাতে বাদুড়ের ন্যায় অন্ধ হয়ে যাও যে, কিছু দেখতে পাও না?
আর অন্ধকার রাতে দৃষ্টিশক্তি লাভ করো?

إذا ما وجدت الحق بعد ضلالةٍ فما البر اِلَّا ترك ما كنت تؤثرُ

যেহেতু তুমি ভ্রষ্টতার পর সত্য পেয়ে গেছ,
তাই পূর্বে যা তুমি অবলম্বন করে রেখেছিলে তা ত্যাগের মাঝেই রয়েছে পুণ্য।

ولا تبغ حَرَزات النفوس وهتكهم وهل انت اِلَّا دودةٌ يا مزّوِرُ

তুমি মনোনীত লোকদের মৃত্যু ও অসম্মান কামনা কোরো না,
হে মিথ্যাবাদী! তুমি কেবল একটি কীট ছাড়া আর কিছু নও।

ولو انّ قومى آنسونى لَأَفْلَحُوا مِنَ الذُلّ فى الدّنيا وفى الدّين عُزّروا

আমার জাতি যদি আমাকে জানত তাহলে দুনিয়ার লাঞ্ছনা হতে মুক্তি লাভ করত,
আর পরকালে তাদের সম্মান দেওয়া হতো।

ولكن قلوبٌ باليهود تشابهت وهٰذا هو النبأ الذى جآء فاذكروا

কিন্তু কিছু হৃদয় ইহুদী সদৃশ হয়ে গেছে,
এটি সেই সংবাদ যা এসে গেছে, তাই স্মরণ করো।

فصِرْتُ لهم عيسٰى إذا ما تهوّدوا وهٰذا كفٰى مِنّى لقومٍ تفكّروا

অতএব যখন তারা ইহুদী হয়ে গেল তখন আমি তাদের জন্য ঈসা হয়ে গেলাম,
আমার পক্ষ থেকে এতটুকু বিবৃতিই তাদের জন্য যথেষ্ট যারা চিন্তা করে।

وقد تَمّ وَعْدُ نبيّنا فى حديثهٖ إذا جاءهم منهم اِمَامٌ يُذَكِّرُ

নিশ্চয় হাদীসে আমাদের নবী (সা.)-এর যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা পূর্ণতা লাভ করেছে,
যখন মুসলমানদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন ইমাম এসেছেন যিনি নসীহত করেন এবং স্মরণ করান।

اباروا عوام الناس من سمّ منطقٍ وجاءوا ببهتان علينا وزَوّروا

তারা কথার বিষ দ্বারা মানুষকে ধ্বংস করেছে,
আর আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছে এবং মিথ্যা বলেছে।

يقولون ما لا يفعلون خيانَةً يخالف فى الحالاتِ بيتٌ ومنبرُ

তারা অসৎ পন্থা অবলম্বন করে, তা বলে যা তারা করে না;
অবস্থার দিক থেকে তাদের ঘর ও বক্তৃতার মিম্বরের মাঝে অনেক বড়ো পার্থক্য রয়েছে।

الا رُبّ قوّالٍ يُسِرّك قوله ولو تنظرنّ الوجه ساءك منظرُ

অনেক বড়ো বড়ো বুলি আওড়ানোর লোক আছে যাদের কথা তোমার কাছে খুব ভালো লাগবে,
কিন্তু যখন তুমি তাদের চেহারার প্রতি তাকাবে তখন তোমার তা খুব মন্দ মনে হবে।

ترى العين ما هو ظاهرٌ غير كاتم وما تنظر العينان ما هو يُستترُ

চোখ কেবল তা দেখে যা প্রকাশ্য, গুপ্ত নয়–
আর যা পর্দাবৃত বিষয়, চোখ তা দেখতে সক্ষম নয়।

وفيهم وان قيل اهتدينا غواية وكبر بهٖ ينمو الضلال ويثمرُ

আমরা হিদায়াত পেয়ে গিয়েছি বললেও তাদের মাঝে একপ্রকার ভ্রষ্টতা বিদ্যমান,
আর অহংকার বিদ্যমান যার মাধ্যমে ভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পায় ও বিস্তার লাভ করে।

اناسٌ اضاعوا دينهم مِن رعونة وأَهواءَ دنياهم على الدينِ اٰثروا

তারা এমন মানুষ যারা অহংকার করে নিজেদের ধর্মকে ধ্বংস করেছে,
আর জাগতিক কামনা-বাসনাকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে।

تألّم قلبى من أعاصير جهلهم ففى الصدر حُزّازٌ وفى القلب خنجرُ

তাদের অজ্ঞতার ঝড়ের কারণে আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়েছে,
অতএব বক্ষে রয়েছে এক যন্ত্রণা এবং হৃদয়ে চলছে এক খঞ্জর।

لهم سَلَفٌ قد اخطأوا فى بيانهم فهم اٰثروا آثارهم وتخيّروا

তাদের এমন পূর্বপুরুষ রয়েছে যারা নিজেদের বিবৃতিতে ভুল করেছে,
তবুও তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ও অবলম্বন করেছে।

هممنا بخيرٍ ثم ذُقنا جفاءهم وجئنا بعدلٍ ثم للظلم شَمّروا

আমরা পুণ্যকর্ম করার সংকল্প করেও তাদের অন্যায়েরই শিকার হয়েছি,
আমরা ন্যায়বিচার করতে এসেছি কিন্তু তারা অত্যাচার আরম্ভ করছে।

وجدنا الافاعِیّ المبیدة دونهم ولا مثلهم شرّ العقارب تابرُ

আমরা প্রাণহারী সাপকেও তাদের চেয়ে কম বিপজ্জনক পেয়েছি,
আর সবচেয়ে বিষাক্ত বিচ্ছুও তাদের মতো হুল ফোঁটায় না।

ومَا نحن اِلَّا کالفتیل مذلّة باعینهم بل منه ادنٰی واحقرُ

তাদের দৃষ্টিতে আমরা খেজুর বীজের পাতলা ঝিল্লির ন্যায় তুচ্ছ,
বরং আমরা আরো তুচ্ছ আরো হেয়।

فنشکوا إلی اللّٰه القدیر تضرّعًا ومَن مثلُه عند المصائب ینصرُ

অতএব আমরা সর্বশক্তিমান খোদার কাছে কাকুতিমিনতির সাথে অভিযোগ নিয়ে যাই,
আর বিপদে তাঁর ন্যায় কে-ইবা সাহায্য করতে পারে?

رمٰی کل من عادٰی الیّ سهامه فَأَصبحت أمْشی کالوحید واُکفَرُ

সকল শত্রু আমার প্রতি তাদের তির নিক্ষেপ করেছে,
অতএব আমি একাই থেকে গেছি আর কাফির আখ্যায়িত হয়েছি।

حُسینٌ دفاه القوم فی دشت کربلا وکَلّمنی ظلمًا حُسینٌ اٰخرُ

একজন হোসাইন তিনি ছিলেন যাঁকে শত্রুরা কারবালার প্রান্তরে হত্যা করেছে,
আরেক হোসাইন সে– যে আমাকে নিছক অন্যায়ভাবে ক্ষত-বিক্ষত করেছে।

ایا راشقی قد کنتَ تمدح منطقی وتُثنی علیّ بألفةٍ وتُوقِّرُ

হে আমার প্রতি তির নিক্ষেপকারী! তুমি আমার যুক্তির প্রশংসা করতে,
তুমি ভালোবাসার সাথে আমার প্রশংসা করতে আর আমাকে সম্মান করতে।

ولِلّٰه دَرّك حین قَرّظتَ مخلصًا کتابی وصرتَ لکلِّ ضالٍّ مُخفّرُ

তুমি কত আন্তরিকতার সাথে আমার পুস্তক বারাহীনে আহমদীয়ার সমালোচনা লিখেছ,
আর সকল ভ্রষ্ট লোকের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে গিয়েছিলে।

وانت الذی قد قال فی تقریظهٖ کمثل المؤلف لیس فینا غضنفرُ

তুমি সেই ব্যক্তি– যে নিজ সমালোচনাতে লিখেছিলে,
এই লেখকের ন্যায় ধর্মের পথে আমাদের মাঝে কোনো সিংহ নেই।

عرفتَ مقامی ثم أَنکرتَ مُدبرًا فما الجهل بعد العلم ان کنتَ تشعرُ

তুমি আমার পদমর্যাদা শনাক্ত করেছ, কিন্তু জেনেশুনে অস্বীকার করেছ, অতএব এটি কেমন অজ্ঞতা যা জ্ঞান অর্জনের পর জেনেশুনে প্রকাশ করা হলো।

کمثلك مع علمٍ بحالی۔ وفطنةٍ عجبتُ لهُ یبغی الهدٰی ثم یاطرُ

অবাক হতে হয়, আমার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তোমার মতো বুদ্ধিমান মানুষ
হিদায়াতের পথে এসে আবার সঠিক পথ পরিত্যাগ করে!*

قَطعتَ ودادًا قد غرسناه فی الصبا ولیس فؤادی فی الوداد یقصِّرُ

তুমি সেই বন্ধুত্বকে ছিন্ন করেছ যার চারা আমরা শৈশবে রোপণ করেছিলাম, কিন্তু আমার হৃদয় বন্ধুত্ব রক্ষায় কোনো ত্রুটি করে নি।

علٰی غیر شیءٍ قُلتَ ما قلت عُجلةً
وَ وَاللّٰہ انّی صادقٌ لا اُزوّرُ

তুমি তড়িঘড়ি করে যা বলেছ তা কোনো যুক্তির ভিত্তিতে বলো নি, আর খোদার কসম! আমি সত্যবাদী, আমি মিথ্যা বলি নি।



* **টীকাঃ** মৌলবি আবু সাঈদ মুহাম্মদ হোসেন সাহেব নিজের পত্রিকা 'ইশায়াতুস সুন্নাহ'-তে যেখানে আমার সম্পর্কে একথা স্বীকার করেন যে, আমি এ যুগে ধর্মের কাজে অনন্য এবং ইসলাম ধর্মের জন্য আত্মনিবেদিত আর খোদার পথে এমন এক বীর যার কোনো বিকল্প নেই; সেখানে নিজের সম্পর্কে স্বীকার করেছেন যে, এ ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। –লেখক

মৌলবি সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের* কতক সন্দেহ-সংশয়ের নিরসন

তাঁর প্রশ্নঃ

مَاقَتَلُوْهُ وَمَاصَلَبُوْهُ -সম্পর্কে এ সন্দেহ রয়েই গেল যে, مَاصَلَبُوْهُ শব্দের অর্থ যদি এটি হয়, ইহুদীরা হযরত ঈসাকে ক্রুশে হত্যা করে নি, তাহলে এমন ক্ষেত্রে مَاقَتَلُوْهُ যা এর পূর্বে রয়েছে, সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন প্রমাণিত হয়। যদি এটি বলা হয় যে, مَاقَتَلُوْهُ যোগ করার কারণ হলো তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর পা ভাঙা হয় নি আর একথাটি সঠিক হিসেবে মেনে নেওয়া হয় তাহলে مَاقَتَلُوْهُ শব্দ مَاصَلَبُوْهُ শব্দের পরে থাকা উচিত ছিল, কেননা পা ক্রুশ থেকে নামানোর পর ভাঙা হয়। তাই প্রশ্ন হলো, সালাবুহু-র পূর্বে কাতালুহু রাখার হেতু কী থাকতে পারে? এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করুন।

আমার উত্তরঃ

স্মরণ রাখতে হবে, কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতে উপরিউক্ত বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

وَّ قَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مَا قَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَ مَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

(আন-নিসা: ১৫৮-১৫৯)

অনুবাদ: আর তাদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) একথা বলা যে, আমরা মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম রসূলুল্লাহ-কে হত্যা করেছি; অথচ তারা তাঁকে হত্যাও করে নি আর ক্রুশেও মারতে পারে নি, বরং এ বিষয়টি তাদের জন্য সন্দেহযুক্ত হয়ে

* **টীকা:** এই মৌলবি সাহেব বঙ্গদেশের ত্রিপুরা রাজ্যের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্কুলের শিক্ষক এবং কাযী। –লেখক

যায়। যারা ঈসা সম্পর্কে মতভেদ রাখে (অর্থাৎ খ্রিষ্টানরা বলে, ঈসাকে জীবিত আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আর ইহুদীরা বলে, আমরা তাঁকে হত্যা করেছি) এ উভয় দলই সন্দেহে নিপতিত। তাদের বাস্তব বিষয়ের কোনো জ্ঞানই নেই, তারা সঠিক জ্ঞান রাখে না আর তারা নিছক ধারণার অনুসরণ করে। অর্থাৎ ঈসা আকাশেও যায় নি, যেটি খ্রিষ্টানদের ধারণা আর ইহুদীদের হাতে নিহতও হয় নি, যেটি ইহুদীদের ধারণা রয়েছে। বরং একটি তৃতীয় কথাই সঠিক অর্থাৎ তিনি রক্ষা পেয়ে অন্য একটি দেশে চলে গিয়েছেন। পক্ষান্তরে স্বয়ং ইহুদীরাও বিশ্বাস করে না যে, তারা তাঁকে হত্যা করেছে। প্রকৃত বিষয় হলো, খোদা তা'লা তাঁকে নিজের দিকে নিয়ে গেছেন। আর খোদা মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়।*

এটি জানা কথা, এ আয়াতের প্রারম্ভে এ কথাটি ইহুদীদের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে,

اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ

অর্থাৎ আমরা মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়মকে হত্যা করেছি। অতএব যে উক্তি খোদা তা'লা ইহদীদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রথমে সেটি খণ্ডন করা আবশ্যক ছিল। এ কারণে খোদা তা'লা কাতালু শব্দ সালাবু-র পূর্বে রেখেছেন, কেননা এখানে ইহুদীদের পক্ষ থেকে যে দাবির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো,

اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ

এরপর এটিও জানা থাকা উচিত যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে অর্থাৎ হযরত ঈসাকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে ইহুদীদের মাঝে দুই প্রকার বিশ্বাস চলে আসছে। একদল বলে, তাঁকে

---

* **টীকাঃ** ইহুদীদের কথা হলো আমরা ঈসাকে হত্যা করেছি। ইহুদীদের এ উক্তির পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মূলত এটি বোঝানো যে, ঈসার মুমিনদের ন্যায় রাফা হয় নি কেননা তওরাতে লেখা আছে, নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার নিহত হয়। এখানে খোদা এর উত্তর প্রদান করেছেন যে, ঈসা নিহত হন নি, বরং বিশ্বাসীদের ন্যায় খোদার পানে তিনি উত্থিত হয়েছেন। –লেখক

প্রথমে তরবারি দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল আর এরপর মানুষের খাতিরে শিক্ষণীয় নির্দশনে পরিণত করার জন্য ক্রুশে বা গাছে ঝুলানো হয়েছে। দ্বিতীয় দল বলে, তাঁকে ক্রুশে ঝুলানো হয়েছে আর ক্রুশে দেবার পর তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এ উভয় দল মহানবী (সা.)-এর সময় বিদ্যমান ছিল আর এখনও তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। যেহেতু তাঁর হত্যার মাধ্যম সম্পর্কে ইহুদীদের মাঝে মতভেদ ছিল, কেউ তাঁর মৃত্যুর মাধ্যম প্রথমে হত্যা আখ্যা দিয়ে এরপর ক্রুশে দেওয়ায় বিশ্বাসী ছিল আর অন্যরা হত্যার পূর্বে ক্রুশে ঝুলানোর বিষয়টি হয়েছে বলে মনে করত। তাই খোদা তা'লা উভয় দলের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডন করতে চেয়েছেন; কিন্তু যে ফিরকার খণ্ডনের জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তারা তারাই যারা ক্রুশীয় ঘটনার পূর্বে হত্যা করার বিশ্বাস রাখতো। এ কারণে প্রথমেই হত্যার ধারণার নিরসন করে দেওয়া হয়েছে আর ক্রুশে মারার ধারণার খণ্ডন পরে করা হয়েছে।

পরিতাপের বিষয় হলো, এসব সন্দেহ হৃদয়ে দানা বাধার কারণ হলো, বেশিরভাগ মুসলমান ইহুদীদের বিভিন্ন দল এবং তাদের বিশ্বাসের বিষয়ে পুরোপুরি অবগত নয় আর খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসেরও পুরো জ্ঞান রাখে না। তাই আমি এখানে ইহুদীদের একটি পুরোনো গ্রন্থ থেকে হযরত ঈসাকে হত্যা করা সম্পর্কে বর্ণনা করতে চাই যা আজ থেকে প্রায় ১৯০০ বছর পূর্বে লেখা হয়েছে আর আমাদের কাছে এখানে সংরক্ষিত আছে। স্মর্তব্য যে, এ গ্রন্থের নাম হলো 'তওলীদূতে ইয়াশু', যা কতক ইহুদী আলেম কর্তৃক লিখিত একটি প্রাচীন হিব্রু গ্রন্থ। যেমন- এ বইয়ের ৩১ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 'এরপর তারা (অর্থাৎ ইহুদীরা) হযরত ঈসাকে বাইরে ময়দানে তথা শাস্তি প্রদানের জায়গায় নিয়ে যায় এবং তাঁকে পাথর মেরে হত্যা করে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে তারা কাঠে ঝুলিয়ে দেয়...' যেন তাঁর শবদেহ পশু খেয়ে ফেলতে পারে আর এভাবে যেন লাশের অবমাননা হয়। ইনজীলের একথায়ও এ বিষয়ের সমর্থন দেখা যায় যেখানে লেখা রয়েছে যে, 'ঈসা– যাকে তোমরা হত্যা করে কাঠে ঝুলিয়েছ'। প্রেরিতদের কার্য ৫: ৩০ দেখুন।*

---

* **টীকা:** আজও এমন ইহুদী ওলামা বিদ্যমান, আর মোম্বাই এবং কোলকাতায়ও যাদের দেখা যায়, তারা হযরত ঈসা আকাশে চলে গেছেন মর্মে খ্রিষ্টানদের কথায় হাসিবিদ্রুপ করে। তারা বলে, এরা কত নির্বোধ যারা আসল কথাটা বুঝেই নি। কেননা প্রাচীন

ইনজীলের এ বাক্য থেকে বুঝা যায় যে, প্রথমে হত্যা করেছে, এরপর কাঠে ঝুলিয়েছে। এটি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, যেমনটি কিনা পাদরিদের অভ্যাস, ইনজীলের কোনো কোনো উর্দু সংস্করণে এ বাক্যটি পরিবর্তন করে

*** চলমান টীকাঃ** ইহুদীদের দাবি ছিল, যাকে ক্রুশে মারা হয় সে বেদীন হয়ে থাকে আর তার আত্মা ঊর্ধ্বলোকে উত্থিত হয় না। এ দাবির খণ্ডনের জন্য খ্রিষ্টানরা একথা বানিয়েছে যে, ঈসা সশরীরে আকাশে চলে গেছেন যেন ক্রুশবিদ্ধ হবার কলঙ্ক মুছে দিতে পারে। কিন্তু এ পরিকল্পনা করতে গিয়ে তারা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে, কেননা ইহুদীদের বিশ্বাস এটি নয়, যে ব্যক্তি সশরীরে আকাশে যায় না সে বেদীন ও কাফির আর তার মুক্তি লাভ হয় না। কেননা ইহুদীদের বিশ্বাস অনুসারে হযরত মূসাও সশরীরে আকাশে যান নি। ইহুদীদের যুক্তি ছিল, তওরাতের শিক্ষানুসারে যে ব্যক্তিকে কাঠে ঝুলানো হয় তার আত্মা আকাশে উত্থিত হয় না, কেননা ক্রুশ অপরাধীদের হত্যা করার মাধ্যম। অতএব খোদা এর ঊর্ধ্বে যে, একজন পবিত্র ও সঠিক পথের অনুসারী মুমিনকে ক্রুশের মাধ্যমে মৃত্যু দেবেন। অতএব তওরাতে একথাই লিখে দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি ক্রুশের মাধ্যমে নিহত হয়– সে মুমিন নয় আর তার আত্মা খোদার পানে উত্থিত হয় না অর্থাৎ খোদার দিকে রাফা হয় না। ঈসা (আ.) যেহেতু ক্রুশে নিহত হয়েছেন তাই এর মাধ্যমে ইহুদীদের কথা অনুসারে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, তিনি ঈমানদার ছিলেন না আর তার আত্মা খোদার দিকে উত্থিত হয় নি। পক্ষান্তরে একথা বলা আহাম্মকের ধারণা যে, ঈসা সশরীরে আকাশে চলে গেছেন। এমন উদ্ভট উত্তর দিলেও ইহুদীদের আপত্তি নিজের জায়গায় বলবৎ থাকে, কেননা তাদের আপত্তি আধ্যাত্মিক রাফা নিয়ে অর্থাৎ খোদার দিকে রাফা হওয়া সংক্রান্ত, দৈহিকভাবে উত্থিত হওয়া সংক্রান্ত নয়। কুরআন শরীফ যা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মতভেদের নিস্পত্তি করে থাকে, তা নিজের সিদ্ধান্তে এ রায় প্রদান করেছে যে, بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ অর্থাৎ খোদা ঈসাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। জানা কথা যে, খোদার দিকে আত্মা উত্থিত হয় দেহ নয়। খোদা এটি বলেন নি যে, بل رفعه الله الى السماء বরং বলেছেন, بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ এখানে খোদা তা'লার কাজ ছিল শুধু ইহুদীদের আপত্তি খণ্ডন করা যা নিহিত আছে আধ্যাত্মিক উন্নতি অস্বীকার করার মাঝে, এছাড়া খ্রিষ্টানদের ভ্রান্তিও দূর করা উচিত ছিল।** অতএব খোদা তা'লা এমন একটি

**** পাদটীকাঃ** যদি খোদা তা'লার এসব আয়াতে অর্থাৎ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ এ শুধু এটি বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে সশরীরে দ্বিতীয় বা চতুর্থ আকাশে পৌঁছানো হয়েছিল তাহলে আমাদের কেউ বলুক যে, মুমিনদের ন্যায় হযরত ঈসার খোদার দিকে

লিখে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন ইংরেজি ইনজীলে আজও একই বাক্য বিদ্যমান যা আমরা এখন উদ্ধৃত করেছি। যাহোক এটি প্রমাণিত যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার বিষয়ে ইহুদীদের দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যার মধ্যে

*** চলমান টীকা:** পূর্ণাঙ্গীন শব্দ ব্যবহার করেছেন যার মাধ্যমে উভয় পক্ষের ভ্রান্তি প্রমাণ করে দিয়েছেন। কেননা খোদা তা'লার উক্তি بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ শুধু এটি প্রমাণ করে না যে, খোদা তা'লার দিকে মসীহর আধ্যাত্মিক উত্থান হয়েছে, আর তিনি মুমিন বরং এটিও প্রমাণ করে যে, আকাশ পানে তার (দৈহিক) রাফা বা উত্থান হয় নি কেননা খোদা তা'লা যিনি দেহ, দিক এবং স্থানকালের ঊর্ধ্বে, তাঁর দিকে রাফা হওয়া পরিষ্কারভাবে বলছে যে, তার দৈহিক রাফা নয় বরং যেভাবে অন্য সকল মুমিনের আত্মা তাঁর দিকে যায় সেভাবেই হযরত ঈসা (আ.)-এর আত্মাও তাঁর দিকে গিয়েছে। সকল জ্ঞানী লোক জানে অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, যখন মুমিন মারা যায় তার আত্মা খোদার দিকেই যায়। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন,

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ

অর্থাৎ 'হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা তোমার প্রভুর দিকে ফিরে আসো তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আর তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট; আর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো' (আল-ফাজর: ২৮-৩১)। ইহুদীদের বিশ্বাসও এটিই ছিল যে, মুমিনদের আত্মার রাফা খোদার দিকে হয় অপরদিকে বেদীন ও কাফিরের রাফা খোদা তা'লার দিকে হয় না আর তারা হযরত ঈসাকে কাফির ও বেদীন মনে করত এ মর্মে যে,

---

**** চলমান পাদটীকা:** আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় নি মর্মে ইহুদীদের আপত্তির খণ্ডন কোন্ আয়াতে আছে? এটি বলা নাউযুবিল্লাহ কুরআন শরীফের অবমাননা যে, ইহুদীদের আপত্তি ছিল একটি আর উত্তর দেওয়া হয়েছে ভিন্ন। খোদা তা'লা যেন ইহুদীদের কথার অর্থই বুঝেন নি। ইহুদীরা এ সম্পর্কে হযরত ঈসার কাছে বিশেষ কোনো নিদর্শন দাবি করে নি। তাদের আপত্তি কেবল এটি ছিল যে, সাধারণ মুমিনদের ন্যায় তার রাফা হয় নি আর তাদের উত্তর কেবল এ ভাষায় দেওয়া উচিত ছিল যে, তার খোদার পানে রাফা হয়ে গেছে। অতএব আলোচিত আয়াতের অর্থ যদি এটি না হয় আর আকাশে উত্তোলন অর্থ হয় তাহলে এটি ইহুদীদের আপত্তির উত্তর হলো না। কুরআন সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, প্রশ্ন কিছু করা হয় উত্তর ভিন্ন কিছু দেওয়া হয়, নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসে গিয়ে ঠেঁকে। অথচ কুরআন শরীফের একটি দায়িত্ব হলো, ইহুদীদের সেসব অপবাদের নিরসন, যা তারা হযরত ঈসার প্রতি আরোপ করেছিল। সেসব অপবাদের একটি হলো, তারা হযরত ঈসার আধ্যাত্মিক রাফা অস্বীকার করত আর এভাবে তাঁকে খোদা না করুন কাফির

প্রথমত হলো, হত্যা করার পর ক্রুশবিদ্ধ করেছে। অতএব এ বিশ্বাসের খণ্ডনও আবশ্যক ছিল। আর এমন দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের কথা পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আয়াত, إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ (আন-নিসা: ১৫৮) আয়াতে। অতএব যেখানে দাবি ছিল, আমরা ঈসাকে হত্যা করেছি সেখানে প্রথমে একথার খণ্ডন আবশ্যক ছিল। কিন্তু খোদা তা'লা খণ্ডনের পূর্ণতার জন্য অন্য ফিরকারও এখানে খণ্ডন করেছেন যারা বলত, আমরা প্রথমে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছি। অতএব এর খণ্ডনের জন্য مَا صَلَبُوهُ বলেছেন। এরপর আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ

(আন-নিসা: ১৫৮)

*** চলমান টীকা:** তিনি নাকি খোদার নাম নিয়ে মিথ্যা বলেছেন আর তিনি সত্য নবী নন। তিনি যদি সত্য নবী হতেন তাহলে তাঁর আসার পূর্বে ইলিয়াস নবী পুনরায় পৃথিবীতে আসতেন! এ কারণে তারা এ বিশ্বাস রাখত আর আজও এ বিশ্বাসই লালন করে যে, হযরত ঈসার আত্মা মুমিনদের ন্যায় খোদার দিকে যায় নি বরং শয়তানের দিকে গিয়েছে; অথচ খোদা তা'লা ইহুদীদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন আর একই সাথে খ্রিষ্টানদেরও মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছেন। ইহুদীরা হযরত ঈসার প্রতি বড়ো বড়ো অপবাদ আরোপ করেছে। ইহুদীদের হাদীসগ্রন্থ তালমুদে একস্থানে লেখা রয়েছে যে, ঈসার মৃতদেহ যখন দাফন করা হয়েছে তখন ইহুদা ইস্কিরিউত নামের একজন মালি পানি আটকানোর জন্য তার লাশ কবর থেকে বের করে বাঁধ হিসেবে ব্যবহার করে। ঈসার শিষ্যরা কবর খালি দেখে হইচই আরম্ভ করে দেয় যে, তিনি সশরীরে আকাশে চলে গেছেন। তখন সেই লাশ রানী হেলেনার সামনে সবাইকে দেখানো হয় ফলে ঈসার শিষ্যরা খুবই লজ্জিত হয়। (মিথ্যাবাদীর ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত) দ্রষ্টব্য: জুইশ এনসাইক্লোপিডিয়া পৃ. ১৭২, ৭ম খণ্ড। এই এনসাইক্লোপিডিয়াটি ইহুদীদের। –লেখক

**** চলমান পাদটীকা:** চিহ্নিত করত। তাই এসব অপবাদ হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করা কুরআন শরীফের আবশ্যকীয় দায়িত্ব ছিল। অতএব এসব আয়াতে যদি তিনি হযরত ঈসাকে সেসব অপবাদ হতে নির্দোষ সাব্যস্ত না করে থাকেন তাহলে কুরআন শরীফ হতে এমন আয়াত উপস্থাপন করা উচিত যাতে তিনি হযরত ঈসাকে সেসব অপবাদ হতে নির্দোষ বলে ঘোষণা দিয়ে থাকবেন। –লেখক

অর্থাৎ ঈসাকে হত্যাও করা হয় নি আর তাঁকে ক্রুশেও মারা হয় নি, বরং তাদের কাছে প্রকৃত অবস্থাকে ঘোলাটে বা সন্দেহযুক্ত করা হয়েছে। আর ইহুদী ও খ্রিষ্টান, যারা হযরত ঈসার নিহত হওয়া বা আধ্যাত্মিক রাফার বিষয়ে মতভেদ রাখত, তারা নিছক সন্দেহে নিপতিত। তাদের কারোই সঠিক জ্ঞান নেই; তারা কেবল ধারণা ও সন্দেহের পেছনে ছুটছে আর তারা নিজেরাও বিশ্বাস করে না যে, সত্যিই ঈসা (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছে। এ কারণেই খ্রিষ্টানদের মধ্যে কোনো কোনো ফিরকার বিশ্বাস হলো, মসীহর দ্বিতীয় আগমন ইলিয়াস নবীর ন্যায় বুরুয বা প্রতিচ্ছায়া হিসেবে হবে অর্থাৎ এ বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত যে, মসীহ আকাশে জীবিত বসে আছেন; সত্য কথা হলো, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। শেষ যুগে তাঁর আসার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেই দ্বিতীয় আগমনের অর্থ হলো এমন এক ব্যক্তির আগমন ঘটবে যে, ঈসা মসীহর স্বভাব ও চরিত্রে আসবেন; এমন নয় যে ঈসা স্বয়ং আসবেন। যেমন-এ সম্পর্কে লেখক ডি.এফ. স্ট্রাসের 'নিউ লাইফ অফ জীযায' পুস্তকের প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১০-এ একটি বাক্য রয়েছে যা আমি আমার পুস্তক 'তোহ্ফায়ে গোলড়াভিয়া', পৃ. ১২৭-এ উল্লেখ করেছি আর এখানে শুধু এর অনুবাদই দেওয়া হচ্ছে, তা হলো–

"ক্রুশে দেবার সময় হাত ও পা উভয়টিতে কীলক মারা হলেও মানুষের দেহ হতে অতি সামান্য পরিমাণ রক্তক্ষরণ হয়, এ কারণে ক্রুশে মানুষ ধীরে ধীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চাপ পড়ার কারণে খিঁচুনির ফলে বা ক্ষুধার কারণে মারা যায়। অতএব যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, প্রায় ছয় ঘণ্টা ক্রুশে থাকার পর ঈসা-কে যখন নামানো হয়েছে তখন তিনি মৃত ছিলেন, তাহলেও সর্বোচ্চ যা ঘটেছে তা হলো, মৃতপ্রায় এক অচেতন অবস্থা তাঁর ওপর বিরাজমান ছিল। এরপর নিরাময়ী মলম ও অত্যন্ত সুগন্ধিযুক্ত ঔষধ মালিশ করে তাঁকে যখন গুহার সুশীতল গহ্বরে রাখা হয় তাঁর অচেতনতা কেটে যায় বা চেতনা ফিরে পান। এ দাবির প্রমাণস্বরূপ প্রায়শ জোসেফাসের ঘটনা উপস্থাপন করা হয়, যেখানে জোসেফাস লিখেছে, একবার আমি একটি সামরিক অভিযান থেকে ফিরে আসছিলাম। পথিমধ্যে আমি দেখলাম, বেশ কিছু ইহুদী ক্রুশে ঝুলছে, যাদের তিনজন আমার পরিচিত ছিল। অতএব টিটস (সমসাময়িক শাসক)-এর কাছ থেকে তাদের নামানোর অনুমতি চাই; তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে নামিয়ে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করি। তখন তাদের একজন সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু অন্য দুজন মারা যায়।"

'মডার্ন ডাউট এন্ড ক্রিশ্চিয়ান বিলিফ' (Modern Doubt & Christian Belief) গ্রন্থের ৩৪৭, ৪৫৫ ও ৪৫৭ পৃষ্ঠায় ইংরেজি ভাষায় একটি বাক্য রয়েছে যা আমি আমার পুস্তক 'তোহফায়ে গোলড়াভিয়া'-র ১৩৮ পৃষ্ঠায় লিখে দিয়েছি যার অনুবাদ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো–

"শ্লীর মীখর ও প্রাচীন গবেষকরা বিশ্বাস করতেন, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশে মারা যান নি, বরং বাহ্যত মৃতপ্রায় একটি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল। তিনি কবর থেকে বের হবার পর কিছুকাল নিজের শিষ্যদের সাথে ঘোরাফেরা করেন, এরপর দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রকৃত মৃত্যুর জন্য কোনো পৃথক স্থান অভিমুখে যাত্রা করেন।"

আর যিশাইয় নবীর কিতাবের ৫৩তম অধ্যায়েও এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে এবং ইনজীলে বিদ্যমান হযরত ঈসা (আ.)-এর দোয়াও এটিই প্রকাশ করছে। যেমন- সেখানে লিপিবদ্ধ আছে–

دَعَا بِدُمُوْعٍ جَارِيَةٍ وعَبَرَاتٍ مُتَحَدِّرَةٍ فَسُمِعَ لِتَقْوَاهُ۔

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) অনেক কাকুতিমিনতি করে দোয়া করেছেন এবং তাঁর গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে। অতএব তাঁর খোদাভীতির কারণে সেই দোয়া গৃহীত হয়েছে। দক্ষিণ ইতালির সবচেয়ে বিখ্যাত পত্রিকা কুরিয়ার ডালাসিয়েরা-তে ১৮৭৯ সনের ১৩ জুলাই-এর সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিস্ময়কর সংবাদ প্রকাশ করেছে যে, জেরুযালেমে কোর নামের একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন, যিনি নিজের জীবনে একজন ওলী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি কিছু সম্পত্তি রেখে মারা যান। গভর্নর তার আত্মীয়স্বজনদের সন্ধান করে তাদের হাতে দুই লক্ষ ফ্রাঙ্ক সমান অর্থ (এক লাখ পৌনে ঊনিশ হাজার রুপি) তুলে দেন যা বিভিন্ন দেশের মুদ্রায় ছিল আর এই অর্থ সেই গুহা হতে হস্তগত হয় যেখানে সেই সন্ন্যাসী দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করে আসছিলেন। অর্থের সাথে কিছু নথিপত্রও সেসব আত্মীয়ের হস্তগত হয় যা তারা পড়তে পারে নি। কয়েকজন হিব্রু ভাষাবিদের সেসব কাগজ দেখার সুযোগ হয়। তারা দেখে আশ্চর্য হয় যে, সেসব পাণ্ডুলিপি অনেক প্রাচীন হিব্রু ভাষায় লেখা। তা পাঠে এই বাক্য উদ্ধার হয় যে, 'মরিয়ম তনয় যীশু মসীহর সেবক, জেলে পিতর, খোদার নাম নিয়ে ও তাঁর ইচ্ছানুসারে লোকদের এরূপে সম্বোধন করছে।' আর পত্রটি এভাবে শেষ হয় যে, 'আমি পিতর জেলে, যীশুর নামে আমার

জীবনের নব্বইতম বছরে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশমূলক শব্দ আমার প্রভু ও মনিব, মরিয়ম তনয় যীশু মসীহর মৃত্যুর তিন ঈদে ফাসাখ (অর্থাৎ তিন বছর পর) খোদার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে বলীয়ের নামক স্থানে এই ভালোবাসামাখা শব্দগুলো লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

সেসব বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই পাণ্ডুলিপি পিতরের সময় থেকে চলে আসছে। লন্ডন বাইবেল সোসাইটির মতামতও এটিই আর ভালোভাবে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাইবেল সোসাইটি এখন এর বিনিময়ে চার লাখ লিরা (দুই লাখ সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার রুপি) মালিকদের দিয়ে পাণ্ডুলিপি ক্রয় করতে চায়।

ঈসা ইবনে মরিয়মের দোয়া। সেই দুজনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। সে বলে, হে আমার খোদা! আমি সে বিষয়ের ওপর বিজয়ী হবার সামর্থ্য রাখি না– যাকে আমি মন্দ মনে করি। আমি সেই পুণ্যও অর্জন করতে পারি নি– যা অর্জনের বাসনা আমার ছিল। কিন্তু অন্যরা নিজেদের পুরস্কার নিজেদের হাতে রাখে কিন্তু আমি রাখি না। আমি কেবল আমার কর্মের মাধ্যমে বড়ো হতে পারি। আমার চেয়ে মন্দ অবস্থায় আর কেউ নেই। হে খোদা! যিনি সবচেয়ে মহান, আমার পাপ ক্ষমা করে দাও। হে খোদা! এমন যেন না হয় যে, আমি আমার শত্রুদের সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত হবো। আমাকে আমার বন্ধুদের চোখে তুচ্ছ কোরো না এবং এমনটি যেন না হয় যে, আমার তাকওয়া আমাকে সমস্যার মুখে ঠেলে দেবে। এমনটি করো না যে, এই পৃথিবীই আমার বড়ো আনন্দের স্থান বা আমার পরম অভিষ্ট হবে। আর এমন ব্যক্তিকে আমার ওপর নিযুক্ত কোরো না যে আমার প্রতি দয়া করবে না। হে খোদা! যিনি বড়ো দয়ালু, তোমার দয়ার দোহাই! এমনটিই করো। তুমি এমন সবার প্রতি দয়া করো যারা তোমার দয়ার মুখাপেক্ষী।

তার প্রশ্নঃ

وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (আন-নিসা: ১৫৮-১৫৯) আয়াতে এ সন্দেহ থেকে যায় যে, بَل শব্দটি رفعه الله إليه বাক্যকে ما قتلوه يقينًا এর সাথে বিশেষভাবে সংযুক্ত ও সন্নিবেশিত করে, যার মাধ্যমে এ উভয় ঘটনার পারস্পরিক যোগসূত্র দেখা যায়। অতএব এটি বাহ্যত একথার দাবি রাখে যে, রাফা-র যুগ নিহত হবার যুগের সাথে সন্নিবেশিত ও সম্পৃক্ত হবে আর উভয় যুগের মাঝে কোনো

ব্যবধান থাকবে না; অথচ আপনার বর্ণনা অনুসারে রাফা-র যুগ ও নিহত হবার যুগের মাঝে অনেক ব্যবধান রয়েছে আর তা অনেক দূরবর্তী সময়। কুরআন শরীফের আয়াত যদি ما قتلوه يقينا بل خلّصه الله من ايديهم حيًّا ثُمّ رفعه إليه (নিশ্চয় তারা তাকে হত্যা করে নি, বরং আল্লাহ তাকে তাদের হাত হতে জীবিত উদ্ধার করে নিজের দিকে উত্থিত করেছেন) তাহলে এ অর্থ প্রকাশ পেত।

আমার উত্তরঃ

কেবল ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখার কারণে আপনার হৃদয়ে এ সন্দেহ দানা বেঁধেছে। যদি প্রকৃত ঘটনার ওপর আপনার দৃষ্টি থাকত তাহলে এ সন্দেহ আদৌ দেখা দিত না। প্রকৃত বিষয় হলো, তওরাত অনুসারে ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল, নবুওয়তের দাবিকারক যদি নিহত হয় তাহলে সে মিথ্যাবাদী বা মিথ্যা রচনাকারী হয়ে থাকে, সত্য নবী নয়। কোনো দাবিকারককে যদি ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয় তাহলে সে অভিশপ্ত এবং তার খোদার পানে রাফা হয় না। হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইহুদীদের বিশ্বাস হলো, তিনি নিহতও হয়েছেন, আবার ক্রুশেও মারা গেছেন। কেউ কেউ বলে থাকে, প্রথমে হত্যা করা হয়েছে, এরপর ক্রুশে ঝুলানো হয়েছে আবার কেউ কেউ বলে থাকে, প্রথমে ক্রুশে ঝুলিয়ে পরে হত্যা করা হয়েছে। অতএব এ উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)-এর আধ্যাত্মিক রাফা-র অস্বীকারকারী ছিল এবং আজও অস্বীকার করে এবং বলে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে এবং ক্রুশে মারা হয়েছে, এজন্য খোদা তা'লার দিকে মুমিনদের ন্যায় তাঁর রাফা হয় নি। ইহুদীদের বিশ্বাস হলো, কাফিরের খোদার দিকে রাফা হয় না কিন্তু মুমিন মৃত্যুর পর খোদার দিকে উত্থিত হয়। তাদের ধারণানুসারে হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশে মৃত্যুবরণ করায় নাউযুবিল্লাহ কাফির ও অভিশপ্ত হয়ে গিয়েছেন। এ কারণে তিনি খোদার দিকে উত্থিত হন নি। এ বিষয়টিই পবিত্র কুরআনের নিষ্পত্তি করার কথা ছিল। অতএব খোদা তা'লা উল্লিখিত আয়াতগুলোতে এ সিদ্ধান্তই দিয়েছেন। আয়াত وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (নিশ্চিত কথা যে, তারা তাকে হত্যা করে নি বরং আল্লাহ তাকে তাঁর দিকে উত্থিত করেছেন- অনুবাদক) এই সিদ্ধান্তই প্রদান করে; কেননা ইহুদী ও মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী رفع الى الله দ্বারা সেই মৃত্যুকে বুঝানো হয় যা ঈমানের অবস্থায় হয়ে থাকে এবং আত্মা খোদা তা'লার দিকে যায়। হত্যা ও ক্রুশে মৃত্যুর বিশ্বাসের অন্তরালে ইহুদীদের এটি প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিল যে, মৃত্যুর সময় তাঁর আত্মা

খোদার দিকে যায় নি। অতএব ইহুদীদের হত্যার দাবি ও ক্রুশে ঝোলানোর দাবির উত্তর সেটিই যা খোদা তা'লা দিয়েছেন। অন্য ভাষায় আয়াতের সারকথা হলো, ইহুদীরা নিহত হওয়া বা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের অজুহাত দেখিয়ে বলে যে, ঈসা (আ.)-এর আত্মার মৃত্যুর সময় খোদার দিকে রাফা হয় নি। খোদা তা'লা বলছেন, এমন নয়, বরং মৃত্যুর সময় খোদার দিকে ঈসা (আ.)-এর আত্মার রাফা হয়েছে। অতএব বাক্যের অর্থ হলো بل رفعه الله إليه عند موته (বরং যেহেতু আল্লাহর দিকে রাফা মৃত্যুর সময়ই হয়ে থাকে, বরং ঈমানের অবস্থায় যে মৃত্যু হয় তারই নাম رفع إلى الله। (খোদার দিকে রাফা হওয়া –অনুবাদক) তাই বলা যায়, ইহুদীরা বলত مات عيسٰى كافرًا غير مرفوع إلى الله (ঈসা অবিশ্বাসী বা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে আর খোদার দিকে তাঁর রাফা হয় নি –অনুবাদক) আর খোদা এই উত্তর দিয়েছেন যে, بل مات مؤمنًا مرفوعًا الى الله (মুমিন হিসেবে খোদার দিকে রাফা হবার অবস্থায় তিনি মারা গিয়েছেন –অনুবাদক) অতএব بل শব্দ এখানে অস্থানে নয়, বরং একান্ত আরবদের বাগ্‌ধারা অনুসারে ব্যবহৃত হয়ছে। ইহুদীদের ভ্রান্তি ছিল, তারা ধারণা রাখত যে, হযরত ঈসা (আ.) সত্যিই ক্রুশে নিহত হয়েছেন আর এ কারণে তারা এক ভ্রান্তির পর দ্বিতীয় ভুল করে বসেছে অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তাঁর খোদার দিকে রাফাকে অস্বীকার করে বসেছে। কিন্তু খোদা তা'লা বলেন, তিনি আদৌ নিহত হন নি আর ক্রুশেও মারা যান নি, বরং মৃত্যুর সময় খোদার দিকে তাঁর রাফা হয়েছে। অতএব এ ধরনের কথায় জটিল কিছু নেই আর এসব অর্থের নিরিখে بل শব্দ অযথা নয়, বরং যেখানে ইহুদী ও মুসলমানদের সর্বসম্মত অভিমত হলো, رفع إلى الله মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার খোদার পানে যাবার ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এখানে অন্য কোনো অর্থের অবকাশই নেই।

আর এটিও স্মরণ থাকা উচিত, যে যুগ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য হলো, হযরত ঈসা (আ.) নিহতও হন নি আর ক্রুশেও মারা যান নি, সেই যুগের ক্ষেত্রে এই বক্তব্যও বিদ্যমান যে, মৃত্যুর পর খোদার দিকে তাঁর রাফা হয়েছে। অতএব بل শব্দটি এখানে কালগত ধারাবাহিকতার জন্য ব্যবহার হয়েছে, সেই বিশেষ মুহূর্তের জন্য ব্যবহার হয় নি। অতএব আয়াতের সারকথা হলো, সেই যুগে হযরত ঈসা (আ.) নিহতও হন নি আর ক্রুশেও মারা যান নি, বরং স্বাভাবিক মৃত্যুর পর খোদার দিকে তাঁর রাফা হয়েছে, যেমনটি কুরআনে

প্রতিশ্রুতি ছিল যে, يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ (আলে-ইমরানঃ ৫৬)। আর 'তাওয়াফফা' স্বাভাবিক মৃত্যু দেওয়াকে বলা হয়, যেমনটি কাশ্‌কাফির লেখক এই আয়াতের অর্থাৎ انّى متوفّيك এর তফসীরে লিখেছেন, إنّى مميتك حتف انفك। (নিশ্চয় আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেবো –অনুবাদক) কুরআন শরীফের এ আয়াত অর্থাৎ اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ সব বিবাদের নিরসন করে দেয়। কেননা আমাদের বিরোধীরা বলে, হযরত ঈসা (আ.)-এর রাফা তাঁর জীবদ্দশায় হয়েছে আর খোদা তা'লা এই আয়াতে বলছেন, মৃত্যুর পর রাফা হয়েছে। অতএব পরিতাপ সেসব লোকের জন্য যারা আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট আয়াতের বিপরীত দাবি করে। অথচ কুরআন শরীফ, সকল পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলি ও সকল হাদীস ঘোষণা করছে যে, মৃত্যুর পরই সেই রাফা হয় যাকে আধ্যাত্মিক রাফা বলা হয়, যা মৃত্যুর পর সকল মুমিনের হওয়া আবশ্যক। কোনো কোনো বিদ্বেষী এখানে উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে বলে, আয়াতটি এভাবে পড়া উচিত যে, يٰعِيْسٰى اِنِّىْ رَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُتَوَفِّيْكَ। যেন খোদা তা'লা 'মুতাওয়াফফিকা'-কে রাফার পূর্বে রাখার মতো ভুল করে বসেছেন আর বলেছেন, يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ অথচ বলার কথা ছিল, يٰعِيْسٰى اِنِّىْ رَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُتَوَفِّيْكَ। হায় পরিতাপ! বিদ্বেষ কত বড়ো একটি ব্যাধি যে, এর পক্ষ নিতে গিয়ে আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতেও এদের বাধে না। এই প্রক্ষেপণ সেই নোংরা কাজ– যে কারণে ইহুদী জাতি অভিশপ্ত আখ্যায়িত হয়েছে আর তাদের চেহারা বিকৃত করা হয়েছে। এখন এরা পবিত্র কুরআনে পরিবর্তন-পরিবর্ধনে উদ্যত। আর যদি এই প্রতিশ্রুতি না থাকত যে, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (আল-হিজরঃ ১০)। তাহলে তাদের কাছে এই আশাই ছিল যে, আয়াত إنّى متوفّيك و رافعك إلىّ -এর পরিবর্তে কুরআন শরীফে يا عيسى إنّى رافعك إلىّ و متوفّيك লিখে দিত। কিন্তু এমন প্রক্ষেপণও সম্ভব ছিল না, কেননা খোদা তা'লা এ আয়াতে চারটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন- তিনি বলেন,

(১) يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ (২) وَرَافِعُكَ اِلَىَّ (৩) وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (৪) وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

এই চারটি প্রতিশ্রুতির ওপর নম্বর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যেমনটি কিনা সহীহ হাদীস ও স্বয়ং কুরআন থেকে প্রমাণিত যে, مطهّرك من الّذين كفروا সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি যা রাফার প্রতিশ্রুতির পরে ছিল তা মহানবী (সা.)-এর

আবির্ভাবের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে, কেননা তিনি হযরত ঈসা (আ.)-কে অন্যায় সব অপবাদ থেকে মুক্ত করেছেন, যা ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা তাঁর প্রতি আরোপ করেছিল। একইভাবে চতুর্থ প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্যের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। অতএব আমাদের বিরোধীদের ইচ্ছানুসারে متوفّيك শব্দ যদি পরে রাখা হয় আর رافعك إلىّ পূর্বে আনা হয় তাহলে رافعك إلىّ বাক্যাংশ مطهّرك এর পূর্বে আসতে পারে না, কেননা مطهّرك বাক্যাংশ ইতিমধ্যে পূর্ণ হয়ে গেছে। আমাদের বিরোধীদের উক্তি অনুসারে متوفّيك -র প্রতিশ্রুতি এখনও পূর্ণ হয় নি; একইভাবে متوفّيك বাক্যাংশ وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -র পূর্বেও বসতে পারে না, কেননা সেই প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এর আঁচল কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। তাই توفّى শব্দ যদি আয়াতের প্রথম দিক থেকে অপসারণ করা হয় তাহলে সেটিকে কিয়ামতের পূর্বে আয়াতের অন্য কোনো স্থানে রাখার সুযোগ নেই। অতএব এর আবশ্যকীয় ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের পরেই মারা যাবেন এবং এই বিন্যাস মৃত্যুর পথে বাঁধা হয়ে থাকবে। কুরআনের এই নিদর্শনমূলক দিকটি দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, আমাদের বিরোধীরা ইহুদীদের ন্যায় কুরআনে প্রক্ষেপণ করতে উদ্যত হলেও তা করতে সক্ষম হয় নি আর এমন কোনো স্থানও চোখে পড়ে না যেখানে رَافِعُكَ বাক্যাংশকে এর বর্তমান স্থান থেকে সরিয়ে রাখা যেতে পারে। প্রত্যেকটি স্থান এমনভাবে পূর্ণ হয়ে গেছে যে, হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ একটি আয়াতই অর্থাৎ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ সত্য সন্ধানীর জন্য যথেষ্ট, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সেই রাফা যা সম্পর্কে আমাদের বিরোধীরা তুলকালাম কাণ্ড ঘটাচ্ছে, তা মৃত্যুর পরে হবে, মৃত্যুর পূর্বে নয়। কেননা খোদার সাক্ষ্যের মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত; আর খোদার সাক্ষ্য গ্রহণ না করা ঈমানদার মানুষের কাজ নয়। যেহেতু কুরআনের আয়াত অনুসারে রাফা-র স্থান মৃত্যুর পর, তাই এটি স্পষ্ট কথা যে, এটি সেই রাফা যা মৃত্যুর পর প্রত্যেক মুমিনের জন্য খোদার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত বিষয়।

অদ্ভুত বিষয় হলো খোদা তা'লা رافعك إلىّ বাক্যাংশকে متوفّيك -র পরে রেখেছেন আর এরা رافعك বাক্যাংশকে পূর্বে রাখে আর متوفّيك-কে পরে নিয়ে

যায়, যাতে কোনোভাবে হযরত ঈসা (আ.)-কে জীবিত আকাশে বসিয়ে রাখা যায়। এমতাবস্থায় প্রক্ষেপণে, ইহুদীদের বিশেষত্ব কী হলো? এছাড়া ইহুদীদের ন্যায় এরা যদি ইচ্ছামতো কুরআন শরীফকে আগে-পিছে করার স্বাধীনতা রাখে তাহলে কুরআনের জন্য কোনোভাবে এটি শুভ লক্ষণ নয়। এমন কোনো হাদীস তাদের উপস্থাপন করা উচিত যাতে তাদেরকে এমন কোনো কাজের অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকবে যে, رافعك إلىّ বাক্যাংশ প্রথমে পাঠ করে নিও আর متوفّيك পরে। যদি কুরআন ও হাদীস হতে এমন অনুমতির প্রমাণ পাওয়া না যায় তাহলে সেই অভিশাপকে ভয় করে না কেন যা তাদের পূর্বে ইহুদীদের ভাগ্যে জুটেছে।

তাঁর প্রশ্নঃ

আপনার বর্ণনানুসারে হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশ থেকে মুক্তি লাভের পর কাশ্মীরের দিকে চলে গেছেন। প্রথমত সে যুগে কাশ্মীর পর্যন্ত পৌঁছা কোনো সহজ বিষয় ছিল না, বিশেষ করে গোপনে আসা। এছাড়া এ আপত্তিও উত্থাপিত হয় যে, হাওয়ারীরা কেন তাঁর সাথে এসে মিলিত হয় নি এবং কেন হযরত ঈসা (আ.) জীবিত কবরস্থ ব্যক্তির ন্যায় অজানাই রয়ে গেলেন!

আমার উত্তরঃ

যে খোদা হযরত ঈসা (আ.)-কে কাশ্মীর যাবার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনিই তাঁর পথপ্রদর্শক ছিলেন। নবীর জন্য কাশ্মীর পৌঁছে যাওয়া কীভাবে আশ্চর্যের বিষয় হতে পারে? যদি আশ্চর্যই হতে হয় তাহলে একজন অধার্মিক এ বিষয়েও বিস্ময় প্রকাশ করতে পারে যে, হিজরতের সময় কাফিররা একান্ত সওর গুহার মুখে পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও কীভাবে আমাদের নবী (সা.) তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেন? তাই এমন আপত্তির উত্তর হলো, খোদার বিশেষ কৃপা নবীদের রক্ষা করে যা অলৌকিকভাবে তাঁদের সাথে থাকে এবং তাঁদের পথপ্রদর্শন করে। বাকি রইল এ কথা যে, যদি হযরত ঈসা (আ.) কাশ্মীর গিয়ে থাকেন তাহলে হাওয়ারীরা কেন তাঁর কাছে যায় নি? এর উত্তর হলো, কোনো বিষয়ের জ্ঞান না থাকার অর্থ এই নয় যে, সেই জিনিসটির অস্তিত্বই নেই। আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে, তারা আসে নি। তবে হিজরতের সময় আমাদের নবী (সা.)-এর গোপন সফরের ন্যায় সেই সফরও গোপন

ছিল,* তাই একটি বড়ো কাফেলা নিয়ে সেই সফর করা যুক্তিযুক্ত মনে করা হয় নি। যেমন এটি জানা কথা যে, আমাদের নবী (সা.) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন শুধু হযরত আবু বকর (রা.) সাথে গিয়েছেন, আর সে যুগেও ২০০ মাইল অতিক্রম করে মদীনা যাওয়া সহজ বিষয় ছিল না। মহানবী (সা.) চাইলে ৬০-৭০ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি (সা.) কেবল হযরত আবু বকর (রা.)-কে সফরসঙ্গী বানিয়েছেন।

অতএব নবীদের গোপনীয় বিষয়ে নাক গলানো একটি অসংগত হস্তক্ষেপ। এছাড়া এটি কীভাবে জানা গেল যে, পরেও শিষ্যরা হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে মিলিত হবার জন্য ভারতে যান নি। সত্য কথা হলো, খ্রিষ্টানরা স্বয়ং এতে বিশ্বাস রাখে যে, সে দিনগুলোতে কোনো কোনো শিষ্য ভারতে অবশ্যই এসেছিলেন। থমাস হাওয়ারীর মাদ্রাজ আসা আর অদ্যাবধি মাদ্রাজে প্রত্যেক বছর তার স্মরণে খ্রিষ্টানদের মেলা সদৃশ সমাবেশ এমন একটি বিষয় যা কোনো ব্যক্তির কাছে অজানা নয়। সত্য কথা হলো, আমরা শ্রীনগর কাশ্মীরের যে কবরকে হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর বলি, খ্রিষ্টানদের বড়ো বড়ো পাদরির মতে তা কোনো হাওয়ারীর কবর। অথচ কবরে শায়িত ব্যক্তি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, আমি নবী এবং একজন শাহজাদা আর আমার প্রতি 'ইনজীল' অবতীর্ণ হয়েছে। আর কাশ্মীরের যে-সব প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলি আমাদের হস্তগত হয়েছে তাতে লেখা আছে, ইনি একজন বনী ইসরাঈলী নবী ছিলেন, যিনি শাহজাদা নবী আখ্যায়িত হতেন আর তিনি

---

* **টীকাঃ** নবীদের ক্ষেত্রে আল্লাহর একটি রীতি হলো তারা নিজেদের দেশ হতে হিজরত করে থাকেন যেমনটি সহীহ বুখারীতে উল্লিখিত আছে। যেমন হযরত মূসা (আ.)-ও মিশর থেকে কিনান অভিমুখে হিজরত করেছেন। আমাদের নবী (সা.)-ও মক্কা হতে মদীনা হিজরত করেছেন তাই হযরত ঈসারও এ সুন্নত পালন করা আবশ্যক ছিল। অতএব তিনিও ক্রুশের ঘটনার পর কাশ্মীর অভিমুখে হিজরত করেছেন। ইনজীলেও এই হিজরতের দিকে এ মর্মে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবী কেবল নিজের দেশেই অপমানিত হন। এখানে নবী বলতে তিনি নিজেকে বুঝিয়েছেন। অতএব খ্রিষ্টানদের জন্য এখানে ডুবে মরার বিষয় যে, তারা তাকে নবী নয় বরং খোদা আখ্যায়িত করে। অথচ নবী সে হয়ে থাকে, যে খোদার পক্ষ থেকে এলহাম লাভ করে। অতএব খোদা ও নবী পৃথক পৃথক সত্তা হওয়া আবশ্যক। –লেখক

স্বদেশ হতে কাশ্মীরে হিজরত করেছেন। সেসব পুস্তকে তাঁর আগমনের যে তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা থেকে বুঝা যায়, তিনি যখন কাশ্মীরে এসেছেন সে ঘটনার পর থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত ১৯০০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমরা খ্রিষ্টানদের অভিযুক্ত করে বলি, তোমরা স্বীকার করো যে, খান ইয়ার মহল্লার কবরে সমাহিত ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারী ছিলেন অথচ তাঁর পুস্তকে লেখা আছে তিনি নবী ছিলেন এবং শাহজাদা ছিলেন আর তাঁর প্রতি 'ইনজীল' অবতীর্ণ হয়েছিল– তাহলে তিনি হাওয়ারী কীভাবে হলেন? কোনো হাওয়ারী কি বলতে পারে যে, আমি শাহজাদা ও নবী আর আমার প্রতি 'ইনজীল' অবতীর্ণ হয়েছে? অতএব কাশ্মীরে যে কবর রয়েছে সেটি হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর হবার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যারা তাঁকে আকাশে বসিয়ে রাখে তাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, তিনি কাশ্মীরের শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় ঘুমিয়ে আছেন। যেভাবে খোদা তা'লা দীর্ঘকাল আসহাবে কাহাফ তথা গুহাবাসীদের বিষয় গোপন রেখেছিলেন, সেভাবেই হযরত ঈসা (আ.)-কেও গোপন রেখেছেন আর অবশেষে আমাদের কাছে সত্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। খোদা তা'লার কাজে এমন সহস্র সহস্র উদাহরণ রয়েছে। এছাড়া কাউকে সশরীরে আকাশে বসিয়ে রাখা খোদার সুন্নত পরিপন্থি।

তাঁর প্রশ্নঃ

হাদীসে আগমনকারী ঈসাকে নবীউল্লাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তাই প্রশ্ন হলো, কুরআন ও হাদীসে মুহাদ্দাসকেও নবী বলার কোনো প্রমাণ আছে কি?

আমার উত্তরঃ

আরবী ও হিব্রু ভাষায় 'নবী' শব্দের অর্থ হলো কেবল ভবিষ্যৎ সংবাদদাতা, যিনি খোদার পক্ষ থেকে এলহাম পেয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে থাকেন। অতএব যেখানে কুরআন শরীফ অনুসারে এমন নবুওয়তের দ্বার রুদ্ধ নয় অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কল্যাণ ও তাঁকে অনুসরণের মাধ্যমে কোনো মানুষের খোদা তা'লার সাথে বাক্যালাপের সম্মান লাভ ও খোদার ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদ লাভ করার দ্বার খোলা, সেখানে এমন নবী এ উম্মতে কেন হবেন না? আর না হবার প্রমাণইবা কী? এমন নবুওয়তের ওপর মোহর লেগে

গেছে- এটি আমাদের বিশ্বাস নয়। কেবল সেই নবুওয়তের দ্বার রুদ্ধ যা নতুন শরীয়ত-সংক্রান্ত শিক্ষা নিজের মাঝে রাখে অথবা এমন কোনো দাবি করা যা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য হতে বেরিয়ে করতে হয়। কিন্তু এমন ব্যক্তি যাঁকে একদিকে খোদা তা'লা তাঁর ওহীতে উম্মতিও আখ্যা দেন অপরদিকে তাঁর নাম নবীও রাখেন, তাঁর এমন দাবি কুরআন শরীফের শিক্ষার পরিপন্থি নয়। কেননা এই নবুওয়ত উম্মতি হবার কারণে সত্যিকার অর্থে মহানবী (সা.)-এরই নবুওয়তের ছায়া, কোনো স্বাধীন নবুওয়ত নয়। যদি আপনি হাদীসগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করতেন তাহলে এ আপত্তি আদৌ আপনার মাথায় দানা বাঁধত না। আপনি বলেন যে, আগমনকারী ঈসাকে হাদীসে আল্লাহর নবী বলা হয়েছে। আমি বলছি, একই আগমনকারী ঈসাকে হাদীসে উম্মতিও বলা হয়েছে।* আপনি কি কুরআন শরীফ অথবা হাদীস হতে দেখাতে পারবেন যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম, যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁর নাম কোনো স্থানে উম্মতিও রাখা হয়েছে? অতএব এটি সুস্পষ্ট বিষয় যে, এই ঈসা যাঁকে উম্মতিও বলা হয় এবং নবীও বলা হয়, ইনি ভিন্ন ঈসা; তিনি সেই ঈসা নন যিনি বনী ইসরাঈলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যিনি একজন শরীয়তবাহক স্বাধীন নবী ছিলেন, যাঁর প্রতি 'ইনজীল' অবতীর্ণ হয়েছিল– তাঁকে আপনি কীভাবে উম্মতি আখ্যায়িত করতে পারেন? সহীহ বুখারীতে যেখানে আগমনকারী ঈসার নাম উম্মতি রাখা হয়েছে, সেখানে তাঁর অবয়বও প্রথম ঈসার অবয়ব থেকে ভিন্ন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, আগমনকারী ঈসা সম্পর্কে যদি হাদীসে শুধু নবী শব্দ ব্যবহার হতো এবং তাঁর নাম উম্মতি না রাখা হতো তাহলে হয়ত ভুল বুঝা সম্ভব ছিল, কিন্তু সহীহ বুখারীতে আগমনকারী ঈসা সম্পর্কে সুস্পষ্ট লেখা আছে اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ অর্থাৎ হে উম্মতিগণ! আগমনকারী ঈসাও শুধু একজন উম্মতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। একইভাবে মুসলিমেও তাঁর সম্পর্কে اَمَّكُمْ مِنْكُمْ বাক্য রয়েছে অর্থাৎ সেই ঈসা তোমাদের ইমাম হবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে হবে অর্থাৎ উম্মতেরই একজন হবে।

*** টীকাঃ** উম্মতি সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে মহানবীর অনুসরণ ছাড়া কোনোভাবে উৎকর্ষ সাধন করতে পারে না। অতএব হযরত ঈসা সম্পর্কে এটি ভাবা যেতে পারে কি যে, তিনি ততক্ষণ অসম্পূর্ণ থাকবেন যতক্ষণ দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে এসে মহানবীর উম্মতে প্রবেশ এবং তার অনুসরণ না করেন? –লেখক

যেখানে এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আগমনকারী ঈসা উম্মতি হবেন, তাই ঐশী বাণীতে তাঁর নাম নবী রাখা স্বাধীন নবীর অর্থে নয়, বরং সেখানে এর একমাত্র অর্থ হলো, তিনি খোদার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথন করবেন আর তিনি তাঁর কাছে অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করবেন। তাই উম্মতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি নবী আখ্যায়িত হবেন। যদি একথা বলা হয় যে, এ উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত খোদার সাথে বাক্যালাপের ও কথোপকথনের এবং খোদার পক্ষ থেকে ওহী লাভের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে, তাই কোনো ব্যক্তি নবী কীভাবে আখ্যায়িত হতে পারে, কেননা নবীর জন্য খোদার সাথে বাক্যালাপ করা আবশ্যক, তাহলে এ প্রশ্নের উত্তর হলো, এ উম্মতের জন্য এ দরজা আদৌ বন্ধ হয় নি। আর যদি এ উম্মতের জন্য এ দরজা বন্ধ হতো তাহলে এটি একটি মৃত উম্মত হতো আর খোদা তা'লার সাথে এর সম্পর্ক থাকত না। যদি এ দরজা উম্মতের জন্য বন্ধ হতো তাহলে কুরআনে কেন اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (আল-ফাতিহা: ৬-৭) দোয়া শেখানো হলো? আর মহানবী (সা.)-কে যে খাতামুল আম্বিয়া বলা হয়েছে এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর (সা.) পর খোদার সাথে বাক্যালাপের দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। যদি এ অর্থ সঠিক হতো তাহলে এই উম্মত একটি অভিশপ্ত উম্মত হতো যা শয়তানের ন্যায় চিরকাল খোদা তা'লা হতে বিতাড়িত ও দূরে থাকত; বরং এর অর্থ হলো সরাসরি খোদা তা'লার পক্ষ হতে ওহীর কল্যাণ লাভ করা বন্ধ হয়ে গেছে আর এ নিয়ামত মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়া কারো জন্য লাভ করা সম্ভব নয়। এ গর্ব একান্ত মহানবী (সা.)-এর যে, তাঁর অনুসরণের মাঝেই এ কল্যাণ নিহিত অর্থাৎ এক ব্যক্তি যদি শতভাগ তাঁর অনুসরণকারী হয়ে থাকে তাহলে সে খোদা তা'লার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথনের সম্মান লাভ করতে পারে। এমন নবী নিজ সত্তায় কিবা সম্মান ও মর্যাদা রাখে আর তাঁর প্রভাব ও পবিত্রকরণ শক্তির অর্থইবা কী যাঁর অনুসরণের দাবিদার নিছক অন্ধ ও দৃষ্টিহীনই রয়ে যায় আর খোদা তা'লা স্বীয় বাক্যালাপ ও কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের চোখ খুলেন না? এ ধারণা করা কত বাজে ও অর্থহীন একটি বিশ্বাস যে, মহানবী (সা.)-এর পর খোদার ওহীর দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে আর ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত এর কোনো আশাই নেই! কেবল কাহিনির পূজা করো– এমন ধর্ম কি ধর্ম আখ্যায়িত হবার যোগ্য হতে পারে যাতে সরাসরি খোদার কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় না? যা

আছে কেবল কল্পকাহিনি; আর কেউ যদি তাঁর পথে নিজ জীবনও উৎসর্গ করে, তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানে বিলীনও হয়ে যায় আর সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাঁকে প্রাধান্য দেয়, তবুও তিনি তাঁকে চেনার দ্বার তার জন্য অবারিত করেন না আর বাক্যালাপে তাকে সম্মানিত করেন না!

আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, এ যুগে এমন ধর্মের প্রতি আমার চেয়ে বেশি বীতশ্রদ্ধ আর কেউ হবে না। এমন ধর্মের নাম আমি শয়তানি ধর্ম রাখি, রহমানি নয়। আর আমি দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে, এমন ধর্ম জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় ও অন্ধ রাখে এবং অন্ধ অবস্থায় মারে আর অন্ধ অবস্থাতেই কবরে নিয়ে যায়। কিন্তু আমি একইসাথে মহাসম্মানিত ও দয়ালু খোদার নামে শপথ করে বলছি, ইসলাম এমন ধর্ম নয়; বরং পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা নিজের মাঝে এ বৈশিষ্ট্য রাখে যে, এটি আমাদের নেতা ও মনিব মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ আনুগত্যের শর্ত পূরণ হলে খোদার সাথে বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত করে থাকে। এ কারণেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, علماء أُمّتی كأنبياءِ بنی إسرائيل অর্থাৎ আমার উম্মতের খোদাপ্রেমী আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীদের ন্যায়। এ হাদীসেও খোদাপ্রেমিক আলেমদেরকে একদিকে উম্মতি বলা হয়েছে, অপরদিকে নবীদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

এছাড়া যেখানে এটি জানা কথা যে, প্রাচীনকাল হতে খোদা তা'লা নিজ বান্দাদের সাথে কথা বলে আসছেন, এমনকি ইসরাঈলী নারীরা পর্যন্ত খোদার সাথে কথোপকথনের সম্মান লাভ করেছেন, যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা এবং মরিয়ম সিদ্দীকা প্রমুখ, সেখানে এ উম্মত কত দুর্ভাগা ও হতভাগা যে, এর পুরুষরা বনী ইসরাঈলের নারীদের সমান মর্যাদাও রাখে না। এটি কি ভাবা যেতে পারে যে, এখন এমন এক যুগ এসে গেছে যখন খোদা তা'লা শোনেন কিন্তু কথা বলেন না? অসহায় বান্দাদের দোয়া গ্রহণ করতে যদি তাঁর কোনো সম্মানহানী না হয়, তাহলে কথা বললে কেন সম্মানহানী হবে?

স্মরণ রাখা উচিত, খোদার গুণাবলি কখনো নিষ্ক্রিয় হয় না। অতএব তিনি যেভাবে সবসময় শুনবেন, একইভাবে তিনি চিরকাল কথাও বলবেন। এ প্রমাণের চেয়ে বেশি স্পষ্ট প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, খোদা তা'লা যেভাবে শুনে থাকেন তদ্রূপ তাঁর কথা বলার ধারাও কখনো বন্ধ হবে না। এটি থেকে

প্রমাণিত হয় যে, একটি দল সবসময় এমন থাকবে যাদের সাথে খোদা তা'লা বাক্যালাপ ও কথোপকথন অব্যাহত রাখবেন। আমি বুঝি না, 'নবী' নাম শুনে বেশিরভাগ মানুষ কেন ক্ষেপে যায়? যেখানে এটি প্রমাণিত সত্য যে, আগমনকারী মসীহ এ উম্মত হতেই আসবেন সেখানে খোদা তা'লা তাঁর নাম নবী রাখলে সমস্যা কোথায়? এমন লোক এটি দেখে না যে, তাঁকে উম্মতিও তো বলা হয়েছে আর উম্মতিদের সকল গুণাবলি তাঁর মাঝে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব এ যৌগিক নাম একটি পৃথক নাম। আর হযরত ঈসা ইসরাঈলীকে কখনো এ নামে নামকরণ করা হয় নি। আমার ওহীতে খোদা তা'লা আমাকে বার বার উম্মতি বলেও ডেকেছেন আর নবী বলেও সম্বোধন করেছেন। এ উভয় নাম পেয়ে আমার হৃদয়ে অসাধারণ আনন্দ বোধ হয়। আমি (খোদার প্রতি) কৃতজ্ঞতা জানাই যে, আমাকে এই যৌগিক নামে সম্মানিত করা হয়েছে। এ যৌগিক নাম রাখার পেছনে যে প্রজ্ঞা নিহিত আছে বলে মনে হয় তা হলো, খ্রিষ্টানদেরকে ভর্ৎসনার চাবুক মারা। অর্থাৎ তোমরা ঈসা ইবনে মরিয়মকে খোদা বানিয়ে থাকো, কিন্তু আমাদের নবী (সা.) এমন মানের নবী যে, তাঁর উম্মতের এক সদস্য উম্মতি হয়েও নবী হতে পারে এবং ঈসা আখ্যায়িত হতে পারে।

তার প্রশ্নঃ

প্রতিশ্রুত মাহদী সম্পর্কে কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, من وُلد فاطمة আর কতক হাদীসে من عترتى আছে আর কোনো কোনো হাদীসে من اهل بيتى -ও আছে। এছাড়া এটিও আছে যে, يواطئُ إسمه إسمى و إسم إبيه إسم إبى। অতএব অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করুন, এগুলোর প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা কী?

আমার উত্তরঃ

আমার সেই মাহদী হবার কোনো দাবি নেই যে মাহদী من ولد فاطمة ইত্যাদির পরিপূরণস্থল ও সত্যায়নকারী, বরং আমি মসীহ মওউদ হবার দাবি করেছি। মসীহ মওউদ সম্পর্কে কোনো মুহাদ্দিসের উক্তি নেই যে, তিনি ফাতিমার বংশ থেকে হবেন। অবশ্য এর সাথে সব মুহাদ্দিসের ন্যায় আমি বলি যে, প্রতিশ্রুত মাহদী-সংক্রান্ত যত হাদীস রয়েছে, সব ক'টি বিতর্কিত ও সন্দেহযুক্ত আর সেগুলোর একটিও সহীহ হাদীস নয়। এসব হাদীসে যত মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, অন্য কোনো হাদীসে তা দেখা যায় না। আব্বাসী

খলীফাদের যুগে খলীফাদের প্রতিশ্রুত মাহদী আখ্যায়িত হবার বড়ো সাধ ছিল, এ কারণে কোনো কোনো হাদীসে মাহদী বনী আব্বাস হতে হবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো কোনোটিতে ফাতিমার বংশ থেকে হবেন বলে বলা হয়েছে, কতিপয় হাদীসে رجل من اُمتی -ও রয়েছে অর্থাৎ সে আমার উম্মতের এক ব্যক্তি হবে। কিন্তু এসব হাদীস কোনোভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটি কেবল আমার কথা নয় বরং আহলে সুন্নতের বড়ো বড়ো আলেম এমন কথা বলে আসছেন। সেসব হাদীসের বিপরীতে সে হাদীসটি বেশি সঠিক যা ইবনে মাজা লিখেছে। তা হলো, لا مهدی الّا عیسٰی অর্থাৎ কেবল আগমনকারী ঈসা-ই মাহদী; অন্য কোনো মাহদী নেই।

তার কথাঃ

মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহের আলেমরাও অর্থ করার চেষ্টা করেছেন। সেগুলোর বেশিরভাগ স্বপ্ন ও দিব্যদর্শন ছিল।

আমার উত্তরঃ

এই আপত্তি আমি বুঝি নি, তাই উত্তর দিতে অপারগ।

তার প্রশ্নঃ

বাহ্যিকতার পূজারিরা অন্তর্দৃষ্টি রাখে না, তাই হযরত মসীহ মওউদকে না চেনা তাদের ক্ষেত্রে তেমন কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় কিন্তু খোদাপ্রেমিক ও আধ্যাত্মিক জগতের মানুষের হযরত মসীহ মওউদ-কে এলহাম ইত্যাদির মাধ্যমে চেনা আবশ্যক, যেমনটি কিনা কাযী সানাউল্লাহ পানিপতি মরহুম 'তযকিরাতুল মাআদ' পুস্তকে ইমাম মাহদী সম্পর্কে লিখেছেন যে, সিরিয়ার আবদাল ও ইরাকের বিভিন্ন লোক তার হাতে বয়আত করতে আসবে।

আমার উত্তরঃ

এসব কথা এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে, প্রতিশ্রুত মাহদী ফাতিমার বংশ হতে বা আব্বাসের বংশ হতে আসবেন আর আবদাল ও কুতুব তার হাতে বয়আত করবে। কিন্তু আমি একটু পূর্বেই লিখে এসেছি যে, বড়ো বড়ো হাদীস বিশারদদের বিশ্বাস হলো, মাহদী-সংক্রান্ত বেশিরভাগ হাদীস বিতর্কিত, সন্দেহযুক্ত ও বানোয়াট। এগুলোর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। এসব হাদীসকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য অনেক আলেম অনেক বই লিখেছে আর দৃপ্তকণ্ঠে

এসব হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যেখানে এ হলো পরিস্থিতি, অর্থাৎ স্বয়ং যেখানে মাহদীর আগমনের বিষয়টি সন্দেহের দোলাচলে দুলছে, সেখানে আবদালদের বয়আত করার বিষয়টি কীভাবে নিশ্চিত হতে পারে? যেখানে মূলই সঠিক নয় সেখানে শাখা কীভাবে সঠিক হতে পারে? এছাড়া আবদালদের মাথায় কোনো শিং তো থাকে না। যারা নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে– তারাই খোদার দৃষ্টিতে আবদাল। আপনি যদি নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করেন আর মানুষের অভিশাপ ও তিরস্কারের ভয় না করে সত্যের জন্য নিবেদিত হয়ে যান, তাহলে আপনি আবদালদের অন্তর্ভুক্ত।

আমার জামা'তে বেশিরভাগ মানুষ এমন– যারা এ জামা'তের জন্য অনেক দুঃখ বরণ করেছেন, অনেক লাঞ্ছনা সয়েছেন এবং প্রাণ দিতেও তারা দ্বিধা করেন নি। তারা কি আবদাল নন? আমীর আবদুর রহমানের সামনে শেখ আবদুর রহমানকে এ জামা'তের কারণে গলা টিপে শহীদ করা হয়েছে। তিনি এক ছাগের ন্যায় নিজেকে জবাই করিয়েছেন; তিনি কি আবদালদের অন্তর্ভুক্ত নন? একইভাবে সাহেবযাদা মৌলবি আবদুল লতীফ সাহেবেকে এ জামা'তের জন্য পাথর মেরে শহীদ করা হয়েছে, যিনি মুহাদ্দেস ও ফকীহ আর কাবুলের আলেমদের শিরোমণি ছিলেন। তাকে বার বার বুঝানো হয়েছে যে, এ ব্যক্তির বয়আত থেকে বেরিয়ে আসুন, তাহলে পূর্বের চেয়ে বেশি সম্মান দেওয়া হবে। কিন্তু তিনি মৃত্যুকে সাদরে বরণ করেছেন আর স্ত্রী ও ছোটো ছোটো সন্তানদের কথা ভাবেন নি। চল্লিশ দিন পর্যন্ত পাথরে তার মৃতদেহ ঢাকা পড়ে ছিল। তিনি কি আবদালদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না? এখনও আমি খোদা তা'লার কৃপায় জীবিত আছি। খোদার বড়ো বড়ো প্রতিশ্রুতি রয়েছে, জানি না কত আর কোন কোন দেশ থেকে পবিত্র মানুষ আমার জামা'তভুক্ত হবে। এছাড়া মসীহ মওউদ সম্পর্কে আসারে (তথা সাহাবী বা তাবেয়ীদের বর্ণনায় –অনুবাদক) লেখা আছে যে, আলেমরা তাকে গ্রহণ করবে না। কোনো আবদালের বয়আত করার কথা তো উল্লেখই নেই।

তার প্রশ্নঃ

যেহেতু এখন পর্যন্ত হযরত সাহেবের এমন কোনো স্পষ্ট প্রভাব বা নিদর্শন প্রকাশ পেতে দেখা যায় নি, আর দু-তিন লাখ মানুষের জামা'তভুক্ত হওয়া

সমুদ্রে একটি বিন্দুর চেয়ে বেশি কিছু নয়; তাই স্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত যদি কেউ অস্বীকার না করে জামা'তভুক্ত হতে বিলম্ব করে বা দেরি করে তাহলে এটি কি বৈধ হবে?

আমার উত্তরঃ

বয়আত করা হতে বিরত থাকা ও দেরি করা এক ধরনের অস্বীকারের নামান্তর। বাকি থাকল একথা যে, এখনও অনেকেই ঈমান আনে নি– এটি একথার প্রমাণ হতে পারে না যে, দাবি প্রমাণিত নয়। যদি কোনো প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির সত্যতার পক্ষে প্রমাণ থাকে তাহলে কোনো ব্যক্তির ঈমান না আনার কারণে তার দাবি দুর্বল হতে পারে না। এছাড়া এটিও দেখা উচিত যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত যারা আন্তরিকভাবে ঈমান এনেছিল তারা দেড় লক্ষের বেশি ছিল না। প্রশ্ন হলো– তাদের সংখ্যাস্বল্পতার কারণে মহানবীর নবুওয়ত সন্দেহযুক্ত হতে পারে কি?

আসল কথা হলো, সত্য নবীর সত্যতার জন্য এটি কোনো শর্ত নয় যে, ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যাধিক্য থাকতে হবে। অবশ্য অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে সত্য পুরোপুরি উপস্থাপনের শর্ত রয়েছে। এখানে নবুওয়তের পদ্ধতিতে সত্যের অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে দুবার এদেশে চন্দ্রে ও সূর্যে গ্রহণ লেগেছে, যা মসীহ মওউদ-এর আবির্ভাবের লক্ষণ ছিল। একইভাবে একটি নূতন বাহনও আবিষ্কৃত হয়েছে– যার প্রতি কুরআন শরীফ ও হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ রেলগাড়ি– যা উটের জায়গা নিয়েছে। যেমনটি কুরআন শরীফে রয়েছে, وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (আত-তাকভীর: ৫) অর্থাৎ শেষ যুগে উষ্ট্রী পরিত্যক্ত হবে। অপরদিকে মুসলিমের হাদীসে উল্লিখিত মসীহ মওউদের আবির্ভাবের একটি লক্ষণ হলো وليتركن القلاص فلا يُسعى عليها অর্থাৎ তখন উট বেকার হয়ে যাবে আর সেগুলোর ওপর কেউ আরোহণ করবে না। জানা কথা, সে যুগ এসে গেছে। এটিও লেখা হয়েছে যে, সে যুগে ভূমিকম্প হবে। অতএব সেই ভূমিকম্পও মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে আর যা অবশিষ্ট আছে তা-ও দেখতে পাবে। লেখা হয়েছিল যে, আদম (আ.) থেকে ষষ্ঠ হাজারের শেষের দিকে মসীহ মওউদ জন্মগ্রহণ করবেন। ঠিক সে সময়েই আমার জন্ম হয়েছে। একইভাবে কুরআন শরীফ এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, সেই মসীহ মওউদ হযরত ঈসা

(আ.)-এর ন্যায় চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হবেন।* অতএব আমার আবির্ভাব চতুর্দশ শতাব্দীতে হয়েছে।

অর্থাৎ যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর পর ঈসা (আ.) চতুর্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছি। এই শেষ যুগ সম্পর্কে খোদা তা'লা কুরআন শরীফে এই সংবাদও দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে কিতাব ও পত্রপত্রিকা অনেক বেশি প্রকাশিত হবে। বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক মেলামেশা বা সাক্ষাতের পথ সুগম হবে। নদী কেটে বহু খাল প্রবাহিত করা হবে। অনেক নতুন নতুন খনি খনন করা হবে। মানুষের ভেতর ধর্মীয় বিষয়ে অনেক বিতণ্ডা দেখা দেবে। এক জাতি অন্য জাতির ওপর হামলা করবে। তখন আকাশ থেকে শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, অর্থাৎ খোদা তা'লা মসীহ মওউদকে পাঠিয়ে ধর্মের প্রচারের জন্য স্বীয় একপ্রকার বিকাশ ঘটাবেন। তখন সকল দেশে পুণ্য প্রকৃতির মানুষের মাঝে ইসলামের প্রতি এক আকর্ষণ সৃষ্টি হবে। যতটা খোদা তা'লা চান ততটা সারা পৃথিবীর পুণ্যবান লোকদের ইসলামে সমবেত করবেন। এরপর (যুগের) সমাপ্তি ঘটবে। এসব বিষয় প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। একইভাবে সঠিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছিল যে, সেই মসীহ মওউদ শতাব্দীর শিরোভাগে আসবেন আর

*** টীকাঃ** যদিও ভুলবশত খ্রিষ্টানরা লিখেছে যে, হযরত ঈসা হযরত মূসার পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু এটি তারা ভুল করেছে। ইহুদীদের ইতিহাস থেকে সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত যে, ইসূ অর্থাৎ হযরত ঈসা মূসার পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবিভূত হয়েছেন, আর সে কথাই সঠিক; যদিও সাদৃশ্য প্রমাণ করার জন্য পুরো মিল থাকা আবশ্যক নয়। যেমন- কোনো ব্যক্তিকে যদি বলা হয়, এ ব্যক্তি বাঘ তাহলে আবশ্যক নয় যে, বাঘের ন্যায় তার থাবা, চামড়া আবার লেজও থাকবে এবং বাঘের ন্যায় গর্জনও করবে বরং এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির মতো যখন বলা হয় তখন একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সাদৃশ্য থাকা যথেষ্ট হয়ে থাকে। অতএব খ্রিষ্টানদের কথা যদি মেনে নেই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে হযরত ঈসা (আ.) এসেছেন তাহলেও কোনো সমস্যা নেই, কেননা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী পরস্পর লাগোয়া। যুগের এতটা পার্থক্য সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে কোনো বিপত্তি সৃষ্টি করে না। কিন্তু আমরা এখানে ইহুদীদের কথাকে প্রাধান্য দেই যারা বলে যে, ইসূ বা হযরত ঈসা হযরত মূসার পর ঠিক চতুর্দশ শতাব্দীতে নবুওয়তের দাবি করেছিলেন, কেননা তাদের হাতে যে হিব্রু তওরাত রয়েছে তা খ্রিষ্টানদের অনুবাদের চেয়ে বেশি সঠিক। –লেখক

তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হবেন। অতএব এসব লক্ষণ এ যুগে পূর্ণতা লাভ করেছে। লিখিত আছে যে, তিনি তাঁর জন্মের নিরিখে দুটি শতাব্দীকে মিলিত করবেন আর তাকে দুটো নাম দেওয়া হবে। আর তাঁর জন্মে দু-বংশের সম্মিলন ঘটবে। তাঁর চতুর্থ দ্বৈত বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যমজ জন্মগ্রহণ করবেন। অতএব এসব নিদর্শন প্রকাশ পেয়ে গেছে, কেননা দুটো শতাব্দী থেকে অংশ পাওয়া অর্থাৎ আমার ক্ষেত্রে যুল-কারনাইন হওয়া এমনভাবে প্রমাণিত যে, কোনো জাতির নির্ধারিত এমন কোনো শতাব্দী নেই যাতে আমার জন্ম সেই জাতির দুটো শতাব্দীকে যুক্ত করে নি। একইভাবে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমি দুটো নাম পেয়েছি। প্রধানত আমার নাম উম্মতি রাখা হয়েছে, যেমনটি আমার নাম গোলাম আহমদ থেকে স্পষ্ট। আর দ্বিতীয়ত আমার নাম রূপকভাবে নবী রাখা হয়েছে, যেভাবে বারাহীনের পূর্বের খণ্ডগুলোতে খোদা আমার নাম 'আহমদ' রেখেছেন। এ নামেই তিনি আমাকে বার বার সম্বোধন করেছেন আর এটি একথার দিকে ইঙ্গিত ছিল যে, আমি ছায়া নবী।*

অতএব আমি উম্মতিও আর রূপক অর্থে নবীও। এর প্রতি খোদার সেই ওহীও ইঙ্গিত করে যা বারাহীনের পূর্বের খণ্ডগুলোতে বিদ্যমান।

كُلُّ بَرَكَةٍ مِّنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَبَارَكَ مَنْ عَلَّمَ وَتَعَلَّمَ

অর্থাৎ সকল কল্যাণ মহানবী (সা.)-এর সত্তা থেকে উৎসারিত। অতএব বহু কল্যাণের অধিকারী সেই ব্যক্তি যিনি শিখিয়েছে, অর্থাৎ মহানবী (সা.)। এছাড়া অনেক কল্যাণের অধিকারী সে, যে শিখেছে অর্থাৎ এই অধম। অতএব পূর্ণ আনুগত্যের কারণে আমার নাম উম্মতি রাখা হয়েছে আর নবুওয়তের পূর্ণ প্রতিফলন গ্রহণের কারণে আমার নাম নবী হয়েছে। এভাবে আমার দুটো নাম অর্জিত হলো। যারা বার বার আপত্তি করে যে, সহীহ মুসলিমে আগমনকারী ঈসার নাম নবী রাখা হয়েছে তাদের জন্য আবশ্যক হলো আমাদের বক্তব্য

---

* **টীকাঃ** 'নবী হওয়া' শব্দ শুনে কেউ যেন এখানে বিভ্রান্ত না হয়। আমি বার বার লিখেছি যে, এটি স্বাধীন নবুওয়ত নয়। কোনো স্বাধীন নবী উম্মতি আখ্যায়িত হতে পারে না, কিন্তু আমি উম্মতি। এটি খোদার পক্ষ থেকে একটি সম্মানসূচক নাম মাত্র– যা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে অর্জিত হয়েছে যেন হযরত ঈসার সাথে পূর্ণ সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। –লেখক

মনোযোগ সহকারে পাঠ করা, কেননা যে মুসলিম শরীফে আগমনকারী ঈসার নাম নবী রাখা হয়েছে একই মুসলিম শরীফে আগমনকারী ঈসার নাম উম্মতিও রাখা হয়েছে। আর শুধু হাদীসেই নয়, বরং কুরআন শরীফ থেকেও এটিই সাব্যস্ত হয়, কেননা সূরা তাহরীমে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ উম্মতের কিছু লোকের নাম মরিয়ম রাখা হয়েছে আর শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের কারণে সেই মরিয়মে খোদার পক্ষ থেকে রূহ বা আত্মা ফুৎকার করা হয়েছে। আত্মা বা রূহ ফুৎকারের পর মরিয়ম হতে ঈসার জন্ম লাভ হয়েছে। এ ভিত্তিতে খোদা তা'লা আমার নাম মরিয়ম রেখেছেন, কেননা আমার জীবনের একটি কাল সম্পূর্ণভাবে মরিয়মী অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে। আর এরপর সেই মরিয়মী অবস্থা যখন খোদার পছন্দ হয়েছে তখন আমার ভেতর তাঁর পক্ষ হতে এক রূহ ফুৎকার করা হয়েছে। এই রূহ ফুৎকারের পর আমি মরিয়মী অবস্থা হতে উন্নতি করে ঈসা হয়ে গিয়েছি। যেমনটি আমার গ্রন্থ বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যমান। বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্বের খণ্ডগুলোতে আমার নাম মরিয়ম রাখা হয়েছে। যেমনটি খোদা তা'লা বলেন, يا مريم اسكن انت و زوجك الجنّة অর্থাৎ হে মরিয়ম! তুমি এবং তোমার সাথি উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করো। একই বারাহীনে আমাকে মরিয়ম উপাধি দিয়ে বলেন, نَفختُ فيك من روح الصدق অর্থাৎ হে মরিয়ম! আমরা তোমাতে নিষ্ঠার রূহ ফুঁকে দিয়েছি। অতএব রূপকভাবে আত্মা ফুৎকার করা সেই গর্ভধারণের সাথে সামঞ্জস্য রাখে যা মরিয়ম সিদ্দীকার ক্ষেত্রে ঘটেছিল। এই গর্ভের পর কিতাবে আমার নাম ঈসা রাখা হয়েছে। যেমন তিনি বলেন, يا عيسٰى انّى متوفّيك ورافعك الىّ অর্থাৎ হে ঈসা! আমিই তোমাকে মৃত্যু দেবো আর মুমিনদের ন্যায় আমি তোমাকে আমার পানে উত্থিত করব। এভাবে আমি খোদার কিতাবে ঈসা ইবনে মরিয়ম আখ্যায়িত হলাম। মরিয়ম যেহেতু একজন উম্মতি আর ঈসা একজন নবী অতএব আমার নাম মরিয়ম ও ঈসা রাখার মাধ্যমে এটি প্রকাশ করা হয়েছে যে, আমি উম্মতিও আবার নবীও, কিন্তু সেই নবী যে আনুগত্যের কল্যাণে ছায়াস্বরূপ খোদার দৃষ্টিতে নবী হয়েছে। আমার ঈসা ইবনে মরিয়ম হওয়া সে বিষয়, যা সম্পর্কে নির্বোধরা আপত্তি করে থাকে যে, হাদীসে আগমনকারী ঈসার নাম ঈসা ইবনে মরিয়ম রাখা হয়েছে, কিন্তু এ ব্যক্তি যে ইবনে মরিয়ম নয়, তার মায়ের নাম মরিয়ম ছিল না। আর জানে না যে, সূরা তাহরীমে প্রদত্ত

প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমার নাম প্রথমে মরিয়ম রাখা হয়েছে; এরপর খোদার কৃপায় আমাতে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ খোদা স্বীয় একটি বিশেষ বিকাশের মাধ্যমে সেই মরিয়মী অবস্থা হতে একটি ভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করেছেন আর এর নাম রেখেছেন ঈসা। যেহেতু সেই অবস্থা মরিয়মী অবস্থা হতে সৃষ্ট এ কারণে খোদা আমাকে ঈসা বিন মরিয়ম নামে সম্বোধন করেছেন, আর এভাবে আমি ঈসা বিন মরিয়ম হলাম। বস্তুত এখানে মরিয়ম বলতে সেই মরিয়মকে বুঝায় না যিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর মা ছিলেন, বরং খোদা একটি আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যের নিরিখে আমার নাম বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্বের খণ্ডগুলোতে মরিয়ম রেখেছেন যা মরিয়ম ও ঈসার মায়ের সাথে আমার ছিল। পুনরায় আমার প্রতি ভিন্ন একটি রূপে বিকশিত হয়ে সেটিকে রূহ ফুৎকার করার সাথে তুলনা করেছেন। আর সেই রূহ যখন প্রকাশিত হলো তখন সেই (রূহ বা আত্মার) দৃষ্টিকোণ থেকে আমার নাম ঈসা রেখেছেন। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমার নাম ঈসা বিন মরিয়ম রাখা হয়েছে।

এখানে এ গূঢ় তত্ত্বও ভালোভাবে বুঝা উচিত যে, কুরআন শরীফে আয়াত يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ (আলে ইমরান: ৫৬) হযরত ঈসার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। এর কারণ হলো হযরত ঈসাকে (ইহুদীরা) কাফির আখ্যা দিয়েছে (আর) তাঁর সম্পর্কে ইহুদীদের বিশ্বাস এটিই ছিল যে, তার আত্মা খোদার পানে উত্থিত হয় নি। আমার জাতির বিরোধীরাও আমার সম্পর্কে একই বিশ্বাস পোষণ করে। অর্থাৎ তারা বলে– এ ব্যক্তি কাফির, এর আত্মা খোদার পানে উত্থিত হবে না। তাদের কথা খণ্ডনের জন্য খোদা তা'লা আমাকে বলেন, মৃত্যুর পর আমি তোমার আত্মা বা রূহ আমার দিকে উঠাবো। এছাড়া اِنّى متوفّيك এর মাঝে একটি ভবিষ্যদ্বাণীও অন্তর্নিহিত আছে আর তা হলো, আরবী ভাষায় তাওয়াফফা নিহত হওয়া বা ক্রুশের মৃত্যুকে বলা হয় না, বরং স্বাভাবিক মৃত্যুকে বলা হয়। যেমন- আল্লামা যামাখশরী তার তফসীর কাশশাফে আয়াত يا عيسى إنّى متوفّيك -এর তফসীরে লিখেছেন যে, إنّى مميتك حتف انفك অর্থাৎ আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেবো। যেহেতু খোদা তা'লা জানতেন হযরত ঈসার ন্যায় আমাকে হত্যা করা ও ক্রুশে মারার জন্যও চেষ্টা করা হবে, এ কারণে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে আমাকে সম্বোধন করে বলেন, يا عيسى انّى متوفيك । এতে এ ইঙ্গিতই ছিল যে, আমি তোমাকে নিহত হওয়া বা ক্রুশের মৃত্যু থেকে রক্ষা করব। এটি জানা কথা,

আমাকে হত্যা করা বা ক্রুশে মারার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। জাতির আলেমরা আমাকে হত্যা করার জন্য ফতোয়া জারি করেছে আর ফাঁসি দেবার উদ্দেশ্যে একটি মিথ্যা মামলা আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে যাতে বাদী ছিল পাদরি মার্টিন ক্লার্ক। আর সাক্ষীদের মাঝে একজন ছিলেন আবু সাঈদ মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, আমি আবদুল মজীদ* নামের এক ব্যক্তিকে মার্টিন ক্লার্ককে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছি। আমার বিরুদ্ধে পুরো সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়; কিন্তু খোদা আমাকে মামলার পূর্বেই সংবাদ দিয়েছেন যে, এমন মামলা দায়ের করা হবে আর আমি তোমাকে রক্ষা করব। সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী মামলার পূর্বেই প্রায় ৬০, ৭০ বা ৮০জনকে শোনানো হয়েছে। খোদা আমাকে স্বীয় পবিত্র ওহী অনুসারে এই মিথ্যা মামলা হতে সসম্মানে রক্ষা করেছেন। অতএব সেসব অপচেষ্টা আমাকে ফাঁসি দেবার নিমিত্তে ছিল যেমনটি ইহুদীরা হযরত ঈসার বিরুদ্ধে করেছিল।

মজার বিষয় হলো, যেভাবে রোমান পিলাত (যে সেই অঞ্চলের গভর্নর ছিল যেখানে হযরত ঈসা বসবাস করতেন) ইহুদীদের বলেছিল– আমি এ ব্যক্তির অর্থাৎ ঈসার এমন কোনো অপরাধ দেখি না, যার কারণে আমি তাকে ফাঁসি দিতে পারি। একইভাবে সেই বিচারক যার আদালতে আমার বিরুদ্ধে হত্যার মামলা ছিল, তার নাম ছিল ডগলাস, আমাদের জেলার যিনি ডেপুটি কমিশনার ছিলেন, আমাকে সম্বোধন করে তিনি বলেন– আমি আপনাকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করব না। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, যেভাবে হযরত ঈসার সাথে একজন চোরকেও ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেভাবে যেদিন আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা এই মিথ্যা হত্যা মামলার রায় প্রদান করা হয়, সেদিন একই আদালতে মুক্তিফৌজের এমন এক খ্রিষ্টান চোরও পেশ হয়েছিল, যে কিছু টাকা চুরি করেছিল। বস্তুত আমার সম্পর্কে খোদা তা'লার يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ বলা, একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল যাতে এ ইঙ্গিত ছিল যে, হযরত ঈসার ন্যায় আমাকেও হত্যা করার কিছু চক্রান্ত করা হবে কিন্তু সেসব ষড়যন্ত্রে শত্রু ব্যর্থ হবে।

*** টীকাঃ** এটি একটি মুদ্রণপ্রমাদ। প্রকৃত নামটি হলো 'আব্দুল হামীদ'। –অনুবাদক

তৃতীয় বিষয়, যা আমাকে দুয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে তা হলো, আমার জাতিগত অবস্থা। যেমনটি বাহ্যত শ্রুতি রয়েছে যে, পিতার দিক থেকে আমি মোঘল, কিন্তু আমার কোনো কোনো দাদি সৈয়দ বংশীয় ছিলেন কিন্তু খোদা তা'লা আমাকে পিতার দিক থেকে পারস্য বংশোদ্ভূত আখ্যা দেন আর মায়ের দিক থেকে ফাতেমি আখ্যায়িত করেন, তাই সত্য তা-ই যা তিনি বলেন।

চতুর্থ বিষয়, যা আমাকে দুয়ের সাথে যুক্ত করে তা হলো, আমি যমজ জন্মগ্রহণ করেছি। আমার সাথে এক মেয়ে ছিল যে আমার পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিল।

আমরা পুনরায় আমাদের মূল কথার দিকে ফিরে এসে বলছি যে, একথা বলা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত ও আত্মপ্রতারণার শামিল যে, হাদীসে মসীহ মওউদের জন্য নবী নাম দেখে মনে করা হবে যে, তিনি (পূর্বের) ঈসা (আ.)-ই। কেননা সেসব হাদীসে যদিও আগমনকারী ঈসার নাম নবী রাখা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে এমন একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, সেই শর্তের নিরিখে সম্ভবই নয় যে, সেই নবী বলতে ইসরাঈলী ঈসা বুঝাবে। কেননা নবী নাম রাখা সত্ত্বেও সেই ঈসাকে সেই হাদীসগুলোতে উম্মতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি উম্মতি শব্দের অর্থে প্রণিধান করবে, সে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে যে, হযরত ঈসাকে উম্মতি আখ্যা দেওয়া একটি কুফরি, কেননা উম্মতি তাকে বলা হয়ে থাকে যে মহানবীর অনুসরণ ও কুরআনের অনুকরণ না করলে নিছক পথভ্রষ্ট ও বেদীন এবং বেঈমান থেকে যায় আর মহানবী ও কুরআন শরীফের অনুকরণ ও অনুসরণের কল্যাণে তার ঈমান ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়ে যায়। কিন্তু এটি জানা কথা যে, হযরত ঈসা সম্পর্কে এমনটি মনে করা কুফরী, কেননা তিনি মর্যাদায় মহানবী থেকে যত ছোটোই হোন না কেন, একথা বলা যাবে না যে– যতদিন তিনি পৃথিবীতে এসে মহানবী (সা.)-এর উম্মতভুক্ত না হবেন, ততদিন নাউযুবিল্লাহ পথভ্রষ্ট, বেদীন ও অসম্পূর্ণ আর তাঁর তত্ত্বজ্ঞান অপূর্ণ! অতএব আমি আমার বিরোধীদের নিশ্চিতভাবে বলতে চাই যে, হযরত ঈসা মোটেও উম্মতি নন। যদিও তিনি বরং সকল নবী মহানবী (সা.)-এর সত্যতায় বিশ্বাস রাখতেন, কিন্তু তারা সেসব শিক্ষার অনুসারী ছিলেন যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল আর সরাসরি খোদা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। উম্মতি হবার জন্য তারা মহানবীর অনুসরণ করবেন বা তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষায় নবী হয়ে থাকবেন এমনটি আদৌ নয়। খোদা তা'লা তাদেরকে পৃথক

কিতাব দিয়েছিলেন আর সেসব কিতাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যেমনটি কিনা কুরআন শরীফ এর সাক্ষী। অতএব এই স্পষ্ট সাক্ষ্যের নিরিখে হযরত ঈসা কীভাবে মসীহ মওউদ হতে পারেন? অতএব তিনি যেহেতু উম্মতি নন, তাই তিনি তেমন নবীও হতে পারেন না যার জন্য উম্মতি হওয়া আবশ্যক। একইভাবে আমার জন্য খোদা তা'লা শত শত নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন যার কতক বারাহীনের এ খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে।

তার প্রশ্নঃ

এখন হযরতের বয়স কত? হযরত যে শুভসংবাদ দেন যে, হযরতের মাধ্যমে ইসলাম অসাধারণভাবে উন্নতি করবে, প্রশ্ন হলো সেই উন্নতি কি হযরতের জীবদ্দশায় হবে? এর ব্যাখ্যার অপেক্ষায় থাকলাম।

আমার উত্তরঃ

বয়সের প্রকৃত জ্ঞান খোদা তা'লাই জানেন, কিন্তু আমি যতটা জানি এখন ১৩২৩ হিজরি সনে আমার বয়স ৭০ বছরের কাছাকাছি। বাকি আল্লাহই ভালো জানেন। আমি জানি না ইসলামের পুরো উন্নতি কি আমার জীবদ্দশায় হবে নাকি আমার পরে। অবশ্য আমার বিশ্বাস হলো, ধর্মের পুরো উন্নতি কখনো নবীর জীবদ্দশায় হয় নি, বরং নবীদের কাজ এটি যে, তারা উন্নতির কিছুটা নিদর্শন প্রদর্শন করেন বাকি উন্নতি তাদের তিরোধানের পর সাধিত হয়েছে। যেমন- আমাদের নবী (সা.) পুরো পৃথিবীর জন্য এবং প্রত্যেক কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় লাল জাতি অর্থাৎ ইউরোপের লোকেরা ইসলাম থেকে কোনো অংশ পায় নি। একজনও ইসলাম গ্রহণ করে নি। আর যারা কৃষ্ণাঙ্গ ছিল, তাদের মাঝে কেবল আরব উপদ্বীপে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন। তাই আমি মনে করি আমার ক্ষেত্রেও এমনটিই হবে। খোদার পক্ষ থেকে বার বার আমার প্রতি কুরআনের ওহী–

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

(ইউনুসঃ ৪৭)

অবতীর্ণ হয়েছে। এর ভিত্তিতে আমি আশা করি, কোনো না কোনো সাফল্য আমার জীবদ্দশায় লাভ হবে।

তার প্রশ্নঃ

হাদীসে কোনো জীবের ছবি ওঠানোর বিষয়ে কঠিন সতর্কবাণী রয়েছে, কিন্তু হুযূরের যে ছবি ছাপানো হয়েছে তা দেখে মনে হয় হযরত এটিকে বৈধ মনে করেন।

আমার উত্তরঃ

কেউ আমার ফটো উঠিয়ে তা মূর্তিপূজারিদের ন্যায় নিজের কাছে রাখবে বা প্রচার করবে, আমি এর ঘোর বিরোধী। আমি আদৌ কাউকে এমনটি করার নির্দেশ দেই নি। আর প্রতিমা পূজা ও ছবি পূজার আমার চেয়ে বড়ো শত্রু আর কেউ হবে না। কিন্তু আমি দেখেছি, বর্তমানে ইউরোপের মানুষ যে ব্যক্তির রচনা পড়তে চায় প্রথমে তার ছবি দেখা পছন্দ করে, কেননা ইউরোপীয় দেশসমূহ বিচক্ষণতায় অনেক উন্নতি করেছে। তাদের বেশিরভাগ মানুষ শুধু ছবি দেখে চিনতে পারে যে, এমন দাবিকারক সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী। তারা সহস্র সহস্র মাইলের দূরত্বের কারণে আমার কাছে পৌঁছাতে পারে না আর চেহারা দেখারও সুযোগ পায় না। তাই সেসব দেশের বিচক্ষণ লোকেরা ছবির মাধ্যমে আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ে ভাবে। বেশ কিছু এমন মানুষ আছে যারা ইউরোপ বা আমেরিকা থেকে আমার কাছে পত্র লিখেছে আর নিজেদের পত্রে লিখেছে যে, আমরা আপনার ছবি গভীর দৃষ্টিতে দেখেছি আর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের মানতে হয়েছে যে, এই ছবি যার– তিনি মিথ্যাবাদী নন। একজন আমেরিকান মহিলা আমার ছবি দেখে বলে যে, এটি যীশু বা ঈসা (আ.)-এর ছবি। অতএব এ উদ্দেশ্যে এবং এতটা, আমি এই রীতি সূচিত হবার বিষয়ে যথার্থ কারণে নীরবতা অবলম্বন করেছি, انما الاعمال بالنيات এছাড়া আমি একথা বিশ্বাস করি না যে, ছবি তোলা শতভাগ নিষিদ্ধ। কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত যে, জিন ফিরকা হযরত সোলায়মানের জন্য ছবি বানাতো আর বনী ইসরাঈলের কাছে দীর্ঘকাল নবীদের ছবি সংরক্ষিত ছিল যাতে মহানবী (সা.)-এরও ছবি ছিল। জিবরাঈল মহানবী (সা.)-কে হযরত আয়েশার ছবি একটি রেশমি কাপড়ে দেখিয়েছিলেন। পানিতে কোনো কোনো পাথরে কোনো কোনো প্রাণীর ছবি প্রকৃতিগতভাবে ছেপে যায়। যে যন্ত্রের মাধ্যমে বর্তমান যুগে ছবি তোলা হয় তা মহানবীর যুগে আবিষ্কৃত হয় নি। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্র যার

মাধ্যমে অনেক রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। ছবি তোলার জন্য আরো একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যার মাধ্যমে মানুষের সকল হাড়ের ছবি ওঠানো হয়। অস্থিসন্ধি বা জোড়ার ব্যথা, গাউট ইত্যাদি রোগ নির্ণয়ের জন্য এ যন্ত্রের মাধ্যমে ছবি ওঠানো হয় আর রোগ নির্ণয় হয়। একইভাবে ফটোর মাধ্যমে জ্ঞানের অনেক কল্যাণকর দিক সামনে এসেছে। যেমন- কোনো কোনো ইংরেজ ফটোর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল প্রাণী, এমনকি বিভিন্ন প্রকার পঙ্গপালের ছবি এবং সকল প্রকার পশুপাখির ছবি নিজেদের পুস্তকে ছেপে দিয়েছে, যার ফলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাই ভাবা যায় কি যে, সেই খোদা যিনি জ্ঞান অর্জনের প্রেরণা যোগান তিনি এমন যন্ত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করবেন যার মাধ্যমে বড়ো বড়ো কঠিন রোগ নীর্ণিত হয় আর বিচক্ষণদের জন্য হিদায়াত লাভের একটি মাধ্যম হয়ে যায়। এসব হলো সব অজ্ঞতা যা ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের মৌলবিরা বাদশার চেহারা খচিত রুপি এবং দুআনা, চার আনা ও আধুলি নিজেদের পকেট ও ঘর থেকে কেন বাইরে ছুড়ে ফেলে দেয় না? এসব মুদ্রায় কি ছবি নেই? পরিতাপ! এরা অযৌক্তিক কথাবার্তা বলে শত্রুদেরকে ইসলামের প্রতি হাসি-তিরস্কারের সুযোগ করে দেয়। ইসলাম এমন সকল বাজে কাজকে হারাম বা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছে যা শিরকের সহায়ক। এমন কাজকে নয় যা মানবীয় জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে এবং রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হয়ে থাকে আর প্রজ্ঞাবানদের হিদায়াত লাভের যোগ্য করে তোলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার জামা'তের সদস্যরা এমন প্রয়োজন দেখা দেওয়া ছাড়া, যে ক্ষেত্রে তারা অপারগ, সাধারণ রীতি হিসেবে আমার ফটো ছাপানোকে নিজেদের উপার্জনের উপায় এবং পেশা বানিয়ে নেবে! এমনটি আমি আদৌ পছন্দ করব না। কেননা এভাবে ধীরে ধীরে বিদাতের সূচনা হয় এবং বিষয় শিরকে পর্যবসিত হয়। তাই আমি আমার জামা'তকে এখানেও নসীহত করব, তারা যেন যথাসাধ্য এমন কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকে। আমি কোনো কোনো লোকের কার্ড দেখেছি যেগুলোর পেছনে একপ্রান্তে আমার ছবি খচিত ছিল। আমি এমন প্রচারের প্রচণ্ড বিরোধী। আমি চাই না আমার জামা'তের কেউ এমন কাজ করুক। একটি কল্যাণকর ও যথাযথ বিষয়ের জন্য কাজ করা এক বিষয় আর হিন্দুদের ন্যায় নিজেদের জ্যেষ্ঠদের ছবি স্থানে-অস্থানে দেয়ালে-দ্বারে ঝুলিয়ে রাখা একটি ভিন্ন বিষয়। সবসময় দেখা গিয়েছে যে, এমন বাজে কাজ মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে

যায় আর এর ফলে বড়ো বড়ো ব্যাধির জন্ম হয়, যেমনটি হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের মাঝে দেখা দিয়েছে। আমি মনে করি, যে ব্যক্তি আমার নসীহতকে সম্মান ও মাহাত্ম্যের দৃষ্টিতে দেখে আর যে আমার সত্য অনুসারী, সে এ নির্দেশের পর এমন কাজ থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় সে আমার নির্দেশনার পরিপন্থি কাজ করছে বলে গণ্য হবে আর ধৃষ্টতার সাথে শরীয়তের শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করে বলে বিবেচিত হবে।

এমন মানুষ যারা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না আর আমার অবস্থা সম্পর্কেও অবগত নয় নিছক ছোটো মনের পরিচয় দিয়ে ও নির্বুদ্ধিতার বশবর্তী হয়ে আমার সম্পর্কে এমনসব আপত্তি ছাপিয়ে দিয়েছে যে, এর মাধ্যমে যদি কিছু প্রমাণিত হয় তাহলে তা কেবল এটিই যে, তারা যতটা জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে জাগতিক আসন ও পদ লাভের চেষ্টা করে, তার সহস্র ভাগের একভাগও ধর্মের দিকে তাদের মনোযোগ নেই। তাদের আপত্তি শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য হতে হয় যে, এরা মুসলমান আখ্যায়িত হয় ঠিকই কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ।

একটু ভাবা উচিত, এগুলো তাদের কেমন আপত্তি? যেমন- তারা বলে যে, এটি কেবল অর্থ উপার্জনের একটি কৌশল, আর তাঁর (অর্থাৎ হযরত মির্যা সাহেবের –অনুবাদক) সাহায্যকারীরা বেতনভাতা পায়। এখন যার হৃদয়ে সামান্য খোদাভীতি আছে তার ভাবা উচিত যে, এটি কি সেই আপত্তি নয় যা আদি হতে নবীদের বিরুদ্ধে অন্ধ হৃদয়ের লোকেরা করে আসছে। ফেরাউন মূসা সম্পর্কে কুধারণা করে আর নিজের লোকদের ডেকে বলে যে, এ ব্যক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো তোমাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে তা দখল করা। একইভাবে ইহুদীরা হযরত ঈসা সম্পর্কে এই ধারণার ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এ ব্যক্তি ষড়যন্ত্রবাজ আর নবী হবার ভান করে আমাদের শাসক সাজতে চায়। আমাদের নবী (সা.) সম্পর্কেও কুরাইশ কাফিররা এই কুধারণাই পোষণ করে, যেমনটি কুরআনে তাদের উক্তি إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (সোয়াদঃ ৭) লিপিবদ্ধ রয়েছে, অর্থাৎ এ দাবির পেছনে কোনো স্বার্থ আছে। অতএব এমন আপত্তিকারীদের জন্য আমরা কিবা আক্ষেপ করতে পারি? তারা পূর্ববর্তী অস্বীকারকারীদের রীতি অনুসরণ করছে। সত্যান্বেষীর রীতি হওয়া উচিত দাবি মনোযোগ সহকারে দেখা আর প্রমাণাদি ন্যায়সংগতভাবে বিশ্লেষণ করা এবং সে কথা বলা যা বিবেক, খোদাভীতি ও ইনসাফের দাবিসম্মত। এমনটি হওয়া

উচিত নয় যে, পরীক্ষানীরিক্ষা করার পূর্বেই তারা বলতে আরম্ভ করবে যে, এই ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছে কেবল অর্থ উপার্জনের জন্য।

এছাড়া একটি আপত্তি এটিও করা হয় যে, ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো পূর্ণ হয় নি। এ আপত্তির উত্তর হিসেবে এতটা লেখাই যথেষ্ট যে, لعنة الله على الكاذبين অর্থাৎ যদি তারা আমার বইগুলো মনোযোগ সহকারে দেখত বা আমার জামা'তের জ্ঞানী ও অবগত লোকদের জিজ্ঞেস করত তাহলে তারা জানতে পারত যে, বেশ কয়েক হাজার ভবিষ্যদ্‌বাণী আজ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করেছে। এসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতার সাক্ষী কেবল দু-একজন নয়, বরং সহস্র সহস্র মানুষ। অনর্থক সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে কী লাভ? এমন কথায় হযরত ঈসার দ্বিতীয়বার (আকাশ হতে) আগমনের বিশ্বাস কি দৃঢ়তা লাভ করবে? হযরত ঈসার দ্বিতীয়বার আগমনের বিশ্বাস পরিত্যাগ করা উচিত। সকল বিরোধীর বিশ্বাস রাখা উচিত, নিজ সময়ে তাকে মরতে হবে এবং মরবে, কিন্তু হযরত ঈসাকে আকাশ থেকে অবতরণ করতে কেউ দেখবে না। এটিও আমার একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী যার সত্যতার সাক্ষী প্রত্যেক বিরোধী স্বীয় মৃত্যুর সময় হবে। যত মোল্লা-মৌলবি রয়েছে আর সকল শত্রু যারা আমার বিরুদ্ধে কলম ধরে তাদের সবার স্মরণ রাখা উচিত, যারা হযরত ঈসাকে আকাশ হতে অবতরণ করতে দেখতে চায় তারা নিজেদের সেই আশা অপূর্ণ থাকার আক্ষেপ নিয়েই মরবে। মৃত্যুশয্যায় মারাত্মক অসুস্থতার মাঝে কাতরাতে থাকবে আর চরম দুঃখবেদনার মাঝে পৃথিবী ছেড়ে যাবে, কিন্তু আদৌ তাকে অবতরণ করতে দেখবে না– এটি কি ভবিষ্যদ্‌বাণী নয়? তারা কি বলতে পারে যে, এটি পূর্ণ হবে না? অবশ্যই পূর্ণ হবে। তাদের ঘরে যদি সন্তানসন্ততি হয় তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত, তারাও ঠিক সেভাবেই ব্যর্থ অবস্থায় মারা যাবে, কিন্তু কেউ আকাশ থেকে আসবে না। যদি সন্তানের সন্তান হয় তারাও এই ব্যর্থতার ভাগী হবে; তাদের কেউ হযরত ঈসাকে আকাশ থেকে অবতরণ করতে দেখবে না।

কোনো কোনো নির্বোধ বলে, আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কে কৃত ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয় নি। তারা বোঝে না যে, এই ভবিষ্যদ্‌বাণীও আবদুল্লাহ আথম-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণীর ন্যায় শর্তসাপেক্ষ ছিল। ভবিষ্যদ্‌বাণীতে খোদা তা'লা তার বিবাহিত স্ত্রীর নানিকে সম্বোধন করে বলেন, توبی توبی فانّ البلاء علی عقبك অর্থাৎ হে মহিলা! তওবা করো, কেননা তোমার মেয়ের কন্যা বা দৌহিত্রীর

ওপর বিপদ নেমে আসতে যাচ্ছে। অতএব স্বয়ং আহমদ বেগ যখন ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর মৃত্যুবরণ করে– যা এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর একটি শাখা তখন মানবপ্রকৃতির দাবি অনুসারে তার সাথে সম্পৃক্ত সবার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার হয়। তারা ভয় পেয়ে যায় আর কাকুতিমিনতি করে। এ কারণে খোদা তা'লা এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতা বিলম্বিত করেন। এটি ছিল শর্তসাপেক্ষ ভবিষ্যদ্‌বাণী, যেমনটি ছিল আবদুল্লাহ আথমের মৃত্যু-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী, যার মৃত্যুর পর প্রায় এগারো বছর কেটে গেছে। ইউনুস নবী তার জাতির ধ্বংসের যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন তাতে কোনো শর্ত ছিল না, কিন্তু সেই জাতিও তওবা ও এস্তেগফার করে নিস্তার পেয়েছে। আমরা বার বার বলেছি যে, সতর্কীকরণমূলক ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো তওবা ও এস্তেগফারের মাধ্যমে বিলম্বিত হতে পারে, বরং রহিত হতে পারে, যেমনটি ইউনুসের জাতির ধ্বংস-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী তওবার মাধ্যমে টলে গিয়েছিল। কিন্তু পরিতাপ! এ যুগের লোকেরা কেমন অন্ধ! বার বার তাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে উত্তর দেওয়া হয়, তা সত্ত্বেও তারা বুঝে না। ইউনুস নবী কি তাদের দৃষ্টিতে সত্য নবী ছিলেন না? যার ভবিষ্যদ্‌বাণী নিঃশর্ত ছিল এবং অকাট্য ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল যে, চল্লিশ দিনের ভেতর তার জাতিকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করা হবে। কিন্তু সে জাতি ধ্বংস হয় নি। কিন্তু এখানে এমন আপত্তি করারও সুযোগ নেই যেমনটি ইউনুসের ভবিষ্যদ্‌বাণীতে ছিল। এখানে আবদুল্লাহ আথম এবং আহমদ বেগ ও তার জামাতার মৃত্যু সম্পর্কে শর্তসাপেক্ষ ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল। অদ্ভুত বিষয় হলো, চারটি ভবিষ্যদ্‌বাণীর মাঝে তিনটি ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে আর আবদুল্লাহ আথম, আহমদ বেগ ও লেখরাম ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পর দীর্ঘকাল কেটে গেছে; তা সত্ত্বেও এরা আপত্তি করা থেকে বিরত হয় না।

তারা এ আপত্তিও করে যে, আহমদ বেগের মেয়ের জন্য বিভিন্ন প্রকার আশা কেন জাগানো হলো বা কেন লোভ দেখানো হলো? এরা বোঝে না, চেষ্টা করার কারণ হলো সেই অদৃষ্ট যেন মুলতুবি হয়ে যায় এবং শাস্তি যেন টলে যায়। একই চেষ্টা আবদুল্লাহ আথম ও লেখরামের ক্ষেত্রেও করা হয়েছিল। একথা কোথা থেকে উদ্‌ঘাটন করলেন যে, কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতার জন্য বৈধ চেষ্টা করা নিষিদ্ধ। গভীর দৃষ্টিতে দেখো আর লজ্জাবোধকে কাজে লাগাও। মহানবী (সা.)-কে কুরআনে কি এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়

নি যে, আরবের প্রতিমা পূজার প্রথা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এর স্থলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে আর সেদিন আসবে যখন কাবা শরীফের চাবি মহানবী (সা.)-এর হাতে থাকবে– তিনি যাকে চাইবেন দেবেন? খোদা এ সবকিছু নিজেই করবেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম প্রচারের জন্য এমনসব চেষ্টা করা হয় যার বিস্তারিত বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই। সত্য কথা হলো, সহীহ হাদীসে আছে, কেউ যদি স্বপ্ন দেখে আর তার চেষ্টায় সেই স্বপ্ন পূর্ণ হওয়া সম্ভব হয়– তাহলে চেষ্টা করে তা পূর্ণ করা উচিত।

‘আল-খিতাবুল মালীহ্ ফী তাহ্কীকিল মাহ্দী ওয়াল মাসীহ্’ নামক গ্রন্থে উত্থাপিত সংশয়সমূহের খণ্ডন

[এটি মৌলবি রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের অসংলগ্ন উক্তিসমূহের একটি সংকলন]

এই পুস্তিকায় লেখকের জন্য যতটা সম্ভব ছিল তিনি আমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণের প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন আর নিজের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক অবাস্তব কথার আশ্রয় নিয়েছেন। এ পুস্তিকা একেবারেই কাঁচা ও ভিত্তিহীন এবং বাজে ধ্যানধারণা ও মিথ্যা কথাবার্তায় পরিপূর্ণ। আমি জানি, এর খণ্ডন লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। এমন মানুষ– যে কুরআন শরীফ ও হাদীসের কিছুটা জ্ঞান রাখে, তার জন্য এর খণ্ডন লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি যেহেতু শুনেছি যে, মৌলবি রশীদ সাহেবের শিষ্যরা সাহারনপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে এ পুস্তিকাকে অনেক গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য দিয়ে থাকে, শুধু এ কারণে এটিকে অনেক ভালোবাসার সাথে পাঠ করা হয় যে, এটি তাঁর জীবনের একটি স্মৃতিচিহ্ন। অতএব এমন লোকদেরকে এ ধরনের মানুষের প্রতারণা থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এ কয়েকটি আপত্তির উত্তর প্রদান করা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম, যে কারণে এ অঞ্চলের অজ্ঞ ও জ্ঞানহীন লোকেরা ভ্রষ্টতার ঘূর্ণিতে পাক খাচ্ছে আর মিথ্যার সমাহার এই পুস্তিকা নিয়ে গর্ব করে।

আমি এখানে সত্যসন্ধানীদের সামনে একটি সঠিক পথ উন্মোচনের নিমিত্তে প্রথমে মূল বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করি। তা হলো, আমাদের বিরোধীরা– যাদের মাঝে মৌলবি রশীদ আহমদ সাহেবও অন্তর্ভুক্ত, এ বিশ্বাস রাখে যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেন নি আর

তিনি কোনো কারণে জীবিত অবস্থায় আকাশে চলে গেছেন* আর কোনো সময় কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন, কিন্তু এটি বলে না যে, কোন্ উদ্দেশ্যে তাকে আকাশে ওঠানো হয়েছে। কেবল ইহুদীদের হাত থেকে প্রাণরক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল, নাকি অন্য কোনো ব্যাপার ছিল? আর তারা একথার কোনো সদুত্তর দিতে পারে না যে, প্রায় ২০০০ বছর হয়ে গেল! কেন তিনি আকাশে বসে আছেন? এখনও কি হৃদয়ে ইহুদীদের হাতে ধরা পড়ার ভীতি বিরাজমান? তারা এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না, কেন তাকে এই বিশেষত্ব দেওয়া হলো যে, সব নবীর বিপরীতে এত দীর্ঘকাল আকাশে বসে আছেন যা ২০০০ বছরের কাছাকাছি হবে? এরপর কোনো সময় মহানবীর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী আবার পৃথিবীতে অবতরণ করবেন! তাদের কাছে একথার যৌক্তিক কোনো সদুত্তর নেই যে, এমন দৈহিক ঊর্ধ্বারোহণ ও অবতরণের ভেতর কী প্রজ্ঞা নিহিত ছিল? ইহুদীদের হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা, নাকি অন্য কিছু। তারা একথা বলতে পারে না যে, এমন ব্যক্তিকে আকাশে আরোহণ ও অবতরণের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব দেওয়া হলো যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা জানতেন যে, তাকে খোদা বানানো হবে আর ৪০ কোটি মানুষ তার প্রতি এই অলৌকিক বিষয় আরোপ করার কারণে তাকে খোদার পুত্র, বরং খোদা মানবে। এরা যদিও জোর দিয়ে বলে যে, হযরত ঈসা মরেন নি, বরং জীবিত আছেন, কিন্তু একথার কোনো উত্তর নেই যে, খোদার রীতির বিপরীতে কুরআনের কোন্ স্পষ্ট আয়াত দ্বারা তাঁর জীবিত থাকা প্রমাণিত হয়? কিন্তু সেই বিশ্বাস, যাতে খোদা তা'লা আমাকে অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা হলো, হযরত ঈসা অন্যান্য মানুষের ন্যায় মানবীয় জীবন লাভ করে মৃত্যুবরণ করেছেন। সশরীরে আকাশে যাওয়া এবং এরপর কোনো সময় মাটির দেহ নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করা– এগুলো সবই তার বিরুদ্ধে অপবাদ। মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ তা'লা বলেন,

---

* **টীকাঃ** স্বপ্ন বিশারদরা লিখেছেন, কেউ যদি স্বপ্নে দেখে যে, সে জীবিত আকাশে চলে গেছে তাহলে তার এই স্বপ্নের অর্থ হবে তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে অর্থাৎ বিরোধীদের হত্যার ষড়যন্ত্র হতে সে নিরাপদ থাকবে। তাই হযরত ঈসাও যদি এমন স্বপ্ন দেখে থাকেন তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই আর নির্বোধরা স্বপ্নের অর্থে দৃষ্টি না দিয়ে সেটির অর্থ করেছে তাঁর সশরীরে আকাশে যাওয়া। –লেখক

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا

(বনী ইসরাঈল: ৯৪)

অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়া ও নির্ধারিত হবার যোগ্য আসল বিষয় হলো, এটি কি সত্য যে, খোদার নিয়মের বিপরীতে সত্যিই হযরত ঈসা (আ.) সশরীরে আকাশে আরোহণ করেছেন? যদি কুরআন শরীফের স্পষ্ট আয়াতের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, হযরত ঈসা সত্যিকার অর্থে সশরীরে আকাশে উত্থিত হয়েছিলেন তাহলে তাঁর অবতরণের বিষয়ে কোনো বিতর্কের প্রয়োজন নেই, কেননা যে ব্যক্তি মাটির দেহ সহ আকাশে যাবে তার কুরআনের আয়াত অনুসারে ফিরে আসা আবশ্যক।

অতএব হযরত ঈসা যদি সশরীরে আকাশে চলে গিয়ে থাকেন তাহলে এতে কী সন্দেহ আছে যে, তিনি ফিরে আসবেন। এর কারণ হলো পৃথিবীতে কোনো কাজের জন্য তার যদি আবার আসার প্রয়োজন না-ও থাকে মৃত্যুর জন্য তাকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে; কেননা আকাশে কবরের কোনো স্থান নেই। কুরআনের স্পষ্ট আয়াত থেকে প্রমাণিত যে, সব মানুষ পৃথিবীতে মারা যাবে আর ভূমিতেই তাকে কবরস্থ করা হবে। আর জমি থেকেই সে উত্থিত হবে যেমনটি আল্লাহ তা'লা বলেন,

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

(তাহা: ৫৬)

অবশ্য এটিও হতে পারে যে, আকাশ হতে অসুস্থ হয়ে আসবেন বা পথিমধ্যে অসুস্থ হতে পারেন আর ভূমিতে এসে মারা যাবেন। এটি বলার কারণ হলো, হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, আগমনকারী ঈসা হলুদ বর্ণের দুটি চাদর পরিহিত অবস্থায় অবতীর্ণ হবে। তাবীর বিশারদদের সর্বসম্মত মত হলো, তাবীরের দৃষ্টিকোণ থেকে হলুদ বর্ণের চাদরের অর্থ হলো অসুস্থতা।

আমি বেশ কয়েকবার বর্ণনা করেছি, আমি যে খোদার পক্ষ থেকে মসীহ মওউদ, হাদীসে আমার দৈহিক লক্ষণাবলির মাঝে এদুটো লক্ষণও লেখা হয়েছে। কেননা হলুদ চাদর বলতে অসুস্থতা বুঝায়, যেমনটি কিনা মসীহ মওউদ সম্পর্কে হাদীসে দুটো হুলুদ চাদরের কথা উল্লিখিত আছে সেভাবে সত্যিই আমি দুটো রোগে আক্রান্ত। একটি রোগ দেহের ওপরের অংশে যা

ওপরের চাদর আর তা হলো, মাথাঘোরা। যার ভয়াবহতার কারণে অনেক সময় আমি মাটিতে পড়ে যাই আর হৃদয়ে রক্তপ্রবাহ কমে যায় আর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় রোগ দেহের নীচের অংশে রয়েছে তা হলো, বহুমূত্র রোগ, যাকে ডায়াবেটিসও বলা হয়। প্রতিদিন বহুবার প্রস্রাব হয় আর ১৫-২০ বার পর্যন্ত এ সংখ্যা পৌঁছে যায়। অনেক সময় দিন-রাতে প্রায় ১০০ বার প্রস্রাব হয় আর এর ফলে দুর্বলতা অনেক বেড়ে যায়। অতএব এ হলো দুটো হলুদ চাদর যা আমার অদৃষ্টে এসেছে। যারা আমাকে গ্রহণ করে না তাদের অবশ্যই মানতে হবে যে, হযরত ঈসা অবতরণ করার সময় অবশ্যই আকাশ থেকে এই উপহার আনবেন, অর্থাৎ দুটো রোগ তার সাথে থাকবে। একটি দেহের ওপরের অংশে আর দ্বিতীয়টি দেহের নীচের অংশে হবে।

যদি কেউ বলে যে, এসব চাদর বলতে আসল চাদর বুঝায়, তাহলে এর অর্থ এটি হবে যে, হযরত ঈসা (আ.) অবতরণের সময় হিন্দুদের যোগীদের ন্যায় হলুদ বর্ণের দুটি চাদর পরে অবতরণ করবেন। কিন্তু এ অর্থ সেসব অর্থের পরিপন্থি যা স্বয়ং মহানবী (সা.) তার স্বপ্নের ক্ষেত্রে করেছেন। যেমন মহানবী (সা.) নিজের হাতে দুটো কড়া দেখেছিলেন আর এর অর্থ করেছেন দুইজন মিথ্যা নবী। গাভি জবাই হতে দেখেছেন আর এর অর্থ করেছেন তাঁর সাহাবীদের শাহাদত বরণ। হযরত ওমর (রা.)-এর একটি বড়ো জুব্বা দেখেছেন আর এর অর্থ করেছেন তাকওয়া। অতএব এ হাদীসেও মহানবী (সা.)-এর চিরাচরিত রীতি অনুসারে দুটো হলুদ চাদরের এ অর্থ কেন করা হবে না যা সর্বসম্মতভাবে ইসলামের সকল দক্ষ স্বপ্ন বিশারদ করেছেন যাদের একজনও এ ব্যাখ্যার বিরোধী নন; অর্থাৎ দুটো হলুদ চাদর বলতে দুটো রোগ বুঝায়। আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আমার অভিজ্ঞতাও এটি। অগণিত বার, যখনই কারো সম্পর্কে বা নিজের ক্ষেত্রে জানতে পেরেছি যে, দেহে হলুদ চাদর রয়েছে, সেক্ষেত্রে অসুস্থ হওয়া অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। অতএব যেভাবে হযরত ঈসার ক্ষেত্রে মুতাওয়াফফিকার সে অর্থ করা হচ্ছে যা সারা পৃথিবীর বিজ্ঞদের কৃত অর্থের পরিপন্থি, একইভাবে দুটো হলুদ চাদরেরও সে অর্থ করা যা মহানবী (সা.), সাহাবীরা (রা.), তাবেঈন, তবা-তাবেঈন এবং আহলে বায়তের কৃত অর্থের বিপরীত– এটি বড়ো অন্যায়।

এখন সারকথা হলো, এ পর্যায়ে এটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, হযরত ঈসা কি সত্যিই মৃত্যুবরণ করেছেন, নাকি করেন নি? কেননা একথা যদি

প্রমাণিত হয় যে, তিনি রক্তমাংসের দেহ নিয়ে আকাশে চলে গেছেন তাহলে যেমনটি আমি এখনই বর্ণনা করে এসেছি যে, মাহদীর দলে যোগ দেবার জন্য বা মরার জন্য তার পৃথিবীতে আসা আবশ্যক। এটিই মূল বিতর্ক, যার সমাধান হলে সব বিবাদের নিরসন হয়ে যায় আর যে দলের কাছে ঈসার জীবিত থাকা বা মৃত্যুবরণের অনুকূলে শক্তিশালী প্রমাণ আছে, সেই দলই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ বিতর্কের সমাধানের পর অন্য সব ছোটো ছোটো বা গৌণ বিতর্কের কোনো প্রয়োজন থাকে না, বরং পরাজিত পক্ষের অন্যান্য আপত্তি নিজে থেকেই দূর হয়ে যায়। অতএব সত্য সন্ধানীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটিই যা সম্পর্কে তার পুরো মনোযোগসহকারে চিন্তা করা উচিত।

এখানে পরিতাপের বিষয় হলো, যদিও কুরআন শরীফে পরিষ্কার ভাষায় হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে আর মহানবী (সা.) স্পষ্ট ভাষায় হযরত ঈসার সেসব আত্মার সাথে মিলিত হবার কথা বলেছেন যারা পৃথিবী থেকে অতীত হয়ে গেছে। এছাড়া সাহাবীরা প্রকাশ্য ইজমার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন;* তা সত্ত্বেও আমাদের বিরোধীরা হযরত ঈসার জীবিত থাকার কথা বলে কুরআন করীমকে পরিত্যাগ করে, হাদীস পরিত্যাগ করে, সাহাবীদের ইজমাকে অবজ্ঞা করে আর নিজেদের পিতাপিতামহের ভ্রান্তিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে। তাদের কাছে একথার বিন্দুমাত্র প্রমাণ নেই যে, হযরত ঈসা

*** টীকাঃ** মহানবীর ইন্তেকালের পর সাহাবীরা (রা.) তার প্রয়াণে গভীরভাবে মর্মাহত হন। এই বেদনায় হযরত উমর কতিপয় মুনাফিকের মন্তব্য শুনে বলেছিলেন, মহানবী পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন এবং মুনাফিকদের নাক ও কান কাটবেন। কিন্তু যেহেতু এটি ভুল ধারণা ছিল তাই প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক হযরত আয়েশার ঘরে যান এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে চাদর অপসারণ করেন এবং তাঁর পবিত্র ললাটে চুম্বন করে বলেন,

اَنْتَ طَيِّبٌ حَيًّا وَمَيِّتًا لَنْ يَّجْمَعَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْمَوْتَتَيْنِ اِلَّا مَوْتَتَكَ الْاُوْلٰى

অর্থাৎ জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আপনি পবিত্র। খোদা আদৌ আপনার ওপর দুটো মৃত্যু একত্রিত করবেন না। প্রথম মৃত্যুর অর্থ হলো মহানবী পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। এরপর সকল সাহাবী (রা.)-কে মসজিদে সমবেত করেন। কাকতালীয় বিষয় হলো সেদিন জীবিত সব সাহাবী মদীনায় উপস্থিত ছিলেন তাই সবাইকে সমবেত করে হযরত আবু বকর মিম্বরে চড়ে আয়াত,

ইন্তেকাল করেন নি আর তিনি শেষ যুগে পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন। কেবল সে হিংসা ও বিদ্বেষ তাদেরকে বিরোধিতায় প্রবৃত্ত করছে যা স্বার্থপর লোকদের সাথে সহাবস্থানের কারণে হৃদয়ে সৃষ্টি হয়ে গিয়ে থাকে। কথার কথা, যদি এ বিষয়টিও মাঝে থাকত অর্থাৎ আমার যুক্তি-প্রমাণের বিপরীতে তাদের কাছে যদি কুরআন ও হাদীসের কোনো প্রমাণাদি হযরত ঈসার জীবিত থাকার পক্ষে থাকত, তাহলেও তাকওয়ার দাবি ছিল এমন মানুষের বিরোধীতা কিছুটা লজ্জাশীলতা প্রদর্শন করা যে, একান্ত প্রয়োজনের সময়ে ঠিক শতাব্দীর শিরোভাগে এসেছে আর শক্তিশালী নিদর্শনাবলির মাধ্যমে নিজের দাবির

*** চলমান টীকাঃ**

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ اَفَاۗىِٕنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ

পাঠ করেন অর্থাৎ মহানবী কেবল একজন নবী আর তাঁর পূর্বের সব নবী মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই মহানবী (সা.) যদি মারা যান বা নিহত হন তোমরা কি ধর্ম পরিত্যাগ করবে? সাহাবীদের মাঝে সংঘটিত এটি প্রথম ইজমা ছিল। যা হতে প্রমাণিত হয়, সব নবী মৃত্যুবরণ করেছেন যাদের মাঝে হযরত ঈসাও অন্তর্ভুক্ত। আর একথা বলা সম্পূর্ণভাবে একটি হঠকারিতা যে, 'খালাত' শব্দের একটি অর্থ হলো জীবিত আকাশে যাওয়া। কেননা আরবদের সব অভিধান ঘাঁটলে জীবিত আকাশে যাবার জন্য 'খালাত' শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। এছাড়া এখানে খোদা তা'লা স্বয়ং দ্বিতীয় বাক্যে 'খালাত'-এর অর্থ বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, اَفَاۗىِٕنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ অর্থাৎ 'খালাত'-এর অর্থ দুটো, শুধু দুভাবে এর অর্থ প্রকাশ পেতে পারে। একটি হলো স্বাভাবিক মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়া, দ্বিতীয়টি হলো নিহত হওয়া। নতুবা ব্যাখ্যা এভাবে হওয়া উচিত ছিল যে,

اَفَاِن مَّات او قتل او رفع الی السّماء مع جسمه العنصری۔

অর্থাৎ যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন বা সশরীরে আকাশে উত্থিত হন। বিরোধীদের উক্তি অনুসারে 'খালাত' শব্দের যত অর্থ থাকতে পারে তার ভেতর শুধু দুটো নিয়েছেন বাকিগুলোর কথা উল্লেখও করেন নি; এমনটি বলা বাক্যালংকার পরিপন্থি। এছাড়া হযরত আবু বকরের মূল যুক্তি এটি ছিল যে, দ্বিতীয়বার মহানবী পৃথিবীতে আসবেন না যেটির বিশদ ব্যাখ্যা হযরত আবু বকর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র ললাটে চুমু দেবার সময় করে দিয়েছেন। যাহোক, বিরোধীদের সর্বাবস্থায় মানতে হবে যে, জীবিত থাকলেও হযরত ঈসা আদৌ পৃথিবীতে আসতে পারেন না নতুবা তাঁর যুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। আর সাহাবীদের ইজমা এমন বিষয় যা কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না। –লেখক

সত্যতা প্রমাণ করেছে। কেননা খোদা তা'লা তাদের নাম 'হাকাম' রাখেন নি যে, তারা মসীহ মওউদ-এর বিরুদ্ধে নিজেদের কথা ও গল্পকে প্রধান্য দেবে, বরং মসীহ মওউদ-এর নাম 'হাকাম' রেখেছেন। অতএব তাকওয়ার শর্ত হলো, তাদের হাতে কোনো কাল্পনিক প্রমাণ থাকলেও এমন ব্যক্তির বিপরীতে যে নিশ্চিত শরীয়তসম্মত প্রমাণাদি উপস্থাপন করে এবং ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করে, নিজেদের যুক্তিপ্রমাণ পরিহার করা। কিন্তু পরিতাপ! তারা ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আর নিছক মিথ্যার সমর্থন করে। আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ন্যায় বিচারক হিসেবে এসেছি কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে গিয়ে হাকাম বা ন্যায়বিচারক সাজতে চায়।

এখন আমরা একথা লেখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করব যে, সত্যিই হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন আর তার জীবিত থাকার বিশ্বাস কুরআন শরীফ ও সঠিক হাদীসের পরিপন্থি।

অতএব স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরআন শরীফ স্পষ্ট ভাষায় ও ডঙ্কা বাজিয়ে ঘোষণা করে যে, হযরত ঈসা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, যেমন একস্থানে খোদা তা'লা প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে বলেন যে,

يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَىَّ

(আলে ইমরানঃ ৫৬)

আর অন্যত্র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার প্রতি ইঙ্গিত করেন। যেমন তাঁর উক্তি হলো,

وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ

(আন-নিসাঃ ১৫৮-১৫৯)

প্রথম আয়াতের অর্থ হলো, হে ঈসা! আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেবো।* অর্থাৎ নিহত হওয়া ও ক্রুশীয় মৃত্যুর মাধ্যমে তোমাকে মৃত্যু দেওয়া হবে না।

*** টীকাঃ** জেনে রাখা ভালো, আরবী ভাষায় توفّى (তাওয়াফফা) শুধু মৃত্যু দেওয়াকে বলে না, বরং স্বাভাবিক মৃত্যু দেওয়াকে বলা হয় যা নিহত হওয়া বা ক্রুশে মারা যাওয়া অথবা বহিরাগত কোনো কারণে হয় না। এ কারণে কাশশাফের লেখক যিনি আরবী ভাষার

আর আমি তোমাকে আমার পানে উত্থিত করব। অতএব এ আয়াত প্রতিশ্রুতিস্বরূপ ছিল। উল্লিখিত দ্বিতীয় আয়াতে সেই প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা হলো, ইহুদীরা নিজেরা নিশ্চয় বিশ্বাস রাখে না যে, তারা ঈসাকে হত্যা করেছে। যেখানে হত্যা প্রমাণিত নয়, সেখানে স্বাভাবিক মৃত্যু প্রমাণিত যা সব মানুষের জন্য আবশ্যক। এমতাবস্থায় যে বিষয়কে ইহুদীরা নিজেদের ধারণানুসারে হযরত ঈসার রাফা ইলাল্লাহর পথে প্রতিবন্ধক বানিয়েছে, অর্থাৎ হত্যা ও ক্রুশে দিয়ে মারা, সেই প্রতিবন্ধকতা বাতিল হয়ে গেল আর খোদা নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাকে নিজের পানে উত্থিত করেছেন।

এখানে এ বিষয়ে হঠকারিত দেখানো অর্থহীন যে, তাওয়াফফা শব্দের অর্থ মৃত্যু দেওয়া নয়।* কেননা এ বিষয়ে আরবী ভাষার সকল পণ্ডিত একমত যে,

---

*** চলমান টীকাঃ** একজন আল্লামা বা সুপণ্ডিত ব্যক্তিত্ব, তিনি এ স্থানে اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ -এর তফসীরে লিখেছেন, اِنِّیْ مُمِیْتُكَ حَتْفَ اَنْفِكَ অর্থাৎ আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেবো। এ কারণেই লিসানুল আরব ও তাজুল উরূসে লেখা হয়েছে,

توفّی المیّت استیفاء مُدّته التی وفیت له وعدّد ایّامه وشهوره واَعوامه فی الدنیا۔

অর্থাৎ প্রয়াত ব্যক্তির তাওয়াফফা হবার অর্থ হলো তার স্বাভাবিক জীবনের সকল দিন, মাস ও বছর পূর্ণ করা হবে আর এটি তখনই হয় যখন স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, নিহত না হয়। –লেখক

*** টীকাঃ** সহীহ বুখারী যা কুরআন করীমের পরে সবচেয়ে সঠিক গ্রন্থ আখ্যায়িত হয়, সেখানে তাওয়াফফা শব্দের অর্থ 'মৃত্যু দেওয়া' লেখা হয়েছে। কেননা হযরত ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে আয়াত یٰعِیْسٰۤی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ সম্পর্কে এই রেওয়ায়েত লিখেছে, اِنّی مُمِیْتُكَ । ইমাম বুখারীও এটিকেই নিজের বিশ্বাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেননা তিনি এর সমর্থনে অন্য একটি হাদীসও উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন যেভাবে ঈসা কিয়ামতের দিন বলবেন, আমার উম্মতের যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা আমার মৃত্যুর পর পথভ্রষ্ট হয়েছে ; একইভাবে আমি এটিই বলব যে, আমার উম্মতের যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা আমার মৃত্যুর পর পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব এমন ক্ষেত্রে যেখানে তাওয়াফফা শব্দের কর্তা খোদা আর কর্ম কোনো নাম হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে অর্থ মৃত্যুই হয়ে থাকে যা কোনোভাবে অস্বীকার করার উপায় নেই। –লেখক

যখন কোনো আলাম বা ব্যক্তির নাম নিয়ে তার ক্ষেত্রে তাওয়াফফা শব্দ ব্যবহার করা হয়, উদাহরণস্বরূপ যদি বলা হয়, تَوَفَّى اللّٰهُ زَيْدًا সেক্ষেত্রে এর অর্থ হবে খোদা যায়েদকে মৃত্যু দিয়েছেন। এ কারণেই ভাষা বিশারদরা এমন ক্ষেত্রে অন্য কোনো অর্থ লেখেন না, শুধু মৃত্যু দেওয়া লিখে থাকেন। যেমন লিসানুল আরব-এ আমাদের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাক্য–

تُوُفِّيَ فلان تَوَفَّاهُ اللّٰهُ إذا قبض نفسه وفى الصّحاح إذا قبض روحه۔

বিদ্যমান অর্থাৎ যখন বলা হবে, توفى فلان বা যদি এটি বলা হয়, تَوَفَّاهُ اللّٰهُ সেক্ষেত্রে এর শুধু এটিই অর্থ হবে যে, অমুক ব্যক্তি মারা গিয়েছে আর খোদা তাকে মৃত্যু দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাজুল উরূসে এই বাক্য লেখা হয়েছে যে, تُوُفِّيَ فُلَانٌ إِذَا مَات অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায় তার জন্য تُوُفِّيَ فُلَانٌ ব্যবহার হয়। দ্বিতীয় বাক্য তাজুল উরূসে এটি লেখা রয়েছে যে, تَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: اِذَا قَبَضَ نَفْسَه, অর্থাৎ এই বাক্য تَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ তখন ব্যবহার হয় যখন খোদা কারো রূহ কবজ করেন। সহীহ হাদীস গ্রন্থে লেখা আছে যে, تَوَفَّاهُ اللّٰهُ قَبَضَ رُوْحَه অর্থাৎ تَوَفَّاهُ اللّٰهُ বাক্যের অর্থ হলো অমুক ব্যক্তির আত্মা খোদা তা'লা কবজ করেছেন। আমি যতটা সম্ভব ছিল সিহাহ সিত্তা ও অন্যান্য হাদীসে দৃষ্টিপাত করেছি। জানা গেল যে, মহানবী (সা.)-এর বাণী, সাহাবীদের উক্তি আর তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের উক্তিতে একটি দৃষ্টান্তও এমন দেখা যায় না যা থেকে বলা যেতে পারে যে, কোনো 'আলাম' (তথা নির্দিষ্ট ব্যক্তি)-এর জন্য 'তাওয়াফফা' শব্দ ব্যবহার হয়েছে, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির নাম নিয়ে তাওয়াফফা শব্দ ব্যবহার হয়েছে, যাতে খোদা 'ফায়েল' (অর্থাৎ কর্তা) আর সে ব্যক্তি 'মাফয়ূলে বিহি' (অর্থাৎ কর্ম), তবুও বাক্যের অর্থ 'মৃত্যু' ছাড়া অন্য কিছু করা হয়েছে। বরং সর্বত্র যখন নাম নিয়ে কোনো ব্যক্তির জন্য তাওয়াফফা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আর সেখানে খোদা কর্তা এবং যে ব্যক্তির নাম নেওয়া হয়েছে সে কর্ম, সেক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছে মর্মে অর্থ করা হয়েছে। তিন শতাধিক হাদীসে আমি এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পেয়েছি যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে স্থানেই তাওয়াফফা শব্দের কর্তা খোদা আর কর্ম কোনো 'আলাম' অর্থাৎ কোনো নাম উল্লেখ করে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কর্ম চিহ্নিত করা হয়েছে সেখানে অর্থ হলো মৃত্যু দেওয়া, অন্য কিছু নয়। কিন্তু তন্ন তন্ন করে সন্ধান করা সত্ত্বেও এমন একটি হাদীসও আমি পাই নি যাতে তাওয়াফফা ক্রিয়ার কর্তা খোদা

আর কর্ম কোনো 'আলাম' অর্থাৎ নাম উল্লেখ করে কাউকে কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; সেখানে মৃত্যু দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো অর্থ হয়েছে।

একইভাবে কুরআন শরীফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করলে তা হতেও এটিই প্রমাণিত হয়েছে। যেমন আয়াত تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ (ইউসুফ: ১০২) এবং আয়াত وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ (ইউনুস: ৪৭) ইত্যাদি হতে প্রমাণিত। এছাড়া আমি আরবের বিভিন্ন কাব্যে শুধু এ কারণে বিচরণ করেছি আর অজ্ঞতার যুগ ও মুসলিম যুগের কবিতা বড়ো মনোযোগ সহকারে দেখেছি এবং অনেক সময় এগুলো দেখার পেছনে ব্যয় হয়েছে, কিন্তু আমি সেগুলোতেও কোনো উদাহরণ এমন পাই নি যেখানে খোদা তাওয়াফফা ক্রিয়ার কর্তা আর কোনো 'আলাম' কর্ম অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিকে তার নাম উল্লেখ করে কর্ম আখ্যা দেওয়া হবে এমন ক্ষেত্রে মৃত্যু দেওয়া ছাড়া এ শব্দের অন্য কোনো অর্থ হবে। এরপর আমি অনেক আরব জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছি। তাদের কথা থেকেও একথাই জানা গেছে যে, আজ পর্যন্ত পুরো আরবে এই কথাই চলমান রয়েছে– যখন এক ব্যক্তি অন্যের সম্পর্কে توفّى الله فلانا ব্যবহার করে তখন দ্ব্যর্থহীনভাবে এর অর্থ এটিই নেওয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তিকে খোদা মৃত্যু দিয়েছেন। যখন কোনো আরবের কাছে অন্য কোনো আরবের পক্ষ থেকে পত্র আসে আর তাতে যদি এটি লেখা থাকে যে, توفّى الله زيدًا তখন এর অর্থ এটিই নেওয়া হয় যে, খোদা যায়েদকে মৃত্যু দিয়েছেন। অতএব এতটুকু গবেষণার পর যা নিশ্চিত জ্ঞানের পর্যায়ে উপনীত, এই বিষয়টির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে আর দেখা ও পরীক্ষিত বিষয়ের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, যার সম্পর্কে এভাবে তাওয়াফফা শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে এর অর্থ হবে– সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে, অন্য কোনো অর্থ নয়। যেহেতু কুরআন শরীফে এ শব্দ এভাবে দুবার হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে বলে দেখা যায়, তাই নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, হযরত ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন আর তাঁর রাফা আধ্যাত্মিক অর্থে হয়েছে। তাঁর অপমৃত্যু হয় নি, অর্থাৎ তিনি নিহত হন নি আর ক্রুশেও মারা যান নি, যেমনটি খোদা তা'লা কুরআন শরীফে সংবাদ দিয়েছেন। এর বিপরীতে তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন।

আর লিসানুল আরব ও অন্যান্য অভিধান থেকে একথা স্পষ্ট যে, তাওয়াফফা শব্দের আসল অর্থ কাউকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেওয়া। আমরা বর্ণনা

করেছি যে, আরবী ভাষার একজন অদ্বিতীয় ইমাম যার বিপরীতে কারো উচ্চবাচ্য করার সুযোগ নেই অর্থাৎ আল্লামা যমখশরী* আয়াত اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ এর অর্থ করেন اِنِّیْ مُمِیْتُكَ حَتْفَ اَنْفِكَ অর্থাৎ হে ঈসা! আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেবো। 'হাতাফ' আরবী ভাষায় মৃত্যুকে বলা হয় আর 'আনফ' নাককে বলা হয়। আরবদের মাঝে প্রাচীনকাল থেকে এই বিশ্বাস চলে আসছে যে, মানুষের প্রাণ নাকের পথে বের হয় তাই তারা স্বাভাবিক মৃত্যুর নাম حتف انف রেখে দিয়েছে। আরবী ভাষায় 'তাওয়াফফা' শব্দ স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য ব্যবহার হয়। যেখানে কোনো ব্যক্তি হত্যার মাধ্যমে মারা যায় সেখানে 'কতল' শব্দ ব্যবহার করে। এটি এমন একটি শব্দ যা কোনো আরবী ভাষাভাষীর অজানা নয়। অবশ্য আরবদের রীতি হলো, কখনো কখনো এমন শব্দকে যা নিজের প্রকৃত রূপে বিশেষ স্থানে ব্যবহার হয়, একটি বিশেষ 'কারীনা' বা সাথিশব্দ যুক্ত করে ভিন্ন অর্থেও তা ব্যবহার করে অর্থাৎ সেটির ব্যবহারের গণ্ডিকে বিস্তৃত করে দেয়। এমন 'কারীনা' বা সাথি শব্দ যদি না থাকে তাহলে এমন পরিস্থিতিতে সে শব্দ তার আসল রূপে ব্যবহার হওয়া আবশ্যক হয়ে থাকে। অতএব এখানে আল্লামা যমখশরী আয়াত اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ এর অধীনে লিখেছেন যে, اِنّی متوفیك حتف انفك অর্থাৎ হে ঈসা! আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেবো। এসব অর্থ করার ক্ষেত্রে আল্লামা সাহেব কেবল প্রকৃত অর্থে توفّی শব্দ যেভাবে ব্যবহার হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন নি, বরং এর বিপরীতে আয়াত ما قتلوه يقينا এবং আয়াত ما قتلوه وما صلبوه দেখে একথার পক্ষে দৃঢ় সাথি (তথা সম্পূরক) শব্দ পেয়েছেন যে, এখানে متوفّيك শব্দের ব্যবহার, এর প্রকৃত অর্থে হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক।

অর্থাৎ এখানে এর অর্থ হলো, হে ঈসা! আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু

---

* **টীকাঃ** স্মরণ রাখা উচিত, এখানে আমরা যে যমখশরীকে আল্লামা ও ইমাম নামে অভিহিত করেছি তা কেবল ভাষা জ্ঞানের গভীরতার দৃষ্টিকোণ থেকে। কেননা এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ব্যক্তি আরবীর ভাষাজ্ঞান ও বাগ্‌ধারা আর সেগুলোর ব্যবহারের স্থানকাল, আরবী ভাষার শব্দের প্রাঞ্জলতা ও অপ্রাঞ্জলতা, উত্তম ও অর্থহীন ভাষা, প্রতিশব্দের মাঝে পার্থক্য ও বিশেষত্ব, সেগুলোর গঠন, প্রাচীন ও আধুনিক শব্দাবলি, আরবী ব্যকরণের সূক্ষ্ম নিয়মকানুন এবং বাকালংকার শাস্ত্রে খুবই দক্ষ অধিকন্তু সেসব বিষয়ের ইমাম ও আল্লামা ছিলেন অন্য কোনো বিষয়ে নয়। –লেখক

দেবো। এ কারণে তিনি আয়াত اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ এর অর্থ করেছেন اِنِّی مُمِیتك حتف انفك অর্থাৎ আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেবো।* অতএব ইমাম যমখ্শরীর গভীর দৃষ্টি অত্যন্ত প্রশংসনীয় যে, তিনি তাওয়াফফার কেবল প্রকৃত অর্থ উপস্থাপনের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি, বরং এর পাশাপাশি কুরআন শরীফের সেসব আয়াতে দৃষ্টিপাত করে, অর্থাৎ ঈসাকে হত্যাও করা হয় নি আর ক্রুশেও মারা হয় নি বরং মুতাওয়াফফিকা শব্দের প্রকৃত অর্থ ও রূপ সামনে রেখে মুতাওয়াফফিকার তফসীর করেছেন। এমন তফসীর ভাষাজ্ঞানে দক্ষ ব্যক্তি ছাড়া সবাই করতে পারে না। স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লামা ইমাম যমখশরী আরবী ভাষার একজন স্বীকৃত আলেম। ভাষাজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগের সবার মস্তক তার সামনে অবনত। অভিধান লেখকরা তার উক্তি সনদ বা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন- তাজুল উরূসের লেখক বিভিন্ন স্থানে সনদ হিসেবে তার উক্তির বরাত টেনে থাকেন।

এখন পাঠক বুঝতে পারছেন যে যখন আয়াত مَاقَتَلُوْهُ يَقِيْنًا (আন-নিসা: ১৫৮) ও আয়াত وَمَاقَتَلُوْهُ وَمَاصَلَبُوْهُ (আন-নিসা: ১৫৮) শুধু তাওয়াফফা শব্দের ব্যাখ্যার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে তাই স্মরণ রাখতে হবে এটি নূতন কোনো বিষয়ের অবতারণা করা হয় নি, বরং শুধু এটি ব্যখ্যা করা উদ্দেশ্য যে, মুতাওয়াফফিকা শব্দে, ঈসাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেওয়া হবে আর তিনি স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেছেন, কেউ হত্যা করে নি আর কেউ ক্রুশেও মারতে পারে নি মর্মে প্রতিশ্রুতি অন্তর্নিহিত ছিল। অতএব হযরত ঈসার অভিশপ্ত হওয়া ও আধ্যাত্মিক রাফা না হওয়া সংক্রান্ত যে ধারণা ইহুদীদের হৃদয়ে দানা বেধেছিল, তা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। কেননা তার ক্রুশে মৃত্যু বা নিহত হবার ওপর এর পুরো ভিত্তি ছিল আর এটি থেকে এ ফলাফল বের করা হয়েছিল যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ) অভিশপ্ত ছিলেন এবং খোদার দরবার হতে

*** টীকা:** ইহুদীদের ধারণানুসারে কোনো নবীর আধ্যাত্মিক উন্নতি যেহেতু স্বাভাবিক মৃত্যু হলেই কেবল সম্ভব, নিহত হওয়া বা ক্রুশে মারা যাওয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থি বিষয়, একারণে খোদা তা'লা ইহুদীদের মুখ বন্ধ করার জন্য বলেছেন যে ঈসা স্বাভাবিক ভাবে মারা যাবে। যেহেতু আধ্যাত্মিক রাফা স্বাভাবিক মৃত্যুর একটি সহজাত ফলাফল একারণে মুতাওয়াফফিকা শব্দের পরে রাফেউকা শব্দ অবতীর্ণ করেছেন যেন ইহুদীদের ধারণা সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হয়। –লেখক

বিতাড়িত ছিলেন যার খোদা তা'লার দিকে রাফা হয় নি। তাই যেহেতু মুতাওয়াফফিকা শব্দ ব্যবহার করে খোদা তা'লা এ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ঈসা স্বাভাবিকভাবে মারা গিয়েছেন পরন্তু খোদা তা'লা এখানেই কথা শেষ করেন নি, বরং মুতাওয়াফফিকা শব্দ ব্যবহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বাভাবিক মৃত্যুবরণের বিষয়টি مَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ এবং وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا এর মাধ্যমে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা যে ব্যক্তির মৃত্যু, হত্যা বা অন্যান্য কারণে হয় নি তার সম্পর্কে এটিই ধরে নেওয়া হয় যে, সে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। অতএব এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ বাক্য মুতাওয়াফফিকার ব্যাখ্যা বইকি। যেহেতু নিহত হওয়া ও ক্রুশে মারা যাবার ধারণা উড়িয়ে দেওয়া হলো, তাই اذا فات الشرط فات المشروط উক্তি অনুসারে হযরত ঈসার খোদার দিকে রাফা প্রমাণিত হয়ে গেল আর এটিই ছিল আয়াতের উদ্দেশ্য।

এখন আমরা আমাদের প্রথম কথার দিকে ফিরে এসে বলছি, এটি প্রমাণিত বিষয় যে, কোনো বাক্য, যাতে তাওয়াফফা শব্দের ব্যবহারে খোদা তা'লা কর্তা আর কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তাকে সেই কর্তার কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়, এমন বাক্যের অর্থ সবসময় হয়ে থাকে 'খোদা তা'লা সেই ব্যক্তিকে মৃত্যু দিয়েছেন' বা 'মৃত্যু দেবেন'; কোনোভাবে অন্য কোনো অর্থ হয় না। বেশ কিছুকাল পূর্বে আমি এ প্রমাণিত বিষয়ে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলাম যে, যে ব্যক্তি একথার বিপরীতে কোনো হাদীস বা আরবদের নির্ভরযোগ্য কাব্য হতে এমন কোনো বাক্য উপস্থাপন করবে, যাতে তাওয়াফফা শব্দের কর্তা খোদা আর কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তাকে সেই কর্তার কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও সে স্থানে অর্থ যদি মৃত্যু না হয়, তাহলে তাকে এত পরিমাণ পুরস্কার দেবো। এ বিজ্ঞাপনের আজ পর্যন্ত কেউ উত্তর দেয় নি। এখন পুনরায় দায়মুক্তির নিমিত্তে নগদ দু-শো রুপির বিজ্ঞাপন দিচ্ছি যে, যদি আমাদের কোনো বিরোধী আমাদের এ বিবৃতিকে নিশ্চিত ও অকাট্য মনে না করে তাহলে সে মহানবীর সঠিক হাদীস বা আরবী ভাষাভাষী আর ভাষাজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি রাখে, এমন প্রাচীন কবিদের নির্ভরযোগ্য উক্তি হতে এমন কোনো বাক্য উপস্থাপন করুক যাতে তাওয়াফফা শব্দের কর্তা হবেন খোদা আর কর্ম হবে কোনো আলাম, যেমন যায়েদ, বকর ও খালেদ প্রমুখ আর সে বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে মৃত্যু না হয়ে অন্য কিছু হয়, এমন পরিস্থিতিতে আমি এমন ব্যক্তিকে নগদ দু-শো রুপি প্রদান করব।

এমন ব্যক্তির শুধু একথা প্রমাণ করতে হবে যে, যে হাদীস সে উপস্থাপন করছে– তা মহানবী (সা.)-এর সঠিক হাদীস। অথবা (তার কথা) অতীত কবিদের মাঝে এমন কোনো কবির উক্তি; আরবদের ভাষা ও বাগ্‌ধারায়– যার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। একইসাথে এই প্রমাণ উপস্থাপন করাও আবশ্যক হবে যে, সেই হাদীস বা পঙ্‌ক্তি থেকে সুনিশ্চিতভাবে আমাদের দাবির পরিপন্থি অর্থ বের হয়, আমরা যে-সব অর্থ করি তাতে আয়াতের অর্থ বিকৃত হয় অর্থাৎ সেসব হাদীস ও পঙ্‌ক্তি নিশ্চিতভাবে সে অর্থই প্রদান করে (যা তারা বলছে)। কেননা সে হাদীস বা পঙ্‌ক্তির যদি সেই অর্থও করা সম্ভব হয় যা আমরা করেছি তাহলে এমন হাদীস বা পঙ্‌ক্তি কোনোভাবে উপস্থাপনের যোগ্য হবে না, কেননা কোনো বাক্য উদারহণ হিসেবে উপস্থাপন করতে হলে সেই বিরোধী বিষয় তাতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। এর কারণ হলো, যেখানে শত শত নিশ্চিত ও অকাট্য উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাওয়াফফা শব্দ যে স্থানে খোদা কর্তা আর কোনো আলাম অর্থাৎ নাম উল্লেখপূর্বক কোনো মানুষকে যেখানে কর্ম দেখানো হয়েছে, সেখানে মৃত্যু প্রদান করা ছাড়া সেই কর্মের জন্য তাওয়াফফা শব্দ অন্য কোনো অর্থে ব্যবহার হতেই পারে না। ভূরি ভূরি ও নিরবচ্ছিন্ন উদাহরণের বিপরীতে যে ব্যক্তি কিছু দাবি করে, তার দায়িত্ব হলো, আমাদের দাবির বিরুদ্ধে কোনো সুনিশ্চিত প্রমাণ উপস্তাপন করা।

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

(আল-বাকারা: ২৫)

অতঃপর হযরত ঈসার মৃত্যুর দ্বিতীয় ও সুনিশ্চিত প্রমাণ হলো খোদা তা'লার উক্তি بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ কেননা কুরআন ও হাদীস ঘাটলে বুঝা যায় যে, رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ যা رفع الی الله বাক্য থেকে স্পষ্ট হয়, মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো অর্থে ব্যবহার হয় না। আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ

(আল-ফাজর: ২৮-৩১)

অর্থাৎ হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! যে খোদার পক্ষ থেকে আরামপ্রাপ্ত, তোমার খোদার পানে ফিরে আসো এমতাবস্থায় যে খোদা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আর

তুমি খোদার প্রতি সন্তুষ্ট আর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।

এখন এটি জানা কথা, 'খোদার দিকে চলে আসো' মর্মে মহান আল্লাহর উক্তির, ইসলামের কোনো অনুসারী এ অর্থ করে না যে, তুমি জীবিত আকাশে গিয়ে বসে যাও, বরং আয়াত ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ এর অর্থ মৃত্যুই করা হয়। অতএব খোদার দিকে ফিরে যাওয়া বলতে যেখানে কুরআনের আয়াতের আলোকে 'মৃত্যু' বুঝায় সেখানে খোদার দিকে উত্থিত হওয়া, যেমনটি আয়াত بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ থেকে প্রকাশিত হয়, কেন মৃত্যু হবে না।* এটি ন্যায়পরায়ণতা, বিবেক ও তাকওয়ার পরিপন্থি বিষয়, যে অর্থ কুরআনের পরিষ্কার আয়াত

---

* **টীকা:** একইভাবে কুরআনে এমন অনেক আয়াত আছে যা হতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, رَفْعٌ اِلَى اللّٰهِ এবং رُجُوْعٌ اِلَى اللّٰهِ শব্দ সমাহার সবসময় মৃত্যুর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ

(আস-সাজদা:১২)

অর্থাৎ সেই ফেরেশতা তোমাদের মৃত্যু দেবে যে তামাদের ওপর নিযুক্ত আছে এরপর তোমরা তোমাদের প্রভুর পানে প্রত্যাবর্তিত হবে। এছাড়া অন্য একস্থানে ফুরকানে হামীদে বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

(আল-আনকাবূত: ৫৮)

অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এরপর আমাদের দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। এছাড়া আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا

(মারইয়াম: ৫৮)

অর্থাৎ একে অর্থাৎ এই নবীকে সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছি। এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো যারা মৃত্যুর পর খোদা তা'লার দিকে উত্থিত হয় তাদের মর্যাদা একটি পদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না, তারা বেশ কিছু পদমর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ তা'লা বলছেন, আমরা এ নবীকে ওঠানোর পর অর্থাৎ মৃত্যু দেবার পর এখানে মহান মর্যাদা দান করেছি। নবাব

থেকে প্রমাণিত হয় তা পরিত্যাগ করা হবে আর যে-সব অর্থ ও বাগ্‌ধারার কোনো প্রমাণ নেই– তা অবলম্বন করা হবে। কেউ বলতে পারে কি যে, রাফা ইলাল্লাহর আরবী ভাষা ও আরবী বাগ্‌ধারায় মৃত্যু প্রদান করা ছাড়া অন্য কোনো অর্থও আছে? অবশ্য এ মৃত্যু দ্বারা এমন মৃত্যু বুঝায় যারপর আত্মা খোদার দিকে ওঠানো হয়, যেভাবে মুমিনদের মৃত্যু হয়ে থাকে। এ বাগ্‌ধারাই পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান। উল্লিখিত আয়াতে যে বলেছেন فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ এর অর্থ পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে মেলালে দাঁড়ায়, খোদার দিকে ফিরে আসো এবং খোদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। এটি থেকেও প্রমাণিত হয় যে, যতদিন মৃত্যুবরণ না করবে, ততদিন কোনো ব্যক্তি অতীতের বা প্রয়াত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। অতএব যেখানে কুরআনের আয়াত অনুসারে অতীতের আত্মাগুলোর সাথে মিলিত হওয়া মৃত্যুবরণ করা ছাড়া অসম্ভব, সেখানে হযরত ঈসা মৃত্যুবরণ করা ছাড়া কীভাবে হযরত ইয়াহইয়ার পাশে দ্বিতীয় আকাশে গিয়ে বসলেন?

এখানে এ গূঢ় কথাও স্মরণ থাকা উচিত যে, উল্লিখিত আয়াতে খোদা তা'লা وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ও বলেছেন আর এর অর্থ এ বাক্যাংশকে পুরো আয়াতের সাথে মিলালে এটি দাঁড়ায় যে, হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা, তুমি তোমার খোদার দিকে ফিরে আসো। তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, আর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। অতএব যেখানে মহানবী (সা.)-এর মিরাজের রাতে লব্ধ অভিজ্ঞতা হতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন শরীফের এ আয়াত অনুসারে পৃথিবী হতে নবী ও রসূলদের পরলোকগত আত্মা পরলোকে এমন এক জামা'তের ন্যায়, যারা তাৎক্ষণিকভাবে অতীতে প্রয়াত লোকদের দলে গিয়ে মিলিত হয় এবং তাদের

*** চলমান টীকা:** সিদ্দীক হাসান খান তাঁর তফসীর ফাতহুল বয়ানে লিখেছেন, এখানে রাফা বলতে আধ্যাত্মিক রাফা বুঝায় যা লাভ হয় মৃত্যুর পর নতুবা সেই নবীর মৃত্যুর জন্য পৃথিবীতে ফিরে আসা আবশ্যক হয়ে যায়। পরিতাপের বিষয় হলো, এসব লোকের আয়াত اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ -এর ক্ষেত্রে এ অর্থ মনে থাকে না অথচ এ আয়াতে প্রথমে মুতাওয়াফফিকা শব্দ বিদ্যমান আর পরে রয়েছে রাফিঊকা। অতএব রাফিউকা-র অর্থ যদি মৃত্যু করা যায় তাহলে মুতাওয়াফফিকা ও রাফিউকা-র অর্থ কেন মৃত্যু হবে না? –লেখক

দলে প্রবেশ করে, যেমনটি আয়াত فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ -এর প্রতিপাদ্য বিষয়। এছাড়া এ আয়াতগুলোর শেষ অংশ, অর্থাৎ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ আয়াতাংশও এটিই দাবি করে যে, আল্লাহর সেসব বান্দার তাৎক্ষণিকভাবে জান্নাতে প্রবেশ করা উচিত। অধিকন্তু আয়াতাংশ فِيْ عِبٰدِيْ -এর অর্থ এটি নয় যে, তা এমন কোনোকিছু যা সুদূর ভবিষ্যতে ঘটবে, বরং পুণ্যবানদের মৃত্যুর অব্যবহিত পর তা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ যে দল পরে মৃত্যুবরণ করে তারা পূর্ববর্তীদের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে গিয়ে মিলিত হয়। অতএব এভাবে আয়াতের দ্বিতীয়াংশও অর্থাৎ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়। অর্থাৎ পবিত্র ও পূত মুমিনদের মধ্য হতে যে মৃত্যুবরণ করে সে-ও তাৎক্ষণিকভাবে জান্নাতে প্রবেশ করে। একথাই সত্য যেভাবে কুরআনের অন্যান্য স্থানেও* এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।**

*** টীকাঃ** এখানে আপাতদৃষ্টিতে এই আপত্তি আবশ্যকীয়ভাবে সামনে আসবে, যেখানে প্রত্যেক এমন পূত ও পবিত্র মুমিন যাদের ওপর কোনো পাপ ও পঙ্কিলতার বোঝা নেই, তৎক্ষণাৎ জান্নাতে প্রবেশ করে, এমতাবস্থায় মানুষের হাশর-নশর ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট আবশ্যকীয় বিষয়াদি অস্বীকার করা আবশ্যক হয়ে যায়; এর কারণ হলো জান্নাতে প্রবেশ করার কারণে আয়াত وَمَاهُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ (আল-হিজর: ৪৯) অনুসারে তাদের জান্নাত থেকে বের হওয়া অসম্ভব। অতএব এর মাধ্যমে হাশর (সকল মানুষের দেহ সমবেত করা) এবং পারলৌকিক বিষয়াদি মিথ্যা প্রমাণিত হলো। এর উত্তর হলো পূত-পবিত্র মুমিন যে মৃত্যুর অব্যবহিত পর জান্নাতে প্রবেশ করে, এই বিশ্বাসটি আমার বানানো নয় বরং কুরআন শরীফই এই বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়েছে। মানুষকে সমবেত করা ও মৃতদের জীবিত করা সংক্রান্ত যে দ্বিতীয় শিক্ষা কুরআন শরীফে আছে তা-ও সত্য; আমরা তাতেও ঈমান রাখি। পার্থক্য কেবল এতটুকু, যে জান্নাতে প্রবেশ করার বিষয়টি কেবল রূপক অর্থে হয়ে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে মুমিনদের মৃত্যুর অব্যবহিত পর তাদের যে দেহ দেওয়া হয়ে থাকে সেই দেহ তখনও অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু যেদিন দেহ একত্রিত করা হবে তা হবে সবচেয়ে বড়ো তাজাল্লি বা মহাবিকাশের দিন আর সেদিন পূর্ণ দেহ লাভ হবে। জান্নাতিদের কোনোভাবে জান্নাতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। এক আঙ্গিকে তারা খোদা তা'লার সামনে থাকবে আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তারা জান্নাতে থাকবে। যে-সব শহীদ সবুজ চড়ুই পাখির ন্যায় জান্নাতের ফল খায়, তারা কি জান্নাত থেকে বেরিয়ে খোদার সামনে উপস্থাপিত হবে না? فتدبر (অতএব চিন্তা করো!)। –লেখক

**** টীকাঃ** জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য দেহ থাকা আবশ্যক কিন্তু সেই দেহ ভৌত দেহ হওয়া আবশ্যক নয়, বরং এমন দেহ প্রয়োজন যা পার্থিব উপাদানে সৃষ্ট নয় কেননা জান্নাতের ফল ইত্যাদিও জড় কিছু নয় বরং তা ভিন্ন ধরনের সৃষ্টি, তাই দেহও নূতন সৃষ্টি

সেই স্থানগুলোর একটি হলো সেটি যেখানে আল্লাহ তা'লা বলেন, قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ (ইয়াসীন: ২৭) অর্থাৎ বলা হয়েছে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। একইভাবে এমন আরো অনেক স্থান রয়েছে যা লিপিবদ্ধ করা বিষয়কে দীর্ঘ করা। আর যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূত-পবিত্র লোকদের আত্মা মৃত্যুর পরপরই জান্নাতে প্রবেশ করে। একইভাবে অনেক হাদীস থেকেও এই অর্থই প্রমাণিত হয়। শহীদদের আত্মার বেহেশতের ফল খাওয়া-সংক্রান্ত এমনসব প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে যা কারো অজানা নয়। খোদা তা'লা বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

(আলে ইমরান: ১৭০)

অর্থাৎ যারা খোদা তা'লার পথে মারা যায় তাদের মৃত বলে মনে কোরো না বরং তারা জীবিত; খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তারা রিযকপ্রাপ্ত হন। অতীত গ্রন্থাবলি হতেও এটিই প্রমাণিত হয়। অতএব পূত-পবিত্রদের আত্মার বেহেশতে প্রবেশ করা প্রমাণিত বিষয়। জানা কথা, বেহেশত সেই স্থান যাতে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক নিয়ামত থাকবে এবং বিভিন্ন প্রকার ফলফলাদিও থাকবে। বেহেশতে প্রবেশের অর্থ হলো সেসব নিয়ামত খাওয়া, নতুবা আত্মার শুধু বেহেশতে প্রবেশ করা অর্থহীন ও অলাভজনক। তারা বেহেশতে প্রবেশ করে কি বঞ্চিত ব্যক্তির ন্যায় বসে থাকবে আর জান্নাতের নিয়ামত থেকে লাভবান হবে না? তাই আয়াত وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ স্পষ্টভাবে বলছে যে, মুমিন মৃত্যুর পর একটি দেহ লাভ করে।* এ কারণেই প্রথম সারির সকল ইমাম ও প্রথমসারির সূফীরা এ বিশ্বাস রাখেন যে, পূত-পবিত্র মুমিনরা মৃত্যুর অব্যবহিত

** **চলমান টীকা:** হবে– যা পূর্বের দেহ হতে ভিন্ন হবে। কিন্তু মুমিনদের মৃত্যুর পর দেহ লাভ করা আবশ্যক। এ সম্পর্কে কেবল জান্নাতি শব্দই প্রমাণ বহন করে না, বরং মিরাজের রাতে মহানবী (সা.) নবীদের কেবল আত্মা দেখেন নি, বরং সবার দেহ দেখেছেন আর হযরত ঈসার দেহ তাদের চেয়ে ভিন্ন রকম ছিল না। –লেখক

---

* **টীকা:** স্মরণ থাকা উচিত খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসও এটিই যে, ঈসাকে জড়দেহ সহ ওঠানো হয় নি, বরং মৃত্যুর পর তার একটি প্রতাপান্বিত বা জালালী দেহ লাভ হয়েছে। অতএব পরিতাপ! বরং বড়োই পরিতাপ!! বক্রযুগের মুসলমান যারা তৃতীয় শতাব্দীর পর জন্মগ্রহণ করেছে তারা এ বিষয়ে সাহাবীদের বিশ্বাসেও বিশ্বাসী নয় কেননা সকল সাহাবীর এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছিল যে, সকল অতীত নবী ইন্তেকাল করেছেন

পরেই একটি পবিত্র ও আলোকিত দেহ লাভ করেন যার মাধ্যমে তারা জান্নাতের সব নিয়ামতরাজি উপভোগ করেন। বেহেশতকে শুধু শহীদদের জন্য

*** চলমান টীকাঃ** যাদের মাঝে হযরত ঈসাও অন্তর্ভুক্ত। আবার তারা এ বিষয়ে ইহুদীদের সাথেও একমত নয়। ইহুদীরা নাউযুবিল্লাহ হযরত ঈসাকে অভিশপ্ত আখ্যা দিয়ে কেবল তার আধ্যাত্মিক রাফা-র কথা অস্বীকার করে যা মৃত্যুর পর মুমিনের জন্য আবশ্যক হয়ে থাকে, কেননা কাঠে বা ক্রুশে ঝুলানোর ফলাফল কেবল আধ্যাত্মিক রাফা (আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত হওয়া) হতে বঞ্চিত থাকা ও অভিশপ্ত হওয়া, অন্য কিছু নয়। এরা এ বিষয়ে খ্রিষ্টানদের সাথে মতৈক্য পোষণ করে না, কেননা খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসার দেহের রাফায় বিশ্বাসী কিন্তু এদের ন্যায় ভৌতিক দেহের রাফায় বিশ্বাসী নয়, বরং জালালী বা আধ্যাত্মিক দেহের রাফায় বিশ্বাস রাখে যা তাদের দাবি অনুসারে মৃত্যুর পর তার লাভ হয়েছে। অতএব আমরা একথা অস্বীকার করতে পারি না যে, মৃত্যুর পর হযরত ঈসা জালালী বা আধ্যাত্মিক দেহ লাভ করে থাকবেন যা মাটির দেহ নয়; কেননা তা মৃত্যুর পর সকল খোদাপ্রেমিক মুমিনের লাভ হয়ে থাকে। যেমন আয়াত وَادْخُلِي جَنَّتِي- এর সাক্ষী। নিছক আত্মা বা রূহ বেহেশতে প্রবেশের যোগ্যতা রাখে না অতএব এক্ষেত্রে হযরত ঈসার কোনো বিশেষত্ব নেই। অবশ্য খ্রিষ্টানদের এ বিশ্বাস পোষণ করা একটি ভ্রান্তি যে, সেই জালালী বা আধ্যাত্মিক দেহ হযরত ঈসার লাভ হয়েছে ক্রুশীয় মৃত্যুর পর। হযরত ঈসা আদৌ ক্রুশে মারা যান নি কেননা মারা গেলে নিজের জন্য তিনি ইউনুস নবীর যে উপমা উপস্থাপন করেছেন সেক্ষেত্রে তিনি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হন আর অভিশপ্ত হবার কথা সত্য প্রমাণিত হয়। অভিশপ্ত সে হয় যার হৃদয় শয়তানের ন্যায় খোদাবিমুখ। সে খোদার শত্রু আর খোদা তার শত্রু আর সে শয়তানের ন্যায় খোদার দরবার হতে বিতাড়িত হয়ে খোদার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো আমরা এ ধরনের অর্থ হযরত ঈসার জন্য প্রস্তাব করতে পারি কি? মোটেই নয়। কোনো খ্রিষ্টান হযরত ঈসা সম্পর্কে এমন অবমাননাকর কথা বলার অধিকার রাখে কি যে, তিনি ক্রুশীয় ঘটনার পর খোদাবিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন আর শয়তানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন? পৃথিবীর সৃষ্টি হতে অভিশাপের অন্তর্নিহিত মর্ম এটিই চলে আসছে আর এ বিষয়ে পৃথিবীর সকল জাতির মতৈক্য রয়েছে। কিন্তু পরিতাপ! খ্রিষ্টানরা কখনো এ অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করে নি নতুবা গভীর ঘৃণার সাথে তারা এ বিশ্বাস পরিত্যাগ করত। এ ছাড়া ইনজীল যে-সব ঘটনা উপস্থাপন করেছে তা থেকে বুঝা যায় যে ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে রেহাই পাবার পর হযরত ঈসার কেবল মাটির দেহই দেখা গিয়েছে। যেমন- থমাস হাওয়ারী যখন সন্দেহ করল যে, হযরত ঈসা কীভাবে ক্রুশ থেকে মুক্তি পেয়ে আসতে পারেন? তখন হযরত ঈসা প্রমাণ দেবার জন্য নিজের ক্ষত তাকে দেখালেন আর থমাস ক্ষতস্থানে নিজের আঙুলও রাখলেন। প্রশ্ন হলো, জালালী বা আধ্যাত্মিক দেহে কি ক্ষত থাকতে পারে? অথবা আমরা কি বলতে পারি যে, জালালী দেহ লাভ করেছেন কিন্তু আঘাত ও ক্ষত হতে অব্যাহতি পান নি বরং জালালী দেহ সেটি ছিল যা কাশ্মীরে মৃত্যু পাবার পরে লাভ হয়েছে? –লেখক

নির্দিষ্ট করা একটি অন্যায়, বরং একটি কুফরী বইকি। কোনো সত্যিকার মুমিন এমন অবমাননাকর কথা বলতে পারে কি যে, মহানবী (সা.), যাঁর কবরের নীচে জান্নাত, তিনি অদ্যাবধি জান্নাতের বাইরে আছেন! পক্ষান্তরে যারা তাঁর মাধ্যমে ঈমান ও তাকওয়ার মর্যাদায় ধন্য হয়েছে, শহীদ হবার কারণে তারা বেহেশতে রয়েছে আর বেহেশতের ফলফলাদি খাচ্ছে। সত্য কথা হলো, যে খোদার পথে জীবন উৎসর্গ করেছে, সে শাহাদত বরণ করেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের নবী (সা.) সবচেয়ে বড়ো শহীদ। অতএব একথা যেখানে প্রমাণিত সেখানে আমরাও বলি যে, হযরত ঈসা সশরীরে আকাশে উত্থিত হয়েছেন (কিন্তু সে দেহ নিয়ে যা এই এই জড় দেহ হতে ভিন্ন) আর খোদা তা'লার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং বেহেশতে প্রবেশ করেছেন। এমতাবস্থায় আমাদের ও আমাদের বিরোধীদের মাঝে বিতণ্ডা কেবল শব্দচয়ন নিয়ে। তাই এমতাবস্থায় যখন সশরীরে রাফা প্রমাণিত হলো, সেখানে এরপর সকল নবীকে পবিত্র দেহ দেওয়া সংক্রান্ত খোদার একটি প্রতিষ্ঠিত রীতি অবজ্ঞা করে শুধু ঈসাকে মাটির দেহ সহ আকাশে ওঠানোর আর দরকার কী। যদি বিশ্বাস এটিই হয়ে থাকে যে, তিনিও মৃত্যুর পর একটি নূরের দেহ লাভ করেছিলেন, যেমনটি কিনা হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ইয়াহইয়া প্রমুখ নবীদের লাভ হয়েছিল আর সেই দেহসহ তারা খোদা তা'লার দিকে উত্থিত হয়েছেন, তাহলে একথা আমরা অস্বীকার করি না। এমন দেহ নিয়ে হযরত মসীহর আকাশে যাওয়া আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করি।

چشم ما روشن ودلِ ماشاد۔

(আমাদের চোখ উজ্জ্বল আর আমাদের হৃদয় প্রফুল্ল –অনুবাদক)।

যদিও উল্লিখিত আয়াত হযরত ঈসার মৃত্যু সম্পর্কে স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত একটি আয়াত, তা সত্ত্বেও যদি কুরআন শরীফকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখা হয় তাহলে বুঝা যাবে যে, আরো অনেক এমন আয়াত রয়েছে যা দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ সেসব আয়াতের একটি হলো,

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুধু একজন রসূল এবং তাঁর পূর্বের সকল রসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তিনি যদি মারা যান কিংবা নিহত হন, তোমরা কি

ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে? (আলে ইমরান: ১৪৫) যেমনটি এখনই আমি বর্ণনা করেছি, একথা সঠিক নয় যে, 'খালাত' শব্দ অন্য সকল নবীর জন্য মৃত্যু দেবার অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য 'সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাবার' অর্থে ব্যবহৃত হবে। এ দাবিটি সম্পূর্ণরূপে প্রমাণশূন্য। এর অনুকূলে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় নি। সত্য কথা হলো, পবিত্র কুরআনের যে-সব স্থানে 'খালাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, (তা) মৃত্যুর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো ব্যক্তি পবিত্র কুরআন থেকে এমন একটি উদাহরণও দেখাতে পারবে না যে, (খালাত) সশরীরে আকাশে তুলে নেবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া যেমনটি এখনই বর্ণনা করলাম, এই আয়াতগুলোতে খোদা তা'লা স্বয়ং 'খালাত' শব্দের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। 'খালাত' শব্দের অর্থ কেবল মৃত্যু ও নিহত হবার মাঝেই সীমিত করে দিয়েছেন। এ মহান আয়াত, যার ভিত্তিতে সাহাবীগণ (রা.)-এর মাঝে এ বিষয়ে ইজমা হয়েছিল যে, সকল নবী ও রসূল মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের কেউ পৃথিবীতে আর আসবেন না। বাস্তবিকপক্ষে এই ইজমার আসল প্রতিপাদ্য হলো (পুনরায়) পৃথিবীতে ফিরে আসা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর এই ইজমার উদ্দেশ্য ছিল, মহানবী (সা.) পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং মুনাফিকদের নাক-কান কাটবেন মর্মে ধারণার অপনোদন করা, যা হযরত উমর (রা.)-এর হৃদয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। এমতাবস্থায় এটি জানা কথা যে, ইসলাম ধর্মে যদি কোনো নবীর পৃথিবীতে ফিরে আসার ধারণা স্বীকৃত হতো তাহলে এই আয়াত পাঠ করে হযরত উমর (রা.)-এর ধারণার অপনোদন করা অসম্ভব আর মহানবী (সা.)-কেও খাটো করা হতো, বরং এমন পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর এ আয়াত পাঠ করাই অপ্রাসঙ্গিক ছিল। বস্তুত এ আয়াতটি সেই মহান আয়াত যা সরবকণ্ঠে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর ঘোষণা প্রদান করে। فالحمد لله على ذالك।

এছাড়া আরো একটি আয়াত আছে যার মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন,

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَ اُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ

অর্থাৎ ঈসা মসীহ একজন রসূল মাত্র। তাঁর পূর্বের সকল রসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মাতা একজন পুণ্যবতী নারী ছিলেন। তারা উভয়েই যখন জীবিত ছিলেন খাবার খেতেন। (আল-মায়েদা: ৭৬)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'লা হযরত ঈসা (আ.)-এর ঈশ্বরত্বের বিশ্বাসের অপনোদন করছেন আর বলছেন, তার পূর্বের সকল রসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও এ ধারণা রাখা ভুল যে, মসীহ জীবিত আকাশে বসে আছেন। কাজেই, এ যুক্তির মাধ্যমে কীভাবে তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে? কারণ এ যুক্তিই ভ্রান্ত। সত্য কথা হলো, মৃত্যু কাউকে রেহাই দেয় নি, সবাই মৃত্যুবরণ করেছে। তার মা থাকা তাঁর বান্দা হবার অনুকূলে দ্বিতীয় প্রমাণ যার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন; কেননা খোদার কোনো মা থাকতে পারে না। তাঁর বান্দা হবার তৃতীয় প্রমাণ হলো, তিনি ও তাঁর মাতা যখন জীবিত ছিলেন, উভয়েই আহার করতেন আর খোদা আহার করার মতো দুর্বলতার ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ খাবার (দেহের) ঘাটতি পূরণ করার জন্য হয়ে থাকে আর খোদার সত্তায় কোনো ঘাটতি বা ক্ষয়ের কথা ভাবাই যায় না; কিন্তু মসীহ খাবার খেতেন। অতএব তিনি যদি খোদা হয়ে থাকেন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়! খোদার সত্তাও কি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে থাকে? এটি একথার প্রতি ইঙ্গিত যে, গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের দেহ তিন বছরে সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়, পূর্বের উপাদানগুলো ক্ষয় হয়ে যায় আর নতুন উপাদান সেগুলোর স্থান নিয়ে নেয়, কিন্তু খোদার সত্তায় আদৌ এমন কোনো দুর্বলতা নেই। হযরত ঈসা যে মানুষ ছিলেন তার প্রমাণ হিসেবে খোদা তা'লা এই দলিল উপস্থাপন করেন।

অথচ এদের জন্য পরিতাপ! হযরত ঈসাকে আকাশে তুলে দিয়ে আবার বিশ্বাস রাখে যে, তার অস্তিত্বে মানুষের ন্যায় ক্ষয়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার মতো দুর্বলতা নেই আর ক্ষয়ের ঘাটতি খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে পুরণ হওয়া ছাড়াই তাঁর অস্তিত্ব লয় ও ধ্বংস হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে! এভাবে তারা খোদার এই যুক্তি ও প্রমাণকে খণ্ডন করতে চায় যা তিনি আলোচ্য আয়াতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অর্থাৎ খোদা, হযরত ঈসা (আ.)-এর মানুষ হবার এই প্রমাণ দিচ্ছেন যে, তিনিও মানুষের মতো খাবারের মুখাপেক্ষী ছিলেন। খাবার ছাড়া তার দেহ টিকে থাকতে পারত না বরং যা ক্ষয় হতো তা পুরণের প্রয়োজন পড়ত; কিন্তু এরা হযরত ঈসাকে স্বশরীরে আকাশে তুলে। তারা এ বিশ্বাস রাখে যে, তার দেহ খাবার ছাড়া টিকে থাকতে পারে আর এভাবে আল্লাহ তা'লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা হযরত ঈসার ঈশ্বরত্বের অনুকূলে একটি খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করায়। হযরত ঈসার মানুষ হবার অনুকূলে খোদা তা'লা যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, লজ্জার বিষয় হলো– এরা সেই প্রমাণের অসম্মান করে।

কেননা খোদা তা'লা যে বিষয় অস্বীকার করেন অর্থাৎ মসীহকে ঈশ্বর আখ্যা দেবার জন্য যে বৈশিষ্ট্য দরকার তা তার মাঝে নেই কিন্তু এরা বলে সেই বৈশিষ্ট্য তার মাঝে আছে। কাজেই, এটি খোদার সেই সুনিশ্চিত যুক্তির অসম্মান– যা তিনি হযরত ঈসার মানুষ হবার অনুকূলে প্রদান করেছেন। যদি একথা সত্য হয় যে, হযরত ঈসা মানব দেহধারী হওয়া সত্ত্বেও খাবারের মুখাপেক্ষী নন আর তার দেহ খোদার সত্তার ন্যায় আপনা-আপনি প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, তাহলে এটি তার ঈশ্বর হবার একটি প্রমাণ বইকি; সূচনা থেকে খ্রিষ্টানরা এটিই উপস্থাপন করে আসছে। এর উত্তরে একথা বলা যথেষ্ট নয় যে, পৃথিবীতে তিনি খাবার খেতেন কিন্তু আকাশে খান না, কেননা বিরোধী বলতে পারে, পৃথিবীতেও তিনি মন চাইলেই খেতেন; অন্য মানুষের মতো খাবারের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। যদি মুখাপেক্ষী হতেন তাহলে আকাশেও অবশ্যই খাবারের মুখাপেক্ষী। এ জাতির জন্য আমার বার বার আক্ষেপ হয় যে, খোদা খাবার খাওয়াকে হযরত ঈসার মানুষ হবার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন অথচ এরা বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা পৃথিবীতে ত্রিশবছর পর্যন্ত খাবার খেয়েছেন কিন্তু আকাশে না খেয়েই ১৯০০ বছর জীবিত আছেন।

হযরত ঈসার মৃত্যুর আরো একটি প্রমাণ হলো পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন,

فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ *

[হে আদম সন্তানগণ! তোমরা পৃথিবীতে জীবনযাপন করবে আর পৃথিবীতেই মৃত্যুবরণ করবে আর পৃথিবী হতেই উত্থিত হবে। (আল-আরাফ: ২৬) –অনুবাদক]

---

* **টীকাঃ** আমরা যেমনটি বর্ণনা করেছি যে হযরত ঈসার নিজস্ব একটি স্বীকারোক্তি রয়েছে যা তার মৃত্যুর প্রমাণ বহন করে। কেননা তিনি 'হে ঈসা তুমিই কি লোকদের শিক্ষা দিয়েছে যে আমাকে ও আমার মাকে খোদা মানো?' মর্মে খোদার প্রশ্নের কুরআনে লিখিত উত্তর এই দেন,

وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ আমি সেসময় পর্যন্ত তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম

অতএব এমন স্পষ্ট আয়াত থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, হযরত ঈসা (আ.) পৃথিবীতে থাকার পরিবর্তে প্রায় ২০০০ বছর বা ততোধিক কোনো অজ্ঞাত কাল পর্যন্ত আকাশে থাকবেন? এমন পরিস্থিতিতে আবশ্যকীয়ভাবে কুরআন মিথ্যা সাব্যস্ত হয়।

এরপর হযরত ঈসার মৃত্যু সম্পর্কে আরো একটি প্রমাণ হলো, পবিত্র কুরআনের আয়াত,

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلَىٰ حِيْنٍ

[তোমাদের বসবাসস্থল পৃথিবী হবে আর মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা পৃথিবীতেই তোমাদের আরাম ও প্রশান্তির উপকরণাদি পাবে। (আল-বাকারা: ৩৭) –অনুবাদক]

এই আয়াতও উল্লিখিত আয়াতের সমর্থক। কাজেই, এটি কী করে সম্ভবপর হতে পারে যে, হযরত ঈসা ভূপৃষ্ঠে শুধু ৩৩ বছর জীবন কাটাবেন– যা মানুষের বসবাসের স্থান, কিন্তু আকাশে যা মানুষের থাকার জায়গা নয় (সেখানে) ২০০০ বা ততোধিক কোনো অজানা কাল পর্যন্ত বসবাস করবেন? এর ফলে তাঁর মানুষ হবার বিষয়ে সন্দেহ দেখা দেবে। বিশেষ করে এ কারণে যে, এমন অতি মানবীয় বিশেষত্ব প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অন্য কোনো মানুষ তাঁর সমকক্ষ নয়।

হযরত ঈসার মৃত্যুর আরেকটি প্রমাণ হলো, পবিত্র কুরআনের আয়াত,

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً

(আর-রূম: ৫৫)

*** চলমান টীকা:** আর যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী তুমিই ছিলে। এ আয়াতে হযরত ঈসা খ্রিষ্টানদের হিদায়াতকে নিজের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করেন। অতএব হযরত ঈসা যদি এখনও জীবিত থাকেন তাহলে খ্রিষ্টানদের সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক আর আয়াত فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ হতে এটিই প্রমাণিত হয়। হযরত ঈসা কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে আসবেন না নতুবা খোদার সামনে তাঁর মিথ্যা বলা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় যে, আমার উম্মতের পথভ্রষ্ট হবার কথা কিছুই জানি না। –লেখক

অর্থাৎ খোদা সেই সত্তা! যিনি তোমাদের দুর্বল অবস্থা হতে সৃষ্টি করেছেন, দুর্বলতার পর আবার শক্তি দিয়েছেন। শক্তিশালী হবার পর দুর্বলতায় ও বার্ধক্যে উপনীত করেছেন। এটি স্পষ্ট কথা যে, এ আয়াত সমগ্র মানবতার জন্য এমনকি সকল নবীও এতে অন্তর্ভুক্ত। সত্য কথা হলো, আমাদের নবী (সা.) যিনি নবীদের সর্দার, তিনিও এর ঊর্ধ্বে নন। তাঁর ক্ষেত্রেও বার্ধক্যের লক্ষণাবলি প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল আর শ্মশ্রুতে কিছু সাদা চুল শোভা পেত। তিনি স্বয়ং নিজের মাঝে শেষ বয়সে বার্ধক্যের দুর্বলতা অনুভব করতেন। কিন্তু আমাদের বিরোধীদের কথা অনুসারে হযরত ঈসা, এরও ঊর্ধ্বে। তারা বলে, এটি তার এমন একটি বিশেষত্ব যা অলৌকিক আর এটিই ঈসা (আ.)-এর ঈশ্বর হবার একটি বর্ধিত প্রমাণ। অতএব হযরত ঈসা (আ.)-এর ঈশ্বর হবার শুধু একটি নয় বরং পাঁচটি প্রমাণ রয়েছে– যা খ্রিষ্টানদের দাবি ও আমাদের জাতিভুক্ত বিরোধীদের বিশ্বাস অনুসারে এখানে বিদ্যমান, যার খণ্ডন এই বিশেষত্বের খণ্ডন করা ছাড়া উপায় নেই। এটি বলার কারণ হলো, হযরত ঈসার নিজস্ব বিশেষত্ব হলো, তিনি দেহসহ আকাশে চলে গেছেন, অন্য কোনো মানুষ এক্ষেত্রে তাঁর শরীক বা সমকক্ষ নয়। দ্বিতীয়ত, তিনি এই বৈশিষ্ট্যও রাখেন যে, তিনি শত শত বছর পর্যন্ত কোনো পানাহার ছাড়াই আকাশে জীবিত আছেন। এক্ষেত্রে অন্য কোনো মানুষ তার শরীক বা অংশীদার নয়। তৃতীয় বিশেষত্ব হলো, এত বছর ধরে আকাশে বার্ধক্য ও দুর্বলতামুক্ত অবস্থায় কেবল তিনিই রয়েছেন। এক্ষেত্রে কোনো মানুষ তাঁর সমকক্ষ নয়। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, সুদীর্ঘকাল পর আকাশ হতে ফেরেশতার সাথে অবতরণকারী তিনিই আখ্যায়িত হন, যাতে কোনো একজন মানুষও তাঁর শরীক বা অংশীদার নয়। এখন চিন্তা করে দেখা উচিত, এ চারটি বৈশিষ্ট্য যা শুধুমাত্র তাঁর সত্তায় বিদ্যমান বলে মানা হয় আর এক্ষেত্রে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় মনে করা হয়! এ বিশ্বাস মানুষের জন্য কতটা পরীক্ষার কারণ হতে পারে?* তাঁকে খোদা বানানোর বহু যুক্তি হাতে এসে যায় যা স্বয়ং মুসলমানদের স্বীকারোক্তি দ্বারা সাব্যস্ত। অতএব খোদা যদি হযরত ঈসাকে মৃত আখ্যা দিয়ে এসব বিশেষত্বকে প্রত্যাখ্যান বা খণ্ডন না

---

* **টীকাঃ** এছাড়াও, আমাদের বিরোধী মুসলমানরা দুর্ভাগ্যবশত ও অজ্ঞতার কারণে হযরত ঈসা (আ.)-এর মাঝে একটি পঞ্চম বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান বলে বিশ্বাস করে। আর তা হলো, সব নবীর মাঝে শয়তানের স্পর্শ থেকে কেবল তিনিই পবিত্র, অন্য কোনো

করেন তাহলে খণ্ডনের দ্বিতীয় রীতি ছিল, খোদা তা'লার এমন কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা যা হতে বুঝা যেত যে, এসব অলৌকিক বিষয়ে অন্য কতক মানুষও তাঁর শরীক বা অংশীদার। যেমনটি বিনা পিতায় জন্মের ক্ষেত্রে খোদা তা'লা হযরত আদম (আ.)-এর উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু যেখানে খোদা তা'লা (তাদের কথা অনুসারে) হযরত ঈসাকে মৃতও আখ্যা দেন নি আর সেসব বিশেষত্বকেও খণ্ডন করেন নি; এমতাবস্থায় খোদা তা'লা যেন খ্রিষ্টানদের যুক্তির সামনে নির্বাক হয়ে গেলেন। যদি বলো, আমরা এটিও বলি যে, হযরত

*** চলমান টীকাঃ** নবী পবিত্র নন। এবং ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হলো, রূহুল কুদুস বা পবিত্রাত্মা সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকত, কিন্তু অন্য কোনো নবীর সঙ্গে রূহুল কুদসের এমন স্থায়ী সাহচর্য ছিল না। মূলত এগুলো সবই তাদের ভুল ধারণা। তারা বোঝে না যে, প্রত্যেক নবীই শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র। কিন্তু আল্লাহ যে এখানে তাঁর রসূলের বাণীর মাধ্যমে হযরত ঈসা ও তাঁর মাতাকে শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র হবার কথা উল্লেখ করেছেন, এর পেছনে প্রজ্ঞা হলো, অভাগা ইহুদীরা হযরত মরিয়ম সিদ্দীকাকে একজন ব্যভিচারিণী মহিলা মনে করত এবং হযরত ঈসাকে জারজ সন্তান বলে ধারণা করত– আমরা এমন ধারণা হতে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আল্লাহ তা'লা এই অপবাদ থেকে তাদের নির্দোষ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তাই হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা উভয়ই শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র– এভাবে তিনি তাদের অপবাদমুক্ত করলেন। অর্থাৎ ব্যভিচার একটি শয়তানি কাজ আর ঈসা ও মরিয়ম এই শয়তানি কাজ থেকে সুরক্ষিত। এর অর্থ এই নয় যে, কেবল তাঁরাই সুরক্ষিত আর অন্য নবীগণ কলুষিত।

একইভাবে ইহুদীদের ধারণা ছিল যে, অবৈধ জন্মের কারণে হযরত ঈসার সঙ্গী হলো শয়তান এবং তওরাত অনুসারে এটিই ছিল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের খণ্ডনের উদ্দেশ্যে রূহুল কুদুসের বা পবিত্মার সাহচর্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

এটাও সঠিক নয় যে, ঈসার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর জন্ম রূহুল কুদুসের ছায়ায় হয়েছিল। কারণ কুরআন শরীফ ও তওরাত অনুসারে এটি প্রতিষ্ঠিত যে, কিছু মানুষ শয়তানের ছায়ায় জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে শয়তানি স্বভাব থাকে, আর কিছু মানুষ রূহুল কুদুসের ছায়ায় জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে পবিত্র স্বভাব থাকে। যারা অবৈধ সন্তান, তারা শয়তানের ছায়াতেই মাতৃগর্ভে অস্তিত্ব লাভ করে। তাই এটি খণ্ডন করা প্রয়োজন ছিল যে, হযরত ঈসার জন্ম অবৈধ নয়। অতএব তাঁর সম্পর্কে রূহুল কুদুসের ছায়ার উল্লেখ ইনজীলেও করা হয়েছে, যাতে জানা যায় যে, তিনি শয়তানের ছায়ায় জন্মগ্রহণ করেন নি এবং তাঁর জন্ম অবৈধও নয়। –লেখক

ঈসা শেষ যুগে এসে একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার পর মৃত্যুবরণ করবেন; তাহলে একথার উত্তর হলো, খ্রিষ্টানরা এটি মানে না। তারা তোমাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা তোমাদেরকেই অভিযুক্ত করে। তোমাদের প্রমাণবিহীন দাবি মেনে নেওয়া তাদের জন্য আবশ্যক নয়। কেননা হযরত ঈসা যদি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকেন আর মৃতদের জীবিত করার মতো ঈশ্বর হবার সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর সত্তায় বিদ্যমান থাকে তাহলে হতে পারে তিনি মৃত্যুও এড়াতে সক্ষম হবেন। কেননা খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস তো এটিই যে, তিনি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে মরবেন না বরং ঈশ্বর হিসেবে মানুষকে শাস্তি-পুরস্কার বা প্রতিদান দেবেন। যেখানে তোমাদের নিজেদের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে এ চারটি বৈশিষ্ট্য হযরত ঈসার মাঝে প্রমাণিত, এমতাবস্থায় খ্রিষ্টানরা আপনাদের কাঁধে চড়ে বসবে। তাদের মতে, হযরত ঈসাকে ঈশ্বর বানানোর জন্য এই চারটি বিশেষত্বই যথেষ্ট। আর এটি খোদার প্রজ্ঞা পরিপন্থি কথা যে, খোদা এমন ব্যক্তিকে এই চারটি বিশেষত্ব দান করবেন যাকে চল্লিশ কোটি মানুষ ঈশ্বর বানাচ্ছে। মহানবী (সা.)-এর যুগে খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসার বিশেষত্ব সম্পর্কে শুধু একটি বিষয় উপস্থাপন করেছিল অর্থাৎ তিনি বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন খোদা তাৎক্ষণিকভাবে এর উত্তর দিয়েছেন আর বলেছেন,

إِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার দৃষ্টিতে ঈসার উপমা হলো আদম। খোদা তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এরপর বলেন হও আর সে জীবন্ত-প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। (সূরা আলে ইমরান: ৬০) অর্থাৎ হযরত ঈসার বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করা তাকে তেমন কোনো বিশেষত্ব প্রদান করে না, যে কারণে আবশ্যকীয়ভাবে সে ঈশ্বর হতে পারে। আদমের পিতামাতা কেউই ছিল না। অতএব যেখানে খোদা তা'লার আত্মাভিমানের দাবি হলো, হযরত ঈসার মাঝে বিনা পিতায় জন্মগ্রহণের বিশেষত্ব যেন না থাকে যেন তার ঈশ্বর হবার পক্ষে কোনো খোঁড়া যুক্তি দাঁড় না করানো হয়; তাই এটি কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে যে, খোদা তা'লা হযরত ঈসার মাঝে চারটি অলৌকিক বিশেষত্ব রয়েছে বলে মেনে নিলেন? তবে খোদা যদি এসব বিশেষত্ব খণ্ডনের জন্য কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে থাকেন তাহলে সেসব উদাহরণ উপস্থাপন করা উচিত, নতুবা মানতে হবে যে, খোদা তা'লা খ্রিষ্টানদের দাবির উত্তর দিতে পারেন নি, কেননা

এগুলো এমন বিশেষত্ব যা খ্রিষ্টানরা উপস্থাপন করে থাকে আর এসব বিশেষত্বকে হযরত ঈসা (আ.)-এর ঈশ্বর হবার অনুকূলে প্রমাণ আখ্যায়িত করে। অতএব যেখানে খোদা তা'লা এ চারটি বিশেষত্বকে আদমের জন্মের ন্যায় কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে খণ্ডন করেন নি, তাই সাব্যস্ত হলো যে, খোদা তা'লা খ্রিষ্টানদের দাবি মেনে নিয়েছেন। আর যদি খণ্ডন করে থাকেন এবং এই চারটি বিশেষত্বের কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে থাকেন, তাহলে পবিত্র কুরআন হতে সেই আয়াতগুলো উপস্থাপন করো।

পবিত্র কুরআনের সেসব আয়াতের মধ্য হতে যেগুলো হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে একটি হলো,

وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ

(আন-নাহল: ২১-২২)

অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের পূজা করা হয় সেগুলো কোনোকিছু সৃষ্টি করতে পারে না বরং তারাই সৃষ্ট এবং তারা সবাই মৃত, জীবিত নয়; আর তারা জানে না কখন তাদের উত্থিত করা হবে।

অতএব এ স্থানে মনোযোগ দিয়ে দেখা উচিত যে, এ আয়াতগুলো কত পরিষ্কারভাবে হযরত ঈসা এবং সেসব লোকের মৃত্যুর ঘোষণা দিচ্ছে যাদেরকে ইহুদী, খ্রিষ্টান ও আরবের কোনো কোনো গোত্র নিজেদের উপাস্য গণ্য করত এবং তাদের কাছে দোয়া করত। স্মরণ রেখো! এটি খোদার কথা, আর অবাস্তব কথা বলা খোদার মহিমা পরিপন্থি কাজ। অতএব যেখানে তিনি পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বলছেন– বিভিন্ন ফিরকায় যত মানুষের পূজা করা হয় আর যাদেরকে ঈশ্বর বানানো হয়েছে তারা সবাই মারা গিয়েছে, তাদের মাঝে একজনও জীবিত নেই; সেখানে হযরত ঈসা (আ.)-কে জীবিত মনে করা কত বড়ো বিদ্রোহ, অবাধ্যতা এবং খোদার নির্দেশের বিরোধিতা! হযরত ঈসা (আ.) কি সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত নন, যাদেরকে ঈশ্বর বানানো হয়েছে আর নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য যাকে ডাকা হয়? সত্য কথা হলো, তিনি এমন লোকদের মাঝে তালিকার শীর্ষে রয়েছেন, কেননা তাকে ঈশ্বর বানানোর জন্য চল্লিশ কোটি মানুষ যেমন বাড়াবাড়ি করে এবং নাছোড় আচরণ প্রদর্শন করছে, তার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো ফিরকায় আদৌ দেখা যায় না।

এসব আয়াত যা আমরা এখানে লিখেছি, তা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এরপর আমরা যখন মহানবী (সা.)-এর হাদীস শরীফের প্রতি তাকাই তা থেকেও এ অর্থই সাব্যস্ত হয়। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, আল্লাহ তা'লা স্বীয় উক্তির মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন আর মহানবী (সা.) নিজের দর্শনের বা চাক্ষুষ দেখার ভিত্তিতে হযরত ঈসার মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। অতএব খোদা তা'লা নিজের কথা এবং মহানবী (সা.) স্বীয় কর্মের মাধ্যমে অর্থাৎ দেখার ভিত্তিতে এ বিষয়ে মোহরাঙ্কিত করেছেন বা সত্যায়ন করেছেন যে, হযরত ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা মহানবী (সা.) চাক্ষুষ দেখার ভিত্তিতে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি মেরাজের রাতে হযরত ঈসাকে প্রয়াত নবীদের মাঝে আকাশে দেখেছেন; যারা এ পৃথিবী হতে অন্য জগতে চলে গেছেন। কেবল এতটুকুই নয় বরং অন্য নবী আলাইহিমুস সালামদের দেহ যেভাবে দেখেছেন হযরত ঈসার দেহও সেভাবেই দেখেছেন। আমরা পূর্বেও লিখেছি, এমনটি মনে করা ভুল যে, এ পৃথিবী হতে বিদায় নেওয়া পূর্ববর্তী নবী আলাইহিমুস সালামদের আকাশে কেবল আত্মা বিদ্যমান বরং তাদের সাথে জ্যোতির্মণ্ডিত ও প্রতাপান্বিত দেহ রয়েছে, যে দেহের সাথে মৃত্যুর পর তাঁরা পৃথিবী থেকে উত্থিত হয়েছেন। যেমনটি আয়াত– وَادْخُلِي جَنَّتِي (আল-ফাজর: ৩১) একথার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, কেননা বেহেশতে প্রবেশের জন্য দেহের প্রয়োজন আর পবিত্র কুরআন বিভিন্ন স্থানে স্পষ্টভাবে বলে যে, যারা বেহেশতে প্রবেশ করবে তাদের দেহও থাকবে; কেউ শুধু আত্মা নিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে না। অতএব আয়াত وَادْخُلِي جَنَّتِي একথার অনুকূলে সুস্পষ্ট একটি আয়াত যে, প্রত্যেক পুণ্যবান যে মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করে, সে মৃত্যুর পর অবশ্যই একটি দেহ লাভ করে। দেহ লাভ করা সম্পর্কে দ্বিতীয় সাক্ষ্য মহানবী (সা.)-এর চাক্ষুষ দর্শন। কেননা তিনি (সা.) মিরাজের রাতে আকাশে কেবল নবীদের আত্মাই দেখেন নি বরং তিনি তাদের দেহও দেখেছেন। হযরত মসীহর ভিন্ন কোনো দেহ দেখেন নি বরং যেভাবে অন্য সব নবীর দেহ দেখেছেন হযরত ঈসা-মসীহর দেহও তেমনই ছিল। কাজেই, মানুষ যদি অযথা মিথ্যা পূজার বিষয়ে হঠকারিতামূলক আচরণ প্রদর্শন না করে, তাহলে তার জন্য একথা অনুধাবন করা খুবই সহজ যে, হযরত ঈসা যে দেহ নিয়ে উত্থিত হয়েছেন তা ভৌত দেহ ছিল না বরং তা সেই দেহ ছিল যা মৃত্যুর পর

প্রত্যেক মুমিন লাভ করে থাকে। কেননা আল্লাহ তা'লা স্বয়ং বলেন, ভৌত দেহ আকাশে যেতে পারে না। যেমন তিনি বলেন,

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَآءً وَّ اَمْوَاتًا

অর্থাৎ আমরা কি ভূমিকে এরূপ বানাই নি যে, তা জীবিত ও মৃত অবস্থায় মানুষের দেহকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে, কোনো দেহকেই ছাড়ে না বা আকাশের দিকে যাবার সুযোগ প্রদান করে না। (আল-মুরসালাত: ২৬-২৭)

এছাড়া অন্যত্র তিনি বলেন,

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا

অর্থাৎ কাফিররা যখন মহানবী (সা.)-কে আকাশে আরোহণের অনুরোধ জানায় অর্থাৎ বলে, সশরীরে আকাশে আরোহণ করে দেখান, তখন তারা এ উত্তর পায় যে,

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا

অর্থাৎ তাদের বলে দাও, আমার খোদা অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার অভিযোগ হতে পবিত্র। তিনি পূর্বেই বলেছেন, সশরীরে কেউ আকাশে যাবে না। (বনী ইসরাঈল: ৯৪) যেমন তিনি বলেন,

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَآءً وَّ اَمْوَاتًا

আবার বলেন,

فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ

(আল-আরাফ: ২৬)

পুনরায় বলেন,

وَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

(আল-বাকারা: ৩৭)

অতএব এটি কেবল আরবের কাফিরদের দুষ্কৃতি ছিল যে, তারা খোদার প্রতিশ্রুতি পরিপন্থি নিদর্শন দাবি করত অথচ তারা খুব ভালোভাবেই জানত, এমন নিদর্শন দেখানো হবে না, কেননা এটি খোদার সেই উক্তি-পরিপন্থি যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর খোদা তা'লা স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করার মতো

কাজ করা থেকে পবিত্র। পুনরায় তিনি বলেন, তাদের বলে দাও আমি কেবল একজন মানুষ আর খোদা বলে দিয়েছেন যে, মানুষের জন্য ভৌত দেহ নিয়ে আকাশে আরোহণ করা নিষিদ্ধ। অবশ্য, পবিত্ররা অন্য দেহ সহকারে আকাশে যেতে পারে। যেমন- সকল নবী ও রসূল এবং মুমিনদের আত্মা মৃত্যুর পর আকাশে গিয়ে থাকে। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'লা বলেন,

مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ

অর্থাৎ মুমিনদের জন্য আকাশের দ্বার অবারিত করা হবে। (সোয়াদঃ ৫১)

স্মরণ রাখা উচিত, যদি কেবল রূহ বা আত্মা হতো তাহলে তাদের জন্য 'লাহুম' সর্বনাম ব্যবহার করা হতো না। অতএব এটি একথার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে, মৃত্যুর পর মুমিনদের দেহের যে রাফা হয় তা কিন্তু মাটির দেহ নয় বরং মুমিনের রূহ বা আত্মাকে আরেক ধরনের দেহ প্রদান করা হয় যা পবিত্র ও জ্যোতির্মণ্ডিত হয়ে থাকে আর তা সেসব কষ্ট ও দুর্বলতা হতে মুক্ত থাকে যা ভৌত দেহের আবশ্যকীয় অংশ, অর্থাৎ তা জাগতিক পানাহারের মুখাপেক্ষী হয় না। সেসব মানুষ যাদেরকে খোদা তা'লার নৈকট্য প্রদান করা হয় তারা এমন দেহই লাভ করে। আর আমরা ঈমান রাখি যে, হযরত ঈসাও মৃত্যুর পর এমন দেহই লাভ করেছেন আর সেই দেহসহ তাকে খোদার দিকে ওঠানো হয়েছে।

কোনো কোনো নির্বোধ এখানে এই আপত্তি করে, যেখানে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত

وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ

এবং এই আয়াত

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

(আল-মায়েদাঃ ১১৮) পরিষ্কারভাবে বলছে, হযরত ঈসা (আ.) খোদার সামনে এই অজুহাত দেখাবেন যে, মানুষ আমার মৃত্যুর পর বিকৃত হয়েছে আমার জীবদ্দশায় নয়, একথার বিরুদ্ধে আপত্তি বর্তায়। কেননা যদি এ বিশ্বাস সঠিক হয়ে থাকে যে, হযরত ঈসা ক্রুশীয় মৃত্যু হতে পরিত্রাণ লাভ করে কাশ্মীর অভিমুখে চলে গিয়েছিলেন আর কাশ্মীরে ৮৭ বছর বয়স অতিবাহিত করেছেন, এমতাবস্থায় একথা বলা সঠিক নয় যে, আমার মৃত্যুর পর লোক নষ্ট হয়েছে বরং বলা উচিত ছিল, আমার কাশ্মীরে যাবার পর লোকেরা বিকৃত হয়েছে, কেননা তার মৃত্যু হয়েছে ক্রুশের ঘটনার ৮৭ বছর পর।

স্মরণ রাখা উচিত, এমন ধারণা সঠিক চিন্তাশক্তির অভাবে হৃদয়ে দানা বাঁধে; কেননা কাশ্মীর অভিমুখে সফর এ বাক্যের বিরোধী নয়, কারণ مَادُمْتُ فِيْهِمْ -এর অর্থ হলো, যতদিন আমি আমার সেই উম্মতের মাঝে ছিলাম, যারা আমার প্রতি ঈমান এনেছিল। এর অর্থ এটি নয় যে, যতদিন আমি তাদের দেশে ছিলাম। কেননা আমরা জানি, হযরত ঈসা সিরিয়া থেকে হিজরত করে কাশ্মীর অভিমুখে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা একথা স্বীকার করি না যে, হযরত ঈসার মাতা এবং তার হাওয়ারীরা পেছনে থেকে গেছে বরং ইতিহাসের আলোকে প্রমাণিত যে, হযরত ঈসার হাওয়ারীরাও কিছু তাঁর সাথে আর কিছু পরে তাঁর সাথে এসে যোগ দিয়েছে। যেমন- থমাস হাওয়ারী হযরত ঈসার সাথে এসেছিলেন, অন্য হাওয়ারীরা পরে এসেছিলেন। আর হযরত ঈসা নিজের সাথি হিসেবে কেবল একজনকেই নির্বাচন করেছিলেন অর্থাৎ থমাসকে। যেভাবে আমাদের নবী (সা.) মদীনা অভিমুখে হিজরতের সময় শুধু হযরত আবু বকরকেই পছন্দ করেছিলেন। এর কারণ হলো, রোমান কর্তৃপক্ষ হযরত ঈসাকে বিদ্রোহী ঘোষণা করেছিল আর সেই অপরাধে পিলাতকেও রোমান সম্রাটের নির্দেশে হত্যা করা হয়েছিল। কেননা সে পর্দার অন্তরালে হযরত ঈসার সমর্থক ছিল আর তার স্ত্রীও হযরত ঈসার ভক্ত ছিল। তাই হযরত ঈসার এ দেশ থেকে কোনো কাফিলা সাথে না নিয়ে গোপনে যাত্রা করা আবশ্যক ছিল। এ কারণে তিনি এই সফরে কেবল থমাস হাওয়ারীকে সাথে নিয়েছেন, যেভাবে আমাদের নবী (সা.) মদীনার সফরে শুধু হযরত আবু বকরকে সাথে নিয়েছিলেন। আর যেভাবে আমাদের নবী (সা.)-এর বাকি সাহাবীরা বিভিন্ন পথ পাড়ি দিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে মদীনায় পৌঁছেছিলেন ঠিক একইভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীরাও বিভিন্ন পথ পাড়ি দিয়ে, বিভিন্ন সময়ে হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। যতদিন হযরত ঈসা তাদের মাঝে ছিলেন, যেমনটি আয়াত مَادُمْتُ فِيْهِمْ এর প্রতিপাদ্য বিষয়, তারা সবাই একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর তাদের সন্তানসন্ততি বিকৃতির শিকার হয়। এটি জানা যায় না যে, কোন প্রজন্মে গিয়ে এই বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছিল। ঐতিহাসিকরা লিখেছে, তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টধর্ম তাদের মূল শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, মনে হয় হযরত ঈসার মৃত্যুর পর রোমের বাদশার খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার কারণে তারা সবাই স্বদেশের দিকে ফিরে আসে, কেননা তখন প্রবাসে থাকা অর্থহীন ছিল।

আর এখানে একথাও স্মরণ থাকা উচিত, হযরত ঈসা (আ.)-এর কাশ্মীর অভিমুখে সফর করা কোনো প্রমাণবিহীন বিষয় নয় বরং বড়ো বড়ো যুক্তিপ্রমাণাদির ভিত্তিতে এ বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। এমনকি 'কাশ্মীর' শব্দটি স্বয়ং একথার (জ্বলন্ত) প্রমাণ বহন করে। 'কাশ্মীর' শব্দটিকে কাশ্মীরী ভাষায় 'কাশীর' বলা হয় আর সব কাশ্মীরী এটিকে কাশীর বলে। তাই মনে হয়, এ শব্দটি হিব্রু শব্দ যা 'কাফ' ও 'আশীর' শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। আর আশীর হিব্রু ভাষায় সিরিয়াকে বলা হয় এবং কাফ শব্দ সাদৃশ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। অতএব এ শব্দটি ছিল 'কা আশীর' অর্থাৎ 'কাফ' পৃথক এবং 'আশীর' পৃথক, যার অর্থ হলো সিরিয়ার মতো দেশ। এ দেশটি যেহেতু হযরত ঈসা (আ.)-এর হিজরতস্থল ছিল আর তিনি শীতপ্রধান দেশের বাসিন্দা ছিলেন এ কারণে খোদা তা'লা হযরত ঈসাকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে এ দেশের নাম 'কা আশীর' রেখে দিয়েছেন যার অর্থ হলো, 'আশীর' দেশের ন্যায়। এরপর বহুল ব্যবহারের কারণে (মাঝ থেকে) আলিফ উঠে যায় আর 'কাশীর' রয়ে যায়। অনন্তর বিদেশীরা– যারা কাশীরের অধিবাসী ছিল না আর যারা এ দেশের ভাষা জানত না তারা এতে একটি মীম যুক্ত করে কাশ্মীর বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু খোদা তা'লার কৃপা ও দয়ার নিদর্শন হলো, আজও কাশ্মীরী ভাষায় 'কাশীর'-ই বলা ও লেখা হয়ে থাকে।

এছাড়া কাশ্মীরে আজ পর্যন্ত অনেক জিনিসের হিব্রু নাম দেখা যায়, বরং কোনো কোনো পাহাড়ে নবীদের নাম ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে যা থেকে বুঝা যায়, কোনো যুগে অবশ্যই এ এলাকায় হিব্রু ভাষাভাষী জাতি বসবাস করত। যেমন- কাশ্মীরে সোলায়মান নবীর নামে একটি পাহাড় বিদ্যমান রয়েছে। আর এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য আমরা আমাদের কোনো কোনো গ্রন্থে একটি দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করেছি যা হিব্রু শব্দ ও ইসরাঈলী নবীদের নাম-সংবলিত, আর যা আজও কাশ্মীরে বিদ্যমান রয়েছে। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলি আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে যা আমরা অনেক কষ্ট করে জোগাড় করেছি। সেগুলো থেকেও বিশদভাবে জানা যায়, অতীতে এক সময়ে যা কালের গণনায় ২০০০ বছরের কাছাকাছি হবে, একজন ইসরাঈলী কাশ্মীরে এসেছিলেন, যিনি বনী ইসরাঈলী ছিলেন এবং শাহজাদা নবী নামে আখ্যায়িত হতেন। তাঁর সমাধি খানইয়ার মহল্লায় অবস্থিত, যা ইউয আসেফের সমাধি নামে প্রসিদ্ধ। এটি জানা কথা, এসব গ্রন্থ আমার জন্মেরও অনেক পূর্বে

কাশ্মীরে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব কোনো ব্যক্তি কীভাবে বলতে পারে যে, কাশ্মীরীরা বানিয়ে এমন কথা লিখেছিল। আর বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তারা অতি-সরলতার কারণে আজও অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় এ বিশ্বাস রাখে যে, হযরত ঈসা সশরীরে আকাশে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিশ্বাস সত্ত্বেও একথা খুব ভালোভাবে জানে যে, একজন ইসরাঈলী নবী কাশ্মীরে এসেছিলেন, যিনি শাহজাদা নবী হিসেবে নিজের পরিচয় দিতেন আর তাদের বইপুস্তক থেকে জানা যায়, সে যুগের পর থেকে আজ পর্যন্ত ১৯০০ বছরের অধিক কাল কেটে গেছে। এখানে কাশ্মীরীদের সরলতার কারণে আমাদের যে লাভ হয়েছে তা হলো, তারা যদি জানত যে, বনী ইসরাঈলে শাহজাদা নবী কে ছিলেন আর সেই নবী কে, যার তিরোধানের পর অদ্যাবধি ১৯০০ বছর কেটে গেছে তাহলে তারা কখনো আমাদেরকে এসব গ্রন্থ দেখাতো না। তাই, আমি বলি, তাদের অতি-সরলতার কারণে আমাদের অনেক লাভ হয়েছে। এছাড়া তারা শাহজাদা নবীর নাম 'ইউয আসেফ' বর্ণনা করে থাকে। স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, এটি ঈসূ আসেফের এটি বিকৃত রূপ। 'আসেফ' হিব্রু ভাষায় সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জাতির সন্ধান করে বেড়ায়। যেহেতু হযরত ঈসা স্বজাতি তথা ইহুদীদের কিছু হারানো গোত্রের সন্ধানে কাশ্মীরে এসেছিলেন এ কারণে তিনি নিজের নাম ঈসূ আসেফ ধারণ করেছিলেন। ইউয আসেফের পুস্তকে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে, ইউয আসেফের প্রতি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে 'ইনজীল' অবতীর্ণ হয়েছিল। অতএব এমন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও একথা কীভাবে অস্বীকার করা যেতে পারে যে, ইউয আসেফ সত্যিকার অর্থেই হযরত ঈসা (আ.)। নতুবা সে ব্যক্তি মূলত কে– যে শাহজাদা নবী হিসেবে নিজের পরিচয় দিত আর যার যুগ ছিল হযরত ঈসার সমসাময়িক? এটি স্পষ্ট করার দায়িত্ব আমাদের বিরোধীদের কাঁধে বর্তাবে। এটিও জানা গেল যে, হযরত ঈসা যখন কাশ্মীরে এসেছেন তখন সমসাময়িক বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা তাদের পুস্তকে তাঁর কথা কিছুটা উল্লেখ করেছে।

একথার স্বপক্ষে আরো একটি শক্তিশালী প্রমাণ হলো, আল্লাহর উক্তি,

اٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ

(আল-মুমিনূন: ৫১)

অর্থাৎ আমরা ঈসা ও তার মা-কে এমন এক টিলায় আশ্রয় দিয়েছি যা ছিল

নিরাপদ বিশ্রামস্থল এবং সকল শত্রুর নাগালের বাইরে আর সে স্থানের পানি ছিল অত্যন্ত সুপেয়।

স্মরণ রাখার বিষয় হলো, 'আওয়া' শব্দ আরবী ভাষায় একটি সমস্যা থেকে উত্তরণের পর কোনো ব্যক্তিকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। অতএব সেই নিরাপদ স্থল সিরিয়া হতে পারে না, কেননা সিরিয়া রোমান সম্রাটের শাসিত অঞ্চল ছিল আর হযরত ঈসা রোমান সম্রাটের দৃষ্টিতে বিদ্রোহী ছিলেন। অতএব সে স্থানটি কাশ্মীরই ছিল যা সিরিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল আর আরামদায়ক স্থান ছিল অর্থাৎ নিরাপদ স্থান ছিল আর রোমান সম্রাটের সাথে সেই স্থানের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

কোনো কোনো মানুষ এখানে আরো একটি আপত্তি উত্থাপন করে থাকে, আর তা হলো, যেখানে এটি বলা হয়ে থাকে যে, এই মুহাম্মদী ধারা মূসায়ী ধারার সমান্তরালে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে আর সকল ভালো-মন্দে এ জামা'ত মূসায়ী ধারার রং ও বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে রাখে, এই বাস্তবতার নিরিখে যেখানে পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.)-এর নাম মূসার সদৃশ রাখা হয়েছে, তাই শেষ খলীফার নাম ভবিষ্যদ্বাণীতে ঈসার সদৃশ রাখা আবশ্যক ছিল, অথচ 'ইনজীল' এবং মহানবীর হাদীসে খিলাফতের ধারাবাহিকতায় শেষ যুগে আগমনকারী ব্যক্তির নাম ঈসা ইবনে মরিয়ম রাখা হয়েছে, ঈসার মসীল বা ঈসা সদৃশ রাখা হয় নি!

এই অলীক ধারণার উত্তর হলো, ইসলামের প্রথম ও শেষ যুগের খলীফা সম্পর্কে সেভাবেই ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করা আবশ্যক ছিল যেভাবে খোদা তা'লার পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলিতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল। যেমন এ বিষয়টি কারো অজানা নয় যে, তওরাতে মহানবী (সা.) সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা এভাবে রয়েছে– 'খোদা তা'লা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে মূসার সদৃশ এক নবী দণ্ডায়মান করিবেন'। এখানে একথা লেখেন নি যে, খোদা মূসাকে পাঠাবেন। কাজেই, তওরাত অনুসারে পবিত্র কুরআনে মহানবীর আগমন সম্পর্কে খোদা তা'লার একথাই বলা উচিত ছিল, যেন তওরাত ও কুরআনের মাঝে কোনো বিরোধ দেখা না দেয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা.) সম্পর্কে বলেন,

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

(আল-মুযযাম্মিল: ১৬)

অর্থাৎ আমরা ফিরাউনের প্রতি প্রেরিত নবীর ন্যায় তোমাদের প্রতি এ রসূল প্রেরণ করেছি।

কিন্তু শেষ খলীফা সম্পর্কে, যার নাম ইনজীলে ঈসা রাখা হয়েছে– এ সংবাদ দেওয়া হয় নি যে, শেষ যুগে ঈসার মসীল বা সদৃশ আসবেন বরং এটি লেখা হয়েছে যে, ঈসা আসবেন। কাজেই, ইনজীলের ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারে ইসলামের শেষ খলীফার নাম ঈসা রাখা আবশ্যক ছিল, যেন 'ইনজীল' ও মহানবীর হাদীসে বিরোধ না থাকে।

অবশ্য এখানে একজন সত্যসন্ধানীর এ প্রশ্ন করার অবশ্যই অধিকার রয়েছে যে, তওরাতে মহানবী (সা.)-কে কেবল মূসার মসীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু ইনজীলে (ঈসার মসীলকে) ঈসা নামেই উল্লেখ করা হয়েছে– এর পেছনের প্রজ্ঞা ও কারণ কী ছিল? আর ঈসা বলতে আক্ষরিক অর্থে ঈসা নেওয়া আর তাঁরই দ্বিতীয়বার আগমন কেন বৈধ হবে না?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, হযরত ঈসা (আ.) কোনোভাবেই দ্বিতীয়বার আসতে পারেন না, কেননা তিনি ইন্তেকাল করেছেন আর তাঁর মৃত্যুবরণ করার কথা আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন। মহানবী (সা.) হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে সেই দলের মাঝে দেখেছেন যারা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এরপর তৃতীয় সাক্ষ্য হলো, সকল সাহাবী রাযিআল্লাহু আনহুমের সাক্ষ্যের মাধ্যমে সকল নবীর মৃত্যুবরণ করা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এরপর রয়েছে বিবেকের সাক্ষ্য, যা উল্লিখিত তিনটি সাক্ষ্যের সমর্থন করে, কেননা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে বিবেক কখনো কোনো নবীর আজ পর্যন্ত সশরীরে আকাশে যাওয়া ও ফিরে আসার দৃষ্টান্ত দেখে নি। অতএব চারটি সাক্ষ্য সম্মিলিতভাবে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর সশরীরে জীবিত আকাশে যাওয়া এবং অদ্যাবধি জীবিত থাকা আর কোনো সময়ে আবার সেই দেহ নিয়ে পৃথিবীতে আসা– এগুলো সব তাঁর প্রতি অপবাদ ছাড়া কিছু নয়। বড়োই পরিতাপ! একসময় ইসলাম মূর্তিপূজা থেকে যোজন যোজন দূরে ছিল কিন্তু আজ মূর্তিপূজা সদৃশ এ বিশ্বাস মুসলমানদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে, অর্থাৎ হযরত ঈসাকে এমনসব বিশেষত্ব প্রদান করা হয়েছে যা অন্যান্য নবীর মাঝে দেখা যায় না। খোদা তা'লা মুসলমানদের এমন মূর্তিপূজা হতে পরিত্রাণ দিন। ঈসার মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন নিহিত আর ঈসার জীবিত থাকার মাঝে

ইসলামের মৃত্যু নিহিত। খোদা তা'লা অচিরেই সেই দিন নিয়ে আসুন যখন উদাসীন মুসলমানদের দৃষ্টি এই সত্যের প্রতি নিবদ্ধ হবে, আমীন।

এখন সার কথা হলো, যেখানে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল সেখানে এ ধারণা স্পষ্টতই ভ্রান্ত যে, হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন। বাকি থাকল ওপরোক্ত প্রশ্ন যে, একজন উম্মতির নাম ঈসা রাখার পেছনে কী প্রজ্ঞা ছিল আর কেন ইনজীলে এবং মহানবীর হাদীসে তাঁর নাম ঈসা রাখা হলো আর 'মূসার মসীল' শব্দের আদলে সেখানে কেন 'ঈসার মসীল' শব্দ ব্যবহার করা হলো না?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, ইসরাঈলী ঈসাকে যে এক অসাধারণ ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, খোদা তা'লা এই উম্মতের শেষ খলীফাকেও সেই ঘটনার অংশীদার করতে চেয়েছেন। তাঁর নাম ঈসা রাখলেই কেবল তিনি সেই ঘটনার অংশীদার হতে পারতেন। যেহেতু খোদা তা'লা উভয় ধারার মাঝে সামঞ্জস্য দেখাতে চেয়েছেন, সে কারণে তিনি মহানবী (সা.)-এর নাম মূসার মসীল রেখেছেন। কেননা ফেরাউনের সাথে হযরত মূসার যে একটি ঘটনা ঘটেছিল, মহানবী (সা.)-কে মসীলে মূসা বলে সম্বোধন করা হলেই কেবল সে ঘটনায় মূসার সাথে তাঁর পূর্ণ ও পরিষ্কার সামঞ্জস্য সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু হযরত ঈসা যে ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা এই উম্মতের শেষ খলীফার বেলায় কেবল তখনই পূর্ণ হতে পারত যদি তাঁর নাম ঈসা রাখা হতো। কেননা সেই ঈসা (আ.)-কে ইহুদীদের গ্রহণ না করার শুধুমাত্র কারণ ছিল, মালাকী নবীর পুস্তকে লেখা হয়েছিল, যতদিন ইলিয়াস নবী পুনরায় পৃথিবীতে না আসবেন ততদিন ঈসা আবির্ভূত হবে না। কিন্তু ইলিয়াস নবী পৃথিবীতে আসেন নি আর যোহন অর্থাৎ ইয়াহইয়াকেই ইলিয়াস আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এ কারণে ইহুদীরা হযরত ঈসাকে গ্রহণ করে নি। কাজেই, সাদৃশ্যের পূর্ণতার জন্য ঐশী বিধানে এটি নির্ধারিত হয়েছিল যে, শেষ যুগে এই উম্মতের কিছু লোক সেসব ইহুদী সৃদশ হয়ে যাবে যারা আগমনকারী ইলিয়াসের রহস্য না বুঝে হযরত ঈসার নবুওয়ত এবং তাঁর সত্যতাকে অস্বীকার করেছিল। অতএব এমন ইহুদীদের জন্য এরূপ কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রয়োজন ছিল যাতে অতীতের কোনো নবীর আগমনের উল্লেখ থাকবে, যেমনটি ইলিয়াস নবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল। এছাড়া ঐশী বিধানে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে, এমন ইহুদী এ উম্মতেও জন্মগ্রহণ করবে। অতএব এ কারণেই আমার নাম

ঈসা রাখা হয়েছে, যেমনটি কিনা হযরত ইয়াহইয়ার নাম ইলিয়াস রাখা হয়েছিল। যেমন- غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব ঈসার আগমনের ভবিষ্যদ্‌বাণী এ উম্মতের জন্য তদ্রূপ, যেমনটি ইহুদীদের জন্য হযরত ইয়াহইয়ার আগমনের ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল। বস্তুত এ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য আমার নাম ঈসা রাখা হয়েছে। আর কেবল এতটুকুই নয়, বরং এ উম্মতের মাঝে এই ঈসাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যানকারীদেরও জন্ম নেবার কথা ছিল যাদের নাম ইহুদী রাখা হয়েছে। যেমন- غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ আয়াতে সেসব ইহুদীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ এই উম্মতের ঈসাকে অস্বীকারকারী ইহুদীদের সেসব ইহুদীর সাথে সামঞ্জস্য থাকবে যারা হযরত ঈসাকে গ্রহণ করে নি। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে পরম সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়েছে। যেভাবে সেসব ইহুদী– যারা ইলিয়াস নবীর পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় ছিল, (তারা) হযরত ঈসাকে শুধু এ খোঁড়া যুক্তির ভিত্তিতে মানে নি যে, ইলিয়াস পুনরায় পৃথিবীতে আসেন নি। একইভাবে এরাও এই অজুহাত দেখিয়ে উম্মতের ঈসার প্রতি ঈমান আনে নি, কারণ ইসরাঈলী ঈসা পুনরায় পৃথিবীতে আসেন নি। অতএব ইলিয়াস নবী পুনরায় পৃথিবীতে না আসার কারণে যে-সব ইহুদী হযরত ঈসার প্রতি ঈমান আনে নি তাদের মাঝে এবং সেসব ইহুদীর মাঝে সামঞ্জস্য প্রমাণিত হয়ে গেল যারা পুনরায় হযরত ঈসার আগমনের জন্য প্রতীক্ষারত; এটিই খোদা তা'লার উদ্দেশ্য ছিল। যেমনটি ইসরাঈলী ইহুদী এবং এসব ইহুদীর মাঝে সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়ে গেল, একইভাবে ইসরাঈলী ঈসা এবং এই উম্মতের ঈসা অর্থাৎ আমার মাঝে পরম সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। কেননা একজন নবী পৃথিবীতে পুনরায় আসেন নি বলে ইহুদীদের দৃষ্টিতে সেই ঈসা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। একইভাবে আমি, যে কিনা ঈসা, এসব ইহুদীর দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত হলাম শুধু এই অজুহাতে যে, একজন নবী এখনো পৃথিবীতে আসেন নি। এটি স্পষ্ট বিষয় যে, যে-সব লোককে মহানবীর হাদীস এই উম্মতের ইহুদী প্রমাণ করে, যাদের প্রতি غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ আয়াতও ইঙ্গিত করে, তারা আসল ইহুদী নয় বরং এই উম্মতেরই সদস্য, যাদের নাম ইহুদী রাখা হয়েছে। একইভাবে সেই ঈসাও পূর্বের ঈসা নন, যিনি একজন বনী ইসরাঈলী নবী ছিলেন বরং তিনিও এই উম্মতেরই অন্তর্ভুক্ত একজন লোক। এই উম্মতের প্রতি খোদার যে দয়া ও কৃপা রয়েছে, সে নিরিখে এটি হতেই পারে না যে, তিনি এই উম্মতকে ইহুদী

উপাধি দেবেন বরং সেসব ইহুদী আখ্যায়িত করবেন যারা ইলিয়াস নবীর পুনরাগমনের চূড়ান্ত যুক্তি উপস্থাপন করে হযরত ঈসাকে কাফির এবং মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছিল; কিন্তু এ উম্মতের কোনো ব্যক্তিকে ঈসার উপাধি দান করবেন না। প্রশ্ন হলো, তাহলে এর মাধ্যমে কি এ ফলাফল দাঁড়ায় না, এ উম্মত খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এমন হতচ্ছাড়া ও দুর্ভাগা যে, তারা তাঁর দৃষ্টিতে বিদ্রোহী ও অবাধ্য ইহুদী উপাধি পেতে পারে ঠিকই, কিন্তু এ উম্মতে এক ব্যক্তিও এমন নেই যে ঈসা উপাধি পাবার যোগ্য হবে। অতএব খোদা তা'লা যে একদিকে এই উম্মতের কিছু লোকের নাম ইহুদী রেখেছেন এবং অপরদিকে এক ব্যক্তির নাম ঈসাও রেখেছেন– এর পেছনে এটিই রহস্য।

কিছু লোক নিছক অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে চরম বিদ্বেষের কারণে ধোঁকা দেবার মানসে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার প্রমাণ হিসেবে আয়াত

وَ اِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ

উপস্থাপন করে আর এর এই অর্থ দাঁড় করাতে চায় যে, ততক্ষণ পর্যন্ত হযরত ঈসা ইন্তেকাল করবেন না যতক্ষণ না সব আহলে কিতাব তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে (আন-নিসা: ১৬০)। কিন্তু এমন অর্থ কেবল সে-ই করবে যে কুরআনের পুরো জ্ঞান রাখে না বা যে সততা বিসর্জন দিয়েছে। কেননা এমন অর্থ করলে পবিত্র কুরআনের একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কেননা আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

(আল-মায়েদা: ১৫)

পুনরায় অন্যত্র বলেন,

وَ اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

(আল-মায়েদা: ৬৫)

এ আয়াতগুলোর অর্থ হলো, আমরা কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে রেখেছি। অতএব উল্লিখিত আয়াতের অর্থ যদি এটি হয় যে, কিয়ামতের পূর্বে সকল ইহুদী হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি

ঈমান আনবে তাহলে আবশ্যকীয়ভাবে কোনো সময় ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের পারস্পরিক শত্রুতাও দূরীভূত হয়ে যাবে আর ইহুদী ধর্মের বীজ পৃথিবীতে থাকবে না অথচ পবিত্র কুরআনের এই আয়াত এবং অন্য বেশ কিছু আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, ইহুদী ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, তবে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাদের নিত্যসাথি হবে আর তারা অন্যান্য শক্তির ছত্রছায়ায় (পরজীবী হয়ে) জীবন কাটাবে। অতএব উল্লিখিত আয়াতের সঠিক অনুবাদ হলো, আহলে কিতাবের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে মহানবী (সা.)-এর প্রতি বা হযরত ঈসার প্রতি ঈমান আনবে। বস্তুত مَوْتِهٖ (মাওতিহী) শব্দের সর্বনামটি আহলে কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত ঈসার প্রতি নয়, এ কারণে এই আয়াতের অন্য কিরাআতে مَوْتِهِمْ (মাওতিহিম) শব্দ রয়েছে। যদি হযরত ঈসার প্রতি এ সর্বনামটি ইঙ্গিত করত তাহলে অন্য কিরাআতে مَوْتِهِمْ (মাওতিহিম) কেন ব্যবহৃত হতো? তফসীর সানায়ী দেখো! তাতে অত্যন্ত জোরালোভাবে আমাদের এই বিবৃতির সত্যায়ন বিদ্যমান। তাতে এটিও লেখা আছে যে, আবু হুরায়রা (রা.)-এর দৃষ্টিতে এটিই অর্থ। কিন্তু তফসীরকারক লেখেন, আবু হুরায়রা কুরআনের মর্ম বুঝার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন আর বিষয়ের অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবনের সামর্থ্য সম্পর্কে তাঁর বিষয়ে হাদীস বিশারদদের আপত্তি রয়েছে। আবু হুরায়রা-র মাঝে নকল করার বৈশিষ্ট্য ছিল আর বিচারবিশ্লেষণ করার সামর্থ্যের ঘাটতি ছিল। আমি বলব, যদি আবু হুরায়রা (রা.) এমন অর্থ করে থাকেন তাহলে এটি তাঁর ভুল যেভাবে অন্য অনেক স্থানে হাদীস বিশারদগণ প্রমাণ করেছেন। অর্থাৎ যে-সব বিষয় বুঝার ও হাদীস-সংক্রান্ত বিচারবিশ্লেষণের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বুঝতে তিনি হোঁচট খান এবং ভুল করেন। এটি স্বীকৃত বিষয় যে, একজন সাহাবীর মতামত শরীয়তের বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ হতে পারে না। শরীয়ত-সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রমাণ বা সনদ কেবল সাহাবীদের (রা.) ইজমা হতে পারে। অতএব আমরা বর্ণনা করে এসেছি– সাহাবীদের এ মর্মে ইজমা রয়েছে যে, সব নবী ইন্তেকাল করেছেন।

স্মরণ রাখা উচিত, যেখানে আয়াত قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর একটি দ্বিতীয় কিরাআত قَبْلَ مَوْتِهِمْ বিদ্যমান রয়েছে যা হাদীস-বিশারদদের নীতি অনুসারে সঠিক হাদীসের শ্রেণিভুক্ত অর্থাৎ এমন হাদীস যা মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রমাণিত, সেক্ষেত্রে কেবল আবু হুরায়রা-র নিজের কথা পরিত্যাজ্য, কেননা তা মহানবীর

কথার সামনে তুচ্ছ ও অর্থহীন। এটি নিয়ে বাড়াবাড়ি অবিশ্বাস বা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। আর কেবল এতটুকুই নয়, বরং আবু হুরায়রা-র কথা মানলে পবিত্র কুরআনের মিথ্যা হওয়া অবধারিত হয়ে যায়। কেননা পবিত্র কুরআন বিভিন্ন স্থানে বলে, ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হবে না। অপরদিকে আবু হুরায়রা বলেন, ইহুদীরা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে– এটি সম্পূর্ণরূপে কুরআন পরিপন্থি (বক্তব্য)। যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস করে, তার উচিত আবু হুরায়রা-র কথাকে পরিত্যাজ্য বস্তুর ন্যায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। বরং মুহাদ্দিসীনের নীতি অনুসারে দ্বিতীয় কিরাআতটি সঠিক হাদীসের মর্যাদা রাখে আর এখানে আয়াত قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর দ্বিতীয় কিরাআত قَبْلَ مَوْتِهِمْ বিদ্যমান, যাকে সঠিক হাদীস মনে করা উচিত। এমন পরিস্থিতিতে আবু হুরায়রার উক্তি কুরআন ও হাদীস উভয়টির পরিপন্থি।

فلا شكّ انّه باطل ومن تبعه فانّه مفسد بطّال۔

(অতএব এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তার উক্তিটি মিথ্যা আর যে এটি অনুসরণ করবে সে নৈরাজ্যবাদী ও মিথ্যাবাদী। –অনুবাদক)

লেখা সমাপ্ত হলো

উপসংহার

পরিশেষে লিপিবদ্ধ করার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ কথা দৃষ্টিতে রয়েছে তা হলো, বিগত চারটি খণ্ডে যে-সব বিষয় বা যে-সব এলহাম সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে বা যে-সব ভবিষ্যদ্‌বাণী সেসব খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ তা সে যুগে পূর্ণ হয় নি কিন্তু পরবর্তীতে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছে সেসব বিষয় ঘটার বা প্রকাশিত হবার কথা এই পরিশিষ্টের নোটে উল্লেখ করাই হলো উদ্দেশ্য। আর যে-সব বিষয়ের স্বরূপ পরবর্তীতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সেসব বাস্তবতার কথা এতে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। অতএব এই পঞ্চম খণ্ডটি পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোর ব্যাখ্যা বা তফসীর। যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তা'লা নিজের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা না করতেন ততক্ষণ পর্যন্ত এমন ব্যাখ্যা করা আমার জন্য সাধ্যাতীত ছিল। কেননা পূর্বের খণ্ডগুলোর এলহামী ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোতে অনেক নিদর্শন পূর্ণ হবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আর এই প্রতিশ্রুতিও রয়েছে যে, খোদা তা'লা এ অধমকে পবিত্র কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান দান করবেন। সেসব খণ্ডে আমার নাম মরিয়ম, ঈসা, মূসা এবং আদম রাখা হয়েছে; এককথায় সকল নবীর নাম আমাকে দেওয়া হয়েছে। কেন রাখা হয়েছে, সেই রহস্য কী তা-ও জানা ছিল না। এসব বিষয় অনুধাবন করা ঐশীশক্তি ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, বিশেষভাবে ঐশী নিদর্শনাবলি প্রকাশ করা এমন একটি বিষয় যা স্পষ্টতই মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। এসব বিষয় প্রকাশের জন্য খোদা তা'লা একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন আর গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড রচনা করা সেসব বিষয়ের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল ছিল। অতএব এমন ক্ষেত্রে সেসব বিষয় প্রকাশিত হওয়া ছাড়া যা পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোর জন্য ব্যাখ্যাস্বরূপ– পঞ্চম খণ্ড লেখা সম্ভব নয়, কেননা সে বিষয়গুলোই পঞ্চম খণ্ডের মূল প্রতিপাদ্য। অপেক্ষা বা স্থগিতাবস্থার যখন ২৪শ বছর এলো তখন ঐশী কৃপার মৃদুমন্দ বাতাস সেসব বিষয় যা বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে অপ্রকাশিত ও পর্দাচ্ছন্ন ছিল, সেগুলোর ওপর সার্বিকভাবে আলোকপাত করেছে। একদিকে সেসব প্রতিশ্রুত ভবিষ্যদ্‌বাণী, যেগুলো পূর্ণ হবার প্রতীক্ষা ছিল, সেগুলো পরিষ্কারভাবে পূর্ণ হয়েছে, অপরদিকে কুরআনে বিধৃত সত্য ও নিগূঢ় রহস্যাবলি যা তত্ত্বজ্ঞানকে পূর্ণতা দান করে তা যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়ে গেছে। পক্ষান্তরে আমাকে নবীদের নাম দেবার যে রহস্য পূর্বের খণ্ডগুলোতে অপ্রকাশিত ছিল, অর্থাৎ আমাকে যে-সব নবীর নাম দেওয়া হয়েছে সেগুলোর

স্বরূপও যথাযথভাবে উন্মোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্বের খণ্ডগুলোতে খোদা তা'লা কর্তৃক আমাকে সকল নবী (আ.)-এর নাম দেবার কথা বলছি। বনী ইসরাঈলের খাতামুল আম্বিয়ার নাম ঈসা এবং ইসলামের খাতামুল আম্বিয়া আহমদ ও মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম আমাকে প্রদানের অজানা রহস্যও যখন প্রকাশ পেয়ে গেল (তখন এই পুস্তক রচনার সময় এলো)। আর আমার নাম উর্ধ্বলোকে ঈসা ইত্যাদি রাখা, এমন একটি রহস্য ছিল যা খোদা তা'লা শত শত বছর সেভাবে গোপন রেখেছিলেন যেভাবে আসহাবে কাহাফ বা গুহাবাসীদের গোপন রেখেছিলেন। সে যুগের আগমন পর্যন্ত সেসব রহস্য অজানা থাকা আবশ্যক ছিল যা আদি থেকে নির্ধারিত ছিল। সে যুগ যখন এসে গেল আর এসব কথা পূর্ণ হয়ে গেল তখন পঞ্চম খণ্ড লেখার সময় এসে গেল। এ বিষয়টি বারাহীনে আহমদীয়ার কাজ শেষ হওয়াকে ২৩ বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করেছে। এগুলো হলো খোদার রহস্য যা সম্পর্কে তিনি যদি অবহিত না করতেন, তাহলে মানুষ অবগত হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি– যে এই পঞ্চম খণ্ড পড়বে, সে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে, এসব ভবিষ্যদ্‌বাণী ও অন্যান্য রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবার পূর্বে যদি পঞ্চম খণ্ড লেখা হতো তাহলে তা পূর্বের অংশগুলোর প্রকৃত মর্ম তুলে ধরার ক্ষেত্রে আদৌ দর্পণ সাব্যস্ত হতে পারত না, বরং তা লেখা নিছক বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন একটি বিষয় হতো। কাজেই, সেই খোদা– যিনি প্রজ্ঞাশীল ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আর যাঁর প্রতিটি কাজ সময়োপযোগী হয়ে থাকে; তিনি চেয়েছেন, প্রথমে সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী ও সকল নিগূঢ় সত্য প্রকাশ পেয়ে যাক, যা পূর্ববর্তী খণ্ডগুলো লেখার সময় অপ্রকাশিত ছিল; এরপর পঞ্চম খণ্ড লেখা হোক যেন তা সেসব বিষয় প্রকাশের ও পূর্ণতার সংবাদ দেয়। সত্যিকার অর্থে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডগুলো যে-সব বিষয়ের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে সেগুলোর জন্য এমন একটি অপেক্ষার যুগ কাটানো আবশ্যক ছিল, যা এ ধরনের পঞ্চম খণ্ড ছাড়া পূর্ণ হতে পারত না। কেননা এই চারটি খণ্ডের একটি বড়ো অংশ হলো, বিভিন্ন ভবিষ্যদ্‌বাণীর সমন্বয়– যাতে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আগামীতে খোদা অমুক অমুক বিষয়াদি প্রকাশ করবেন। আর সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কারো পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না যে, সেসব এলহাম– যাতে এসব ভবিষদ্‌বাণী রয়েছে– তা খোদার পক্ষ থেকে। এ কারণেই সকল বিরোধী সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণীকে অস্বীকার করেছে। খোদা চাইতেন না যে, তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক।

পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোর সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপনের পূর্বে একটি বিচ্ছিন্ন পঞ্চম খণ্ড রচনা করা গবেষকসুলভ রীতির পরিপন্থি। অতএব ঐশী নিয়তির, এ অধমকে পঞ্চম খণ্ড রচনা করা হতে এত দীর্ঘ সময় বিরত রাখা আবশ্যক ছিল, যতদিন সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী ও অন্যান্য বিষয় প্রকাশ না পেয়ে যায় যা প্রথম চারটি খণ্ডে অপ্রকাশিত ও প্রচ্ছন্ন ছিল। অতএব সকল প্রশংসা ও সব কৃপা খোদা তা'লার যে, এই সময়ের মধ্যে, যার পুরো মেয়াদকাল ২৩ বছর, সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকাশিত হয়ে গেছে আর সেসব উপকরণ স্বয়ং খোদা সরবরাহ করেছেন। নিদর্শনাবলি প্রকাশিত হবার পাশাপাশি খোদা তা'লার দিব্যদর্শনমূলক বিকাশ ইসলামের প্রকৃত মর্ম এবং পবিত্র কুরআনের কঠিন আয়াতগুলোর অর্থ আমার সামনে উন্মোচিত করেছে। সুমহান সেসব সূক্ষ্ম বিষয় নিজ শক্তিবলে অবগত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই ব্যবস্থা হবার পর আমি পঞ্চম খণ্ডে, প্রথম চার খণ্ডের সেসব স্থানের ব্যাখ্যা লেখার যোগ্যতা অর্জন করেছি যা পূর্বে লিখতে পারতাম না। অতএব আমি এই পুরো উপকরণের ব্যবস্থা হবার পর এ সংকল্প করি যে, প্রথমে এই সমাপিকায় ইসলাম কাকে বলে তথা ইসলামের বাস্তব ও প্রকৃত অর্থ কী– তা তুলে ধরব, পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনের সুমহান ও সম্পূর্ণ শিক্ষা এর আয়াতের আলোকে কিছুটা বর্ণনা করব এবং এটি প্রকাশ করব যে, ইসলাম বলতে যা বুঝায়– তা-ই কুরআনের সকল আয়াতের কেন্দ্রবিন্দু এবং কুরআনের সকল আয়াত এরই চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। এরপর সে নিদর্শনগুলোর কথা উল্লেখ করব, যার প্রতিশ্রুতি বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে দেওয়া ছিল যে, এগুলো আমার হাতে প্রকাশিত হবে; আর যা ছিল পবিত্র কুরআন অনুসরণের একটি স্বাভাবিক ফল। এছাড়া সবার শেষে সেসব এলহামের ব্যাখ্যা লিখব, যাতে আমার নাম খোদা তা'লা ঈসা রেখেছেন অথবা অন্যান্য নবীদের নামে আমার নাম রেখেছেন। একইভাবে আরো কিছু এলহামী বাক্য বর্ণনা করেছেন– যেগুলো ব্যাখ্যার দাবি রাখে। অতএব উল্লিখিত প্রয়োজনের নিরিখে এই পরিশিষ্টকে চার অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ ইসলামের স্বরূপ তুলে ধরা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পবিত্র কুরআনের সুমহান ও পরিপূর্ণ শিক্ষা বর্ণনা করা।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ সেসব নিদর্শন বর্ণনা করা, যেগুলো বারাহীনে আহমদীয়ায়

প্রকাশিত হবার প্রতিশ্রুতি ছিল আর আমার হাতে খোদা তা'লা তা পূর্ণ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ সেসব এলহামের ব্যাখ্যায়, যেগুলোতে আমার নাম ঈসা রেখেছেন অথবা অন্যান্য নবীর নামে আমার নাম রেখেছেন। একইভাবে আরো কিছু এলহামী বাক্য বর্ণনা করেছেন, যা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এখন এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিম্নে চারটি অধ্যায়ের সূচনা হবে, ইনশাআল্লাহ।

وَمَا تَوْفِيْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ رَبِّ اَنْطِقْنَا بِالْحَقِّ وَاكْشِفْ عَلَيْنَا الْحَقَّ وَاهْدِنَا اِلٰى حَقٍّ مُّبِيْنٍ۔
اٰمِيْنْ ثُمَّ اٰمِيْنْ ۵ ؕ

(সামর্থ্য খোদার পক্ষ থেকেই আসে। হে প্রতিপালক-প্রভু! তুমি আমাদের মুখ থেকে সত্য নিঃসৃত করো আর আমাদের সামনে সত্য প্রকাশ করো অধিকন্তু আমাদেরকে সুস্পষ্ট সত্যের পানে পরিচালিত করো। আমীন, সুম্মা আমীন। –অনুবাদক)

==== ** ====

নিম্নে সেসব বিষয় উপস্থাপন করা হচ্ছে যা হযরত আকদাস এই প্রবন্ধ সম্পর্কে লিখেছিলেন আর যা তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে হস্তগত হয়েছে–

পবিত্র কুরআনের সেসব আয়াত যা এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হবে, ইনশাআল্লাহ–

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

[ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগ (বা জোরজবরদস্তি) নাই। নিশ্চয় সৎপথ ভ্রান্তপথের বিপরীতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে –অনুবাদক] (আল-বাকারা:২৫৭)। পৃ. ৫৬।

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ

অর্থাৎ যদি তোমরা দানখয়রাত প্রকাশ্যে করো তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা দানখয়রাত গোপন রাখো তা হলে তা অনেক ভালো; এমন দানখয়রাত তোমাদের পাপ দূরীভূত করবে (আল-বাকারা: ২৭২)। পৃ. ৬০।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

(আল-বাকারা: ২৭৫)। পৃ. ৬১।

[যারা নিজেদের ধনসম্পদ রাতে ও দিনে (এবং) গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালক-প্রভুর কাছে নির্ধারিত। আর তাদের কোনো ভয় নাই এবং তারা দুঃখভারাক্রান্তও হবে না –অনুবাদক]।।

* **নোট:** উদ্ধৃত এই পৃষ্ঠাগুলোর নম্বর সেই কুরআন মজীদের যা এই পুস্তক রচনার সময় হুযূর (আ.)-এর কাছে ছিল।

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَ لْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ

অর্থাৎ যেন তাদের মঙ্গল হয় (আল-বাকারা: ১৮৭)। পৃ. ৩৭। দ্বিতীয় পারা।

তাদের উচিত আমার নির্দেশাবলি মান্য করা আর আমার প্রতি ঈমান আনা, যেন তাদের মঙ্গল হয়।

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

(আল-বাকারা: ২০১)। পৃ. ৪১। দ্বিতীয় পারা।

তোমরা ভালোবাসায় আপ্লুত হৃদয়ে খোদাকে স্মরণ করো যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতা-পিতামহকে স্মরণ করে থাকো।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَّشْرِیْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ

(আল-বাকারা: ২০৮)। পৃ. ৪২। দ্বিতীয় পারা।

কিছু লোক এমন আছে যারা নিজেদের প্রাণ খোদার পথে বিক্রি করে দেয়, যেন যে-কোনোভাবে তিনি সন্তুষ্ট হন।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِی السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ

অর্থাৎ হে বিশ্বাসীগণ! খোদার পথে আত্মোৎসর্গ করো আর শয়তানের পথ অবলম্বন করবে না, কেননা শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। এখানে শয়তান বলতে সেসব লোককে বুঝায় যারা পাপের শিক্ষা দেয় (আল-বাকারা: ২০৯)। পৃ. ৪৩।

لَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَیْمَانِكُمْ

(আল-বাকারা: ২২৫)। পৃ. ৪৬।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰی

(আল-বাকারা: ২৬৫)। পৃ. ৫৮।

كَالَّذِیْ یُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا

(আল-বাকারা: ২৬৫)। পৃ. ৫৮।

পবিত্র কুরআনে এই বিশেষ সৌন্দর্য বিদ্যমান যে, এর নৈতিক শিক্ষা সমগ্র বিশ্বের জন্য; কিন্তু ইনজীলের চারিত্রিক শিক্ষা শুধু ইহুদীদের জন্য।

নিম্নের আয়াতে পবিত্র কুরআন অন্যান্য উম্মতের পুণ্যবানদেরও প্রশংসা করে।

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

(আলে ইমরান: ১১৪-১১৫)। পৃ. ৮৫।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۖ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

(আলে ইমরান: ১১৯-১২০)। পৃ. ৮৭।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

(আন-নিসা: ৫০)। পৃ. ১১৪।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

(আন-নিসা: ৫৯)। পৃ. ১১৫।

(ইহুদী ও মুসলমানদের মাঝে এ সংক্রান্ত মহানবীর শিক্ষা বা সিদ্ধান্ত)

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا

(আন-নিসা: ৮৬)। পৃ. ১২১।

আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا

(আন-নিসা: ৯৪)। পৃ. ১২৩।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

(আন-নিসা: ৯৫)। পৃ. ১২৩।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا

(আন-নিসা: ১২৬)। রুকূ: ১৮। পঞ্চম পারা। পৃ. ১৩০।

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

(আন-নিসা: ১২৯)। রুকূ: ১৯। পৃ. ১৩০।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ

(আন-নিসা: ১৩৬)। পঞ্চম পারা। পৃ. ১৩৬।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا

(আন-নিসা: ১৩৭)। পৃ. ১৩২।

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا.....وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

(আল-বাকারা: ১৩৭)। পৃ. ২৭।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ

(আল-বাকারা: ১৩৮)। পৃ. ২৭।

যদি তারা সেভাবে ঈমান আনে যেমনটি তোমরা ঈমান এনেছ তাহলে তারা হিদায়াত পেয়ে যাবে। আর যদি সেভাবে ঈমান না আনে তাহলে তারা এমন জাতি যারা বিরোধিতা পরিত্যাগ করতে চায় না এবং মীমাংসার প্রত্যাশী নয়।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ ۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

(আন-নিসা: ১৬৬)। পৃ. ১৩৭।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا

(আন-নিসা: ১৫১-১৫২) । পৃ. ১৩৫ ।

وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ

(আন-নিসা: ১৪১) । পৃ. ১৩৩ ।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَ اٰمَنْتُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

(আন-নিসা: ১৪৮) । পৃ. ১৩৫ ।

اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۫ۚ وَ لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ

(আন-নিসা: ১৭২) । ষষ্ঠ পারা । পৃ. ১৩৯ ।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

(আল-মায়েদা: ০৪) । পৃ. ১৪১ ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

(আল-মায়েদা: ০৯) । ষষ্ঠ পারা । পৃ. ১৪৩ ।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى

(আন-নাহল: ৯১)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

(আল-মায়েদা: ৯১) । পৃ. ১৬১ ।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

(আলে ইমরান: ৩২)

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُکِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

(আল-আনআম: ১৬৩)। অষ্টম পারা। পৃ. ১৯৯-২০৮।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَکّٰىهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا

(আশ-শামস: ১০-১১)

...وَ مَنْ کَانَ فِیْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰی فَهُوَ فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی

(বনী ইসরাঈল: ৭৩)

وَ هُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ بُشْرًۢا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ کُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ کَذٰلِکَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰی لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوْنَ وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَ الَّذِیْ خَبُثَ لَا یَخْرُجُ اِلَّا نَکِدًا ؕ کَذٰلِکَ نُصَرِّفُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّشْکُرُوْنَ

(আল-আরাফ: ৫৮-৫৯)। অষ্টম পারা।
এর শস্য স্বল্পই উদ্‌গত হয়। পৃ. ২০৯।

وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا فِیْ قَرْیَةٍ مِّنْ نَّبِیٍّ اِلَّاۤ اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُوْنَ

(আল-আরাফ: ৯৫)। পৃ. ২১৫।

অর্থাৎ আর আমরা যখনই কোনো জনপদে কোনো রসূল পাঠিয়েছি তখন তাদের অস্বীকারের কারণে আমরা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারির মাধ্যমে পাকড়াও করেছি, যেন তারা এভাবে বিনয় অবলম্বন করে।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَکَانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰی عَفَوْا وَّ قَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَ السَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ

(আল-আরাফ: ৯৬)। নবম পারা। পৃ. ২১৫।

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤی اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰکِنْ کَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ

(আল-আরাফ: ৯৭)। পৃ. ২১৫।

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤی اَنْ یَّاْتِیَهُمْ بَاْسُنَا بَیَاتًا وَّ هُمْ نَآئِمُوْنَ اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤی اَنْ یَّاْتِیَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًی وَّ هُمْ یَلْعَبُوْنَ

(আল-আরাফ: ৯৮-৯৯)। পৃ. ২১৫।

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

(আল-আরাফ: ১৫৮)। নবম পারা। পৃ. ২২৫।

অর্থাৎ এই নবী সেসব বিষয়ের নির্দেশ দেয় যা বিবেক পরিপন্থি নয় আর সেসব বিষয় থেকে বিরত রাখে, যা হতে বিবেক বারণ করে আর পবিত্র সব জিনিসকে বৈধ আখ্যা দেয় আর অপবিত্র জিনিসকে হারাম আখায়িত করে। এছাড়া বিভিন্ন জাতির মাথা হতে সেসব বোঝা অপসারণ করে, যার নীচে তারা চাপা পড়ে ছিল। অধিকন্তু সেসব বেড়ি থেকে তাদের মুক্তি প্রদান করে যার কারণে তারা ঘাড় সোজা করতে পারত না। অতএব যারা তার প্রতি ঈমান আনবে আর নিজেদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং তাকে সাহায্য করবে এবং সেই নূরের অনুসরণ করবে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে; তারা ইহকালে ও পরকালে সমস্যাবলি হতে মুক্তি লাভ করবে।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

(আল-আরাফ: ১৫৯)। নবম পারা। পৃ. ২২৫।

وَ الَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ

(আল-আরাফ: ১৭১)। পৃ. ২২৮।

অর্থাৎ যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং নামায কায়েম করে আমরা তাদের পুরস্কার বৃথা যেতে দেবো না।

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى

(আল-আরাফ: ১৭৩)। পৃ. ২২৯।

অর্থাৎ যে-সব আত্মা বা রূহের শক্তিবৃত্তি যাতে খোদার ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে তা বাস্তব অবস্থার নিরিখে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সেগুলো খোদার হাতের সৃষ্টি।

অতএব যদি এ প্রশ্ন উপস্থাপিত হয় যে, আমরা কীভাবে পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনব, কেননা উভয় শিক্ষার মাঝে পারস্পরিক বিরোধ রয়েছে।

এর উত্তর হলো, এতে কোনো স্ববিরোধ নেই। বেদের শ্লোকগুলোকে সহস্র সহস্রভাবে তফসীর করা হয়েছে, সেসব ব্যাখ্যার একটি হলো সেটি যা কুরআনসম্মত।

যে ব্যক্তি খোদাকে ভয় করে না সে একটি সত্য ও বাস্তব বিষয়ে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আচরণ করে যেন তা তাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চায়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

(আল-আনফাল: ৩০)। নবম পারা। পৃ. ২৩৯।

اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ

(আল-আনফাল: ৩৫)

অনুবাদ: হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো তাহলে তোমাদের মাঝে ও অন্যদের মাঝে খোদা একটি পার্থক্য সৃষ্টি করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদের খোদা মহাশ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

খোদা সেই ব্যক্তিকে ধ্বংস করেন– যে প্রমাণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গেছে আর জীবিত রাখেন তাকে– যে দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে জীবিত আছে।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(আল-আনফাল: ৬২)। দশম পারা। পৃ. ২৪৪।

অর্থাৎ আর বিরোধীরা যদি মীমাংসার হাত প্রসারিত করে তাহলে তোমরাও মীমাংসার হাত প্রসারিত কোরো আর খোদার ওপর নির্ভর করো।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ

(আল-আনফাল: ৬৩)। পৃ. ২৪৪।

নোট: ধর্ম কেবল বুলিসর্বস্ব কাহিনি নয়, বরং যেভাবে স্বর্ণ নিজের লক্ষণাবলির মাধ্যমে চেনা যায় ঠিক সেভাবে সত্যধর্মের অনুসারীকে তার নিজের জ্যোতির মাধ্যমে চেনা যায়।

অর্থাৎ আর মীমাংসার সময় হৃদয়ে প্রতারণা লালন করলে সেই প্রতারণার প্রতিকারের ক্ষেত্রে খোদা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ
اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

(আত-তওবা: ১৩)। দশম পারা। পৃ. ২৫০।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ
وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

(আত-তাওবা: ২৪)। দশম পারা। পৃ. ২৫২।

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

(আত-তাওবা: ১০৩)। দশম পারা। পৃ. ২৬৮।

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

(আত-তাওবা: ১১২)। একাদশ পারা। পৃ. ২৭১।

অনুবাদ: তারা সৌভাগ্যবান– যারা সবকিছু ছেড়ে দিয়ে খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। খোদার ইবাদতে নিবেদিত হয় এবং খোদার প্রশংসায় রত থাকে। আর খোদার শিক্ষা প্রচারের জন্য পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ায় এবং খোদার সামনে বিনত থাকে ও সিজদা করে। তারাই প্রকৃত মুমিন যাদেরকে মুক্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

(অর্থাৎ) খোদা তাঁর প্রকৃতির নিয়মে সমস্যাবলিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। অর্থাৎ সমস্যার লক্ষণাবলি যা ভীতি সঞ্চার করে। পরবর্তীটি হলো, সমস্যার জগতে পদার্পণ। এরপর এমন অবস্থা যখন নৈরাশ্য দেখা দেয়। অতঃপর রয়েছে সমস্যার অমানিশাপূর্ণ যুগ। অনন্তর ঐশী রহমতের প্রভাত। এ হলো পাঁচটি সময় যার দৃষ্টান্ত হলো পাঁচবেলার নামায।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

(আস-সাফ: ৩-৪)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ

(আল-আনআম: ২২)

[**প্রকাশকের কথা:** নিম্নে কয়েকটি আপত্তি এবং কিছু নিগূঢ় সত্য কথা উল্লেখ করা হচ্ছে যা এ বিষয় সম্পর্কে হুযূর (আ.) লিখেছিলেন এবং যা তাঁর নোটে পাওয়া গিয়েছে। এসব আপত্তির খণ্ডন ও কুরআনের শিক্ষানুসারে সেসব বাস্তব বিষয় সম্পর্কে তাঁর আলোকপাতের ইচ্ছা ছিল। একইভাবে বুদ্ধের একটি গ্রন্থ হতে কিছু বিষয় নিয়েছেন বলে মনে হয় যা সেই দিনগুলোতে তিনি (আ.) অধ্যয়ন করছিলেন আর যা সম্পর্কে তিনি কিছু লিখতে চাইতেন। যেমন:]

১. যত ঐশী গ্রন্থ রয়েছে, সেগুলোতে এমন নতুন কোন্ বিষয় আছে যা পূর্বে জানা ছিল না?

২. নবীগণ এমন কোন্ বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করেছেন যা পূর্বে সমাধানের ঊর্ধ্বে ছিল?

৩. নবীগণ আত্মার অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই বলেন নি আর পরজগতের কথাও কিছু বলেন নি, বরং খোদার কথাও বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারেন নি।

স্বাস্থ্যবিদ্যায় ঘুমকে প্রাকৃতিক কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু নবীগণ ঘুমের অন্য কারণ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন- اَمَنَةً نُّعَاسًا [অর্থাৎ শান্তিময় নিদ্রা। আলে ইমরান: ১৫৫) –অনুবাদক]।

৪. অতীতের ভুলভ্রান্তিকে দূর করে নি, আর জটিল বিষয়াদিরও সমাধান করে নি, বরং আরো জটিলতার মুখে ঠেলে দিয়েছে।

৫. বুদ্ধদেবের নৈতিক শিক্ষা সবচেয়ে মহান।

৬. যে জিনিসকে মানুষ ভালোবাসে তা হতে যদি তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে তা তার জন্য একটি শাস্তিতে পরিণত হয়।

৭. যে জিনিসকে মানুষ ভালোবাসে তা যদি হস্তগত হয় তাহলে তা তার জন্য একটি প্রশান্তি বয়ে আনে। وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ (সাবা: ৫৫)

৮. কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করা মুক্তির কারণ হয়ে থাকে।

৯. পৃথিবীতে কখনো মুক্তি লাভ হয় সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে, আবার কখনো সঠিক আমলের মাধ্যমে। আর কখনো সঠিক কথায় এবং কোনো সময়ে সৎকর্মের মাধ্যমে মুক্তি লাভ হয়। কোনো সময় মানবজাতির সাথে পূতঃপবিত্র সম্পর্ক মুক্তির কারণ হয়ে যায় আবার কোনো সময় খোদার সাথে নিবিড় সম্পর্ক দুঃখ-বেদনা দূরীভূত করে। কখনো কখনো এক বেদনা অন্য ব্যথার জন্য প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়।

১০. সত্য বলো, মিথ্যা বোলো না আর বৃথা কথাবার্তা এড়িয়ে চলো। নিজের কথা বা কর্মের মাধ্যমে কারো কোনো ক্ষতি কোরো না। নিজের জীবনকে পবিত্র রাখো আর পরচর্চা কোরো না। কারো প্রতি অপবাদ আরোপ কোরো না। রিপুর তাড়নাকে তোমার ওপর প্রভুত্ব করতে দিও না আর হিংসা ও বিদ্বেষ পরিহার করো। নিজের হৃদয়কে বিদ্বেষমুক্ত রেখো। নিজের শত্রুদের সাথে সেই ব্যবহার কোরো না, যা তুমি নিজের জন্য অপছন্দ করো। এমন উপদেশ অন্যদের দিও না, যা তোমরা নিজেরা মেনে চলো না। তত্ত্বজ্ঞানের উন্নতিতে লেগে থাকো। অজ্ঞতা থেকে হৃদয়কে মুক্ত করো। তড়িঘড়ি করে কারো বিরুদ্ধে আপত্তি কোরো না।

ঘৃণা করলে ঘৃণা দূর হয় না, বরং আরো বৃদ্ধি পায়। ভালোবাসা ঘৃণাকে প্রশমিত করে দূর করে দেয়।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

(আল-হাজ্জ: ৩৮)

অর্থাৎ হৃদয়ের পবিত্রতাই হলো সত্যিকার কুরবানী। মাংস ও রক্ত সত্যিকার কুরবানী নয়। যেখানে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন পশু কুরবানী করে সেখানে বিশেষ লোক হৃদয়কে জবাই করে।

কিন্তু খোদা তা'লা এই কুরবানীর ধারাও বন্ধ করেন নি, যেন বুঝা যায়, এসব কুরবানীর সাথেও মানুষের সম্পর্ক রয়েছে।

খোদা তা'লা বেহেশতের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে আরবের লোকদের

কাছে যে-সব জিনিস প্রিয় ছিল সেগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, যেন এভাবে তাদের হৃদয় এদিকে আকৃষ্ট হয়। অথচ বাস্তবে সেসব জিনিস এগুলো নয়, বরং ভিন্ন কিছু। কিন্তু এমনটি বর্ণনা করা আবশ্যক ছিল, যেন হৃদয়কে আকৃষ্ট করা যায়।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ

(মুহাম্মদ: ১৬) [বুদ্ধের গ্রন্থ, পৃ. ৭৯]

যে নিজের অবাধ্য প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করায় লেগে থাকে সে সত্যিকার অর্থে নিজেকে ধ্বংস করে। কিন্তু যে সত্যপথে চলে তার কেবল দেহই নয়, বরং আত্মাও মুক্তিপ্রাপ্ত।

যে স্বীয় প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার কাজে লেগে থাকে সে সত্যিকার অর্থে নিজেকে ধ্বংস করে যা কেবল দেহকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় না বরং আত্মাকেও ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু যে সোজা পথে চলে আর প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করে না, সে কেবল নিজের দেহকেই ধ্বংস থেকে রক্ষা করে না, বরং নিজের আত্মাকেও মুক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

(আশ-শামস: ১০-১১)

একটি গ্রামে একশটি বাড়ি ছিল কিন্তু শুধু একটি বাড়িতে প্রদীপ জ্বলত। মানুষ যখন জানতে পারল, তখন তারা সবাই স্ব স্ব প্রদীপ নিয়ে আসে আর সবাই সেই প্রদীপ দিয়ে নিজেদের চেরাগ বা প্রদীপ প্রজ্বলিত করে। এভাবে একটি প্রদীপ থেকে অনেক প্রদীপ জ্বলতে পারে। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

(আল-আহযাব: ৪৭)

সম্পদের মালিক হওয়া তো দূরের কথা মানুষ তো নিজের প্রাণেরও মালিক নয়। চামচ শরবতের স্বাদ উপভোগ করতে পারে না, যতবারই তাতে ডোবানো হোক না কেন। হাতের সাহায্যে মিষ্টি মুখ পর্যন্ত পৌঁছে ঠিকই, কিন্তু হাত মিষ্টির স্বাদ নিতে পারে না। এভাবে যাকে খোদা ইন্দ্রিয় দেন নি, সে মাধ্যম হলেও কিছুই লাভবান হতে পারে না।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ

(আল-আনআম: ১২৫)

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

(আল-বাকারা: ১৯)

একটি বড়ো আনন্দ ছোটো আনন্দের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন করে তোলে, যেমনটি খোদা তা'লা বলেন,

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

(আর-রাদ: ২৯)

...وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

(আল-আনকাবূত: ৪৬)

(১) ঈমান হলো বীজ (২) সৎকর্ম হলো বৃষ্টি (৩) চেষ্টাপ্রচেষ্টা বা সংগ্রাম হলো হালচাষ– যা দৈহিক ও বাহ্যিকভাবে করা হয়ে থাকে। পছন্দীয় নফস হলো ষাঁড়– যা কিনা নফসে লাউওয়ামা আর শরীয়ত সেটিকে পরিচালনার জন্য লাঠিস্বরূপ। আর যে শষ্যদানা এর ফলে উৎপাদিত হয় তা চিরস্থায়ী জীবন।

যে উত্তম গুণাবলি বিবর্জিত থাকে সে নিজের সত্তা বা পরিচিতিকে হারিয়ে ফেলে, কেননা উত্তম গুণাবলিই হলো তার সত্তা। নিজের হৃদয়ের আকর্ষণ বা আবেগ খুব কম মানুষই অনুধাবন করে। তারা যে-সব জিনিসে নিজেদের সুখ আছে বলে মনে করে, সত্যিকার অর্থে তা সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয় না।

যে ব্যক্তি অন্যায়ের বিপরীতে অন্যায় করে না বরং ক্ষমা করে দেয়, সে নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এর চেয়ে বেশি প্রশংসনীয় হলো সেই ব্যক্তি– যে ক্ষমা বা প্রতিশোধের বেড়াজালে বন্দি নয়, বরং খোদার সন্তুষ্টির মাঝে বিলীন হয়ে সময়ের দাবি অনুসারে কাজ করে। কেননা খোদা-ও সবার জন্য স্থানকালের দাবির নিরিখে কাজ করেন। যে শাস্তির যোগ্য, তাকে শাস্তি দেন আর যে ক্ষমার যোগ্য, তাকে ক্ষমা করেন।

جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

(আশ-শূরা: ৪১)

পৃথিবীতে দুটি শ্রেণির আধিক্য রয়েছে। এক শ্রেণি তারা– যারা ইনসাফ পছন্দ করে। দ্বিতীয় শ্রেণি তারা– যারা অনুগ্রহ করাকে পছন্দের দৃষ্টিতে দেখে। তৃতীয় শ্রেণি তারা– যাদের ওপর সত্যিকার সহানুভূতি এতটা প্রাধান্য বিস্তার করে যে, তারা ইনসাফ ও অনুগ্রহের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং সত্যিকার সহানুভূতির প্রেরণায় সময়ের দাবি অনুসারে কাজ করে। যেমনটি মা তার শিশুর সাথে করে থাকে অর্থাৎ মিষ্টি ও সুস্বাদু খাবারও তাকে খাইয়ে থাকে আবার সময়ের দাবি অনুসারে তিতা ঔষধও দিয়ে থাকে। উভয় ক্ষেত্রে তার

আমার বর্ণনায় এমন কোনো শব্দ থাকবে না যা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যাবে। আমরা এ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ, কেননা আমি তাদের পক্ষ থেকে শান্তি ও আরাম পেয়েছি। আমি আমার দাবি সম্পর্কে এতটা বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করি যে, আমি আমার পক্ষ থেকে নয় বরং খোদা কর্তৃক মনোনীত হয়ে প্রেরিত হয়েছি, যেন ভুলভ্রান্তি দূর করতে পারি, জটিল বিষয়াদির সমাধান দেই এবং অন্যান্য জাতিকে ইসলামের আলো দেখাতে পারি। স্মরণ রাখা উচিত, আমাদের বিরোধীরা ইসলামের যে-রূপ অপছন্দনীয় চিত্র প্রদর্শন করছে তা ইসলামের চিত্র নয়, বরং ইসলাম এমন এক উজ্জ্বল হীরা, যার প্রতিটি কোণ জ্বলজ্বল করছে। একটি বড়ো প্রাসাদে যদি অনেকগুলো প্রদীপ থাকে তাহলে কোনো প্রদীপ কোনো বাতায়ন পথে আর অন্য প্রদীপ অন্য কোনো কোণা থেকে দেখা যাবে– এটিই ইসলামের বাস্তব অবস্থা। অর্থাৎ এর ঐশী জ্যোতি কেবল এক দিক থেকে দেখা যায় না বরং সকল দিক থেকে এর চিরস্থায়ী প্রদীপ ঝলমল করছে। এর শিক্ষা নিজগুণে একটি প্রদীপ আর এর আধ্যাত্মিক শক্তি নিজেই একটি প্রদীপ। এর সাথে খোদার সাহায্যের যে-সব নিদর্শন রয়েছে সেগুলোর প্রতিটি নিদর্শন এক-একটি প্রদীপ। যে ব্যক্তি এর সত্যতা প্রকাশের জন্য খোদার পক্ষ থেকে আসে সে-ও একটি প্রদীপ। আমার জীবনের একটি বড়ো অংশ বিভিন্ন ফিরকার গ্রন্থাদি অধ্যয়নে কেটেছে। আমি সত্য সত্যই বলছি, আমি অন্য কোনো ধর্মের কোনো শিক্ষাকে কুরআনের শিক্ষার সমতুল্য পাই নি, হোক তা বিশ্বাসের দিক থেকে অথবা নৈতিক শিক্ষার দিক অথবা পারিবারিক বিষয়াদি-সংক্রান্ত আর

রাজনৈতিক বা সামাজিক দিক অথবা সৎকর্মের বণ্টন-সংক্রান্ত (বিষয়)। একথা আমি এ কারণে বলছি না যে, আমি একজন মুসলমান বরং সত্য আমাকে এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করে। আমার সাক্ষ্য অসাময়িক সাক্ষ্য নয়, বরং এমন সময়ের (সাক্ষ্য) যখন পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে মল্লযুদ্ধ চলছে। আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, এ যুদ্ধে অবশেষে ইসলাম জয়যুক্ত হবে। আমি জাগতিক কথাবার্তা বলি না, কেননা আমি পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক রাখি না, বরং আমি তা-ই বলি যা খোদা আমাকে দিয়ে বলান। পৃথিবীর মানুষ হয়ত ভাবতে পারে, চূড়ান্ত পর্যায়ে খ্রিষ্টধর্ম পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে বা বৌদ্ধধর্ম সমগ্র বিশ্বে প্রাধান্য পাবে, কিন্তু তারা এমন ধারণার ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে নিপতিত। দেখো! যতক্ষণ আকাশে কোনো কথা নির্ধারিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে কোনোকিছু প্রকাশিত হয় না। আকাশের খোদা আমাকে বলেন, অবশেষে ইসলাম ধর্ম হৃদয় জয় করবে। এই ধর্মীয় যুদ্ধে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন হাকাম বা ন্যায় বিচারকের সন্ধানীদের সতর্ক করি। আমার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায়– যে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত দলের সংবাদ প্রদান করে, যারা কোনো গ্রামের লোকদের উদাসীনতার ঘোরে তাদের গ্রামে ডাকাতি করতে চায়। কাজেই, যে তার কথা মেনে নেয় সে নিজের সম্পদ সেই ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করে আর যে মানে না তাকে লুণ্ঠন করা হয়। আমাদের সময়ে দুধরনের ডাকাত রয়েছে। কিছু বাইরের পথ বেয়ে আসে আর কিছু ভেতর থেকে আসে। আর সে-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যে নিজের সম্পদ নিরাপদ স্থানে রাখে না। এ যুগে ঈমানের (সাথে সম্পর্কযুক্ত) সম্পদ রক্ষা করার স্থান হলো, ইসলামের গুণাবলি ও সৌন্দর্যের জ্ঞান অর্জন করা, ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তির জ্ঞান অর্জন করা, ইসলামের জীবন্ত নিদর্শনাবলির জ্ঞান থাকা আর সেই ব্যক্তিকে চেনা, যাঁকে ইসলামের মেষগুলোর জন্য রাখাল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। কেননা অতীতের নেকড়ে আজও জীবিত, সে মরে নি। যে ভেড়াকে সে রাখালের নিকট থেকে দূরে দেখবে, সেটিকে অবশ্যই নিয়ে যাবে।

হে খোদার বান্দাগণ! আপনারা জানেন, অনাবৃষ্টির সময় অর্থাৎ যখন দীর্ঘকাল বৃষ্টি হয় না তখন এর চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে কূপও শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করে। অতএব যেভাবে জাগতিক ক্ষেত্রে বৃষ্টির পানি ভূমিতে থাকা পানিকে উদ্‌বেলিত করে, সেভাবে আধ্যাত্মিক পানি যা ঊর্ধ্বলোক থেকে আসা

পানি (অর্থাৎ খোদার ওহী) হয়ে থাকে তা হীন বিবেককে সতেজ করে; সে দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগও আধ্যাত্মিক পানির মুখাপেক্ষী।

আমি আমার দাবি সম্পর্কে এতটা বলা আবশ্যক মনে করি যে, আমি একান্ত প্রয়োজনের সময়ে খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি, কেননা এ যুগে অনেকেই ইহুদীদের রূপধারণ করেছে। কেবল তাকওয়া ও পবিত্রতাকেই বিসর্জন দেয় নি, বরং সেসব ইহুদীর ন্যায় হয়ে গেছে যারা হযরত ঈসার সময় সত্যের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে খোদা এর বিপরীতে আমার নাম মসীহ রেখেছেন। **কেবল আমিই এ যুগের লোকদের নিজের দিকে ডাকি না, বরং স্বয়ং যুগ আমাকে আহ্বান করেছে।**

BARĀHĪN-E-AḤMADIYYA

Ḥaḍrat Mirza Ghulam Ahmad[as] of Qadian claimed to be the same Promised Messiah and Mahdi that the Holy Prophet Muhammad[sa] prophesied would come to rejuvenate Islam and restore its original lustre.

During his early life, Mirza Ghulam Ahmad[as] saw a dream in which he handed a book of his own authorship to the Holy Prophet[sa]. As soon as the book touched the Holy Prophet's blessed hand, it transformed into a beautiful, honey-filled fruit which was then used to revive a dead person lying nearby.

The Promised Messiah[as] was inspired with the following interpretation:

> Allah the Almighty then put it in my mind that the dead person in my dream was Islam and that Allah the Almighty would revive it at my hands through the spiritual power of the Holy Prophet, may peace and blessings of Allah be upon him.

It is this very book—*Barāhīn-e-Aḥmadiyya*—which is to be instrumental in revitalizing Islam in the latter days in accordance with the grand prophecy of the Holy Prophet[sa]. Its subject matter is of universal importance and, as such, it will prove to be a source of lasting value for all readers. The significance of *Barāhīn-e-Aḥmadiyya* cannot be overstated.

ISBN 978-984-991-069-5

978-984-991-069-5